প্রথম প্রাকশ : জানুয়ারী ১৯৫৮, প্রকাশক : হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, মুদ্রাকর : দুর্গা প্রিন্টার্স, ১০।১।বি, রাধানাথ বসু লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ ।

লেখক-পরিচিতি

গিরিশচন্দ্র সেন—১৮৩৫/১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার পাঁচদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাধবরাম। ছাত্রজীবনে ফরাসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কেশচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ে উৎসাহিত হয়ে কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলামধর্ম অনুশীলন করেন। ছয় বছরের পরিশ্রমে 'কোর-আন্-শরীফ-এর সটীক বঙ্গানুবাদ করেন। এটিই কোরাণের প্রথম অনুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট দান। এছাড়া তিনি মূল ফরাসী গ্রন্থ থেকে গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা, হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষ মোহাম্মদ, খলিফাবর্গ, ৯৬ জন তাপস ও তাপসীর জীবনী, সবশুদ্ধ ৪২ খানি পুস্তক রচনা করেন। গোলস্তাঁ ও বুস্তাঁর হিতোপাখ্যানমালা (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল। মুসলমানেরা তাঁকে মৌলভী আখ্যা দিয়েছিল। তিনি রামমোহনের লেখা 'তুহফাৎ-উলমুয়াহ্‌দ্দীন'-এর বাংলায় তরজমা করে ধর্মতত্ব পত্রিকার প্রকাশ করেছিলেন। 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সহযোগী এবং 'মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্গচন্দ্র রায়—১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট ঢাকার পাঁচগা-তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামগতি রায়। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারকদের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। কেশবচন্দ্র 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে তার কার্যপরিচালনা ও উপাসনার ভার বঙ্গচন্দ্রকে দেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধর্মপ্রাণ অঘোরনাথ গুপ্তের মহৎ আদর্শে প্রাণিত হয়ে ঢাকা পগোজ স্কুলে শিক্ষকতা নেন ও ছাত্রদের নিয়ে ধর্মচর্চায় মন দেন। পরে তিনি চাকরি ত্যাগ করে ব্রহ্মোপাসনা, প্রচার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ঐ কাজের সহায়ক হিসাবে 'শুভসাধিনী' নামে এক সংবাদপত্র, ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 'বঙ্গবন্ধু' এবং The East নামে একটি ইংরাজীপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর হুগলীর বাঁশবেড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র মজুমদার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচার কার্যে ব্রতী হন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি কয়েকবার ইউরোপ ও আমেরিকা এবং একবার জাপান যান। শিকাগো বিশ্ব ধর্ম-সম্মেলনে যোগদান করেন। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজেই থেকে যান। ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এবং 'ইন্টারপ্রিটর' নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। 'Society for the Higher Training of Young Men' সমিতি গঠন করে তার সম্পাদক হন। তাঁর ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থের মধ্যে Oriental Christ, Spirit of God, The life and Teachings of Keshab Chandra Sen প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণার মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরমোহন দত্ত। গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ইনষ্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করেন। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকাবস্থায় প্রাইভেট এফ, এ, ও বি, এ, পাশ করেন। উমেশচন্দ্রের ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয় এবং তিনি সপরিবারে কেশবচন্দ্রের 'ভারত-আশ্রম' ভুক্ত হন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূল বিভিন্ন কাজে যোগ দেন। কেশবচন্দ্রের বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার প্রধান শিক্ষক এবং সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আমৃত্যু তার অধ্যক্ষ ছিলেন। 'বামাবোধিনী' 'ধর্মসাধন' ,'ভারত-সংস্কারক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'বামা রচনাবলী' ও 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার আবশ্যকতা' নামে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা

আশীষ

(কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও আত্ম-আলোচনা)

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

সূচনা

কালের নিঃশব্দ গতি বহিয়া ক্রমে ক্রমে ৬৩ বৎসর শেষ করিলাম। কিন্তু আজও জীবনপথে শ্রান্ত কি নিরুৎসাহিত নই। এখনও সকল সাধ পূর্ণ হয় নাই, সকল কাজ শেষ হয় নাই, যেন এখনও কত আয়ু, কত উদ্যম, কত আশা, কত যৌবন দেহ মনে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! কিন্তু এ সমস্ত এখানে না অন্যত্রে পূর্ণ হইবে। ভগবদিচ্ছা কি কে জানে—কে জানে কবে, কত বিলম্বে, কি অবিলম্বে কালান্ত-ধামে প্রবেশ করিব? তৎপূর্বে একবার জীবনদাতার নানা আশীর্বাদ স্মরণ করিব।

জীবনলাভ

সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান আশীর্ব্বাদ এই যে, হে জীবন-সত্তা, জীতিবেশ, তুমি আমাকে এই মহার্ঘ মানব জীবন দিলে। ক্ষুদ্র জীবাণু-বীজ, কোথা হইতে কিরূপে এ প্রকাণ্ড সংসারে রোপিত হইলাম, অঙ্কুরিত হইলাম, নানা প্রকার শক্তিতে ও সম্বন্ধে জড়িত হইলাম। এ দীর্ঘ জীবন পথে চলিতে চলিতে কত জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, স্বাস্থ্য, বল, সৌভাগ্য কুড়াইয়া পাইলাম, এখানে আসিয়া কত জনকে আপনার বলিয়া পাইলাম, কত জনের আত্মীয়তা পাইলাম। অচেষ্টাসত্ত্বে মন ও শরীর আয়ত্ত হইল, সক্ষম হইল; চারিদিকে আপনার শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া অন্যান্য জীবনের শাখা পল্লবকে অবলম্বন করিল; জন-সমাজের মধ্যে একজন হইলাম, ধর্ম্ম-সমাজের মধ্যে একজন হইলাম, মানবমণ্ডলীর মধ্যে একজন হইলাম। আরম্ভে কি ছিলাম, আজ কি হইয়াছি! একাকী ভবে আসিয়া ক্রমে শত সহস্র জনকে সমযাত্রী সঙ্গী পাইয়াছি; অদ্ভুত লীলাচক্রে ঘুরিতেছি! প্রেম-ধাম ইহ সংসার মধ্যে ক্রমে ক্রমে কি নিত্য নব দৃশ্য, কি অব্যক্ত বিভূতি দেখিলাম। কত অপরিমেয় বিচিত্র শব্দরাশি, কত গভীরতার তাৎপর্য্য—সপ্ত-স্বর মধ্যে কত সূক্ষ্ম গম্ভীর নিম্ন উর্দ্ধ স্বর, কত অশ্রুত অজানিত স্বর-তরঙ্গ, ভাবাতরঙ্গ, কত ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, কত তান, সমতান, লয় মহালয়! জ্যোতির্ম্ময় প্রাতঃ সন্ধ্যাতে, শান্ত নিশীথে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি নিগূঢ় আলাপ! ব্রহ্ম আদি-শব্দ, ব্রহ্মই অতি-শব্দ ব্রহ্মই অ-শব্দ! নানা স্বাদে, নানা গন্ধে, নানা মধুময় সংস্পর্শে তাঁহারই সাড়া ও সমাচার বুঝিতে পারি; তাঁহারই মঙ্গলকৃপা নিত্য নিত্য ভোজন করি, পান করি, সেবন করি, পরিধান করি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যমধ্যে বিচরণ করে। দেখি প্রতিজনেরই জীবন-ক্ষেত্রে কত বিপরীত অবস্থার সমন্বয়,—কত আতঙ্ক ও অভয়, কত আঘাত ও আরোগ্য, কত দৈন্য ও কর্ত্তৃত্ব, কত প্রলোভন, পতন ও পুনরুত্থান। বিনা অন্বেষণ ও বিনা চেষ্টায় লব্ধ এই মানব জীবনের মত পরম বিস্ময়কর বস্তু আর কিছুই নাই,—কিন্তু সাধারণতঃ এ জীবনের

অপচয়, অপব্যবহার, অনাদর ও অসার্থকতা দেখিয়া অবাক হই। এই অমূল্য আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়া আমি ইহার কিরূপ ব্যবহার করিলাম? ভবিষ্যতে ইহার পরিণতি কোথায়? এই নানা অবস্থা ঘটিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতরে জীবন-রূপে প্রচ্ছন্ন, হে জগজ্জীবন, তুমি যে স্বয়ং সাক্ষাৎ বিদ্যমান, এতে আমার কোন সন্দেহ নাই। বুঝিয়াছি মানব জীবন পার্থিব বস্তু নহে; জীবন পাওয়া আর তোমাকে পাওয়া; অত্যন্তঃ তোমাকে পাইবার অধিকার ও সম্ভাবনা লাভ করা একই কথা। মানব জীবনের মর্ম্মে পরমাত্মা পরব্রহ্মেরই নিগূঢ় সাদৃশ্য। ইহার অজানিত আরম্ভ, অসীম গতি, অস্পষ্ট নিয়তি, অপরিজ্ঞাত উন্নতি ও অবনতি; ইহার ক্রমান্বয়ে জড়ত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব এবং তজ্জনিত নিগূঢ় আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত; ইহার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও স্পৃহা, ইহার সিদ্ধি অসিদ্ধি, আশা ও আপেক্ষ; ইহার বিবিধ প্রণয় ও বিচ্ছেদ, ইহার অলক্ষিত ক্ষয়, অব্যর্থ বিনাশ, এবং তদতীত মহান অবস্থা অতিশয় আশ্চর্য্য। হেতু-বিহীন, অযাচিত মঙ্গল-প্রেম হইতে এই অমূল্য জীবন লাভ করিলাম; অলক্ষিত কৃপাবলে ইহা এতকাল রক্ষিত হইল; এখন সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারই চরণে, হে প্রাণদাতা, এই প্রাণ উৎসর্গ করি। যদি ইহ সংসারে আসিয়া আর কিছুই করিতে না পারিয়া থাকি, কেবল যদি তোমারই উদ্দেশে, তোমারই প্রভাবমধ্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকি ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব।

পরিবার

ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তা প্রসন্ন ভাবে আমাকে উচ্চকুলে, মধ্যবিত্ত সম্পন্ন পরিবারে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে মা বাপ হারাইয়া নানা অযত্নে ও অনিষ্টে বাল্যকাল কাটিয়াছে: সে কথা ভাবিয়া এখনও এক একবার ক্ষুব্ধ হই। ভাল শিক্ষা পাই নাই, ভাল দৃষ্টান্ত দেখি নাই। ইহার মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন হিতকার অভিপ্রায় নিহিত ছিল আগে তাহা বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারি। ভগবদাশ্রিত জনের পক্ষে ইষ্ট অনিষ্ট সকল অবস্থাই কাল সহকারে ইষ্টেতে পরিণত হয়,— আমি তার সাক্ষী।

প্রারম্ভ কালে

জননী মহাপ্রকৃতি শৈশবে আমাকে শিষ্ট মিষ্ট তুষ্ট স্বভাব দিলেন, অযত্নে পালিত হইয়াও রুষ্ট কি তিক্ত-প্রকৃতি হই নাই, সর্ব্বদা সন্তোষে আমোদে থাকিতাম। সুতীক্ষ্ন মেধা, সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ও শারীরিক স্বাস্থ্য পাইয়া ছিলাম, কিন্তু তদ্বারা লোকের ভালমন্দ ব্যবহারে বিচার করিতে যাইতাম না—সকলই ভাল বোধ হইত। যোগ্য অভিভাবক বিনা যে যথাকালে নিয়মিত জ্ঞান ও নীতি-শিক্ষা লাভ হয় নাই সেজন্য

সময়ে সময়ে অনেক দুর্গতি হইয়াছে, মনে পড়িলে এখনও বিষণ্ণ হই। আমাকে একেবারে অগতি দেখিয়া কোন্ দিব্যগুরু আমার শিক্ষা ও চালনার ভার লইলেন,—কার প্রভাবে ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে আহূত হইয়া আমি নানা মহাসত্য শিখিলাম,—নানা উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিলাম, আজ তাহা স্মরণ করিবার দিন। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দোষ গুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শেষে যৌবনে ধর্ম্মালয়ে দিব্য সার শিক্ষা লাভ করিয়াছি। ক্রমাগত আজ পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি হইয়াছে। ভগবৎ-প্রভাবে আজ আমি কোন্ বিদ্যার অনধিকারী ? বিদ্বান না হই কিন্তু বিদ্যার্থী চিরদিন। অন্তরাত্মার উত্তেজনায় এই অনিবার্য্য জ্ঞানস্পৃহা ধর্ম্মস্পৃহা আমাকে নানা প্রগাঢ় চেষ্টা সাধনাতে নিযুক্ত করিল, এবং নানা অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়ে সে চেষ্টা পূর্ণ হইল, আরও পূর্ণ হইবে। ইহাই আমার পক্ষে দিব্যশিক্ষা। কিন্তু তথাপি দেখ নানা বিষয়ে আমি আজ কতদূর অনভিজ্ঞ ! আমি চিরকাল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের পদানত শিক্ষার্থী ; তিনি আমার দিব্যগুরু, নিত্যগুরু, হৃদিস্থিত অভ্রান্ত দেবর্ষি। হে চৈতন্যময়, তোমাকে প্রণিপাত করি !

শৈশব রহস্য

নির্দ্দোষ ও নির্ব্বোধ অতি-শৈশবে আমার সঙ্গে একজন আনন্দময়-সত্তা কিরূপ ব্যবহার করিতেন, কত ক্রীড়া আমোদ করিতেন তাহা মনে আছে, এখনও ভুলি নাই : মনে পড়িলে বড় কৌতুকাবিষ্ট হই ! বোধ হয় সকল সুজাত সুস্থ-শরীর শিশুর সঙ্গে অন্তরাত্মা এরূপ বিহার করিয়া থাকেন—শিশুর নিকটে শিশু, কুমারীর নিকটে কুমারী, প্রবীণের নিকটে প্রবীণ, কত ভাবে ভগবানের প্রকাশ ! কারণহীন তীব্র অহ্লাদ লইয়া তিনি আমার নিকট যাতায়াত করিতেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেন হাসিতাম, কেন কোলাহল করিতাম ? সে প্রমত্ত আহ্লাদ সংসারজনিত নয়, কেবল দৈহিক ক্রিয়াও নয় —মানসিক, নিগূঢ়রূপে আত্মিক অবস্থা—তাহা কোথা হইতে আসিত, ভিতর হইতে না বাহির হইতে ? বোধ হয় দুদিক হইতেই। যা দেখিতাম তাই ধরিতে যেতাম, খাইতে যেতাম, মর্ম্মের ভিতর রাখিতে যেতাম। আকাশের চাঁদই হউক, আর সন্ধ্যা-তারাই হউক, সহাস্য মাতৃ-মুখই হউক ; যোলার ফুল, মাটির পুতুল, কাঠের চুশী, সকলই সমান, আমার মহা প্রিয়বস্তু। প্রিয় অপ্রিয় এ বিচারই শিখি নাই, সকলই আনন্দময় ও প্রেমময়। সে প্রভা ও পুলক আর কিছু নয়, স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ের মুখ-শ্রী ! এখন বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মজ্ঞান বাড়িয়াছে ; মায়া-বন্ধনে, জড়িত হইয়াছি, তেমন সহজে ও স্বাভাবিক আকারে আর ভগবানকে দেখিতে পাই না। তবে ধর্ম্মসাধন জনিত গভীরতর যোগ লাভ করিয়া এখন দেখিতেছি শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে অন্তরাত্মার

একই অখণ্ড লীলা; কেবল অবস্থা ও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার। জননী, আমি তোমার কাছে তখনও অবোধ, এখনও অবোধ, তোমাতে তখনও হৃষ্ট, এখনও হৃষ্ট। তবে যদি জীবন-প্রভাতে না চাহিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, জীবন অবসানে চাহিয়া যেন তোমাকে পাই।

স্নেহ-প্রবণ প্রকৃতি

প্রথম বয়স হতেই আমার স্বভাব মধ্যে প্রবল মাত্রায় ভালবাসার প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হইল; ভালবাসা দিতে ও পেতে চিরদিন আমি সমান ইচ্ছুক ও প্রস্তুত; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বন্ধুতার আকারে কোন কোন সমবয়স্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে নানা পাপবিকারে জড়িত হয়। ভালবাসার অপব্যবহারে কোন্ পাপের উৎপত্তি হয় না? ভালবাসার যোগ্য ব্যবহার ও পবিত্র পরিণতিতে কোন্ মহৎ গুণ সঞ্চারিত হয় না? আজ এই জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মের প্রভাবে, ব্রহ্মসহবাস গুণে, অবিশ্রান্ত অনুতাপে, আত্মনিগ্রহে, বিবেকের শাসনে, শুদ্ধাত্মা পুরুষদিগের সুদৃষ্টান্ত ও সহবাসগুণে সেই স্বাভাবিক প্রেমপ্রবৃত্তি সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে,—আরাধনা ও প্রার্থনা রূপে ইষ্টদেবতার পদধৌত করিতেছে—কত সম-বিশ্বাসীর সঙ্গে একাত্মা হইয়াছি, আরও হইব। যেখানে অন্তরে ব্রহ্মানুরাগ ও পরহিতৈষণা সেখানে ভবিষ্যতে মঙ্গলের সীমা নাই। এই অক্ষয় ভালবাসার শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম; ধর্ম্ম জীবনের নানা কঠিন কর্ত্তব্য সহজ বোধ হইল; সংসারে নানা সংকট নিবারণ হইল। সেইজন্যই কি ভগবান্ আমাদের জাতীয় স্বভাবকে প্রেম-প্রধান করিলেন? যেন এই প্রেম আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ হয়, পরসেবাতে পরিণত হয়, এবং এ সংসারে স্বর্গীয় পরিবার গঠন করে।

শ্রীকেশব চন্দ্র সেন

যিনি সমস্ত কল্যাণের আকর, তাঁহাকে শতবার নমস্কার, যে বাল্যকালেই আমি শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে অকপট অচ্ছেদ্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইলাম, এবং চিরদিন এই প্রণয়কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শেষে প্রগাঢ় ধর্ম্মবন্ধুত্বয় পরিণত করিতে পারিলাম। নীতি ও ধর্ম্মোৎসাহের দৃষ্টান্ত হইয়া যৌবনের প্রথম হইতে কেশব আমাকে সৎপথে আকর্ষণ করিলেন, অসৎপথে যাইবার গতি রোধ করিলেন, সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির প্রতিবাদ করিলেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রতিভা আমাকে এবং আরও

কত লোককে আলোকে আকীর্ণ করিল, আমাদের মহোন্নতি মহা পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিল। আজ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এখানে নাই, দিব্যধামে আসীন হইয়া আরও কত পূর্ণতা, কত মহিমা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নির্ব্বিকার হইতেছে, শুদ্ধতর ও নিকটতর হইতেছে।

শ্রীমতী সৌদামিনী

যৌবনের প্রারম্ভে আমি এমন একটী আত্মার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলাম যিনি স্বার্থ-বিহীন প্রেমে অসাধারণ যত্ন ও শ্রমে আমার শারীরিক ও সাংসারিক কল্যাণ সাধন করিলেন; এতদ্দ্বারা আমার জীবন ব্রতের মহা সহায়তা হইল। আজ কালের প্রথা অনুসারে আমি মনোনীত করিয়া বিবাহ করি নাই। আত্মীয়দের নির্দ্ধারণ অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যদি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতাম এমন যোগ্য পাত্রী নিশ্চয়ই পাইতাম না। আমার পত্নী সুন্দরী নহেন; বিদুষী নহেন; তাঁহার অনেক বিষয় ত্রুটী আছে জানি, সেজন্য আমি অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই। আমারও অনেক ত্রুটী আছে, কোন্ মানুষের বিশেষ বিশেষ দোষ নাই? কিন্তু তাঁহার নীতি, নিষ্ঠা, কার্যকুশলতা, ভগবানে ভক্তি, উদ্যমপূর্ণ গৃহকার্য্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল। আমার এই ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁর যে স্থান ও কর্ত্তৃত্ব চিরদিন অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিয়াছি। বিধাতার দ্বারা মনোনীত হইয়া তিনি আমার গৃহকর্ত্রী হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করি। এই দৃঢ়চিত্ত নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিনীকে আমার আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ইষ্ট পথে আমার চিরসঙ্গিনী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছি। সাংসারিক কাজ কর্ম্মে আমার যেরূপ অক্ষমতা, এবং শেষ বয়সে শারীরিক অস্বাস্থ্য যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্চয় বুঝিতেছি এমন কর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমতী উদ্যমশালিনী পত্নীর সহযোগিতা না পাইলে আমার প্রাণরক্ষা হইত না, দুরবস্থার সীমা থাকিত না। স্বীয় প্রকৃতি হইতে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়া ইনি দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিলেন। এই ব্রহ্মসমাজ-মণ্ডলীর কোন প্রত্যক্ষ সেবা করুন না করুন সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন, এবং সেজন্য আমার প্রিয় বন্ধুদের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।

ঘরকন্না

আমাদের বাসভবন ও গৃহকার্য্য চিরদিন শুচি সুশৃঙ্খলা মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। বহুদিনাবধি আমার এই ধারণা যে গৃহ পরিষ্কার, দেহ পরিষ্কার; বস্ত্র পরিষ্কার, শয্যা

পরিষ্কার, সাংসারিক সকল বিষয়ে শুদ্ধতা ও পারিপাট্য রক্ষা না করিতে পারিলে সুনীতি, ধর্ম্মশ্রী, ভদ্রতা, ও আত্মশুদ্ধি কিছুই রক্ষা পায় না। সেই ধারণা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আমার প্রিয় পত্নী আমার পরম সহায় হইলেন। আমরা কোন কালেই ধনবান নই, অনেক সময় অভাব ও অনটনে কাল যাপন করিয়াছি, কিন্তু সেজন্য একদিনের তরেও অবসন্ন হইয়া পবিত্র গৃহধর্ম্মে আলস্য কি উপেক্ষা করি নাই। যথাসময়ে দাস দাসীদের বেতন দেওয়া, অঋণী, নির্লোভ হইয়া মিতাচার ও মিতব্যয় করা, বন্ধুদের প্রতি আতিথ্য, অনাথের প্রতি দয়া, ভগবানের গৌরবার্থে ধর্ম্মোৎসবাদি সমাধা করা—সাধ্যমত এ সমস্ত কিছু কিছু করিয়াছি; এজন্য উপযুক্ত সহায়তা উপায় আশ্রয় ঊর্দ্ধ হইতে পাইয়াছি, এ আশীর্ব্বাদের জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। নির্ধন হইয়া সম্পন্ন লোকের ন্যায় দিন যাপন করা, নিজ মণ্ডলীর মধ্যে অনাদৃত হইয়া নানা মণ্ডলী মধ্যে সমাদর পাওয়া, স্বদেশে অসম্মানিত হইয়া অন্য দেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ আশীর্ব্বাদ বিনা এ সমস্ত সৌভাগ্য কোন মতেই ঘটিত না। কিন্তু এ সংসারে কাহারও পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ সন্তোষ সম্ভব নহে। সাংসারিক ধর্ম্ম ও পারত্রিক ধর্ম্ম আমার কাছে একই বিষয়। ধর্ম্মজীবনের কোন অংশে মোহজনিত অসংযম ও অশুদ্ধতা থাকিলে দুয়ের একটীও বজায় থাকে না; স্বার্থ ও পরমার্থ দুই বজায় রাখিতে গেলে, লোকে একটিও বজায় রাখিতে পারে না। সংসারপথে এখনও আমাদের অনেক অকুশল আছে ও অপরাধ আছে, তাহা মানিতেই হইবে; ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া সে সমস্ত বহন করিতেছি ও করিব; অশেষ ধৈর্য্য, সংযম পদে পদে আত্মসম্বরণ, অবিচ্ছেদে ক্ষমা ও সমুন্নত প্রেম বিনা পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম-শ্রী ও পুণ্যালোক স্থায়ী হয় না। পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম রক্ষা না করিতে পারিলে বাহিরে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; আপনার পরিবার মধ্যে যে সংযমী যথার্থই সে সংযমী। বিষয়-সম্পত্তি ও লোক-সাহায্য পাইয়া আমার এই অতি ক্ষুদ্র পরিবারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় নাই; কাহারও অর্থ সাহায্যে ও বাহ্যিক অনুগ্রহে স্পৃহা করি নাই। নানা জাতীয় লোকের শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ দাতব্য সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনুষ্যের দ্বারে ভিখারী নই। কেবল তোমারই দ্বারে, হে দয়ালু দাতা, আমি ইহ পরকালের জন্য অকিঞ্চন প্রার্থী। তুমি আমাদের লজ্জা নিবারণ ও দারিদ্র্য ভঞ্জন করিলে; এ অবশিষ্ট কদিনের জন্য আর কাহার গলগ্রহ হইতে যাইব?

জীবনতত্ত্ব কি?

জীবন্ত পরমেশ্বর আমাকে যে অদ্ভুত মানব জীবন দিলেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ, পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিয়াছি। এই প্রদীপ্ত প্রাণময় পৃথিবীতে কিছুই

ত সামান্য নয়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পশু, পক্ষী, কীট কিছুই সামান্য নয়। ধাতু প্রস্তরেও নিভৃত জীবন আছে; বৃক্ষ লতারও সাড় আছে; সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই মানব-জীবন। অথচ মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহারেই ইহার যথার্থ মূল্য, মহত্ত্ব, এবং অসামান্যতা; নতুবা ইহজীবন অসার, অপদার্থ, এমন কি কত সময়ে ঘোর অনিষ্টের কারণ। কত অবস্থাতে আমি যে নিজ জীবনের অপকৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছি সকলই মনে আছে। এ গুরু অপরাধ ক্ষমা করিয়া, হে মঙ্গলময়, তুমি এখন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত রাখিলে, এবং পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিলে প্রকৃত জীবনতত্ত্ব কি। সাক্ষাৎ প্রাণরূপে তোমাকে পাইয়া প্রাণী হইয়াছি, তোমাকে দিন দিন আরও অধিক উপার্জ্জন করিতেছি। শারীরিক ক্ষয় পাইতেছি বটে কিন্তু সার জীবন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল তাহাও নয় কিন্তু বুঝিয়াছি ভগবৎ অভিপ্রায় অনুসারে দৈহিক জীবন ব্যয় ও ক্ষমা করা ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় জীবন। শারীরিক সুখ, স্বাস্থ্য; মানসিক বুদ্ধি বিবেক; সামাজিক সম্মান, সমাদর, বিদ্যা, সভ্যতা; এ সকল জীবনের মহালক্ষণ ও মহারত্ন বটে; কিন্তু ইহার সংযম অনুশীলনে, ইহার ব্যয় ব্যবহারেই প্রকৃত প্রাণধারণ। যখন এ জীবনের প্রত্যেক লক্ষণে, প্রত্যেক চেষ্টাতে, প্রত্যেক নিগ্রহে, প্রত্যেক সম্ভোগে, প্রাণরূপে বিধাতারূপে তোমাকে উপলব্ধি করি তখনই যথার্থ জীবন ধারণ করি। আমি সেই স্বর্গীয় জীবনের বিচিত্র রসাস্বাদন পাইয়াছি। এজন্য জীবনদাতাকে সহস্র বার ধন্যবাদ করি। পূর্ব্বে ভাবিতাম যে স্বভাবের একটী কোন বিশেষ সদ্‌গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিজ নিয়তিকে পূর্ণ করিব। ভাবরস-প্রধান বাঙ্গালী মনে করে কেবল ভাবুকতার জোরে ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিবে। নানা জাতীয় ভাবরসের উচ্ছ্বাস খুব ভাল জিনিষ তা জানি, তাহাতে বারম্বার মুগ্ধ হইয়াছি, লোককে মুগ্ধ করিয়াছি; কিন্তু ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল না; বিধাতা হইতে দিলেন না। দৈহিক স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও স্ফূর্ত্তি উদ্যম খুব ভাল জিনিষ বটে তাহাও জানি, এবং ইহাও জানি যে সৎসম্ভোগে ও তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ তেজোময় ব্রহ্মস্থিতি সম্ভোগ করা যায়। জ্ঞানচর্চ্চা ও গভীর চিন্তা যে কি উৎকৃষ্ট অবস্থা তাহা বেশ জানি, এবং তৎসম্ভোগে পরমাত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলন লাভ হয়, ব্রহ্ম-মনন ও ব্রহ্ম-ভাব-ভাবনা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও বুঝি। নীতি সুচরিত্রতা কতক উপার্জ্জন করিয়াছি, এবং নানা দেশীয় জ্ঞানবান ব্রহ্মবান লোকের সঙ্গে সহবাস ও বন্ধুতা লাভ করিয়াছি। এইরূপ বিবিধ সম্পর্কে সত্য-স্বরূপের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আমার পক্ষে মহাভাগ্য। কিন্তু এ সমস্ত সম্পর্ক পূর্ব্বে পরস্পর বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল; অখণ্ড জীবনাকারে প্রাপ্ত হই নাই—একটী

অনুশীলন করিতে গিয়া অপরটী ভুলিয়া যাইতাম। প্রেমিক হইতে গিয়া শিথিল-চিত্ত হইতাম, জ্ঞানী হইতে গিয়া অভিমানী, নৈতিক হইতে গিয়া নিষ্ঠুর, সাধক হইতে গিয়া অসামাজিক হইতাম। এখনও এরূপ বিপর্য্যয় মূল স্বভাবে নিহিত আছে। কিন্তু এখন এই মহাসত্য বার বার জীবনে প্রমাণিত হইল যে যথার্থ ধর্ম্ম-জীবন অর্থে মানুষের স্বভাব-বৈচিত্র্য মধ্যে সমান ওজন ও সমান উৎকর্ষ বুঝায়। এইরূপ সামঞ্জস্যের ভিতর জীবন-আদর্শের পূর্ণ পরিমাণ বুঝিতে পারি; পূর্ণ-প্রকৃতির সন্ধান পাই। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ বলিলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝায়, মানুষের সঙ্গে (বিশেষতঃ যে সকল মানুষের সঙ্গে আমি এক ভাবাবলম্বী ও এক পথাবলম্বী তাদের সঙ্গে) পবিত্র সম্বন্ধ বুঝায়। যতদূর মানব জীবনের প্রসার ততদূর ব্রহ্ম সাধনের প্রসার। এরূপ সমতান, সমতুল্য শক্তি, এরূপ সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীবনের নিত্য অধিকার সকল সময় উপলব্ধি করিতে পারি না বটে, কিন্তু নিশ্চয় পাইব; এখনই দিব্যক্ষণে, দিব্যদশায়, জ্ঞান ও ভক্তির উন্নত অবস্থায়, সমাধিকালে, পরসেবা ও পরীক্ষার মধ্যে ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা, হে পরমাত্মন্, তুমি আমার মনোমধ্যে জীবনতত্ত্বের সার আদর্শ রচনা করিলে, দৃঢ়ীভূত করিলে; দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারমার্থিক নানা বিষয়কে একীভূত করিলে। কি নির্জ্জন বাসে, কি লোকালয়ে, এমন একটী উচ্চ কর্ত্তব্য দেখি না যা ধর্ম্ম আলোকে উজ্জ্বল নয়। শরীর, হৃদয়, আত্মা, সংসার, স্বর্গ সমস্ত তন্ময় হইয়া পড়ে। এ স্বর্গীয় সামঞ্জস্য একদিনে হয় না, চিরজীবনের সাধন। লোকচক্ষে ইহা প্রতীয়মান নয়, নাই হইল? দিব্য অক্ষয় জীবনের এক কণাও ভাল, রাশি রাশি কাল্পনিক, স্বার্থময়, লৌকিক চাক্‌চিক্য চাই না। দৈহিকতা চাই না; ভাবুকতার ছড়াছড়ি চাই না; প্রখর বুদ্ধির আস্ফালন, লোকের অসার ও অগভীর প্রশংসা অপ্রশংসা গ্রাহ্য করি না; অসার লোকাচারসম্মত ধার্ম্মিকতা ঘৃণা করি, ইহাতে লোকে যা বলিতে হয় বলুক। তুমি দেখিতে দিলে বটে যে এ সমস্ত অসারতার মধ্যেও সার সত্যের ভগ্নাংশ কণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি হইল না, হইবেও না। ব্রহ্মসত্তার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন যোগ লাভ হইলে তবে এই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক হয়। দেব, ইহা কি এ সংসারে এবং এক জন্মে লাভ হইবে? আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার সমাপ্তি কোথা? হে জীবনাধার, বহু কষ্টে এই মানব জীবনের পূর্ণতা সঞ্চয় করিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

ধর্ম্ম-গ্রহণ

চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে সেই মহাদিন আমি কখনও ভুলিব না যে দিনে, হে জগদ্‌গুরু, তোমার প্রেরণায় এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। আমি অশ্রুজলে অন্ধপ্রায়, উদ্বেগে ও ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত-কলেবর হইয়া এই ধর্ম্মে আমার প্রাণগত বিশ্বাস স্বীকার করিলাম। আমি অল্পদর্শী তখন জানিতাম না আমার জন্য এই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মদীক্ষার মধ্যে কি অসীম মহান অর্থ নিহিত ছিল। এখন এই ধর্ম্মজীবনের অবিশ্রান্ত উন্নতিতে আমার দিব্য-জীবন দিব্য-নীতি বিকশিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মার্থী লোক যেন প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে নিজ বিশ্বাস স্বীকার করিতে ও ধর্ম্মদীক্ষা লইতে উদাসীন না হয়েন। যখন আমার এই প্রথম ধর্ম্মদীক্ষা হয় তখন সার ধর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। প্রায় তার পঁচিশ বর্ষ পরে নিগূঢ়তর মহান যুগধর্ম্মবিধান লাভ করিয়াছি। বীজ হতে যেমন বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে যেমন শাখা ফুল ফল, তেমনি আমাদের সেই প্রিয় আদিম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে এই প্রকাণ্ড সনাতন যুগধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আমাকে চিন্তার অতীত পরমাশ্চর্য্য পরমার্থ-তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে, এবং সর্ব্বপ্রকার পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণে সুখী করিতেছে। উপদেশ শুনিতাম, সর্ব্বান্তঃকরণে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিলে আর সমস্ত যাহা কিছু কাম্য-বস্তু লাভ করিতে পারা যায়, যথার্থই আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। সার ধর্ম্মের প্রভাবে এরূপ না ঘটিলে আমি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কূপে আবদ্ধ থাকিতাম, উদার ধর্ম্মবিশ্বাসী নামের অযোগ্য হইতাম। আজ মানুষ হইয়াছি, মানুষের মধ্যে ধন্য হইয়াছি। সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রদত্ত এই অদ্ভুত ধর্ম্ম হইতে উচ্চ জ্ঞান, উদার সাম্য, শুদ্ধ চরিত্র, নিগূঢ় প্রেম, অগাধ অপার্থিব শান্তি ও নানা পার্থিব সৌভাগ্য লাভ হইল। না জানি অদৃষ্টে আরও কি আছে। আমি এ ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। লোকের নিকট নিগ্রহ পাই, অনুগ্রহ পাই, ভগবানের শুভাশীষ হইতে বঞ্চিত কখনও হই নাই, হইব না। তিনি আমার সর্ব্বস্ব ধন। এই পবিত্র ধর্ম্ম সাধন ইহ-জীবনের একমাত্র সার কার্য্য ভবিষ্যতের যথার্থ নিয়তি, স্বর্গের কেবলমাত্র ভরসা।

কাজকর্ম

ধন্য ধন্য সেই ইষ্টদেবতাকে যিনি সাংসারিক ও মানবীয় অধীনতা হইতে বহুদিনাবধি আমাকে অব্যাহতি দিয়া "আপনার শুভ ইচ্ছানুসারে" জগতের সেবাকার্য্যে নিয়োগ-পত্র দিলেন। আমি ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলাম। প্রথমে বুঝি নাই কি করিতেছি। কিন্তু এই কার্য্য মধ্যে জীবনের শত প্রকার

কাজকর্ম্ম প্রচ্ছন্ন ছিল ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া লোকের যাহা কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি, তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার নিজে লাভ করিয়াছি; অশেষবিধ ভাবী মঙ্গলের আভাস, অঙ্গীকার ও আশা লাভ করিয়াছি। আধ্যাত্মিক আলোকে বুঝিলাম ধর্ম্ম-প্রচার অর্থে কতকগুলি ধর্ম্ম-মতের জল্পনা নয়, কতকগুলি ক্রিয়া কর্ম্মেরও আড়ম্বর নয়, কোন প্রকার দলপুষ্টিও নয়, বৎসরান্তে কি সপ্তাহান্তে বহুভাষা-জড়িত সচীৎকার বক্তৃতা নয়! জীবন-তত্ত্বে, সৃষ্টি-তত্ত্বে, ব্রহ্ম-তত্ত্বে, সকল-প্রকার সু-তত্ত্ব মধ্যে যাহা কিছু সার সত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করা, চরিত্রে পরিণত করা এবং অন্তরাত্মার আলোকময় প্রেরণা-শক্তি অনুসারে লোকের চিত্তে ও চরিত্রে মুদ্রিত করিতে পারা, আমার কাছে ধর্ম্ম-প্রচার অর্থে এই। যদি কিছু বিশেষ ধর্ম্মবার্ত্তা ব্যাখ্যা করিবার না থাকে প্রচার কার্য্য কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ইহা অশেষ আত্মোন্নতি, অসীম ব্রহ্ম-সাধনা ও অবিশ্রান্ত ধর্ম্ম-চেষ্টার ফল। কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ ইতিহাস, কোন্ মহাত্মার জীবন, কোন্ জাতীয় সেবা ভক্তি, যোগ সিদ্ধি হইতে আমি ভূরি ভূরি সত্য না শিখিলাম এবং জনসমাজে ব্যাখ্যা না করিলাম। শত শত মানবীয় সদনুষ্ঠান ও উচ্চ কর্ত্তব্য মধ্যে কোন সৎকার্য্য সাধনে বঞ্চিত হই নাই। এক অখণ্ড অনন্ত ধর্ম্মের মহা-প্রবাহে আন্দোলিত হইতেছি, কোন প্রকার মহদনুষ্ঠান আমার অকরণীয় নহে। যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার অধীনে, হে ভক্ত-বৎসল প্রভু, এই স্বাধীন ধর্ম্ম-ব্রত কথায় কার্য্যে চরিত্রে পালন করিতে পারি। তোমার আহ্বানে অতীতকালে কিংবা বর্ত্তমানে যাঁহারা তোমার অধীন হইলেন ও তোমা হইতে কার্য্যভার পাইলেন আমি অযোগ্য ব্যক্তি হইয়া তাঁদের মধ্যে একজন হইয়াছি; কালাতীত দেশাতীত অক্ষয় ধর্ম্ম-মণ্ডলীর মধ্যে ভুক্ত হইয়াছি—ইহা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে কে? তোমার আজ্ঞা পালন করাই আমার স্বাধীনতা, যাঁরা তোমার অধীন তাঁদের অধীনতাই আমার স্বাধীনতা—আমি অন্য স্বাধীনতা চাই না, অন্য অধীনতাও চাই না। এই চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল হইল তোমার আলয়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, এক দিনের জন্য কার্য্যের বিরাম হয় নাই, হইবেও না। ক্রমাগত উচ্চতর জীবনে আরোহণ করিতেছি, উচ্চতর কর্ত্তব্যের আদেশ পাইতেছি। নিজ জীবনের নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে, মণ্ডলীর ও জনসাধারণের অভাব অনুসারে, এ দেশে ও দেশান্তরে তুমি আমাকে কতরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে; তোমার প্রেরণায় কতই বলিলাম, কতই লিখিলাম, কতই শিখিলাম, কতই ঘুরিলাম, কতই খাটিলাম, তথাপি তোমার প্রভাবে এ চিত্তে এখনও অনেক উৎসাহ অগ্নি! আর কি বলিব, এই মহা-ব্রত সাধনে যেন দেহ মনের

অবশিষ্ট শক্তি আরও একাগ্রভাবে উৎসর্গ করিতে পারি, যেন আরও অনেক হৃদয়ে এ ধর্ম্ম-প্রভাব সংক্রামিত হয়। যেন এখানকার কার্য্য শেষ করিতে না করিতে সেখানকার কার্য্যভার প্রাপ্ত হই।

ঈশা বিষয়ক

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সন্তান ঈশার সঙ্গে আমার যে আন্তরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির শিক্ষা কি কাহারও অনুকরণের ফল নহে; বিজ্ঞান কি ইতিহাস মূলক নহে; আমি ইহার কারণ জানি না, ইহা আমার মূল-প্রকৃতিগত একটী বিস্ময়কর আকর্ষণ। যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে আমি এই ভাবাপন্ন, নানা অবস্থার মধ্যে ইহা আমার মনে জাগরূক আছে। এ ভাব, হে অন্তরাত্মা, তোমার প্রত্যক্ষ প্রেরণার ফল, আমার ধর্ম্ম-প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ফল। তবে এ বিষয়ে (অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়) আচার্য্য কেশবের নিকট সময়ে সময়ে অনেক শিখিয়াছি। ঈশার চরিত্র-লেখক শিষ্য-চতুষ্টয়, মহাপুরুষ পলের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম-প্রতিভা আমার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু, হে পবিত্রাত্মা, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আমার নীতি চরিত্রের দারুণ অভাব দেখিয়া, পাপজনিত আমার গভীর আক্ষেপ ও নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার ভাবী প্রয়োজনীয় দেখিয়া, এ দেশের অধোগতি ও ধর্ম্মহীনতা দেখিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ উদ্দেশে মহাপ্রভু ঈশা-খৃষ্টের জীবন-তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আমার অন্তরে প্রকাশ করিলে। নিগ্রহে, অবিচারে, পতনে, পশ্চাত্তাপে, অকারণ অখ্যাতি অপমানে, অনিবার্য্য উপদ্রবে, পদচ্যুতিতে, ব্যারামে, নিরাশায়, ঘোর-বিদেশ মধ্যে তুমি সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকিয়া ঈশা-দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে সতেজ সন্তুষ্ট ও সার বিশ্বাসে সজীব রাখিলে। তুমিই চিরদিন আমার গম্যধাম ও জীবনের উদ্দেশ্য, তুমিই কেবল মাত্র আমার আরাধ্য প্রার্থনায় পরিত্রাতা। এ পরিত্রাণ পথে তোমার আদিষ্ট নানা মহাপুরুষগণ আমার সঙ্গী ও শিক্ষক। কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রভু ঈশা আমার পথ, আমার পথপ্রদর্শক, আমার অনুকরণীয়, আমার দিব্য বন্ধু, তাঁর তুল্য আর কেহই নাই। তাবৎ মনুষ্যজাতি ও দেবাত্মাবংশ মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া তুমি তাঁহাকে তোমার সন্তানত্বের মুকুট পরিহিত করিলে, মানুষের আদর্শ হেতু নিজের অখণ্ড অভিপ্রায় অনুসারে ইতিহাস গর্ভে তুমি তাঁহাকে সৃজন করিয়াছ। তোমার স্বভাবের পূর্ণ-সাদৃশ্য সে সন্তানের সার মর্ম্ম। সমুদায় মানবকুলের নেতা ও কেন্দ্র তিনি, বিশ্বাসী জগতের ধর্ম্ম জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তিনি পূর্ণাবয়ব ধারণ করিতেছেন। অযথা ভাব ভক্তি ও দূষিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যে তাঁর উপর তোমার প্রাপ্য ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে অপরাধ কখনও তাঁর

নহে, তাঁর স্বয়ং শিক্ষিত ও অবলম্বিত ধর্মেরও নহে। তাঁর ধর্ম ও সনতান ব্রাহ্মধর্ম এক। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিতে চাই না। অধীনতা, বাধ্যতা, পূর্ণ প্রেম, বিশ্বাস, নীতি-নিষ্ঠা, অবিশ্রান্ত আত্মসংযম ও আত্মসমর্পণ, ভগবানের প্রতি ও মানুষের প্রতি অশেষ অকপট অনুরাগ এ সমস্ত লইয়া যদি ধর্মজীবন গঠিত হইবার হয় তবে এ ধর্মজীবনে ঈশাতুল্য মানুষের বন্ধু আর কোন মানুষ হইতে পারে না। কেবল এই ভাবেই আমি তাঁহার চির-অধীন ও অনুগত ভৃত্য। বিধাতাকে শত ধন্যবাদ যে এই আদর্শ-জীবন-রত্ন তিনি আমার হস্তে দিলেন।

অযোগ্য ও অপূর্ণ আমি

আমি আত্মপরীক্ষাতে, কি আত্ম-দোষ-চিন্তনে কখনও কি বিরত হইব? কখনই না। নানা অযোগ্যতা হেতু আমার আন্তরিক আক্ষেপ কখনও নিবৃত্তি পাইবে না। কি হইতে চাই এবং কি হইতে পারিয়াছি, ইহা ভাবিয়া আমার অনুশোচনা এ জীবনে শেষ হইবে না। হে সর্ব্বহিতকারী, তোমার শুভ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য তুমি ধর্মালোক প্রকাশ করিলে তদ্দারা সুসময়ে আমি তোমার তত্ত্ব, তোমার প্রেরিত বার্ত্তা ও বার্ত্তাবাহকদিগের লক্ষণ, বিশেষতঃ তোমার অতুল সন্তান ঈশাতত্ত্ব, অদ্ভুত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, ক্ষয়শীল শরীর ধারণে অক্ষয় স্বর্গীয় জীবনতত্ত্ব, আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি তাহাতে পরম কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু এতাবৎ বিষয়ে এখনও আমার এতাধিক লাভ করিবার অবশিষ্ট আছে যে তাহা ভাবিয়া কোনরূপেই আমি বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকিতে পারি না। ছিন্ন কন্থার ন্যায় এ জীর্ণ চরিত্র আমার দীর্ঘ জীবনের সকল লজ্জা আবরণ করিতে পারে না। এক দিকে টানিতে গেলে অপরদিকে অনটন পড়িয়া যায়। ধর্মের সত্যাসত্য ধর্মবিশ্বাসীর জীবনচরিত্রে প্রমাণিত হয়। ইহা ভাবিয়া বিষম ক্ষোভে দৈন্যে ও আতঙ্কে আত্মা পরিপূর্ণ হয়। যাহা বিশ্বাস করি, যাহা প্রতিদিন লাভ করি তাহা ইচ্ছানুরূপ অভ্যাসে ও চরিত্রে পরিণত হয় না। একদিকে নিজের অপূর্ণতা, অপরদিকে আত্মীয়-দিগের ত্রুটি ও স্বেচ্ছাচার। কিন্তু তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও পরমাশ্চর্য্য ক্ষমা গুণে কোন্ ব্যক্তি না পরিত্রাণ পাইবে? সুতরাং আমি নিরাশ অথবা অবসন্ন নই। যাহা পাই নাই তাহা কোন দিন পাইব, যাহা হয় নাই তাহা হইবে, আমার প্রিয়গণও তোমাতে মতিগতি স্থির রাখিতে পারিলে পরিণামে উদ্ধার হইবেন। তবে সেজন্যে চেষ্টা ও প্রার্থনার সীমা যেন না থাকে। সেজন্য বিশ্বাস ও ধৈর্যের সীমা নাই, সীমা যেন না থাকে। দেখ এই সকল উপার্জ্জিত তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণরূপে দৈনিক জীবনে পরিণত হয় নাই। আমি দিন দিন ইহারই জন্য

প্রতীক্ষা করিতেছি; কিসে এবং কবে আমাদের এই অমূল্য ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে একাকার হইবে। না জানিতে দিয়া শনৈঃ শনৈঃ তোমার অদ্ভুত অধ্যাত্মশক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিতেছে—আজ পর্যন্ত যাহা হইবার তাহা হইলাম। তাহার ভাল মন্দ আমি কি বিচার করিব? পরে কি হইব তাহার পরিমাণই বা কিরূপে করিব? হে অনন্ত আদর্শ, প্রাপ্ত জীবনের সঙ্গে এবং প্রাপ্য পূর্ণতার সঙ্গে ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। হাজার দুঃখিত হই তাহা নিবারণ করিতে পারিব না। তবে এই মাত্র আকুল নিবেদন করি যেন একদিনের জন্য সুদীর্ঘ নিয়তির পথে অগ্রসর হইতে অলস কি উদাসীন না হই।

বাহ্য-সৃষ্টিতে অভিনিবেশ

এই দৃশ্যমান সৃষ্টি-তত্ত্ব আমাকে গ্রাস করিয়াছে। সাবয়ব জড়-জগৎ, অদ্ভুত চিন্ময় মানব-জগৎ, অদৃশ্য ব্রহ্ম-জগৎ আমাকে অভিভূত করিয়াছে। হে বিশ্বরূপ, হে বিভূতিময়, তোমাকে প্রতিদিন নমস্কার যে তুমি আমার স্বভাবে তোমার সৃষ্টির সঙ্গে অতি গভীর সম্বন্ধ সঞ্চার করিলে। কখনও তীব্রভাবে, কখনও কোমলভাবে, প্রকৃতির মহারসে আমি প্রায়ই অভিষিক্ত আছি। লোকের হস্ত-নির্ম্মিত দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রকৃতির মহা-মন্দিরে প্রতিনিয়ত অর্চ্চনা আরাধনা করিয়া থাকি। নিখিল বিশ্ব তদন্তর্গত সকল বস্তু নানাভাবে, সচেতনে ও অচেতনে, কি প্রকাণ্ড অবিশ্রান্ত মহাপূজা করিতেছে—আমি সামান্য প্রাণী-কণিকা এই অনন্ত আরাধনা শুনিয়া থাকি; এ পূজাড়ম্বর সততই দর্শন করি, শ্রবণ করি, সম্ভোগ করি। প্রকৃতি-পটে, আকাশে, ধরাতলে তোমার গৌরবান্বিত মহা-প্রতিমা; তুমি নিজ হস্তে তাহা রচনা করিয়াছ; আমার অর্চ্চনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা,—আমার এই উপাসনার নানা উপকরণ তুমি নিজে নিয়ত সংগ্রহ করিতেছ। আমার এই জীবন্ত পূজা উপহার নিত্য নিত্য তব পদে নিবেদন করিয়া আমি বারম্বার সম্ভ-মুক্তি সম্ভোগ করিতেছি। বাহ্য জগতে এমন কোন পদার্থ, কোন প্রাণী, কোন বিধি, কি ব্যবস্থা, কি দৃশ্য, এমন কি আছে, যাহার অনুরূপ তত্ত্বালোক ও ভাবালোক নিজ অন্তরে দেখিতে না পাই? ভূতত্ত্ব, ভৌতিকশক্তি-তত্ত্ব, জ্যোতিষ্কতত্ত্ব, মানসতত্ত্ব মানবীয় গুণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এসকল যে অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করে তাহা কেবল বাহিরের কথা নয়; তাহা, হে চৈতন্যময়, তোমার নিজের ভাব, চিন্তা, তোমার হৃদয় মন, তোমার অভিপ্রায় অভি-সন্ধি, তোমার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী, তোমার অলৌকিক আত্মপরিচয় শতকণ্ঠে ব্যাখ্যা করে। আমি কেবল নিজ কল্পনা আলোক প্রকৃতিগ্রন্থ পাঠ করিতে চাই না, তোমার প্রকাশিত নানা শাস্ত্র আলোক আমাকে আলোকময়

শিক্ষা দিতেছে। আমি অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তি এ জীবন এই সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, এক জীবনে তাহা হইবার নয়, বহুজীবনে লাভ হইবে। কিন্তু এখানে এতটুকু বুঝিলাম যে এই দৃশ্যমান সাকার জগতেই তোমার নিরাকার চিন্ময় মহামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিতে পাইলে তোমার অপরূপ দিব্য পরিচয় লাভ হয়, তোমার যোগপথ ও জ্ঞানপথ সহজ হয়। এই দিব্য প্রকৃতি-মন্দিরে আমার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহা হইতে আমাকে কে বিচ্যুত করিতে পারে? পূজ্য পিতৃদিগের পার্শ্বে উজ্জ্বল আসন লাভ করিয়াছি।

বিভূতি-যোগ

আমি এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গে নানাবর্ণ আকাশে অনন্ত অভিনয় রসে ডুবিলাম, অকূল অশ্রান্ত প্রবল জলধিতরঙ্গে সাঁতার দিলাম, কত মহাকায় শ্বেতাঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলাম; কত আঁধার অরণ্যে পর্য্যটন করিলাম, কত নদী-নিমগ্ন শুভ্র বালুকাতলে বিভগ্ন সূর্য্যরশ্মি গণনা করিলাম; কত স্বচ্ছ নদীজলে মৃদুহিল্লোলে ব্রহ্ম নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবগাহন করিলাম; কত উৎসাহিত উত্তেজিত বিহঙ্গ সমাচার শুনিলাম; কত অর্দ্ধস্ফুটিত সহাস্য ফুল দলের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলাম; কত অনন্ত নক্ষত্রগতি, অস্তগামী সজীব শশিকলা, কত শব্দময় নির্ঝর, কত গম্ভীর নৈশতিমির, সর্ব্বভেদী মোহতিমির অতিক্রম করিয়া তদতীত অক্ষয় ধ্রুবতত্ত্ব সঞ্চয় করিলাম বলিতে পারি না, আরও কত কি আত্মস্থ করিব। এসকলের মধ্যে, মাতঃ পরাপ্রকৃতি, আমি তোমার আহ্বান, আভ্যাস, ইঙ্গিত, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ অনেক অনুভব করিয়াছি, করিতেছি; বুঝিতেছি, এ নিগূঢ় রহস্য কখনও শেষ হইবে না। পক্ষান্তরে আবার নগরের মিশ্রিত মহাকোলাহল; বাণিজ্য ও কল কারখানার ঘোর শব্দোত্তম, বাজার হাটের অবিশ্রান্ত ক্রয় বিক্রয়, ধনবানের শ্রীবৃদ্ধি, দরিদ্রের কষ্টলভ্য উপজীবিকা, শ্রমজীবীর শ্রমান্তে সন্ধ্যাসঙ্গীত আমার মনে তোমারই বিধি ব্যবহার প্রকাশ করে। এই সৃষ্টির তুমুল প্রবাহে আমি কণার কণামাত্র, কিন্তু তথাপি আমি তোমার মর্ম্মের মর্ম্ম মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছি; তোমাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রকৃতি ও ক্ষুদ্র প্রাণ ধারণ করিতেছি; আমি তোমার মহা-স্বভাবের অতি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। তাই এই বাহ্য-প্রকৃতিকে তোমার কায়া, তোমার ছায়া, তোমার মায়া, তোমার বেশবিন্যাস, তোমার দেবালয় রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তোমাকে বন্দনা করি।

ঐতিহাসিক ও জাতীয় বিষয়ে

কেহবা ইহুদিজাতির ইতিহাসে, কেহবা মুসলমান জাতির, কেহবা বৌদ্ধদিগের মহাবংশাবলীতে বিধাতার অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শন করেন। কিন্তু এমন জাতীয় ইতিহাস

কিছু নাই, যার মধ্যে বিধাতা ক্রিয়াবান নহেন। হে লোকেশ, হে লোক-ভঙ্গনিবারণার্থ সেতুস্বরূপ, জাতি জনপদ ও নানা প্রকার লোক সমিতি মধ্যে তুমি বিচিত্র মানুষিক গৌরব ধারণ করিয়াছ। মানবমণ্ডলীতে, সমষ্টিকৃত মানব-স্বভাবে আমি দিব্য চক্ষে দেবাকৃতি দেখিতেছি। আধার ও আশ্রয়রূপে, প্রাণ ও শক্তিরূপে প্রত্যেক জাতি মধ্যে, লোকের সুকীর্ত্তি ও মহোদ্যম মধ্যে জয়লাভ ও উন্নতি মধ্যে জাতীয় মহিমা সংস্থাপিত হইতেছে, পরিষ্কার মঙ্গলাভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিনম্র ভক্তিতে, হে নারায়ণ, আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি। সভ্য, স্বাধীন, পরাক্রান্ত, জয়শীল জাতির মধ্যে,—অর্দ্ধশিক্ষিত, পরাধীন, দুর্ব্বল কিন্তু উন্নতিশীল জাতির মধ্যে তোমারই জ্যোতির্ম্ময় আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই। তোমার সাক্ষাতে কোন জাতির প্রতি যবন কি ম্লেচ্ছ কি অনার্য্য বলিয়া বিদ্বেষী হইতে পারিনা, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে তোমার বিশেষ বিশেষ অবতারণা দেখি, এমন জাতি দেখি না যে তোমার দ্বারা স্পৃষ্ট ও আকৃষ্ট নয়। তবে আমরা অধীর ও অল্পদর্শী, এই নিগূঢ় কার্য্যবিধি না বুঝিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হই। কোথাও ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম ও পুরুষকার, কোথাও সাত্বিকতা, ভাবুকতা, বুদ্ধিবল ও চিন্তাশক্তি, কোথাও প্রবল সমুন্নত রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী। যেখানে যে কোন প্রকার উচ্চতর জাতীয় জীবন দেখি সেখানে পরব্রহ্মের উজ্জ্বল প্রতিরূপ দেখি।' ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, আমেরিকা জাপান, চীন, আর্য্যাবর্ত্ত, এই সকল মহাদেশে, নব নব ঐশ্বরিক বিভূতি বারম্বার দেখিয়া আরও পরিষ্কার দেখিবার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই সকল বিচিত্র-স্বভাব জাতির মধ্য দিয়া তোমার সঙ্গে আধ্যাত্মরস সম্ভোগ করিয়া থাকি। আপনি কোন বিশেষ জাতীয় বলিয়া সঙ্কীর্ণ হই না ; সমগ্র মানব জাতীয় বলিয়া উদার প্রেম পোষণ করি। মানব প্রকৃতি বিবিধ আদর্শ ও প্রণালীর মধ্য দিয়া নিজ নিয়তি লাভ করে। স্বীয় মাতৃভূমিকে দেবধাম মনে করিয়া খুব আদর করি বটে। বহুদিন বিদেশ পর্য্যটনের পর দেশে ফিরিয়া আসিলে মনে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলাম। বহুদিন বিদেশীয় ভাষা শ্রবণ কথনের পর মাতৃভাষার এক অক্ষয় শুনিলে মনে হয় যেন কর্ণে অমৃতধারা ঢালিয়া দিল। পথের ভিখারী হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত যাহাকে দেখি তাহাকেই আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে জাতীয়-সৌভাগ্যের সুদৃশ্য নিজ-দেশে দেখিলাম না, এ জীবনে দেখিব বলিয়া মনে হয় না, সে অদ্ভুত, জীবন্ত দৃশ্য অন্যত্র দেখিয়া ধন্য হইলাম। জীব মাত্রেতেই পরমাত্মা প্রকটিত, কিন্তু জাতীয় জীবনে, জাতীয় মিলনে, জাতীয় একত্বে

সে মহিমা কতই দেদীপ্যমান! মানুষের স্বার্থবুদ্ধি পরস্পর এত বিভিন্ন, প্রবৃত্তি বাসনা এত বহুধা যে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত বিরোধ ও শত্রুতাই সম্ভব। পূর্ব্বকালে সেই সংগ্রাম সততই ঘটিত, এখনও মাঝে মাঝে ঘটিতেছে। তবে পৃথিবীময় এ দেশানুরাগ, স্বজাতির প্রতি হিতৈষণা, বহুলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা কেন হয়, কোথা হইতে হয়? স্বদেশের হিতের জন্য, স্বজাতির গৌরবের জন্য মানুষে ধন দেয়, সময় ব্যয় করে, স্বার্থত্যাগ করে, বিষম নিগ্রহ সহ্য করে, স্ত্রী পুত্র ভুলিয়া যায়, প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান করে কিসের জন্য? ইহার মধ্যে দৈব প্রেরণা, দৈব শিক্ষা, ভগবৎ প্রভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। আমি ইহারই অনুরাগী, সাধ্যানুসারে ইহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কালের কুটিল গতি অনুসারে বিদেশীয় বিজাতীয় প্রবৃত্তি মনকে কলুষিত করিয়া থাকে, অপরাধী হইয়াছি। ভারতীয় সমস্ত জাতি উদ্ধৃত ও সংশোধিত হউক, যেন আর্য্যজাতি স্বকীয় বিশেষ মাহাত্ম্য হইতে বিচ্যুত না হয়!

জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক, তোমারই দিকে, হে লোকনাথ, মানবজাতি অগ্রসর হইতেছে,—তৎসঙ্গে আমরাও, আমিও অগ্রসর হইতেছি—ইহা কি চমৎকার দৃশ্য! এত পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি, স্বার্থ, রুচি, প্রতিভা, শক্তি, সাধনা কালে কালে সুমিলিত করিয়া তুমি নানা জাতি, রাজ্য, সাম্রাজ্য রচনা করিলে। কোন্ জাতির ইতিহাসে তুমি প্রত্যক্ষ নও? অতএব তোমারই আকর্ষণে, তোমারই বিধানে সকল জাতির সঙ্গে একজাতি হইয়াছি। বর্ণভেদ মানি, জাতিভেদ মানি না, কিন্তু ক্রমে বর্ণবুদ্ধিরও বিলোপ হইতেছে—কবে হইবে? অন্যান্য জাতির নানা সদ্‌গুণ ভাবিয়া স্বজাতির নানা ত্রুটী ভুলিয়া গিয়াছি। মানবীয় মহামণ্ডলের মধ্যে, হে জগৎপিতা, আমাদিগকে, এই হীনবল বাঙ্গালিদিগকে তুমি স্থান দাও। স্বাধীনতার জন্যে, ধর্ম্মসমন্বয়ের জন্যে, জাতিবর্ণবিহীন ভ্রাতৃত্বের জন্যে, সর্ব্বপ্রকার মানবীয় উৎকর্ষ লাভের জন্যে যেখানে যে চেষ্টা দেখি তাহাতেই উৎসাহের সহিত সায় দিয়া থাকি, সর্ব্বজাতীয় মহোন্নতির অংশ ও অধিকার লাভ করিয়াছি। হে ভগবান, এই সৌভাগ্য তুমিই দিলে। কিন্তু দেখ ন্যায়বান বিচারক, তোমাকেই সাক্ষী করিয়া বলি এই সকল জাতীয় মহিমার মধ্যে অনেক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হই। এক জন লোকের আত্মগরিমা ও দুরাকাঙ্ক্ষাহেতু কত সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হয়; এক জাতির স্বার্থস্পৃহায় কত লোকের প্রাণ হানি, গৃহ দগ্ধ হয়, ক্ষেত্র উজাড় বংশলোপ হয়। প্রবলের পীড়নে দুর্ব্বলের নিগ্রহ, ধনবানের হস্তে নির্ধনের আত্মবিক্রয়, জেতার দৌরাত্ম্যে পরাজিতের দাসত্ব, অধর্ম্মের তাড়নায়

ধর্ম্মের মালিন্য ও অন্তর্দ্ধান দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত ও নিরাশপ্রায় হই। মনে করি "তবে এদেশের দশা কি হইবে?" কিন্তু এই বিপর্য্যয় লিখিত কি অলিখিত ইতিহাসের শেষ শিক্ষা নহে। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে পরিণামে সত্যের সাম্রাজ্য, প্রেমের জয়লাভ, নীতিধর্ম্মের বিক্রম, নিপীড়িতদিগের শান্তি সৌভাগ্য স্থাপিত হইবেই হইবে। কবে হইবে কিরূপে হইবে জানি না, কিন্তু ইহাই সকল জাতির অদৃষ্ট নিয়তি; খণ্ডন করে কে? বিশ্বাসীর চক্ষে অদৃষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যেমন সাধক মাত্রেই নিগ্রহ নির্যাতনের মধ্য দিয়া পরিণামে ব্রহ্মেরই অভয়পদ লাভ করেন, তেমনি প্রত্যেক মানবজাতি বার বার উত্থান পতনের মধ্য দিয়া, নানা বিপ্লব পরীক্ষার মধ্য দিয়া শেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে। ইতিহাসের এই অগ্নিময়, রক্তময়, শ্মশানময় পথ, হে লোকেশ, তোমারই আদিষ্ট পথ, ইহার মধ্যে তোমারই অখণ্ড বিধি পালন করিতে হইবে। হে ত্রিকালজ্ঞ, সমস্ত জাতির স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা, আমাদের প্রিয়তম পুরাতন ভারতবর্ষ কি কোন দিন তোমার মনোমত জাতীয় আকার লাভ করিবে? আমি নিজে কোন প্রকার বিদ্বিষ্ট আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িক অনুদার কোলাহলে যোগ দিই না, এজন্য লোকের নিকটে দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হই না। আমি মনে করি, নীতি সদাচার ও সার ধর্ম্মের উৎকর্ষ লাভ হইলে, অপর সমস্ত উন্নতি যথাসময়ে আসিবেই আসিবে, এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া থাকি। জাতীয় সার সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মে মিলিত হইয়া কি আমরা কোন দিন ঐক্যে ও প্রেমে একাকার হইব? পিতা কবে হইব? সেই আকাঙ্খাও প্রার্থনায় বহুকালাবধি একাকী কি পাঁচ জনের সঙ্গে তোমার পদচিহ্ন চিনিয়া সঙ্কটময় জীবন পথে চলিতেছি, যেন এই অভাগা আত্ম-বিমূঢ় জাতি কোন দিন আপনার প্রাপ্য অবস্থা লাভ করে, হে ভারতপতি, এই নিবেদন করি, এবং ইহারই কিঞ্চিৎ অস্ফুট পূর্ব্বাভাস দেখিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি।

মানব প্রকৃতি দর্শন

নমস্কার শত বার, হে নারায়ণ, যে মানব-প্রকৃতির নানা উত্থান পতনে তুমি আমার কাছে তোমার বিশেষ আত্মপরিচয় দিলে, কারণ বাহ্যবস্তু মাত্রেই আত্মাহীন, নীতিহীন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রহিত জড়ময়—চিন্ময় মানব প্রকৃতিমধ্যেই তোমার দিব্যনিবাস। মানবমণ্ডলী ও মানব বিশেষের মধ্যে কি অতুল বিচিত্র জ্যোতিঃ,—

কত দয়া, ধর্ম্ম, শুদ্ধাচার, রিপুসংযম, আত্মত্যাগ, আত্মবিনাশ, পরপ্রেম; কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎসালয়, বিচারালয়, দাতব্যআশ্রম, ধর্ম্মাশ্রম, তপস্যা ভূমি! কীর্ত্তিমান মানববংশে কত মহাবোধিসত্ব, কত মহাধর্ম্মবীর, কত জাতীয় জীবনের আদিপুরুষ, কত উন্নত সভ্য সমাজের নেতা; কত আদিকালীন ঋষি, মনীষী, কত সাধ্বী চির-কুমারী ব্রহ্মচারিণী, বিদুষী, কত কবি, ভগবদ্ভক্ত! আমি এক মুখে এই বিচিত্র মানব স্বভাবের মহাদৃশ্য কিরূপে ব্যাখ্যা করি? হে দিব্যপিতা, তুমি আমাকে এই নানা জাতীয় মানবে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলের মধ্যে তোমার আশ্চর্য্য প্রতিমা ও প্রতিভা দেখাইলে। এ সমুদয় মহাজনগণ তোমারই বংশ, তোমারই অংশ, তোমারই পরিবার। এমন নরাধম কে আছে যার মধ্যে কোন না কোন আকারে তোমাকে বিদ্যমান না দেখি! এ বৈচিত্র্য মধ্যে আমি নিজে একটু পরমাণু বই নহি, যেন আত্ম-অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন না করে। আমি এই মহাকুলে জন্ম পাইয়া সকলের শিষ্য হইয়াছি, প্রতিনিধি হইয়াছি, সকলের কাছে ঋণী, হইয়াছি। সর্ব্বসাক্ষীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি কোন্ জাতিকে, কোন্ ধর্ম্মকে কোন্ ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিব? মানব স্বভাবের সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে আমি অদ্ভুত ব্রহ্ম-স্বভাবের মহামুকুট প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার গভীরে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবত্বের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম। এখন সত্য সাক্ষী করিয়া আমি সমস্ত মানবকে নম্রভাবে নমস্কার করি।

অধ্যাত্মযোগ

কিন্তু হে অন্তরাত্মন্, আমি এমন স্পষ্টভাবে তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ আব কোথায় দেখিব যেমন আমার নিজের আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ মধ্যে দেখিতে পাই? সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব, নীতি, সত্য, সৌন্দর্য্যের মিলন, সর্ব্বপ্রকার রস, রূপ, গুণ,—এ সব বিবিধ মহাভাব ও মহাপ্রতিভা একাকার করিয়া, হে সর্ব্বময়, তুমি মানুষের আত্মার মধ্যে বসতি করিতেছ। সেখানে সগুণ নির্গুণের মিলন, জড় চৈতন্যের মিলন, সান্ত ও অনন্তের মিলন পাই। তুমি অন্তরে দীপ্যমান, সেই আভ্যন্তরিক রশ্মি হইতেই বাহ্যপ্রকৃতির শ্রী, সৃষ্টির মহান আবির্ভাব ও উদ্দেশ্য—তুমি যার নিজ হৃদয়ে প্রকাশিত নাই তার বিচারে তুমি কোথাও নাই। তাহার নিকট সৃষ্টি নিরীশ্বর। আসল কথা এই, বাহিরে সার বস্তু নাই, মানুষ

মহামায়া ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন, তাই অসারকে সার মনে করে। যাহা ইন্দ্রিয় গোচর, তাহা কেবল দৃশ্যমান চঞ্চল লীলা, তাহা তোমার অন্তর্নিবাসের ছায়া মাত্র। তুমিই মূলাধার, সর্ব্বময়, সর্ব্বেসর্ব্বা। তোমার সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ হয়, কোথায় থাকে প্রকৃতির সারতত্ত্ব, কোথায় থাকে মানুষের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ? তখন সংসার মোহান্ধকারময় বন্দী গৃহ, আর কিছুই নহে। তখন আমি অন্ধকারের সন্তান, প্রবৃত্তির ক্রীড়াবস্তু, মোহ মায়া অনীতির দাস, মৃত্যুর অধিকৃত বলিদান, জনাকীর্ণ জগতে আমি একাকী! নিরীশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে একবারও জয় লাভ করিতে পারি না, যখন আবার তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হই, তখন অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়ধামে দেখি এ জগতে তুমি দিব্যমূর্ত্তি, তখন মানুষ হইয়া যাহা কিছু দেখিবার তাহা অবাক হইয়া দেখি,—দেহ-ধারণে ইহ-লোকতত্ত্ব, বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, যাহা কিছু প্রাপ্য তখন তাহা পাই। তোমার সঙ্গে অন্তরে মিলন হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠে; তুমি নিজ পরাক্রমে আমার পক্ষ হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কর, এবং আমার জন্য সমুদয় ত্রিভুবনকে জয় করিয়া আমাকে তোমার জয়াধিকারী কর। তোমার সঙ্গে অন্তরে মিলন হইলে আর কাহাকেও মনে থাকে না, আর কাহাকেও ভয় থাকে না, আর কাহাকেও আবশ্যক থাকে না; গুরু, আচার্য্য, মধ্যবর্ত্তী, মহাজন সকলেই তোমামধ্যে অদৃশ্য হন। তুমি আমাকে তাঁহাদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছ তাই দেখিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ তাই স্থাপিত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বমূলাধার, তোমার প্রসাদে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে ব্রহ্মসঙ্গ ও ব্রহ্মসমাধি নিজ আত্মার মধ্যে লাভ করিয়াছি সদ্য-মুক্তি সম্ভোগ করিতেছি—নিত্যমুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছি। মুক্তিছদাতা, প্রতিদিন আমার সঙ্গী হইয়াছ; ধন্য তুমি, ধন্য তোমার এই যুগধর্ম্ম বিধান!

ইহ-সংসার কি

তোমার দিব্য প্রেরণায়, হে জীবিতেশ্বর এখন বুঝিলাম যে পৃথিবী তোমার মহিমার আলয় ও লীলাভূমি, জীবন্ত শিক্ষাস্থল, কার্য্যস্থল, পরীক্ষাস্থল, নিত্যজীবন, নিত্য আলোক ও নিত্যানন্দ লাভ করিবার স্থল। কিন্তু ইহলোকে সকল গভীর প্রশ্নের উত্তর মিলে না, সকল শুভাশুভ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না, এবং কোন একজনেরও সকল শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এখানে সকল প্রকার সিদ্ধি সম্ভব নয়, এবং তাবৎ নিগূঢ় বিষয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্টিপথে পড়ে না; কিন্তু তথাপি, হে পরম

গুরু, এখানকার সার শিক্ষা এত উচ্চ যে সকল সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, কেবল বিশ্বাসের সহিত সার শিক্ষার জন্য তোমার উপর নির্ভর করি। ধর্ম্ম পরীক্ষা সময় সময় এমনই গুরুতর যে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। তথাপি ইহ-জীবনেতেই আমি নানা পারিতোষিক ও পুরস্কার লাভ করিলাম, সামান্য সাধনে বৃহৎ ফল লাভ করিলাম। কিন্তু এখনও পরীক্ষা অবশিষ্ট রহিয়াছে। উত্তেজনা, রোষ, আত্মসমর্থন ইত্যাদি রিপুর পরীক্ষা; সংশয়, বিক্ষেপ, নিরানন্দ, লোক-ভয় প্রভৃতি বিশ্বাসের পরীক্ষা; প্রলোভন, সংসারস্পৃহা, কুদৃষ্টান্ত ইত্যাদি প্রনীতির পরীক্ষা; অভাব, দারিদ্র্য, অপবাদ, পদচ্যুতি ইত্যাদি সামাজিক পরীক্ষা; রোগ, মোহ, ক্ষয়, মৃত্যুভয়, শোকাদি শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা; আরও শত শত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরীক্ষা প্রেরিত হইতেছে, হয়ত শেষদিন পর্য্যন্ত প্রেরিত হইবে। এই প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে তোমার গভীর শিক্ষা ও পবিত্র অভিপ্রায় নিহিত আছে, আমার নিজের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ব্রতনিষ্ঠা নিহিত আছে। হে ত্রাণকর্ত্তা, তুমি জান সকল বিষয়েই আমার নানা ত্রুটী হইয়াছে, কিন্তু কখনও আমি শিখিতে ও পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক নই, এবং তোমার মুক্তিপ্রদ ক্ষমা লাভে নিরাশ নই। তুমি আমার ঐহিক ত্রুটী যেমন পরিশোধন করিতেছ, তেমনি পারত্রিক মহোন্নতির জন্য আয়োজন করিতেছ; এই দীর্ঘ জীবনে নানা অবকাশ ও আত্মসংশোধনের উপায় আনিয়া দিতেছ। এখন মিনতি করি বিশ্বাস, পবিত্রতা, প্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞানকে পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ কর। যেমন তোমা হইতে অবিরল ক্ষমা লাভ করিলাম তেমনি যেন অত্যাচারী লোকদের প্রতি অবিরল ক্ষমা ও সদ্ভাব বিস্তার করি। তুমি এ বিষয়ে আমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিলে তার জন্য কৃতজ্ঞ হই। আরও ক্ষমতা দাও, যেন ইহলোকে সংসারজয়ী ও আত্মজয়ী হইতে পারি।

দেশ-ভ্রমণ

এ জীবনের ভাবী প্রয়োজন ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমার্ধা করিবার জন্য আমার স্বভাবে এই প্রগাঢ় ভ্রমণ প্রবৃত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। নানা দেশ ও নানা জাতির পরিদর্শনে আমার মহা আহ্লাদ ও মহাশিক্ষা হইল, নিজ স্বভাবে নানা শক্তির বিকাশ হইল, নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে উচ্চ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। পৃথিবীর বিষম বৈচিত্র্য দেখে, নানা দেশীয় লোকের অশেষ বিচিত্র প্রতিভা ও শক্তি বুঝে

অনেক কুসংস্কার, স্পর্দ্ধা ও অভিমান দূর হইল। পরলোকের অলক্ষিত অথচ প্রত্যাশিত রাজ্যে প্রবেশের জন্য আমার জীবন যথার্থই একটী অবিশ্রান্ত তীর্থযাত্রা। জীবনের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীর নানা খণ্ডে গমনাগমন করিলাম, নানা দৃশ্য দর্শন করিলাম, নানা অবস্থা অতিক্রম করিলাম, ইহাতে আমার জাতীয় প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হইল না, আয়ত হইল, সকল প্রকার প্রচ্ছন্ন সুপ্রবৃত্তির অনুশীলন হইল, আমি এখন কোন্ রাজ্যের লোক, কোন্ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য তাহা বলা কঠিন; তবে ক্রমেই ব্রহ্মরাজ্যের নিকট হইতেছি এবং তন্নিবাসীদের আচার বিচারে সংস্কৃত হইতেছি তাহা নিঃসন্দেহ। এই দেশ-ভ্রমণের অনিবার্য্য ইচ্ছা আমি কখনই সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে পারিব কি না তাও জানি না। কত অপরিচিত প্রদেশে বিচরণ করিলাম, কত প্রকার রীতি নীতি দেখিলাম, কত প্রকার অভিনব আদর্শ দেখিয়া সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি উদার হইল; কত নূতন জাতীয় লোকের সঙ্গে নূতন প্রণালীতে আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। তাঁদের সঙ্গে সমসুখ সমদুঃখ সাধারণ আশা, সাধারণ উৎসাহ ও সাধারণ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া মানব-প্রকৃতির একতা উপলব্ধি করিলাম। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি তাঁহারা মহোন্নত, আমরা সেরূপ নই; তাঁদের সঙ্গে মিলিয়া নানা ভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়, মানবপ্রকৃতির মূল্যে ঐক্য উপলব্ধি হয়; কোনদিন যে এক সত্য, এক প্রেম, এক ন্যায় নীতিতে পূর্ব্ব-পশ্চিম একাকার হইবে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

কেশব-সম্বন্ধের পরিণতি

তোমাকে সাক্ষী করিয়া, হে শুভসংকল্প, এ সময় আমি আর একবার সেই মহাতেজঃপুঞ্জ পুরুষকে স্মরণ করি, যিনি আমাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র নাম ধরিয়া কিছুদিন বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র দৃষ্টান্ত, তাঁর মহান ধর্ম্মবার্ত্তা, জীবনপ্রদ ভক্তি, অগ্নিময় উদ্যম উৎসাহ, সংশয়রহিত বিশ্বাসবল, বিশ্বব্যাপী উদারতা আমাকে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তোমার সন্নিহিত করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন প্রথম হইতে জড়িত হইয়া তাঁর ব্রতকে আমার ব্রত করিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মকে আমার ধর্ম্ম করিয়াছে। আমাদের অবলম্বিত "নূতন বিধান" যে যথার্থই নূতন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে প্রমাণ লাভে আমি ধন্য দেশ ধন্য, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য। তিনি বর্ত্তমান হিন্দু জাতির

বিশেষ ধর্ম্মোৎকর্ষ হেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অসীম আদর্শ, বিবিধ ও বহুল ধর্ম্মদর্শন, তাঁর ধর্ম্মশিক্ষা, এ সময়ে এ দেশের সকল লোক গ্রহণ করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বাধ্য। না গ্রহণ করিলে সত্য ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবার ও সাধন করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের যে নূতন গতি ও নূতন কার্য্য হইবে সে সমস্ত তাঁর প্রদর্শিত পথে এবং তাঁহার কীর্ত্তি, তাঁহার ভাব চরিত্র অবলম্বন করিয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। তবে বলা বাহুল্য, তাঁর সমস্ত কথার সমান মূল্য নহে; অতএব কেশবের সকল কথায় ও সকল কাজে আমি সমভাবে সায় দিতে পারিতাম না। এজন্যে আমি যথার্থ দুঃখিত বটে, কিন্তু ধর্ম্ম দ্বারে অপরাধী নই। ব্রাহ্মসমাজে কেহ কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাস, অভক্তি ও অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মচ্যুত ও দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে অযথা ভক্তি দেখাইতে গিয়া নিজে দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন কেবল তাহা নহে, উদার ধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট করিলেন ও কেশবকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিলেন। কেশবের কোন কোন সাময়িক কথা, কি কার্যকে স্থির-গৌরবান্বিত করিতে গিয়া নিজের মত বিশ্বাস তাঁহাতে আরোপ করিলেন, আপনাদের পদবীতে তাঁহাকে নামাইয়া আনিলেন, তাঁহার জীবন, চরিত্র ও আধ্যাত্ম প্রকৃতিকে ভুলিয়া গেলেন। সত্য সাক্ষী করিয়া আমি স্বীকার করি, আমার চক্ষে তিনি যেমন পূর্ব্বে তেমনি এখনও; তিনি আমার অগ্রজ, আমার আচার্য্য, আমার প্রিয়তম বন্ধু। তাঁহার উচ্চস্থান, তাঁহার দিব্য অধিকার, ব্রাহ্মসমাজে তাঁর মহান নিয়তি ও অতুল্য প্রভাব আমি চিরদিন স্বীকার করিয়াছি ও করিব। যদি আমার জীবনে কোন মহোদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা তাঁহার অসামান্য দৃষ্টান্ত ও অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠার ফল; যদি ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আমার কোন স্থান কি অধিকার থাকে, তাহা তাঁরই অনুমোদিত ও তাঁহার দ্বারা স্বীকৃত, তদ্ভিন্ন আমি অন্য অধিকার চাই না, তোমাকে সাক্ষী করিয়া একথা বলিতেছি; লোকের আচরণ যাহাই হউক, তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁর অনুগামী, তাঁরই কনিষ্ঠ, তাঁর বিশ্বাসী বন্ধু। মোহ, ভ্রান্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মহাকীর্ত্তি জগতে বিস্তার ও সংস্থাপন করিতে সক্ষম কর।

চিত্রশক্তি বা কল্পনা

নানা বর্ণে ও নানা আদর্শে চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি ও অনুশীলন হয়; নানা ভাব, চিন্তা,

অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনতত্ত্ব ও সত্যের মহিমা চিত্রিত হয়। জীবনের পূর্ণ আদর্শ যিনি, তাঁহার প্রতিমা ধর্ম্ম-স্বভাবের মর্ম্মে দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা ইহাই পরম সাধন। কখনও বা তিনি ছায়াময়, কখনও বা আলোকময়. এই ছায়ালোক অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ বর্ণনা করি। অনন্তপ্রকৃতি তুমি কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে কোন্ জাতির স্বভাবে কোন্ শক্তিকে প্রবল কর তাহা কে বুঝিবে? আমার অন্তরে অত্যধিক পরিমাণে এই অদ্ভুত কল্পনা শক্তিকে বদ্ধমূল করিলে। অদৃষ্ট কি অর্দ্ধদৃষ্ট বস্তুর গুণতত্ত্ব স্বতঃ ও সহজে আমার মনে মুদ্রিত হয়; আমি চিন্তা ও কথার দ্বারা তাহার উজ্জ্বল চিত্র ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিতে পারি; ইহাতে আমার নিজের আত্মার পরমানন্দ, বিশ্বাস ও চৈতন্য স্ফূরিত হয়, এবং যাঁহারা আমার কথায় প্রত্যয় করেন তাঁদেরও পরম উপকার হয়। হে ব্রহ্মন্, তোমার সত্তা ও স্বরূপ, পরলোকের দিব্যতত্ত্ব, দিব্য-পুরুষদিগের প্রভাব ও চরিত্র, তাঁহাদের সঙ্গে আমার মহাসম্বন্ধ, পুণ্য পাপের ফলাফল ইত্যাদি নানা বিষয় আমার চক্ষে উজ্জ্বল, সুশিক্ষাময় ও সার সত্যে পরিপূর্ণ। এই দৃষ্ট পৃথিবী, ইহার রস, শ্রী, ও দিব্য সঙ্কেত, ইহার শ্রুত কি অশ্রুত সমাচার, জানিত কি অজানিত তাৎপর্য্য, নরবংশের শত সদ্গুণ, বিষম অসদ্গুণ আমি শীঘ্র বুঝিতে পারি। এবং দেখিয়াছি, একবার নয়, অনেকবার দেখিয়াছি ইহাতে ভ্রান্তি হয় নাই। এই কল্পনা শক্তিকে কোন কোন লোকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা অবজ্ঞার বিষয় নহে। যদি সদ্জ্ঞান, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সাধনা, সার ভক্তি, গভীর চিন্তা ও শুদ্ধ-চরিত্রতার সঙ্গে ইহা মিলিতভাবে কার্য্য করে, এই মানসিক চিত্রশক্তি অতীন্দ্রিয় বিষয়কে ইন্দ্রিয়গোচর করে, দুর্ব্বোধ্য সত্যকে ভাব বুদ্ধির আয়ত্তগোচর করিয়া দেয়, কখন কখনও জ্ঞানের অভাব, সাধনের অভাব, এমন কি, বিবেকের অভাব পর্য্যন্ত মোচন করে। চক্ষে যা দেখি নাই, কর্ণে যা শুনি নাই, মনে যা ভাবি নাই, তব প্রেমে উত্তেজিত আত্মার সম্মুখে তুমি সে সকল ব্যাপার ছবির ন্যায় চিত্র করিলে, এবং তোমার শক্তিতে লোকের নিকট আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম। যেন সে চিত্র কখনও মলিন না হয়।

রচনা ও বক্তৃতা শক্তি

সর্ব্বশক্তিমান যেমন একদিকে নানা ভাবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তেমনি অপর দিকে আবার এই সকল মহাসত্য প্রকাশ করিবার জন্য যথাযোগ্য লিখিবার ও বলিবার শক্তি দিলেন। পুস্তক রচনা করিয়া, মুখে উপদেশ

বক্তৃতা করিয়া আমি স্বজাতির এবং অন্য জাতির, নিজ-ধর্ম্মমণ্ডলীর ও অন্য-মণ্ডলীর সেবা করিতে পারিলাম ও ধন্য হইলাম। এই ভাষাশক্তি, দৈবশক্তি, ইহা উপার্জ্জন করিয়া লাভ করি নাই, হৃদয়ের মধ্যে যে আত্মপ্রকাশক পরমেশ্বরের অন্তর্নিবাস তাহা হইতে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি আপনা আপনি পাইয়াছি। যখন অন্তরাত্মার সংস্পর্শে মন উত্তেজিত হয় তখন লিখিতেও পারি বলিতেও পারি, ভাষার অভাবে ভাবের অবরোধ হয় না; কিন্তু ভাবরাশি এমন প্রবল ও অপরিমেয় যে তাহা প্রকাশে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যাহা লিখি ও বলি তাহা শতবার সংশোধন করিয়াও মনঃপূত হয় না; ভাষাশক্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইলে মনঃপূত হইবে কি না জানি না, বোধ করি হইবে না। যত কথার দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি ততই ভাবপ্রবাহ আরও নিগূঢ় ও অকথ্য হইয়া উঠে। যাহা লিখিলাম ও বলিলাম তাহা অনেক সময় অন্য লোককে, অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ লোককে উপলক্ষ করিয়া বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কাহার কত উপকার হইল জানি না, ভাবিতেও চাই না। আমার অন্তরের অমূল্য আহার্য্য ও পানীয় আমি সাগরে ভাসাইয়া দিলাম, কে তাহা সংগ্রহ করিবে জানি না, বিফলে যাইবে না তাহা জানি। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলেও সৎকর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। মনের ধারণা ও উচ্ছাস সম্বরণ করিতে পারি না তাই এত লিখি ও বলি; এই কার্য্যে আমার উৎসাহ ও পরিশ্রম চিরদিন সমান রহিল। ইহাতে আমার নিজের যে মহোপকার হইল তা নিশ্চয়। যাহা মনের মধ্যে ভাবি কি ভোগ করি তাহা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলে চতুর্গুণ পরিষ্কার হয়, পরিপক্ক হয়, ও প্রবল হয়। মনের ভাব, কি ইচ্ছা, কি চিন্তা বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় উদয় হয়, আবার শীঘ্র অদৃশ্য হয়; আত্মপ্রকাশক ভাষাশক্তি দ্বারা এই ভাব চিন্তা ঘনীভূত হয়, নিয়মিত হয়, বর্ষিত হয়; বৈশাখের বৃষ্টির ন্যায় শান্তি, শস্য, ফলপ্রদ হয়; ভাব এবং ভাষা উভয় উভয়ের সহায় হয়, ধর্ম্মকে হিরণ্যগর্ভ করে। এই দিব্য শক্তির জন্য আমি তোমাকে, হে দাতা বিধাতা, শতবার নমস্কার করি।

ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম সকলই তোমার উদার দাতব্য গুণে। হে প্রভো! তুমি কৃপাবান হইয়া যে আমাকে সত্যধর্ম্মপ্রচাররূপ মহাব্রত দিয়াছিলে ইহা গ্রহণ ও চিরজীবন পালন করিয়া আমি ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সদ্গতি লাভ

করিয়াছি। যেন এই ব্রত উদ্‌যাপনে জীবন শেষ করিতে পারি। তোমার শক্তিতে কোন দিন, যে নামেই হউক, এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে একাকার করিবে। আমি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না। কিন্তু এখনই তাহা আরম্ভ হইয়াছে, আমি তাহার শত পূর্ব্বচিহ্ন সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তুমিই ধন্য ধন্য।

বিপরীত সমন্বয়

মানুষের অবস্থা কি মনের ভাব, কি চরিত্রের গতি কখনই একরূপ থাকে না, ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হয়। এই নানা অবস্থার ভিতর ধর্ম্মজীবন কি প্রকারে অখণ্ড হইবে? সনাতন, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-প্রভাবে হে বিশ্বগুরু, কত বন্ধু, কত শিক্ষক, কত সহানুভূতি সাহায্য লাভ করিলাম,—কত শত্রুতা, নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন ও অসদ্ভাব সহ্য করিলাম। এই দুয়েরই মধ্যে তোমার নিত্যনির্ব্বিকার অভিপ্রায় দেখিতেছি, কোন অবস্থার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিতে পারি না। তোমাকে শত ধন্যবাদ, কেন না এ সকল বিপরীত অবস্থার মধ্যে না পড়িলে আমি তোমার বিচিত্র ব্যবহার ও বহুগুণের সমন্বয় বুঝিতে পারিতাম না। তাহা বুঝিয়া নিকট হইতে তোমার আরও নিকটতর হইতেছি। বিবাদ, অসন্তোষ ও উত্তেজনা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। অমঙ্গলেও তুমি আমার পক্ষে মঙ্গল ইহা সাব্যস্ত কথা। তীব্র অবস্থার মধ্যে তুমি মিষ্ট, শত্রুতার মধ্যে তুমি পরম মিত্র; তোমার গুণ কে বুঝিবে?

প্রবৃত্তি ও আসক্তি

তোমাকে সাক্ষী করিয়া হে দ্বিজাত্মাদিগের অধিপতি, সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করি যে তুমি আমার স্বভাবে নানা প্রবৃত্তি ও আসক্তি বিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট করিলে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রবল ও তীক্ষ্ন; সমুদয় মানসিক শক্তি তীব্র ও সজীব; সহজে উত্তেজিত হয়, সহজে নিরস্ত হয়। আমার পক্ষে ভাল হওয়া ও মন্দ হওয়া দুইই সমান স্বাভাবিক ও সমান সহজ। এই জন্য নানা প্রকার লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হইলাম ও নানাপ্রকার লোককে আকর্ষণ করিলাম। ইংরাজ, বাঙালী, স্ত্রী-জাতি, পুরুষ, অল্পবয়স্ক, প্রাচীন অনেকে আমার বন্ধু। ইহার ইষ্টানিষ্ট প্রায় তুল্য। ভাল লোকের দ্বারা খুব আকৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ, তুমি দেখিতেছ এই কলুষিত

জনসমাজে পবিত্রতা অপেক্ষা পাপাচারের দৃষ্টান্ত কতই অধিক, কতই প্রবল। অতএব আমি যে যৌবন সময়ে মাঝে মাঝে কুপথগামী হইব ইহা আশ্চর্য্য নয়, একেবারে রসাতলে যাই নাই ইহাই আশ্চর্য্য। কতক বা বুঝিয়া কতক বা না বুঝিয়া নানা গুরুতর অপরাধে জড়িত হইয়াছিলাম। কালের পূর্ণতাতে তুমি সেই সকল অপরাধ মোচন করিলে। সেই সকল প্রবৃত্তি দমন করিলে। বিবেকের কঠিন বিচার হইতে বোধ করি আমি কখনও নিষ্কৃতি পাইব না, কখনও নিষ্কৃতি চাহিব না। কঠিন আত্মপরীক্ষায় আমার দিন গেল। ইহা সত্ত্বেও তুমি ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে এ কি অভিনব অদ্ভুত জীবনের সঞ্চার করিতেছ। বহু আয়াস, বহু পতন উত্থানের পর অল্পে অল্পে স্বভাব এ কি নূতন অবয়ব লাভ করিতেছে। ঠিক যেন আমি আর সে লোক নই। আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ আছে; কিন্তু দেখ, এ সকল ইন্দ্রিয় কেমন অধ্যাত্ম পথের সহায় হইয়াছে, স্বভাব-নিকেতনের মধ্যে তোমার গমনাগমনের দ্বার কেমন উন্মুক্ত করিতেছে! তুমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছ। এই সকল মানসিক ভাব রুচি প্রবৃত্তি, স্পৃহা, কল্পনা পূর্ব্বের ন্যায় তীব্র বটে, কিন্তু তোমার পরমাশ্চর্য্য প্রভাবে দিব্যাকৃতি পাইয়া অবিরল যোগে অনুরাগে তোমারই মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, আরও হইবে। সশরীরে সংসারে থাকিতে থাকিতে, এখানকার কার্য্য করিতে করিতে, এই দিব্য জীবনের আলোকে সমুদয় সংসার রূপান্তরিত হইতেছে, ধরাধাম স্বর্গধাম হইতেছে, আরও হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আন্তরিক ক্ষয়, অবসাদ, অবনতি হইতে ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতেছি, আরও করিব। এই নানা গুণ দোষ জড়িত মানব প্রকৃতিকে মহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তুমি যে তোমার সঙ্গে বিচিত্র ভাবে একাকার করিতে পার আমি তাহার জীবন্ত সাক্ষী। হে মুক্তিদাতা, এই মহা অদ্ভুত মুক্তি শাস্ত্রের জন্য, এই মহা অদ্ভুত মানব স্বভাবের রহস্যের জন্য তোমাকে সহস্র নমস্কার।

পুনরায় ঈশা-তত্ত্ব

এই বহুভাব জড়িত, প্রলোভন তাড়িত, ধর্ম্মজীবনে আমি এমন সহায় ও সঙ্গী আর কাহাকেও পাই না ঈশা যেমন। মানুষ জন্ম লইয়া জনসমাজের শত প্রলোভনে কিরূপে সংসার মধ্যে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হয় তিনি তদ্বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন,

তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। আমি সেই পথে বহুকষ্টে চলিতেছি। আমার অস্থির অন্তরে ঈশার চিন্ময় প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার জীবনপ্রদ জীবন, তাঁহার মুক্তিপ্রদ মরণ, তাঁহার নিশ্চিত অমরত্ব ক্রমে ক্রমে স্বয়ং পরমাত্ম, প্রকাশ করিলেন ; ইহার ঐতিহাসিক ও বাহ্যিক প্রমাণও অনেক পাইলাম৷ নিজ জীবন, নানা জাতীর জীবন তাহার সাক্ষী। এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। আমার নিকট পরম পিতার স্বভাব, গুণ, চরিত্র ও অভিপ্রায়, মানুষের সঙ্গে পরমাত্মার সহানুভূতি এ জীবনে যতদূর ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন ও করিতেছেন। আমার নিকট এই খ্রীষ্টাত্মা কেবল ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, অভিমানী ধর্ম্মাচার্য্যদের কল্পিত পুরুষ নহেন, কিন্তু জীবন্ত দীপ্তিমান, বর্ত্তমান আদর্শ। এই আদর্শ হে সত্যস্বরূপ, তোমার প্রতিরূপ, তোমাতে পরিপূর্ণ, তোমারই দ্বারা প্রকাশিত, ইহাতে আমার পক্ষে সার ধর্ম্ম সাধ্য হইয়াছে। আমি এই ঈশার অবতারণা মধ্যে জীবে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে জীবদর্শন করিয়াছি, হে বিশ্বরূপ নারায়ণ, তোমার দিব্য দর্শন পাইয়াছি। এইরূপে আমার চক্ষে দেবাত্মাগণ ও সাধকগণ একাত্মা হইয়াছেন, ও তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ঈশা সকলের অগ্রগামী, সকলে তাঁহার অনুগামী। মুখে, কি মতে, আমি কাহারও অনুগামী হইতে চাই না, ঈশারও নয়, অন্য কাহারও নয়। কার্য্যে, ভাবে, চরিত্রে, জীবনে মরণে প্রভু ঈশার অনুগামিত্ব ও অধীনতা চিরদিন অবলম্বন করিয়াছি।

অভাব ও অনটন

সম্পন্ন পরিবারে জন্মিয়াছিলাম বটে, কিঞ্চিৎ পিতৃ-সম্পত্তিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু লোকের অসততায়, নিজের অচেষ্টায়, উপার্জ্জনের অভাবে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। লোকে যে সকল কঠোর উপায়ে আপনার প্রাপ্য অন্য হইতে আদায় করে তদবলম্বনে সক্ষম হইলে এত শীঘ্র নিঃসম্বল হইতাম না, কিন্তু জীবনের কোন অবস্থাতে কাহারও উপর কঠোর ব্যবহার করিতে পারিলাম না। এই জন্য বারম্বার নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, হইতেছি। নিরাশ্রয় হইলাম, তথাপি অর্থের জন্য ধনী কি ধার্ম্মিক কাহারও উপর কখনও নির্ভর করি নাই। সে জন্য বারম্বার ধনবান ও ধর্ম্মবান উভয়েরই অপ্রীতি-ভাজন হইলাম, আত্মবশ ও গর্ব্বিত বলিয়া নিন্দিত হইলাম। তুমি অবগত আছ, হে মঙ্গলময় অন্তর্যামি, একদিন আমাদের এমন অবস্থা ছিল যে অন্ন বস্ত্র পাওয়া গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছিল, ঋণে ডুবিতে ছিলাম। নিরাশ্রয় হইয়া কেবল তোমারই

প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিতাম। অভাব ও দুঃখের কথা কাহাকেও জানাই নাই, কখনও কাহারও গলগ্রহ হই নাই। এখনও আমি নির্ধন বটে, কিন্তু আমার গ্রাসাচ্ছাদন ও প্রাণ রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার অভাব তুমি রাখিলে না। ইহা আমার নিকট একটী অতি বিস্ময়কর ব্যাপার; বিলক্ষণ বুঝিলাম পারত্রিক ও ঐহিকের জন্য একই উপায়, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"।

আমেরিকার সহানুভূতি

এই দশ বারো বৎসর আমেরিকা আমার সকল সাংসারিক অভাব মোচন করিয়াছেন; আমার উপকারি-গণকে আমি আজ পর্য্যন্ত ঠিক জানি না, শুনিতে পাই তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাঁহাদের নিকট কখনও যাচ্ঞা করি নাই, তাঁহাদের কাছে কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই। কেবল তোমার-মাতৃপ্রেম সিংহাসন সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে শত আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি। এখন তাঁহাদের এ অযাচিত দাতব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদেশী হইয়া স্বদেশীর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলেন; তাঁহারা পর হইয়া পরমাত্মীয়ের কার্য্য সাধন করিলেন। কিন্তু তোমার নিকট ও তাঁহাদের নিকট এ জীবন আমার কৃতজ্ঞতা শেষ হইবে না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথমে দৈবাদিষ্ট হইয়া আমেরিকায় যাত্রা করি তখন বুঝি নাই কত বড় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই মহানুভব আমেরিকার হস্তে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও সকল প্রকার ভাবী উন্নতি নির্ভর করে। এই জাতির মহা কীর্ত্তি ও মহান নিয়তি কখনও ভুলিতে পারি না। হে পরমেশ্বর, তুমি আমেরিকার গৌরব বৃদ্ধি কর।

কিরূপে দিন চলিয়াছে

হে ধর্ম্মসাক্ষী, আমি ধন সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করি নাই, কাহারও চাকুরী স্বীকার করি নাই, কোন ব্যবসা বাণিজ্য করি নাই; অতএব আমি যে নির্ধন হইব ইহা আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এই যে নির্ধন হইয়াও রাজপুত্রের ন্যায় কালযাপন করিলাম, তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া যখন যে কার্যে প্রেরণা, পাইলাম তখন তাহাই

নিশ্চয় কর্ত্তব্য বিশ্বাস করিলাম, প্রাণপণে পালন করিলাম; অর্থ লোভে কোন দিন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। এরূপেই সাবধানে এক এক পদ এই দীর্ঘ জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছি। অনেক কার্য্য একেবারে করিতে পারি নাই, অনেক সোপান একেবারে উঠিতে চেষ্টা করি নাই। এই ক্রমশঃ কর্ত্তব্য বিধি, তোমারই পবিত্র ইচ্ছা বিধি; ইহাই এ জীবনের সুমিষ্ট বিধি। ইহা সংসাধনে অসঙ্কোচে দেহ মনের সকল সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়াছি। এরূপ করিয়া সময়ে সময়ে বিপন্ন হইয়াছি বটে, একাকী পড়িতে হইয়াছে, সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছি, কিন্তু সকল বিঘ্ন ক্রমে ক্রমে তুমি খণ্ডন করিলে। আমার প্রতিবেশী, কি স্বদেশী, কি সমবিশ্বাসী, কি শত্রুগণ এ কথা বুঝিলেন না দেখিয়া তুমি মহাদেশী অজ্ঞাতনামা লোকেদের অন্তরেআমার জন্য সুমহৎ সহানুভূতির সঞ্চার করিলে, তাঁহারা কেবল মাত্র প্রীতিপরবশ হইয়া আমার জীবন রক্ষার উপায় করিলেন; আমার প্রধান কয়খানি ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; আমাকে বিদেশী মনে না করিয়া ভ্রাতৃ-তুল্য ব্যবহার করিলেন।

উপজীবিকা-তত্ত্ব

নানা অবস্থার মধ্যে এ জীবনে আমি বিলক্ষণ প্রতীতি করিলাম যে কেবল অর্থকামনায় কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে মানুষ শীঘ্র ধর্ম্মহীন হয়, অনেক ধর্ম্মাত্মা লোকের জীবনেও ইহার প্রমাণ দেখিলাম। ধনকামনা ও ধর্ম্মকামনা একত্রে বাস করিতে পারে না; একটী আর একটীকে নিশ্চয় গ্রাস করিবে। ধনত্যাগ-কামনাতেই ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি সম্ভব। যাহা জীবনের সার কার্য্য তাহা অমূল্য, সর্ব্বপ্রকার বেতনের ও পারিতোষিক পুরস্কারের অতীত। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মানুগত হইয়া অকপট নিষ্কাম ভক্তিতে লোকের সেবার্থে আত্মসমর্পণ করে ও সার কার্য্যে পরিশ্রম করে, উদ্যমের সহিত সেই আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কার্য্য যাহাই হউক, সামান্য কি অসামান্য হউক, মঙ্গলময়ের দুর্জ্ঞেয় প্রণালীতে সে ব্যক্তির নানা গুরুতর অভাব দূর হয়; সে অভাব সাংসারিক হউক, কি অপার্থিব হউক, তাহা সময়ে মিটিয়া যায়। বহু যাচ্ঞা ও চেষ্টায়, বহু তোষামোদে, বহু প্রকার হীনতা স্বীকার করিয়া যাহা পাওয়া যায় না, এবং পাইলে অনেক দিন রাখা যায় না, বিনা প্রার্থনায় তাহা লাভ হয় ও স্থায়ী হয়। তোমা হইতে যে অযাচিত অর্থ আসে (আসিয়া যে থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই) তাহা অর্থ নয়, তাহা পরমার্থ, তদ্দ্বারা

ঐহিক স্বর্গীয় উভয় প্রকার জীবন ধন্য হয়—ধর্ম্মজীবনের একটি নিগূঢ় রহস্য—পবিত্র উপজীবিকা লাভের ইহা মহোচ্চ বিধি। তোমার সঙ্গে একাত্মা ব্যক্তির সঞ্চয় নাই, উপার্জ্জন নাই, ঋণ নাই, অভাব নাই, জীবন রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা তোমার দ্বারা নিত্য প্রেরিত হয়, তাঁহার শ্রী সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? লোকে যদি তোমার প্রেমালোকে নিজ জীবনের আদিষ্ট নিয়তি বুঝিয়া লয়, এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তি নিষ্কাম হইয়া নিয়োগ করে, অর্থাভাবে তাহাকে সংসারের কীট হইতে হয় না। ইহা দুর্লভ দৃশ্য বটে, কিন্তু ইহা শতবার পরীক্ষিত নিশ্চয় সত্য, কঠিন সত্য বটে কিন্তু নিশ্চিত সত্য। কেবল এই একান্ত প্রার্থনা করি, তোমার প্রতি হে দিব্য পিতা! আমার সেই অকপট নিষ্কাম নির্ভর-ভক্তি হউক ও বৃদ্ধি লাভ করুক। তোমার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মদান করিয়া যেন তোমার কৃপাপ্রদত্ত উপায়ে এবং লোকের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দাতব্যে দিন শেষ করি। অন্ন বস্ত্র উপজীবিকার উৎকণ্ঠায় যেন আত্মকে কখনও কলুষিত না করে। কাহাকেও উপার্জ্জন করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু সার ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অনুরোধ করি, উপার্জ্জনশীল সঞ্চয়ী ব্যক্তির ধর্ম্মলাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে—হওয়া কঠিন; কিন্তু সার ধর্ম্মলাভে ইহকাল ও পরকাল দুয়েরই পক্ষে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শৈলাশ্রম ও শান্তিকুটীর

হে উদার আশ্রয়দাতা, "শান্তিকুটীর" ও "শৈলাশ্রম" আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র বাসস্থানের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি। জীবনারম্ভকালে আমি কেবল একটী মাত্র মস্তকাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য স্থান পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তুমি নিজের উদার কৃপানুসারে আমাকে আশার অতীত এই দুইটী উৎকৃষ্ট কুটীর দিলে। কলিকাতা মহানগরে "শান্তিকুটীর" তুল্য একটী যথাযোগ্য বাসভবন লাভ করা আমার মত লোকের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্য নহে—কিন্তু সেখানকার জল বায়ু সহ্য হয় না বলিয়া তুমি হিমাচল মধ্যে আমার জন্য "শৈলাশ্রম" রচনা করিলে। এ স্থানের স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট দৃশ্য, শান্তি ঐকন্তিকতা লাভ করিয়া আমি কত প্রকারে উপকৃত হইলাম। কত প্রকার পরিশ্রম, সাধন ও জীবনের কত প্রকার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, তাহা তুমিই জান। এই দুই বাসস্থানের ভবিষ্যৎ তোমারই পবিত্র অভিপ্রায় মধ্যে লুক্কায়িত আছে, যতদিন জীবিত আছি যেন ইহার যোগ্য ব্যবহার করিতে পারি।

রোগ বার্দ্ধক্য

উৎসাহ, আশা, সাধ, চেষ্টা এখনও ফুরায় নাই বটে, কিন্তু জরা বার্দ্ধক্য যে ক্রমেই বল হরণ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুবৎসরাবধি আমার শরীর রুগ্ন—এখন বিশেষ ভগ্ন, আমার এ রোগ সারিবার নয়। প্রাণ রক্ষার জন্য হে জগজ্জীবন, তোমারই অনুজ্ঞাত শারীরিক ও নৈতিক বিধি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার কাছে প্রাণরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা একই কথা, দুই নয়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছানুসারে আজও জীবিত, উদ্যমশীল ও কার্য্যক্ষম আছি। ইহা তোমারই বিধান; কিন্তু ক্রমেই বলহীন ও প্রাচীন হইতেছি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় যাহা ঘটিবার ঘটুক, কিন্তু তোমার নিকট আমি একটী ঋণ কখনও শুধিতে পারিব না। এই রুগ্ন, ভগ্ন ব্যক্তির অন্তরে তুমি এরূপ অক্ষয় অক্ষুণ্ণ জীবন সঞ্চারিত করিলে যে তদ্দ্বারা আমি শেষ বয়স পর্য্যন্ত, শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত, প্রয়োজন অনুসারে তোমার সেবা বন্দনা করিলাম, কথঞ্চিৎ জগতের কার্য্য করিলাম, করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নানা তত্ত্বালোক লাভ ও প্রচার করিলাম। সবল জীবনে পূর্ব্ব বয়সে অনেকের সহায়তা পাইয়াও যাহা হয় নাই এখন এ সময়ে তাহা হইল। হে অজর, অক্ষয়, রোগ বার্দ্ধক্যে যেমন ধর্ম্মায়ু ক্ষয় পায় নাই, মৃত্যুতেও যেন ধর্ম্ম জীবন রক্ষা পায়।

আত্মীয় বন্ধু

আমরা চিরদিন নিঃসন্তান বটে। কত সময় মনে করি আমাদের এ বয়সে সন্তানাদি থাকিলে এত একাকী ও অসহায় বোধ করিতে হইত না। কিন্তু তোমার মঙ্গল বিধানে, তোমার চিহ্নিত ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে ও তাহার বাহিরে, স্বদেশে ও দেশান্তরে আমরা এত আত্মীয় বন্ধু, পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র পাইয়াছি যে তাঁহাদের অবিশ্রান্ত যত্নে স্নেহে আমরা অনেক সময়ে পরম সুখী ও সহায়বান হইয়াছি। তুমি ইঁহাদের মস্তকে জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদ রাশি বর্ষণ কর! ইঁহারা যে দেশবাসী হউন, তোমার প্রতি অনুরক্ত হউন, তোমার প্রতি অনুরাগ হেতু যেন আমাদের প্রতি অনুরাগী হয়েন। তাঁহাদের মঙ্গল সাধনের যতটুকু ভার আমার হস্তে দিলে তাহা যেন নিষ্কাম ও সরল ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে বহন করিতে পারি। সর্ব্বপ্রকার লোকের

মধ্যে পরস্পর আত্মীয়তা দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করুক ; ভিন্ন জাতি, ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন বয়সের লোক তোমার গৌরবার্থে পরস্পরের সঙ্গে একাত্মা হউক।

আত্মপ্রকাশের শক্তি

তুমি শতবার সহস্রবার ধন্য যে, আমার কণ্ঠে ও লেখনীতে অবতীর্ণ হইয়া, হে চৈতন্যময়, আমাকে উপযুক্ত ভাষাতে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি দিলে। বঙ্গ ভাষা, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষা, সামান্য পরিমাণে হিন্দি ভাষায় এই অধিকার লাভ করিয়া বিধিমতে তোমার আরাধনা ও তোমার সত্য প্রচার করিলাম, নিজে উপকৃত হইলাম, লোকের উপকার করিলাম। প্রথমতঃ বিশ্বাস শক্তি, তার পর ভাব ও চিন্তা, তার পর সাধু ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, তার পর চরিত্রের পরিণতি, তার পর এ সমস্ত প্রচার করিবার শক্তি ক্রমান্বয়ে সঞ্চার করিয়া আমাকে সিদ্ধমনোরথ করিলে। এই মহান আত্মপ্রকাশ শক্তি নানা বিভাগে পরস্পরকে সংগঠিত করিল, মিলিত হইল, পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিল, তোমার আদিষ্ট লোকসেবায় এই শক্তি পবিত্র হইল। তুমি ধন্য !

জাতীয় প্রবৃত্তি

ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্রাণদাতা এ স্বভাবে প্রবল মাত্রায় জাতীয় প্রবৃত্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু প্রকৃতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালী প্রকৃতির, দোষ গুণ সমভাগে আমার মধ্যে প্রবল। একদিকে প্রবল ইন্দ্রিয়াশক্তি, অপর দিকে অতীন্দ্রিয় সত্যলালসা ; এক দিকে অনিবার্য্য পশুপ্রভাব, অপর দিকে অনিবার্য্য পুণ্য-স্পৃহা ; একদিকে ভীরুতা, অমানুষিকতা ও অক্ষমতা, অপরদিকে স্বাভাবিক মহাবল, আন্তরিক উত্তেজনা ও উত্তাপ, অনন্ত রাজ্যের দিকে আকর্ষণ, অজানিত বিষয় জানিতে তীব্র অনুরাগ ; এইরূপ বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যে মন পরিপূর্ণ। আমি বারম্বার অন্তরাত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম ও এই অঙ্গীকার লাভ করিলাম। যে দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আমাকে এই পাপপুণ্য-জড়িত প্রকৃতি-চাঞ্চল্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহার অচঞ্চল স্বকীয় পবিত্র স্বভাবের সাদৃশ্য আমাকে দান করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেই বুঝিতেছি যে এ স্বভাবের প্রত্যেক রক্তবিন্দু হিন্দুগুণে আচ্ছন্ন। যে ভাবুকতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস পাইয়া জড়তা ও অবসাদ পরিহার করিতেছি, যে কল্পনাশক্তি ও অধ্যাত্ম-দর্শনে অদৃষ্ট ও

অজানিত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, যে মৃদু ও ঋজু স্বভাবের মধ্য দিয়া সকল ভদ্রতা ও সুরুচির আভাস পাই, যে আত্মজ্ঞানে স্বাভাবিক উত্তেজনা ও মোহ মধ্যেও অপ্রমাদ রক্ষা করিয়া চলি, সকল বিষয়ে সকল সুখ দুঃখে, নানা আশায় ও আদর্শে যে অশেষ সহানুভূতি স্বজাতির সঙ্গে আমার মনকে আবদ্ধ করিয়াছে, যে চিন্তাশক্তি, দর্শনশক্তি ও ধ্যান ধারণায় সংসার হইতে, কুপ্রবৃত্তি হইতে, বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা হইতে দিন দিন মুক্ত হইতেছি—তোমার সঙ্গে হে পরমাত্মন্, যোগযুক্ত হইতেছি, এ সমুদয়ই হিন্দু প্রকৃতি ও জাতীয় স্বভাব। এই হিন্দু প্রকৃতি হইতে সমস্ত সংসারের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। এজন্য শতবার কৃতজ্ঞ হই। এই হিন্দু প্রবৃত্তি যেন মানব জাতির সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলিত হয় ও সর্ব্ব প্রকার উৎকর্ষ ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

হাসিতামাসা

যে রসবোধে মানুষের মধ্যে এই হাস্য পরিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভগবানের একটি বিশেষ সৃষ্টি। পৃথিবীতে যদি হাসি ক্রন্দন না থাকিত, ইহার অর্দ্ধেক সম্ভোগ ও বৈচিত্র্য চলিয়া যাইত। এই হাস্য-ক্রন্দনে প্রকৃতি আমাকে বিশেষ অধিকার দিলেন। স্বভাবসুলভ ক্রন্দনকে বহুচেষ্টাতে কিছু সংযত করিয়াছি, কিন্তু স্বভাব-সুলভ হাসিকে দমন করি নাই। আমি যোগ্য স্থানে যোগ্য বিষয়ে মিষ্ট পরিহাস ভালবাসি, তীব্র পরিহাসেও আমার আপত্তি নাই; তবে পরিহাস নির্দ্দোষ হওয়া চাই; অপবিত্র কি বিষাক্ত পরিহাস ঘৃণা করি। ধর্ম্ম-জীবনের মধ্যে কৌতুক রহস্যের স্থান আছে মনে করি। আমার নিজের দোষ, দুর্ব্বলতা ভাবিয়া অনেক সময়ে মনে মনে হাসি, কখনও কখনও অন্যের সম্বন্ধেও সেরূপ করি। জীবনের কোন কোন গুরুতর সঙ্কট সময়ে আমি হাসিয়া নিরাশা ও অবসাদকে কতবার উড়াইয়া দিই। হাস্য আমোদে কত সময়ে কত লোককে সত্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছি, কত শত্রুতাকে নিরস্ত্র করিয়াছি, ক্রোধ, উত্তেজনা, বিদ্বেষকে দমন করিয়াছি। হে আনন্দময় দিব্য প্রকৃতি, তোমার মধ্যে নিগূঢ় অপার হাস্যশক্তি আছে ইহা বিশ্বাস করি, নতুবা জগৎ জুড়িয়া এই হাস্য পরিহাস বিস্তৃত হইত না। মানুষের বৃথা চেষ্টা, বৃথা অভিমান, বৃথা দুঃখ সুখ দেখিয়া হয়ত তুমি মহা হাস্য কর। প্রকৃতির নানা আকারে, ঋতু পরিবর্ত্তনের নানা আভাসে, পশু পক্ষীর নানা কলরবে, বাল্য যৌবনের প্রমত্ত আহ্লাদে আমি বারম্বার তব অনন্ত হাস্যের প্রতি-ধ্বনি শুনিতে পাই।

ধর্ম্মাত্মাদের উচ্চ কৌতুকে, তাঁহাদের প্রবল হাস্য-ক্রন্দনে তুমি যোগ দিয়া থাক। কারণ হাস্য অর্থে কেবল মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশ বুঝায় না, সে কেবল বাহ্য লক্ষণ। হাস্য বলিতে সম্পূর্ণ প্রকৃতির রসোচ্ছ্বাস বুঝায়। সুতরাং হাস্য সাধন এক মহা সাধন, যে হাসিতে জানে না সে ব্রহ্মস্বরূপকে জানে না! যখন মানুষের সমুদায় শরীর মন কৌতুক-সরোবরে, অবগাহন করে—তখন সেই সাধকের আনন্দ দৃষ্টিতে তাবৎ সংসার সহাস্য মূর্ত্তি ধারণ করে। যেমন গভীর দুঃখোচ্ছ্বাস কেবল অশ্রুজলে আবদ্ধ নয়, কথায়, স্বরে, সমস্ত শরীরের ভাবে, নীরব আর্ত্তজন শোক কি সহানুভূতির ধারা বর্ষণ করে; তেমনি মুখে না হাসিয়াও মানুষ জীবনের গভীর স্থানে হাস্যরসে মগ্ন থাকিতে পারে। অন্যান্য গভীর রসের ন্যায় এই হাস্যরস বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী দুই প্রকার স্রোতে বহিতে পারে। স্বভাব মধ্যে এই হাস্যক্রন্দনের স্রোত যেন কখনও শুষ্ক না হয়, ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়। জীবনের নানাবিধ বিপরীত অবস্থার মধ্যে হাসিবার বিষয় অনেক, কাঁদিবার বিষয়ও অনেক দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বলিয়া অদ্যাবধি সরসভাবে কাল যাপন করিতেছি। আধ্যাত্মিক উচ্চ কৌতুক ও উচ্চ সহানুভূতি লাভ হেতু আমি দেবদ্বারে কৃতজ্ঞ।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র

ঠিক বলিতে গেলে যে অর্থে অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্ম্মশাস্ত্র স্বীকার করে ব্রাহ্ম-সমাজে সে অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অতীত ধর্ম্ম-বিধানের নিগূঢ় দর্শন ও ইতিহাস এ সমস্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ ও অনুশীলনে আমার প্রগাঢ় প্রবৃত্তি, এতদ্দ্বারা আমার ধর্ম্মজীবন বিশেষরূপে সংগঠিত হইল, এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকারী হইয়া চৈতন্যময় পরমগুরুর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। বিদেশীয়, দেশীয় নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া নানা প্রকারে ও নানা ভাবে পরমেশ্বরের আত্ম-স্বরূপ আমার কাছে যেরূপ প্রকাশ হইল, কেবল আমার নিজ চেষ্টায় সে আলোক কি, সে সত্য, আমি কখনও লাভ করিতে পারিতাম না। এখন এই নিশ্চয় ধারণা যে বিবিধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত শ্রুতি স্মৃতি দর্শন পুরাণাদি কতকদূর না বুঝিলে, নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে ও ব্যবহার চরিত্রে পরিণত না করিলে কোন প্রকার গভীর ধর্ম্মে এখনকার দিনে অধিকার জন্মে না, এবং প্রজ্ঞা, প্রেম, শান্তির স্থায়ী সম্ভোগ হয় না। যথাসাধ্য তাহার চর্চ্চা ও অনুশীলন করিয়া ধন্য হইয়াছি,

সাধ্য থাকিলে আরও অধিক করিতাম। সর্ব্বপ্রথমে মহান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল। আমি হিব্রু কি গ্রীক ভাষা জানি না, সুতরাং আদিম বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিতে সক্ষম নই। ইহাও জানি যে নিতান্ত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিলে মূল-গ্রন্থের ভাবার্থ অনেক সময় বিকারপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তত্রাপি সত্য সাক্ষী করিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে বাইবেল মধ্যে "নূতন বিধি" নামক উত্তর খণ্ড, ও "পুরাতন বিধি"র কোন কোন বিশেষ অধ্যায় মধ্যে ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষ লাভে আমি যতদূর সহায়তা পাইয়াছি এমন আর কোন গ্রন্থে পাই না। তৎপরে পুরাতন আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, গীতাদি গ্রন্থ। আমি সংস্কৃত জানি না, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ মধ্যে এই সকল গ্রন্থ বিষয়ে এতাধিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা হইয়াছে যে তদ্দ্বারা হিন্দুশাস্ত্র যে কি ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা স্থির উপলব্ধি করিয়াছি যে সৃষ্টি মধ্যে জীবাত্মা মাধ্য ব্রহ্ম প্রকাশ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম আমার শিরোধার্য্য; আমি কখনও তাহা অতিক্রম করিতে পারিব না, এদেশে কোন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু কখনও তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সমুচ্চ প্রতিভাপন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি ও নির্ব্বাণ বিষয়ক অনেক উপদেশ আমি আদর, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। মুসলমান সুফী-দিগের মহাভাব কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পুরাতন ও অধুনাতন নানা ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিয়া পরম সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। হে দিব্য দেবতা, তোমার আদিষ্ট প্রেরিত আচার্য্য সংখ্যা অতি বহুল, আমি তাঁহাদিগকে ও তদীয় শিষ্যদিগকে বন্দনা ও অভিবাদন করি। ধর্ম্মশাস্ত্র অকূল সিন্ধু; আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সে জলধি মন্থন করিতে একেবারে অক্ষম। তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে তন্মধ্যস্থ একটী সত্যও হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ বিপুল শাস্ত্র-জলধি কেই বা আমার জন্য ক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিত করিবে? আমার সামান্য সঙ্কীর্ণ আত্মা ইহা ধারণ করিতে পারে না। তোমার সঙ্গে আমার নিগূঢ় যোগ হইলে হৃদয় মধ্যে সকল শাস্ত্রের সার তাৎপর্য্য লাভ হয়। তুমি অনন্ত ও অপার বটে, অথচ তুমি সাধকজনের হৃদয়-বিহারী নিত্য গুরু। তুমি আমার ক্ষুদ্র স্বভাবের আয়তন বুঝিয়া তোমার নিজের অনন্ত আয়তনকে সঙ্কুচিত করিতে পার এবং করিয়া থাক; আমার অভাব অনুসারে তোমা বিষয়ক মহাতত্ত্ব আমার গ্রহণোপযোগী করিতেছে। হে সর্ব্ব-শাস্ত্র-প্রতিপন্ন-সারাৎসার, যেন অন্তরাত্মারূপে আমি তোমাকে হৃদয়ে লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম লাভ করি। তোমার মুখজ্যোতি হারাইলে বেদ পুরাণ সকলই নিরর্থক, মোহান্ধকারময়; তুমি হৃদয়ে

অবতীর্ণ হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপন সকলই সার্থক ও জীবন্ত। তোমার আত্ম-প্রকাশের মহা-প্রণালী এই ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাকে ক্রমশঃ ব্যুৎপত্তি বিধান কর।

চিকাগো নগরে মহামেলা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো নগরে ধর্ম্মমিলন হেতু মহামেলাতে আহূত হইয়া ভগবৎ-কৃপায় স্বচক্ষে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। কিরূপে আপন আপন বিশেষ ধর্ম্মমত ত্যাগ না করিয়াও নানা জাতি, কেবল প্রেম সহানুভূতি ও সত্যের আকর্ষণে একত্রিত হইতে পারে, বিপরীত প্রসঙ্গ সত্ত্বেও উদার ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে পারে, সদ্ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া আসিলাম। এতদ্দর্শনে আমার আকুল আবেদনে ভারতের জন্য "হাস্কেল লেক্চার" নামক বাৎসরিক ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইল। উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ প্রসিদ্ধনামা আচার্য্যদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইল। আমি ইহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

অর্চ্চনা আরাধনা

ব্রহ্ম সহবাস ও তাঁহার প্রত্যক্ষ উপাসনার ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার মানব-জীবনে আর কিছু নাই। জীবের গতি, ধর্ম্ম-জীবনের একমাত্র সম্বল এই ব্রহ্মোপাসনা যাঁহা হইতে লাভ করিলাম আমি কি বলিয়া সেই পরম দেবতাকে ধন্যবাদ করিব। জানি না কেন যে তিনি আমাকে তাঁহার অর্চ্চনা ও আরাধনার দিব্য অধিকার দিলেন!—তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিমল গুন কীর্ত্তন করিবার জন্য আমার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি ও উৎসাহ। যখন সর্ব্বান্তঃকরণে, হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার উপাসনা করি তখন এ পৃথিবীতে থাকি, কি লোকান্তরে, যাই? এ লোকেই থাকি বটে, কিন্তু ইহ-সংসার রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হয়। 'তোমার অদ্ভুত প্রাণপ্রদ সত্তা ও মহান্ বিভূতি আমার কণ্ঠে অবতীর্ণ হয়।

আমার হৃদয়কে জ্যোতিধাম করে বলিয়া তোমার এই জীবন্ত অগ্নিময় সুমিষ্ট বন্দনা কখনও শুষ্ক কি উত্তাপ-বিহীন হইল না, আমার নিজের স্বভাব কখনও কঠোর নির্জীব হইল না। তোমারই স্বকীয় প্রেম ভক্তিরূপে, আনন্দরূপে আমাতে অবতীর্ণ হয়। তোমারই জ্ঞান চৈতন্যরূপে, তোমারই পবিত্রমূর্ত্তি পরিত্রাণ ও স্বর্গরূপে আমার স্বভাবে সঞ্চারিত হয়। আমার ভাব, বিশ্বাস, প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, কল্পনা ও বিবিধ ধর্ম্ম-ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রমত্ত ও প্রমুক্ত করে। এই উপাসনার নিগূঢ় ভাব মধ্যে আমি যে সকল অপ্রমাণিত অলৌকিক সত্যের পরিষ্কার দর্শন পাই, তাহা আর কোথাও পাই না, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার নিজ প্রকৃতি বিষয়ে, ধরাতলে নানা মণ্ডলী ও নানা জাতি জড়িত তোমার ধর্ম্মরাজ্য বিষয়ে, পরলোক বিষয়ে, পূর্ব্বলোক বিষয়ে, মহাপুরুষগণ ও তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ে, নিজের জীবন, স্বভাব ও নিয়তি বিষয়ে আমার শত সন্দেহ ভঞ্জন হয়, শত প্রকার উদ্দীপনার আরম্ভ হয়। তোমার নিজের চিন্তা, ভাব, অভিপ্রায় ও পরমার্থরস আমার ভাষায়, ধারণায়, ধ্যানে, প্রার্থনায়, উপদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, আমাকে তোমাময় করে, আমার মধ্যে নব নব সত্য রচনা করে, আমার পুরাতন আদর্শকে সুপ্রতিপন্ন ও সুপ্রসারিত করে। উপাসনার সময় আমাকে তোমার যে প্রকার সন্তানত্ব দাও, যে দেবত্ব দাও, এবং আমার প্রিয়তম সঙ্গীদিগকেও তদনুরূপ ভাব দাও, সর্ব্বক্ষণ চিরদিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে দিও, এই প্রার্থনা। এই অর্চ্চনা, আরাধনা, এই যোগ ধ্যান যেন কখনও নীরস ও মৌখিক না হয়, কেবল কথাতে নয় কিন্তু ভাবে চিন্তায়, কেবল ভাবে চিন্তায় নয় যেন চরিত্রে পরিণত হয়। তুমি জান ইহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, ধর্ম্মজীবনের সার, ইহলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্বল, পরলোকের নিত্য সম্ভোগ ও নিত্য আভাস। ইহাই আমাকে সর্ব্ব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেয়; দেবাত্মা-দিগের সঙ্গে সম্মিলিত করে; দ্বেষ, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ করে; ক্রমাগত ধর্ম্ম-জীবনের অভিনব উচ্চ উচ্চ অবস্থাতে উপনীত করে। এ অবস্থা পাইলে সকল প্রকার অবতারবাদ ও মধ্যবর্ত্তিতা রহিত হইয়া যায়। ঈশা, শাক্যাদি আর কাহাকেও মনে থাকে না, আর কাহাকেও আবশ্যক হয় না। তোমাকে লাভ করিয়া আর সকলকে লাভ করা হয়, তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগে তাঁদের সঙ্গে একাকার হইয়া যাই; নিত্য নির্ব্বিকার প্রেমে ভেদাভেদ থাকে না, তারতম্য থাকে না। যেন এইরূপে অবাধে ব্যবধানশূন্য হইয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ

সম্মুখস্থ দেখিতে পাই, ও অবাধে তোমার সম্মুখস্থ হইয়া শোক, ভয়, স্বার্থ হইতে জীবন্মুক্ত হই। আশীর্ব্বাদের উপর এই আশীর্ব্বাদ কর।

রচিত গ্রন্থ

তোমার পবিত্র ক্রোড়ে দিব্য গুরু, আমার রচিত কয়খানি গ্রন্থ নিবেদন করি। আমি প্রথমে ইহা মনে করিতে সাহস করি নাই যে আমি আবার এতগুলি পাঠ্য-গ্রন্থ এমন সুন্দর আকারে প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু যা আমার যোগ্যতায় সাধ্য নয়, তা তোমার কৃপায় সাধ্য। ইহা তোমারই উদ্দীপনা ও আলোকে রচিত হইয়াছে। কেবল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য একখানিও রচিত হয় নাই। ইহার মধ্যে তোমারই দিব্য নিঃশ্বাস বহিতেছে। ইহার মধ্যে নানা ত্রুটি আছে জানি, কিন্তু ইহা আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থার ফল। তুমি উপহাররূপে ইহা গ্রহণ কর। যেন এই গ্রন্থ তোমার পরিচিত মণ্ডলীমধ্যে স্থায়ী হয়, এবং ভবিষ্যতে লোকের কল্যাণ সাধন করে।

মৃত্যু বিষয়ক

তুমি অজর, অমর, অশোক—দেখ জরা মরণ ভয়ে আমি বারম্বার সন্তপ্ত। ইহারই নিবারণ জন্য তুমি জীবনান্ত বিষয়ক সুতত্ত্ব শিখাইলে। মৃত্যু ভয়াবহ নয়, কিন্তু পাপাসক্তির বিনাশ। পাপীর নিকট ইহা ভীষণ, দুরাচারের পরিণাম, অতি ঘোরতর। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই কত কত দুরাচার ব্যক্তির মৃত্যু-শয্যায় তুমি বিরাম শান্তি বিধান কর। মানুষের ভ্রান্ত, কুশিক্ষিত কল্পনা, যেখানে বাস্তবিক ভয়ের কারণ নাই; সেখানে দারুণ ভয় আরোপ করে, যাহা যথার্থই ভয়াবহ তাহা ভয় করে না, এবং সর্ব্বদুঃখ-অপহারক মৃত্যুকে কুটিল কুসংস্কারে আবিষ্ট করে। জন্ম ও মরণ এই দুইটি ঘটনা নিঃসন্দেহ তোমার অভিপ্রেত। জন্ম লাভ করা ভয় ও বিষাদের বিষয় নহে; জাত শিশু ক্রন্দন করে, কিন্তু পুরবাসী, প্রতিবাসী আনন্দধ্বনি করে; এরূপ হউক যে শেষ দিনে কুটুম্ব আত্মীয় ক্রন্দন করিবে, কিন্তু স্বর্গগামী

পথিক হাসিতে হাসিতে বিদায় লইবে। তোমাতে যাঁর মহাপ্রেম জন্মিয়াছে, তোমাকে যে সাক্ষাৎ জীবনরূপে হৃদয়স্থ করিয়াছে, এ ঘুর্ণিত অবস্থা-চক্রের পর্য্যটনে যে তোমারই নানা আকার প্রকার উপলব্ধি করিয়াছে, তার কাছে এই সর্ব্বশেষ অবস্থা অসৌভাগ্যের বিষয় নহে। সংসার ভোগ ফুরাইবে বটে, কিন্তু তোমার প্রসাদে ও তোমার অধিষ্ঠানে যে এখানকার বিহিত ভোগ্য ভোগ করে, তার সম্ভোগ তো শেষ হইবার নয়; শরীরের শত রোগ ও ক্ষয়ের মধ্যে, সংসারের শত দুরবস্থার মধ্যে তোমারই কৃপায় অক্ষুণ্ণ রহিলাম, বরং আরও সজীব ও সুখী হইলাম। শরীরের পতনে আমার বিপদ কি? তোমার গৌরবের জন্য জীবন লাভ, তোমাকে গৌরবান্বিত করিয়া এ জীবন শেষ করাতে গৌরব ভিন্ন আর কিছু নয়। তোমাকে জানিয়া, আপনার নিয়তি সুসম্পন্ন করিয়া অক্ষয় হইয়াছি; কৈ এই চৌষট্টি বৎসরে এ জীবাত্মা ত স্ফূর্ত্তিহীন কি মরণাপন্ন হইল না; এখন কিসের ভয়ে বিষণ্ণ হইব? সংসার দৃষ্টি, পাপ দৃষ্টি, দেহ দৃষ্টিতে মৃত্যু সর্ব্বনাশজনক বটে; কিন্তু হে ভয়হারী, দিন দিন তুমি সে অশুভ দৃষ্টি রহিত করিতেছ, এবং তজ্জনিত আক্ষেপ, আতঙ্ক ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে তিমিরাতীত পিতৃলোক, আকাঙ্ক্ষিত চিরপ্রার্থিত গৌরবধাম প্রকাশিত হইতেছে—তোমাময় হইয়া প্রায় প্রতিদিন তাহা যোগচক্ষে দেখিতেছি, মরণান্তে আরও দেখিব। দেহপতন একভাবে দুঃখের বিষয় বটে, এই সুশীতল, সুমিষ্ট, সমুজ্জ্বল, পরিচিত প্রিয়-পৃথিবীর নিকট, এই প্রসন্ন-মূর্ত্তি প্রিয় বন্ধুদের নিকট চিরবিদায় লওয়া দুঃখের বিষয়। কিন্তু অধিক কিংবা অমিশ্রিত দুঃখের বিষয় নয়। দিব্য দেহ, দিব্য শক্তি ও দিব্য আত্মা পাইয়া পরমানন্দময় অভিনব উচ্চলোকে বিচরণ করা কি দুঃখের বিষয়? ত্রিতাপচ্ছায়াময়, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন এই সঙ্কীর্ণ ভবপথ দিয়া, অস্পষ্ট নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া, অপরিসীম উদার জীবন সম্মুখে দেখিতেছি, অপরিমেয় আশা, অব্যর্থ অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা কি দুঃখের বিষয়? মৃত্যুর বিষ-দন্ত কিসে, শ্মশানের বিক্রম কোথা? পাপের বিক্রমে, এবং রক্ত-মাংসের বহু বিকারে মৃত্যুর বিক্রম; হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার প্রসাদগুণে, ক্ষমাগুণে সেই পাপ পরাজিত রক্ত-মাংস দিন দিন বশীভূত হইতেছে। এখন নিষ্পাপ হইয়া, অদেহী হইয়া দেহ ধারণ করিব এমন আশীষ কর। শ্মশান-বৈরাগ্য ঘৃণা করি, অনাসক্তি ও অকিঞ্চন ভক্তি প্রার্থনা করি; নিষ্ফল ও অকারণমৃত্যু-চিন্তা, নিরাশা এবং অস্ফূর্ত্তি ঘৃণা করি—তোমার প্রসন্ন মাতৃমুখ দেখিয়া সতেজে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই; উৎসাহে ও অনুরাগে লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহার করিতে চাই। শোকের ক্রন্দন করিতে চাইনা, শুনিতে চাইনা; সজীব সদানন্দ পৃথিবী হইতে আনন্দে বিদায় লইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার হস্তে আত্ম-

নিবেদন করিতে চাই। জয়যুক্ত হইব, স্বকার্য্য শেষ কবির, স্বধামে প্রবেশ করিব। তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য!

অক্ষয়ধাম

মৃত্যুর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে কে ভেদ করিতে পারে? পরলোক বিষয়ে পূর্ণতত্ত্ব কে জানে? যেমন পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব, ইহাও তেমনি; যে পরিমাণে লোকাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কখন কখন লাভ হয়, যে পরিমাণে সার আত্মতত্ত্ব মাঝে মাঝে লাভ হয়, সেই পরিমাণে বৈকুণ্ঠতত্ত্ব কখন কখন লাভ হয়, ও দিব্যধামনিবাসী অমরাত্মাদিগের সুসমাচার মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ মোহান্ধকারে জাগ্রত থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। মরণান্তে শারীরিক শক্তিবৃত্তি ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে না, নানা অংশে লোপ প্রাপ্ত হইবে তা নিশ্চয়; বহু পরিমাণে মানসিক শক্তিও বজায় থাকিবে না; ইহ-জীবনেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তির আনুকুল্যে যে জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঞ্চার ও সঙ্গতি হয় তাহা কখনও ক্ষয়শীল নহে। তামসিক রাজসিক গুণের বিশ্লেষে আত্মা আরও তেজঃপুঞ্জ মধুময় আকার ধারণ করে। হে ভ্রান্তিহারী, সত্যরূপ ভগবান, স্বর্গ নরক বিষয়ে তুমি আমার নানা অযথা সংস্কার সংশোধন করিয়াছ, নানা সন্দেহ মীমাংসা করিয়াছ। অনেকবার নিভৃত ব্রহ্ম-সহবাস-জনিত আবেগে পারলৌকিক দিব্য আভাস পাইয়াছি, আরও পাইব। এ বিশ্বাস দিন দিন আরও উজ্জ্বলতর হইতেছে যে দেহান্তে দৈহিকতা রক্ষা হইবে না বটে, কিন্তু এক অদ্ভুত দিব্য তনু ধারণ করিব। নানা প্রকার অভিনব জ্ঞানে, প্রবল অনুরাগে, বুদ্ধির অতীত নানা জাতীয় দিব্য শক্তি লাভে, হে পরমাত্মন্, তোমার সঙ্গে অভেদ্য সমাধি ও একতা লাভ হইবে, উৎকৃষ্টতর সেবা বন্দনা আরম্ভ হইবে, বিশ্ব-কৌশল তত্ত্ব, জড়-চৈতন্য তত্ত্ব, সুখ-দুঃখ তত্ত্ব, নীতি-ধর্ম্ম তত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তত্ত্ব, পরমেশ্বরের রীতি প্রকৃতি চরিত্র পরিষ্কার বুঝিতে পারিব; পরমাত্মার সঙ্গে শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সাদৃশ্য আরও আশ্চর্য্যভাবে সম্ভোগ হইবে। দিব্যাত্মা লোকত্রাতা মহাপুরুষদিগের স্থান, পরিচয় ও শুভ সন্দর্শন প্রাপ্ত হইব; এখন যাহা কেবল মাত্র বিশ্বাসে ও আশার আঁধার-আলোক-মিশ্রিত চক্ষে দেখি তখন তাহা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিব। লব্ধ-মুক্তি প্রিয়তম-দিগের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে, নূতন সম্বন্ধ, অক্ষয় প্রেম লাভ হইবে, ত্রুটী ও অপূর্ণতা-

জনিত যে পরিতাপ গ্লানি প্রাপ্য তাহা পাইব বটে, পাইতেছি ও পাইব। হে নিত্যমঙ্গলময়, তোমার অঙ্গীকৃত ও সদা-লব্ধ ক্ষমার মর্ম্ম মধ্যে আরও কি সংগোপন কথা আছে জানি না। কেবল এই জানি যে সে ক্ষমার হস্তে সর্ব্বপ্রকার নরকযাতনার নিষ্কৃতি আছে; সর্ব্বপ্রকার স্বর্গ-সম্ভোগের নিশ্চয়তা আছে; কারণ এখানে থাকিয়া সে নিষ্কৃতি ও সে স্বর্গ-সম্ভোগ করিতেছি। অস্থায়ী গ্লানি ও অবসাদের অন্তে স্থায়ী শান্তি ও অমিত তেজ আছে, এখানে তাহা বুঝিতে পারি, সেখানে কত বুঝিব তার কি অন্ত আছে? সুতরাং বৈকুণ্ঠ-বিষয়ে আমার অসীম স্পৃহা ও অসীম কৌতুক—মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক, মৃত্যুর স্মরণে আনন্দ আশার পরিসীমা নাই। তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব তুমি দেহধারণেই আমাকে অক্ষয়ধাম-বিষয়ক এই সমস্ত মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিলে।

পূর্ব্বজন্ম

হে অন্তরাত্মা, বল আমার বারম্বার এরূপ অবস্থা কেন ঘটে যে আমি মনে করিতে বাধ্য হই এ সংসারে আসিবার পূর্ব্বে কোন খানে, কোন ভাবে, কোন রূপে তোমার সঙ্গে বিদ্যমান ছিলাম; আর ইহাই বা কেন ঘটে যে কেবল জীবনের উচ্চতম দিব্যতম মুহূর্ত্তে এরূপ আভাস পাই, অন্য সময় পাইনা? ঠিক যেন কোন অর্দ্ধস্ফুট স্মৃতি, কোন নিগূঢ়-নিহিত আত্মজ্ঞান হঠাৎ মনোমধ্যে ব্যক্ত হয়, আবার শীঘ্রই মিলাইয়া যায়। আমি এত ভাবি যে ইহা কেবল ভ্রান্তি ও কল্পনা মাত্র—ভাবিয়া তখনকার জন্য নিরস্ত হই; কিন্তু আবার তোমার সঙ্গে নিগূঢ় যোগের মধ্যে ইহা পুনরায় উদয় হয়, নিবারণ করিতে পারি না। ভগবদগীতা পাঠেও ইহা শিখি নাই, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ ও টেনিসনের কবিতা হইতেও নয়, জোহানের ইঞ্জিল হইতেও নয়। এ সকল লেখক হইতে এ ভাবের যথেষ্ট সায় পাইয়াছি বটে, কিন্তু আপনা-আপনি ইহা অন্তরে উদয় হয়, বিলীন হয়। হে আনন্দময় অন্তরঙ্গ, তোমা হইতে স্বতন্ত্র কি একাকার ছিলাম তাহা জানি না, মনে হয় যেন একাকার ছিলাম অথচ স্বতন্ত্র ছিলাম। রশ্মি যেমন জ্যোতির্ম্মণ্ডলে, ঢেউ যেমন সমুদ্রমণ্ডলে, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, আমিও যেন তেমনি ছিলাম,—আমি ঠিক বলিতে পারি না, বলিতে চাইও না, কারণ ইহা বক্তব্য বিষয় বলিয়া মনে হয় না। বলিতে গেলে পাছে এ ধারণা মলিন হয় কি অঠিক হয়

ভয় করি। চিরকাল তুমি পূর্ণ, আমি অপূর্ণ। তুমি আশ্রয় আমি আশ্রিত। তুমি পিতা আমি তোমার পদানত সন্তান। চৈতন্যরূপ, আনন্দরূপ তুমি, তোমার মর্ম্ম মধ্যে যে আমি কোন রূপে বিদ্যমান ছিলাম ও বিদ্যমান আছি এ কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে অবস্থা পূর্ব্বে অপরিস্ফুট, অব্যক্ত ছিল, জীবনের নানা সন্তাপ ও পরীক্ষা মধ্যে তাহা পরিস্ফুট ও জ্ঞানগোচর হইয়াছে। জানি না অন্য সাধকদের মনে কি হয়, আমার পক্ষে ইহা পরম আশীর্ব্বাদ, কেননা ইহাতে আমার অমরত্ব বিষয়ে সকল সংশয় ঘুচিয়া যায়। যদি পূর্ব্বে ছিলাম তো পরেও থাকিব—দেহকে কেবল দুদিনের বাসস্থান মনে হয়, ধর্ম্ম সাধনের যন্ত্র মাত্র বোধ হয়। যতদূর সম্ভব দেহ হতে পৃথক হয়ে কালযাপনে প্রবৃত্তি হয়, পরলোক পরিষ্কার হয়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ অখণ্ড জীবনের আকার ধারণ করে, পরলোকের জন্য যে যে বিশেষ সাধন তাহা রহিত হয় না; কিন্তু সে সাধনে মহোৎসাহ প্রদীপ্ত হয়। খুব শিখাইলে, আরও শিখাও, আরও আলোক দাও।

ইংরাজ-শাসন

ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ, হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীকার করি যে তুমি আমাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ্যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্র জয়ী জাতির নিকট এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই, ভাবি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ইঁহাদের শাসনপ্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য, এবং ইহাও স্বীকার করিনা যে রাজনীতি, লোক-হিতৈষণা, ন্যায়, যাথার্থ্য, সাম্য বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহা ত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এ সকল ত্রুটির ফল ভোগে আমরা পুনঃ পুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি যে এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা ও সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে, কতদিন পরে জানিনা, সমুদয়

মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একতা সম্পন্ন হইবে! আমরা যদি এই ইংরাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটিল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করি, তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর ও সাত্ত্বিকভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেই ত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাটকে, তাঁর মহিষীকে, তাঁর মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর, এদেশ-নিবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজ-দিগকে ধর্মবুদ্ধি ও লোক-সহানুভূতি দাও। এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিধান কর।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাপর

হে পূর্ণব্রহ্ম, হে সর্ব্বারাধ্য গুরু, তোমারই আকর্ষণে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় অর্দ্ধ শতব্দী পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্বাপর স্মরণ করি। এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত না হইলে আমার কি দুর্গতি হইত, সহস্র সহস্র লোকের কি দুর্দ্দশা হইত। নানা জাতির নানা অবস্থার নানা লোক ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীজাতির অভাবনীয় উন্নতি ও শিক্ষালাভ হইয়াছে, নূতন ভাব বিশ্বাসে এদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন হইতেছে, বিদেশীয় ধর্ম্মের অনুসন্ধান হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রচারের প্রগাঢ় উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কত সাধু-চরিত্র বিশ্বাসী ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল প্রচারক আজ আর যুবক নহেন, বহুদর্শী প্রাচীন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও উৎসাহ অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কত প্রকার নীতি, ধর্ম্ম-সাধন সমাজ-সংস্কার, আত্মত্যাগ, কত প্রকার রচনা, ব্যাখ্যান, উপদেশ স্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল। কত মহান্ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে মিশিয়া গেল, কত আরাধনা, প্রার্থনা, কত প্রকার সাধন সংযম সদ্দৃষ্টান্ত ও কঠিন বৈরাগ্য অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইল। এক অদ্বিতীয় তুমি, তোমাতে এই সমস্ত একাকার হইয়া কেবল তোমার গৌরব মাহাত্ম্য মহীয়ান্ করিল। এতাবৎ ধর্ম্মৈশ্বর্য্য আমার প্রেমোজ্জ্বল স্মৃতি-ভাণ্ডারে আমার জীবন চরিত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে। আমি কখনও তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না। এজন্য ভাবিলাম এ ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইবে, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে। আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ এমন বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ, বিশীর্ণ অবস্থায় অভিভূত।

ইহা এখন এত উন্নতিহীন, নিস্পন্দ যে, আজকালকার ব্রাহ্মসমাজকে বিদ্বেষ ও কুভাবের আলয় ইহা বলিলেও বলিতে পারা যায়। শুদ্ধচরিত্রের আদর নাই, বহুদর্শনের প্রতি আস্থা নাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই ; নীতি, সত্য, যাথার্থ্য, এবং সার ধর্মোন্নতি বিরল ; সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধনের গর্ব্ব, মতের গর্ব্ব, ধর্ম্মের গর্ব্ব, সর্ব্বপ্রকার আত্মগরিমা, ভ্রাতৃত্বের ও ধর্ম্মজীবনের মূলচ্ছেদ করিবার উপক্রম করিয়াছে দেখিতে পাই। এ দুর্গতি কেবল মানুষের দোষে ; ধর্ম্ম জীবনহীন হইলে সর্ব্বত্র যা হয় এখানে তাই হইয়াছে। কিন্তু তোমার আলোকে দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মসমাজের গভীর প্রদেশে এখনও পুনর্জ্জীবনের নানা লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বাস করি কোন দিন তোমার প্রভাবে ইহার কীর্ত্তি-সূর্য্য পুনরুত্থান করিবে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এখনও কেহ কেহ এরূপ লোক বিদ্যমান আছেন যাঁহাদের জীবন চরিত্রে তুমি স্বয়ং বিরাজমান। অদ্যাবধি এই ব্রাহ্মসমাজে যত কিছু লাভ করিলাম তজ্জন্য তোমার নিকট শতবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী ব্রাহ্মদিগের নিকটেও সপ্রেম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তাঁহাদের মঙ্গল হউক। হে পরিত্রাতা, তোমার পবিত্র অভিপ্রায় অনুসারে,—আমাদের কল্পনা অনুসারে নয়—তুমি ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবিত কর।

নববিধানবিষয়ক

কি জন্য আমি এই নববিধানে বিশ্বাস করি, কেনই বা ইহাকে সংসারের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম মনে করি, এ ধর্ম্ম হইতে আমার জীবনে কি বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি ? যখন পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তৎসহচরগণ এদেশে একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের সূচনা করেন তখন কি কাহারও ধারণা হইয়াছিল কি নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইতেছে ? সর্ব্ব ধর্ম্ম, বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রতিপন্ন এই সনাতন একেশ্বরবাদ উৎকৃষ্ট জ্ঞানপ্রভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহারা তখনকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন। যখন কালক্রমে এই অভিনব ধর্ম্মবীজ বৃদ্ধির পর বৃদ্ধি, আয়তনের পর নূতন আয়তন লাভ করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিল, তখন কি নবতর কল্যাণতর আদর্শের আবির্ভাব হইল, ঠিক যেন সমাজ এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা উৎসাহিত ও আশ্চর্য্য হইলাম ; কিন্তু তখনও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রম ছিল। কেহবা ইহাকে নববংশজ

হিন্দুদিগের ইংরাজি শিক্ষার পরিচায়ক মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে চলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মের সূচনা মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের প্রচ্ছন্ন সোপান মাত্র ভাবিলেন, কেহবা ইহাকে একটী সামাজিক সংস্কার মাত্র ভাবিলেন। ইহা যে একটী ঐশ্বরিক সৃষ্টি, ইহা যে একটী নূতন যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা পূর্ব্বে তাহা মনে করি নাই। কিন্তু বাস্তবিক প্রথমাবধি এই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মে নূতন যুগধর্ম্মের উপক্রম, ইহার ক্রমশঃ বিকাশ দেখিয়া এখন স্বীকার করিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এই মহাবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, আমরা আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলাম, তার পর যখন তিনি নিজের অসাধারণ প্রতিভা, অসীম উদ্যম, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সহিত এই নববিধান দেশময় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের শেষাংশে একেবারে আত্ম উৎসর্গ করিলেন তখন ভাবিলাম এইবার বুঝি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বিবাদ সাঙ্গ হইল এবং ইহার শাখাত্রয় নূতন প্রণালীতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু শীঘ্রই সে আশা বিফল হইল, নববিধান মণ্ডলীর নেতৃগণ ইহার উচ্চ আদর্শকে এতই হীন ও সঙ্কীর্ণ করিলেন, পরস্পরের প্রতি এতই অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করিলেন, কেশবের বিপক্ষগণ ইহার প্রতি এতই অসত্য ও কুসংস্কার আরোপ করিলেন যে তদ্দ্বারা সকলেরই সাংঘাতিক ক্ষতি হইল। এই অন্ধকার ও অশুভ অবস্থার মধ্যে দেব কেশবচন্দ্র ভগ্ন-হৃদয়ে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই মহা অনিষ্ট মধ্যে এ যুগধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা উন্নত জাতির মধ্যে ইহা ক্রমাগত আপনা আপনি সৌষ্ঠব ও শ্রী-বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। খ্রীষ্টীয় জগতে আধ্যাত্মিক খ্রীষ্টধর্ম্ম নামে ইহা পরিচিত হইতেছে; হিন্দুজাতির মধ্যে ইহা আধ্যাত্মিক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম; মুসলমানদের ভিতরে ইহা অসাম্প্রদায়িক উদার ইস্‌লাম এবং সর্ব্ব জাতির মধ্যে ইহা সার্ব্বভৌমিক সারধর্ম্ম নামে গৃহীত হইতেছে ও হইবে। যে নামে লোকে ইহাকে গ্রহণ করুক, ইহা গৃহীত হইবেই হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমরা কলিকাতা নগরে ইহার সঙ্গে যে সকল বাহ্য আড়ম্বর মিশাইয়া থাকি তাহা সর্ব্বাংশে বজায় থাকিবে না; কেননা সে সমস্ত সার ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়; সময় ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পুনর্গঠিত হইবে; ইহার মধ্যে যাহা মূল সত্য তাহাই চিরস্থায়ী। মূলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান ধর্ম্মের সঙ্গে প্রভেদ নাই, কোন কোন অনুষ্ঠানে ও আদর্শে ও সাধনে প্রভেদ আছে। উদার ভাবে দেখিলে সে প্রভেদ সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা ঘটিলে যাহা সাংঘাতিক নয় তাহা সাংঘাতিক বোধ হয়। জীবন্ত ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির মধ্যে

নানা আকার ও নানা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও বা মহাবিজ্ঞান, কোথাও মহাভাব, কোথাও মহাকীর্ত্তি, কোথাও দেশাচার সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি। নানা প্রকার বৈচিত্র্য মধ্যে যে ঐক্য সমন্বয় আছে তাহাই লাভ করা আমাদের সাধনের বিষয় এবং আদর্শের সিদ্ধি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলন ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম, সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্ব ধর্ম্মের অবলম্বনীয় ও উদ্দেশ্য। সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন পূজ্য পুরুষগণ আমাদের পরমাত্মীয়, তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য সহবাস হইবে; তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের অধিকৃত ঐশ্বর্য্য হইবে। তাবৎ মানবজাতীয় উন্নতি আমাদের নিজ উন্নতির আদর্শ হইবে। সর্ব্ব প্রকার উচ্চজ্ঞান, উচ্চনীতি, উচ্চ-স্বাধীনতা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব আমাদের উপার্জ্জন ও সম্ভোগের বিষয় হইবে। সার ধর্ম্ম বলিতে যেখানে যা বুঝায় সে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইব। বিজ্ঞানে ও বিশ্বাসে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য, সাংসারিক বিহিত কর্ত্তব্য এবং যোগ বৈরাগ্য মধ্যে সামঞ্জস্য, সভ্য রীতিনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য, মানবজীবনের সর্ব্ববিভাগের সামঞ্জস্য দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমার নিজের জীবন এই সামঞ্জস্য ও শান্তি লাভ করিতেছে। কে আমাদের গতি রোধ করে, কে আমাদের ভাব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে পারে? এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ একীভূত। হে মঙ্গলময়, আমরা এই সতেজ সবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার অনন্ত অখণ্ড আত্ম-পরিচয়ের অধিকার পাইলাম। তুমিই ধন্য!

নিগ্রহ বিষয়ক

কি অলক্ষিত অলঙ্ঘ্য অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে আমি ভুক্ত হইলাম, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এত বৎসর পরিশ্রম করিলাম, ইহাতে আমার কি পুরস্কার হইল ভাবিয়া দেখি। আমি যখন আসিলাম, এ সকল লোক, এই বিপক্ষ সপক্ষগণ কোথায় ছিল? অনেক কথা এই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে শিখিলাম—শেষ এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে বিনা উৎপীড়নে নিগ্রহে, ধর্ম্মজীবন কখনও পরিপক্ক হইবার নয়। লোক-সঙ্গ ও লোকসহানুভূতি যতই ভালবাসি না কেন, কালের গতিতে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোন দিন একাকী পড়িতেই হইবে; মানুষের বিষম অপ্রীতিভাজন হইতেই হইবে; প্রিয় অপ্রিয় উভয়ে

বিমুখ হইবে; পরিশেষে হে অন্তরাত্মা, তুমিই কেবল সাক্ষী ও সঙ্গী থাকিবে। কোন্ অভিপ্রায়ে কি করিলাম: আত্ম-গৌরবের জন্য জীবন ধরিলাম কি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য লোকহিতার্থে জীবন ধরিলাম, কেবল তুমিই তার বিচারক। উৎপীড়ন মধ্যে আমার নিজের ও আমার অবলম্বিত মহাধর্ম্মের যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ হইল বটে; এজন্য আমি ধন্য, কিন্তু উৎপীড়ক লোকদিগের কি উপকার হইল জানি না, বরং বিপরীত হইল। দেখ আজ আমার কি অবস্থা, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নিকট আমি গ্রাহ্য নই; আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং কার্য্যে আমার অধিকার নাই; এই ব্রাহ্মসমাজের চক্ষে আমি নানাপ্রকার সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি। সামান্য সরলতা ও সততা বিষয়ে, এই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূলসত্য সম্বন্ধেও লোকে বিশ্বাস করে না। আমার নিকটে যাহা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিষয়—জীবের দৈনিক মুক্তি ও পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ, আবিষ্ট, আকুল ব্রহ্মসহবাস, গভীর ব্রহ্মপরিচয় ও নিয়ত হৃদয়ে ব্রহ্মের আত্ম-বিকাশ—এ সকল বিষয় লোকের কাছে উপেক্ষণীয়, অগ্রাহ্য, অসম্ভব কথা; এদের কাছে যা মুখ্য বিষয়—স্বদল পুষ্টি, বাহ্যিক কথার ছড়াছড়ি ও বৃথা কার্য্যাড়ম্বর—তা আমার কাছে সামান্য, তুচ্ছ অগ্রাহ্য বিষয়; এই সকল কারণে আমি নিজে উপেক্ষণীয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছি। যদি এই নিদারুণ ব্যবহার বাহিরের লোক দ্বারা ঘটিত, আক্ষেপের বিষয় হইত না; কিন্তু এই বিরোধ আমার আত্মীয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের হস্তে ঘটিল। বাহিরের লোক, দেশীয় কি বিদেশীয়, আমাকে আদর ও সম্ভ্রম করেন; ভিতরের লোক ঠিক তার বিপরীত করেন, ইহাতে মাঝে মাঝে আমি অতিশয় আহত ও নিগৃহীত বোধ করি। জানি এ সকল উৎপীড়কগণ পরস্পরের অনুরাগী নয় তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব ও বিরোধের অবধি নাই। কিন্তু এই অসহানুভূতি ও অত্যাচার যেরূপ আমার মর্ম্মভেদ করে সেরূপ অন্যের নহে। ইহা আমার দোষ কি গুণ তা জানি না। হয়ত লোকের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বশতঃ আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু কি করি? স্বভাব যে ধাতু দিয়া রচিত হইয়াছে তাহাতে এই অনুরাগ ও এই যন্ত্রণা দুইই অনিবার্য্য। পদস্থ প্রাচীন হইতে সেদিনকার অপক্ক বালক পর্য্যন্ত সকলেই আমার বিচারক ও সমালোচক; ইঁহাদের একই ব্যবহার। অতএব কাহার উপর বিশেষ অভিযোগ, করি, কোন্ দলের দোহাই দিব? সুতরাং যথা-সম্ভব সকলের প্রতিই শান্ত ব্যবহার করি, সহিষ্ণুতা সাম্য অবলম্বন করি—লোকে স্বীকার করুক না করুক, সকলের হিতচেষ্টা করি। কিন্তু এই হিংসা, শত্রুতায়, কুদৃষ্টান্তে জনসমাজের, ব্রাহ্মসমাজের, নববিধান মণ্ডলীর কি সাংঘাতিক ক্ষতি হইল তাহা মনে

করিয়া আক্ষেপ চতুগুণ হয়। আজ যদি প্রাণ ভরিয়া সকল শক্তি, সকল সাধন, সকল চেষ্টা উৎসর্গ পূর্ব্বক সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবার অবকাশ পাইতাম, কত সুখী হইতাম, লোকে কত সুখী হইত, সমাজের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হইল না। নানা শোচনীয় কারণ বশতঃ, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে, বঙ্গদেশীয় প্রকৃতির বর্ত্তমান গঠনেতে, এই বুদ্ধিগত অগভীর ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ ও অতিবাদে তাহা হইবার নয়। এজন্য আমি কোন বিশেষ লোককে, কি কোন বিশেষ দলকে, অভিসম্পাত করিতে পারি না। আমার প্রতিবাসীদিগের সকলের অভিপ্রায় সমান নহে, তাঁহারা কেহ কেহ ধর্ম্মভীত, নিষ্ঠাবান লোক, ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে ভ্রান্ত হইয়া আমার প্রতি কুব্যবহার করিলেন। ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কথা এই যে, হে বিধাতা, আমার এরূপ অবস্থা তোমার সায় বিনা, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা বিনা ঘটিতে পারিত না। ইহার মধ্যে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় জড়িত রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করি। আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে স্বভাব-সুলভ অভিমানে আমার চরিত্র বহুদিনাবধি কলুষিত ছিল। অন্যের সদ্‌গুণ ও সৎকার্য্যে তেমন আস্থা ছিল না। এ সমস্ত স্পর্দ্ধা চূর্ণ হওয়া আবশ্যক, নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু এ নিগ্রহে দেখ আমি নিধন প্রাপ্ত হই নাই, ধর্ম্মহীন কি সান্ত্বনাহীন হই নাই; আপনার নিয়তি ও আপনার স্থান আরও ভালরূপে বুঝিয়াছি; অন্যের প্রাপ্য অকাতরে অন্যকে দিয়া আমার নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে তোমার হস্তে দিতে শিখিয়াছি। নিতান্ত একাকী না পড়িলে কি তোমার সহবাস ও সহানুভূতি এরূপ আকুলতার সহিত অন্বেষণ করিতাম, এবং লাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখ দূর করিতে পারিতাম? মানুষের সঙ্গে কোন অযথা সম্পর্কে জড়িত হইলেই আমার মন মোহ বন্ধনে পড়ে; নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমার কাছে যাইতে পারে না। এই জন্য এ হৃদয়ের উষর ভূমি তীব্র হলে ভগ্ন হইল; তোমার প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব, তোমার অভিনব ইচ্ছা, তোমার নিত্য-প্রসাদ তন্মধ্যে মূলবদ্ধ হইল; ফলবান হইল; আমি অরণ্যে পড়িয়াছিলাম তাই তোমাকে নিত্যসঙ্গী রূপে পাইয়াছি; ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত, তৃষিত, নিপীড়িতদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছি; নিষ্কাম-প্রেম-সাধনে বিরোধীদের প্রতি সদ্ভাব পোষণের যে কঠিন তপস্যা তাহার অধিকারী হইয়াছি; তোমার দিব্যানুরাগী সন্তান, তোমার দুঃখাবনত হত সন্তান অদ্বিতীয় ঈশার অমূল্য সহানুভূতি ভোগ করিতেছি। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁর দৃষ্টান্তের অনুকরণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ঈশাতুল্য উৎপীড়ন না সহিলে ঈশাতুল্য গভীর ধর্ম্ম-জীবন কখনই সম্ভব নহে। এই ভাগ্যহীন বঙ্গদেশে (কোন দেশেই বা

নয় ?) তোমার পদানত ও অধীন হইয়া চলিলে পরিণামে বিষম ফল হয় তাহা বেশ বুঝিলাম ; সত্য ও নীতির জয় লাভ, অন্যায় ও অধর্মের পরাজয় এ বিশ্বাস যে কি পর্য্যন্ত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম। তাই বলিয়া কি বিশ্বাস ও শুদ্ধাচার ত্যাগ পূর্ব্বক লোকের চিত্তরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইব ! ধিক্ জীবনে যদি মুহূর্ত্তের জন্য এ দুর্ম্মতি হয়। কোন লোককে বর্জ্জন করি না, যদি সকল লোকে পরিত্যাগ করে কি করিব ? কোন সম্প্রদায়কে দ্বেষ করি না, যদি সকল সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাসিত হই, কি করিব ? তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হই নাই, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, এই আমার অসীম সন্তোষ। প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণে আমার কল্যাণ হউক, এ চিন্তা আমি একদিনও পোষণ করি নাই,—কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ইতিহাসে দেখি, তুমি সহস্রাধিক লোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া একজন বিশেষ লোকের অন্বেষণে বাহির হও এবং একজনের পরিত্রাণ সুসম্পন্ন করিতে সমুদায় দৈবশক্তি নিয়োগ কর, তোমার অখণ্ড বিধিকে অতিক্রম কে করিবে ? এই চিরন্তন সার ধর্ম্ম অমূল্য সামগ্রী, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও যে আমি ইহার কণামাত্র সঞ্চয় করিলাম, ইহাতে জীবন ধন্য জ্ঞান করি, তবে সত্য সাক্ষী করিয়া আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই বিরোধ উৎপীড়নের প্রভাবে আমি এমন কতকগুলি ধর্ম্ম-বন্ধু লাভ করিয়াছি যে, তাঁহাদের সহায়তা ও আত্মীয়তা আমার জীবনের অবলম্বন বলিলেও বলিতে পারি, তাঁহাদের প্রতি হে অকিঞ্চনগতি, তুমি বিশেষ প্রসন্ন হও, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে যে এক প্রবল, প্রকাণ্ড, সজীব ও গতিশীল ধর্ম্মমণ্ডল ঘূর্ণায়মান দৃষ্ট হয়, তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তাহার গুণ, শক্তি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এ জীবন মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। আমাদের অবলম্বিত নূতন বিধান নামান্তরে এই বিশ্ব-ধর্ম্ম তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। গত বিংশতি বর্ষের প্রতিকূলতার মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার জন্য তিনবার নানা মহাদেশ ভ্রমণ করিলাম, নানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে পারিলাম, নানা সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলাম, এবং তোমার কৃপাতে দিন দিন বিধিমতে তোমার নিকটবর্ত্তী হইলাম। সুতরাং নিগ্রহে আমার হানি না হইয়া পরম লাভ হইল। বর্ত্তমান অবস্থা যে চিরস্থায়ী হইবে এরূপ মনে করিতে পারি না ; কিন্তু যত দিন এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকে চলিতে হইবে যেন তোমার এ সকল আশীর্ব্বাদ ভুলিয়া না যাই, তোমার গৌরবার্থে যেন সকল ক্লেশ সহ্য করি, এবং তোমারই আদিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি।

পূর্ব্ব পশ্চিমের ঐক্য

উদার ও শিক্ষাশীল হিন্দু-জাতীয় লোক বলিয়াই আমার মন এরূপ পদার্থে গঠিত হইল যে ইহাতে সহজে অন্য জাতীয় লোকের উচ্চ রীতি চরিত্র মুদ্রিত হয়। অনুকরণ করিব না ভাবি, তথাপি অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করিতে বাধ্য হই। গুণ-বিচার করিতে পারি না, কিন্তু দোষাংশ সময়ে বুঝিতে পারি, বুঝিলে পরিহার করি; গুণাংশ স্থায়ী হয়, এইরূপে স্বভাবের গঠন কখনই চরম-দশা প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমাগতই চলিতেছে। এজন্য তোমার চালনায় পাশ্চাত্য প্রকৃতির মহদ্‌গুণ প্রত্যক্ষ করিলাম ও তাহার অনুশীলনে ও অনুসরণে কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইলাম। ইয়ুরোপীয় আদর্শে ন্যায়পরতা, সাম্য, কার্য্যদক্ষতা, মহোদ্যম, অবিশ্রান্ত উন্নতি, স্বাধীন স্বভাব ইত্যাদি গুণ বড় ভালবাসি। সর্ব্বজন মিলিয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবল ঐক্য স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবার রীতি বড় ভালবাসি। নিজ চরিত্রে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন সাধন করিতে নানা চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহার ফলাফল পরে প্রকাশিত হইবে। এই সামঞ্জস্যের পথ আরও প্রমুক্ত হউক।

সদনুষ্ঠান

স্ত্রীচরিত্রের শিক্ষা, সুরুচি, সামাজিকতা, নীতি-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য, যুবকবংশের সর্ব্ববিষয়ক হিতের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন ও উদারতার জন্য, পূর্ব্বপশ্চিমের মিলনের জন্য তোমার চালনায় যাহা কিছু চেষ্টা করিলাম, যাহা কিছু সফলতা লাভ করিলাম, কি করিলাম না, হে সর্ব্বোত্তম-সার, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ স্বীকার করি। ব্রাহ্মসমাজের নানা সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আমার ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সর্ব্বাংশে সার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তোমার অনুজ্ঞাত কার্য্যে আত্ম-সম্প্রদান বিনা ধর্ম্মার্থীর উচ্চ-নিয়তি কখনও সার্থক হয় না।

সংযম-বিষয়ক

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্ম-নির্ব্বাণ ও সর্ব্বোচ্চ নিষ্কলঙ্ক স্বভাব হওয়া বোধ হয় এখনও স্পৃহার বিষয় হয় নাই, সুতরাং এ স্পৃহা উল্লেখে কত জনের সহানুভূতি পাইব? এ দেশে যাহা কঠোর তপস্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আমি তাহা সাধন করি নাই। কোন কোন লোক সে সাধন করেছেন দেখেছি, তাহার ফলাফলও দেখিয়াছি। ইচ্ছা পূর্ব্বক অস্বাভাবিক কষ্ট বহন করিলেই মানুষ যে সংযমী নামের যোগ্য হয় তা মনে করি না। তবে ভোগ বিষয়ে চিত্ত-শৈথিল্য ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী, ইহা স্বীকার করি, এবং উর্দ্ধ হইতে প্রেরিত যে যাতনা তাহা অকিঞ্চনভাবে বহন করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও মুক্তিযোগ লাভ হয় ইহাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি।

হে ধ্রুবজ্যোতির্ম্ময়, হে নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকায়, এ স্বভাবে সকল ইন্দ্রির সমান প্রবল, তবে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার জন্য এত অনিবার্য্য প্রয়াস কেন দিলে? লোমকূপের ন্যায় যাহার চরিত্রে লক্ষ ছিদ্র, যাহার কৃতদোষের ও দোষের সম্ভাবনা গণনা হয় না, সে কি এ সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া যেমন নির্দ্দোষ হইয়া সংসারে আসিয়া ছিল, ততোধিক পবিত্র হইয়া তোমার দিব্য আলয়ে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবে? নিরাশ অন্তরে আমি যতবার এই প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার মুখে একই উত্তর—শতবার একই উত্তর পাইয়াছি। যখন আকুল আরাধনায় প্রেম ও পুণ্য সরোবরে মগ্ন হও, তখন হে আত্মন্ তোমার কি অবস্থা হয়, তখন তুমি পাপী না নিষ্পাপ, তখন তুমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? যখন সাধু সাধ্বীগণ নিষ্ঠাভক্তিতে তোমার চারিদিকে বসিয়া ধ্যান প্রার্থনায় শুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য আকার ধারণ করেন, তাঁহাদের সহবাসে ও সংস্পর্শে তোমার অবস্থা কিরূপ হয়—অপবিত্র না পবিত্র, স্বর্গীয় না সাংসারিক? ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে সে অবস্থায় আদর্শ জীবন লাভ করি, সদ্যমুক্তি সম্ভোগ করি। কিন্তু এ সাময়িক অবস্থাকে নিত্য অবস্থায় পরিণত করিবার জন্য যে সাধন তাহাই কঠিন, প্রায় অসাধ্য। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় ও তজ্জনিত উত্তেজনাকে যে ব্যক্তি একেবারে পরাজয় করিতে যায় সে একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারে না। প্রতিজনের অন্তরে একটী কি দুইটী বিশেষ প্রবৃত্তি প্রবল। প্রথমতঃ তাহাকে আক্রমণ করিবে; সেই প্রবলকে অবলম্বন করিয়া নানা অপ্রবল প্রবৃত্তি রাজত্ব করে। কারণ রিপুপ্রবৃত্তি বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নহে, মূলে একই পদার্থ। তাহাকে ত্রিগুণ-জড়িত প্রকৃতিই বলি, মায়া মোহ অবিদ্যাই বলি, প্রলোভন পাপই বলি মূলে একই কথা। এই বিচিত্র অখণ্ড মানব-প্রকৃতি নানা অবস্থায় নানা রিপু প্রবৃত্তি নামে উক্ত হয়, এবং দুই একটী বিশেষ পাপ ও পাপের জাগ্রত

সম্ভাবনারূপে চরিত্রের মধ্যে কার্য্য করে। যে রাগী, তম-প্রধান, অভিমানী ও অবোধ, সে উত্তেজিত হইলে অবকাশ ও অবস্থা অনুসারে কখনও বিদ্বেষী, বা কুটিল, বা দৌরাত্মাকারী, বা যথার্থ্যবিহীন হইবেই হইবে। সে যদি শান্ত, অক্রোধ হইয়া আত্ম-গরিমাকে খর্ব্ব করে, অন্ততঃ বাহিরে চাপিয়া চলে, তবে সেই সঙ্গে অন্য প্রকার শত দোষকে দমন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহা দমন করা প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া গিয়া, যাহা অপ্রয়োজন, কি তত প্রয়োজন নয় তাহা জয় করিবার চেষ্টায় যদি সে বলক্ষয় করে, তাহার কি গুরুতর কি লঘুতর কোন রিপুই সংযত হয় না। যে বিলাসী, দৈহিক ভোগের দাস, যে সাংসারিক উন্নতিকে ধর্ম্মোন্নতি অপেক্ষা গুরুতর মনে করে, সে কবে কোন প্রবল লোভে পড়িয়া পশ্বাচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে তাহার ঠিক কি? তাহার পক্ষে সামান্য সাদাসিধে আচার ব্যবহার ইহাই বিধি। হে মহাপ্রকৃতি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন রিপুকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছ, একটী বিশেষ রিপুর অন্তর্গত করিয়াছ; সেই বিশেষকে ছেদন করিলে আর আর অনেকগুলি অসৎপ্রবৃত্তিকে ছেদন করা হয়। এক দুর্দ্দান্ত "মার"কে বধ করিয়া সিদ্ধার্থ সকল রিপুর উপর জয় লাভ করিলেন। অদীর্ঘ তপস্যান্তে এক দুরন্ত "সয়তান"কে বিমুখ করিয়া ঈশা সমস্ত প্রলোভনকে জয় করিলেন। কিন্তু পরমার্থদর্শী লোক ইহাও বুঝিতে পারেন যে তোমা রচিত কোন রিপু প্রবৃত্তি মূলে পাপজনক নহে; কেবল যখন মানুষ তাহা লইয়া আত্ম-চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। আমি সেই প্রকাণ্ড আত্ম-সংহারব্রত কেবল স্বীয় বলে প্রতিনিয়ত পালন করিতে পারি নাই। কিন্তু তবে কেন তোমা হইতে বারংবার এই নিশ্চয় অঙ্গীকার শুনি যে মরণের পূর্ব্বে আমি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিবই করিব। নিরপরাধী হইয়া তোমার সংসারে এসেছিলাম; কেবল নিরপরাধকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ মনে করি না; তোমার দিব্য সন্তান ঈশাতুল্য বিজেতা হইয়া স্বধামে চলিয়া যাইব। তোমার দ্বারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ-চরিত্রতা অন্বেষণ করিয়া শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছিলাম; কিন্তু পরিশেষে তোমা দত্ত প্রেম-শক্তি লাভ করিয়া সে অপূর্ণতা পূর্ণ হইতেছে, সে পুণ্যস্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে।

দুর্ভাগ্যের শাসন

হে সন্তাপহারী, একবার এই জীবনের দুঃখ দুর্ভাগ্য-তত্ত্ব তোমার সমক্ষে আলোচনা করি। আমার স্বভাব দৃঢ়-সহিষ্ণু নয়, অল্প ক্লেশে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। কিন্তু

তোমার হস্তে কি ঋজু কি উগ্র কোন স্বভাবেরই নিস্তার নাই, যাহার যে নিয়তি তাহকে তদুপযুক্ত গুণ ও যোগ্যতা না দিয়া ছাড় না। তোমার শিক্ষা ও শাসন বড় তীব্র, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিলে তোমার অধীন জন মারা যায় না, মহাকষ্টের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিপক্ক হয়, রাজসিক স্বভাব ঘুচিয়া সাত্বিকতা লাভ হয়। আমি তাহার সাক্ষী। অসাধ্য রোগে বহুকালাবধি আমার শরীর শুষ্ক হইল, দারুণ সাংসারিক অভাবে বারম্বার উৎকণ্ঠিত হইলাম, দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির গ্লানিতে, বিবেকের তাড়নাতে কতবার ম্লান হইলাম; আত্মীয়গণের অসহানুভূতি, তাচ্ছিল্য ও নির্যাতনে কতবার অস্থির, অবসন্ন, সর্ব্বস্বান্ত প্রায় হইলাম; আপনার ভাবনায় পরের ভাবনায় কতই ভারাক্রান্ত হইলাম। দুঃখ কাহাকে বলে তাহা বিলক্ষণ জানিলাম। কিন্তু হে অন্তর্যামী, বল এই সন্তাপে কি আমি তোমা হইতে দূরীকৃত হইয়াছি, না আরও তোমার শান্তি-ক্রোড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি? আমার নানা অগুণ আমি জানি। এই ধুলিকণা, কীটকণাকে কি তোমার প্রবেশ মন্দিরের দ্বার হইতে ঝাঁটা দিয়া জঞ্জালের মত ফেলিয়া দিলে না, একটী অমূল্য অলঙ্কারের ন্যায়, নয়ন-রঞ্জন প্রিয় সন্তানের ন্যায়, নিজ বক্ষে তুলিয়া লইলে? জীবনের কোন কোন অংশ স্বকৃত দোষের জন্য, অস্পষ্ট অনিবার্য্য দৈব ঘটনার অমিশ্রিত দুঃখে আচ্ছন্ন। কিন্তু যতই তোমার দিকে তাকাইয়া এই দুঃখভার বহন করিলাম, ততই বহন করিবার অধিক সামর্থ্য পাইলাম; তুমি এমন দুঃখ দিলে না যাহার যোগ্য বহন শক্তি পূর্ব্ব হইতে দাও নাই। পিতা, সর্ব্বমঙ্গলময়, তোমার দেওয়া সহ শক্তি গুণে, তোমার অব্যর্থ সান্ত্বনা গুণে, আমার দুঃখভার লঘু হইয়াছে এমন কি কতদূর পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সুখে পরিণত হইয়াছে, এ দুঃখ দুর্ভাগ্য আগুনে আমি অনেক পাপ ও স্বার্থ বুদ্ধি দগ্ধ করিয়াছি, অনেক ক্রোধ অভিমান ভস্ম হইয়াছে; অনেক দীনতা অকিঞ্চনতা উপার্জ্জন করিয়াছি, তোমার দুর্লভ পদাশ্রয় লাভ করিয়াছি। তোমার সহানুভূতি পাইলে কি না সহ্য হয়, কোন্ দুরবস্থায় না স্বর্গীয় প্রকৃতি লাভ হয়? তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য যিনি এবং যাঁহারা এত নিগ্রহ পাইলেন, আমাকে হয়ত কখনও পাইতে হইবে না; তোমার বন্ধুতায় আজ তাঁহারা আমার বন্ধু। হে বিধাতা, তোমার এই দুঃখ-বিধিকে মস্তকে তুলিয়া লই, আজ আমি দুঃখী নই পরম সুখী—পদবিহীন ও কর্ত্তৃত্বহীন হইয়া, নির্ধন ও নির্ব্বান্ধব হইয়া, অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ হইয়া, আজ আমি পরম সুখী। অধীনের শত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

দারুণ আক্ষেপ

এ স্বভাবে কি আছে জানি না যে জন্য অন্তরের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ অনুভব করি। কখনও ইহা ঘন অন্ধকার, কখনও মৃদু অবসাদ; অবস্থা ও সময় ভেদে ইহা নানা আকার ধারণ করে। কেবল দেহ-বৈগুণ্য হেতু যে ইহা নয়, এবং সাংসারিক অভাব হেতুও নয় তাহা খুব জানি। আমার ন্যায় ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সমাজে কয় জন আছে? "আমি বপন করিলাম না, শস্য সংগ্রহ করিলাম, বয়ন করিলাম না, পরিধান করিলাম, উপার্জ্জন করিলাম না, ব্যয় করিলাম," পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ে ঠিক যেন আমি বিধাতার বিশেষ প্রিয় পাত্র। এ জন্য আমার অহঙ্কার নাই, অগাধ কৃতজ্ঞতা, তবে এ নিগূঢ় বিষাদ কোথা হইতে? অন্যান্য রসের সঙ্গে নির্ম্মতা স্বভাবকে বিষাদ রসে রচনা করিয়াছেন—অনুতাপ, দীনতা, সমদুঃখ, চিরদিন অনুভব করিলাম, চিরদিন অনুভব করিব; শান্তিদাতা পরমেশ্বরের সমক্ষে আপনার জন্য, অন্যের জন্য আমার ক্রন্দন কখনও ফুরাইবে না, তত্রাপি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত কি বিশেষ কারণে এই আক্ষেপ। যদি আমি নিজে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইতাম তাহাতে কি পূর্ণ তৃপ্তি পাইতাম? কখনই না। নিজের পরিত্রাণ ও ভাবি পূর্ণতা বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চিন্তায় স্বর্গভোগ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এ সমাজের দশা এরূপ রহিল, ধর্ম্মের নামে অসত্য প্রচলিত রহিল, সরলতায় কপটতায় ভেদ না রহিল, লোকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা ঘোর প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে লাগিল, প্রগাঢ় ধর্ম্মজীবন উচ্চ অমিশ্রিত নীতি, সার সর্ব্বোচ্চ জীবন আদর্শ গ্রহণ না করিল, আমি নিজে ভালই হই আর মন্দই হই, আমার দুঃখ ঘুচিবে না। যদি ব্রাহ্মসমাজ নরকগামী হইল, আমি স্বার্থপূর্ণ স্বর্গ-গমনে সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আদর্শ অপূর্ণ, তাহাতে আমার কি? কিন্তু এই ভারতে, কি তাবৎ জগতে যদি ব্রিটিশ চরিত্র কলুষিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাতে মনে মনে এত অসুখী হই যে বলিতে পারি না। জাপান ক্ষুদ্র স্থান, রুষিয়া সাম্রাজ্যের ন্যায় বৃহদ্ব্যাপার আর কি আছে? কিন্তু এই রুষ-জাপান সংগ্রামে আমার মন কত ব্যথিত আতঙ্কিত আমি কি বলিব? সে দিন ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে চীন দেশের কি ভীষণ শত্রুতায় লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তপাত হইল! ইহাতে ইউরোপীয়দের ক্ষতি কি? কিন্তু আমার মনের বিষাদ গভীর। কি জন্য বিষাদ? এই জন্য যে এ সকল দৌরাত্ম্যে ইউরোপীয় উচ্চ নীতি আমার চক্ষে হীন হইয়া যায়; ঈশার ধর্ম্ম ও মহান আদর্শ বিফল হয়; আত্মম্ভরিতা ও নিজ প্রতিপত্তির প্রবল স্পৃহা জগতে চিরস্থায়ী হয়। এ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির পথ কেবল এক মাত্র

যোগধর্ম্ম ; যখন, হে মঙ্গলময়, তোমার সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয় তখন আর কিছু মনে থাকে না। তখন তোমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়, তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি ও সর্ব্বশক্তি সকল সন্দেহ হরণ করে, সকল আক্ষেপ নিবারণ করে। এই বিশ্বাস ও এই সাহসে বুক বাঁধিয়া জীবনভার সহ্য করিতেছি।

ইনটর্‌প্রেটর পত্রিকা

নানা প্রকার বাহিরের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর মধ্যে আমাদের এই নিগূঢ় ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাব আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহা নিবারণ করিবার ইচ্ছায় এবং সরল গভীর সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় এই "ইনটরপ্রেটর" পত্রিকা প্রকাশ করি। অসাম্প্রদায়িকতা ও সমদর্শন ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। আদি সমাজ, সাধারণ সমাজ ও নববিধান মণ্ডলী এ তিনের মধ্যে একটীকেও শত্রুতার চক্ষে দেখি নাই, তবে একান্ত কর্ত্তব্য বোধে সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ের বিচার ও সমালোচনা করিয়াছি। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, তদ্‌বহির্ভূত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি। খৃষ্টীয়ান কি হিন্দু কেহই বলিতে পারিবেন না "ইনটরপ্রেটর" তাঁহাদের প্রতি অনুদার কি অন্যায়পর। যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যাহার সঙ্গে ধর্ম্ম কি নীতির কোন যোগ আছে তদ্বিষয়ক সার কথা যথাশক্তি প্রকাশ করিয়াছি। নিগূঢ় বিষয়ের সহজ মীমাংসা ইহাই লক্ষ্য ছিল, সকল শ্রেণীস্থ সাধু-লোকের গুণ গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার, ধর্ম্মশ্রী, তাহারই প্রশংসা ও অনুকরণ ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। ন্যায়বান্‌ নিরপেক্ষ বিধাতার হস্তের যন্ত্র হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, নিজের প্রতিপত্তির ও দল পুষ্টির চেষ্টা করি নাই। অনেক লোক যে এই "ইনটরপ্রেটর" পাঠ করিয়াছেন, কি ইহার অনুরাগী হইয়াছেন এমন বলিতে পারি না, অনেক লোক যাঁহাদের সহায়তার উপর আমার অধিকার ছিল তাঁহারা যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এমনও বলিতে পারি না, তবে কতকগুলি পরম বন্ধু যে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত পরিমাণে আমাকে সহায়তা করিলেন ইহা শতবার স্বীকার করি। ইহারা যে কেবল আমার স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী লোক এমত নহে, বাঙ্গালী, ইংরাজ, খৃষ্টীয়ান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিবিধ প্রকারে অগ্রবর্ত্তী ধর্ম্মার্থী লোক আমার সহায় ও সাহায্য-দাতা। ইহাতেই আমি আপনাকে পরম পরিতুষ্ট ও পুরস্কৃত মনে করি। যেমন জীবনের অন্যান্য প্রকার কার্য্যে

অন্তরাত্মার প্রেরণাই আমার আলোক এ বিষয়েও সেই-রূপ, কেবল নিজ জীবনের উচ্চ আদর্শ সুসম্পন্ন করিবার জন্য "ইনটরপ্রেটর" পত্রিকা প্রকাশ করিলাম, ভগবান্ ও পাঠকমণ্ডলী ইহার শত ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা মার্জ্জনা করুন।

উত্তেজনা, উত্তাপ

পিতৃ মাতৃ উভয় কুল হইতে উত্তপ্ত স্বভাব আমার মধ্যে প্রবল। অন্যান্য গুণ অগুণের সঙ্গে ইহা জড়িত রহিয়াছে, মনে করিলেই ইহাকে উৎপাটন করিতে পারি না। এ দেশে ধীর, আক্রোধী অকিঞ্চন স্বভাবের এত প্রশংসা যে আমি সেই সকল গুণের অনুরাগী সাধক না হইয়াও থাকিতে পারিলাম না। অতএব আমি স্বাভাবিক উত্তেজনার নিত্য সংযম স্বীকার করিয়াও তাহার নির্ব্বাণ স্বীকার করিতে পারি না। মানুষের নিজের মানহানি, স্বার্থহানি, পদহানি এমন কি প্রাণহানি হেতু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত না হওয়াই ভাল। কিন্তু জনসমাজের নীতি ও ধর্ম্মহানি নিবারণের জন্য বিরক্ত ও উত্তেজিত হইবার তাহার অধিকার আছে, এবং যাহাতে দুষ্কৃতি বিনাশ হয় তজ্জন্য শত প্রকার উত্তপ্ত চেষ্টা ও সংগ্রাম করাই তাহার গুরুতর কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অধর্ম্ম যার কাছে সমান, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক যার কাছে কাছে সমান, কপট সরলের বিচার ও প্রভেদ নাই,—সকলেরই প্রতি অনুকূল ব্যবহার সে আমার নিকট কখনই আদর্শ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না! স্বয়ং পবিত্র পরমেশ্বর সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন না। তিনি সকলকেই প্রেম করেন বটে এবং সকলেরই মঙ্গল সাধন করেন, কিন্তু সেই প্রেম মঙ্গলের আকার পাত্রভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কোথাও তীব্র, কোথাও মিষ্ট, কাথাও অগ্নিসমান তপ্ত, কোথাও পুষ্প চন্দনের ন্যায় শীতল। সাধকদিগের ব্যবহারও সেইরূপ হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে নিজ ক্রোধ হিংসাকে চরিতার্থ করে কখন সাধক বলিয়া গণিত হইতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আন্তরাত্মাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিদিন আপনার ক্রোধ কুভাবকে দমন করিতে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছে, ভাল মন্দ সকল লোকের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সে যদি ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য, জীবের ত্রাণের জন্য সময়ে সময়ে রুষ্ট হয়, অসদাচারের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে কখনও অননুকরণীয় নহে, বরং তাহার ধর্ম্মসিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হয়। বহু দিনাবধি আমি এই আদর্শের অনুরাগী হইয়াছি। ইহাতে নিজের লাভ ক্ষতি গণনা করি নাই, লোকের হিত ইহাই অন্বেষণ করিয়াছি। মঙ্গলময় আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।

রোগবিষয়ক

দেহ ধারণে রোগ অনিবার্য্য। ইহাতে যাতনা, ভয়, অবসাদ, সম্ভবতঃ মরণ তাহাই বা কে নিবারণ করে? চিকিৎসা শাস্ত্র মানি বটে, কিন্তু কোন গভীর রোগ চিকিৎসাসাধ্য ইহা মনে করি না। ইহাতে যতটা উপকার হয় তাই ভাল। আত্মার গুণে, পরমাত্মার শক্তিতে রুগ্ন দেহ ধর্ম্মজীবনের সহায় হইয়া থাকে, কত সময়ে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। সপ্রেম বিশ্বাস, প্রাণগত নির্ভর, সতত আত্মনিবেদন ইহা কেবল আত্মার ঔষধ নয়, দেহেরও ঔষধ। প্রাণরূপী ভগবানের অন্তর্নিয়মী মহাপ্রকৃতি তুল্য ধন্বন্তরি কে আছে? নিগূঢ়ভাবে সেই আদ্যাশক্তি মানব প্রকৃতি মধ্যে বসবাস করিয়া আমাকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু বিধান করেন, নানা বিধিভঙ্গ সত্ত্বেও ক্রমাগত এই রক্তমাংসের মন্দিরকে সংস্করণ ও পুনর্গঠন করেন—এ সমস্ত আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য্য চিন্তা। যদি তাঁর মনোনীত কাজের জন্য দেহ ধারণ করা হয়, তবে সেই কাজ সমাপন পর্য্যন্ত ইহা রক্ষিত হইবে। এই চব্বিশ পঁচিশ বৎসর আমি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, ইহা ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইতেছে। এত দিন যে জীবিত থাকিব ইহা আশা করি নাই। এ রোগে মানসিক সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম বিশেষ নিষেধ, সর্ব্বপ্রকার ঘটনা যাহাতে শরীর কি মন উত্তেজিত হয় তাহা পরিহার্য্য। এই মহারোগ মস্তকে বহন করিয়া কার গুণে আমি এত দিন সংসারে বাঁচিয়া থাকিলাম? এই পঁচিশ বৎসর আমি যত পরিশ্রম করিয়াছি, দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, রচনা ও বক্তৃতা করিয়াছি, যত নিগ্রহ দৌরাত্ম্য সহিয়াছি এরূপ জীবনে আর কখনও করি নাই; তবে বাঁচিয়া আছি কার আশীর্ব্বাদে? এখন আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই সাক্ষ্য দিতেছি যে যদি কেহ আপনার উচ্চ নিয়তিতে আন্তরিক বিশ্বাস করে ও জীবন মূলে প্রতিষ্ঠিত যে পরাপ্রকৃতি তদাজ্ঞানুসারে নির্ভয়ে আপনার অবলম্বিত ব্রত পালন করে, বিবেকী ও সংযতস্বভাব হইয়া যথাজ্ঞান ও যথাসম্ভব প্রত্যেক শারীরিক ও নৈতিক নিয়ম সাবধানে পালন করিয়া চলে, হে মঙ্গলময়, তুমি তাহাকে এতটুকু আরোগ্য ও অবকাশ দাও যে তদ্দ্বারা সে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারে। তুমি জান আমি সকল সময় শারীরিক বিধি রক্ষা করিয়া চলিতে না পারায় এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হই, সকল সময়ে সমানরূপে দেহ রক্ষা করিতে পারি নাই। যেখানে শারীরিক বিধি কি সাংসারিক ব্যবস্থা নৈতিক ও পারমার্থিক উচ্চবিধির বিরোধী হয়, সেখানে আমি অসঙ্কোচে নিম্ন বিধি লঙ্ঘন করি ও উচ্চ বিধি পালন করি। কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন

করিতে চেষ্টা করি। কি শ্রমে, কি বিশ্রামে, কি আহারে, আচ্ছাদনে, কি ভ্রমণ বিহারে, কি অপরাপর বিষয়ে এই প্রণালী অনুসারে চলিয়া থাকি। শারীরিক জীবন মানুষের অন্যান্য সম্বলের ন্যায় সদ্ব্যয়-শূন্য কৃপণের মত কেবল সঞ্চয় করিতে গেলে দুর্গতি লাভ হয়; কিন্তু যোগ্য বিষয়ে ব্যবহার ও ব্যয় করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একদিন জীবন শেষ হইবেই হইবে; যতদিন আয়ত্তে কাছে এই শারীরিক জীবনকে উচ্চ জীবন রক্ষার ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যয় ও ও ক্ষয় করাই ভাল। বহু চেষ্টা করিলে হয়ত দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়, কিন্তু পরমায়ু বৃদ্ধি হইলেও জীবনের মহান নিয়তি কি সুখভোগের স্পৃহা হয় না। এজন্য যত দিন জীবিত থাকা আবশ্যক ততদিন পৃথিবীতে থাকিলাম, এখন প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছি। যাঁহাদের, বিশেষতঃ একজন যাঁহার অকাতর সেবাতে প্রাণরক্ষা হইল, হে বিধাতা তুমি তাঁহাদিগের প্রতি ও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।

ধর্ম্মাত্মাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ

অধ্যাত্মধর্ম্মের প্রার্থী হইয়া কি কোন দেশীয়, বিশেষতঃ এ দেশীয় কোন দেবাত্মা সিদ্ধপুরুষদিগের প্রতি অনাদর করিব? বিধিমতে চেষ্টা সাধনে কি তাঁহাদের সহবাসের যোগ্য হইব না? তাঁদের সঙ্গ বিনা কোন্ সঙ্গ করিয়া আমি উদ্ধার হইব? তাঁহারাই আমার পূজ্য পিতৃপুরুষ, আমার সগোত্র স্বজাতী, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও সহানুভূতি আমার প্রধান সান্ত্বনা, তাঁহাদের প্রোজ্জ্বল পদ-চিহ্নিত পথে প্রদর্শিত নিয়তি পূর্ণ করিতে বাহির হইয়াছি। তুমি যদি ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যকে বঙ্গদেশে না পাঠাইতে, আমাদের দৈনিক ও সামাজিক পূজা, প্রার্থনা, আমাদের প্রমত্ত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন কখনই এমন মধুর ও কার্য্যকারী হইত না। তুমি যদি সম্বুদ্ধ সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহকে এদেশে না পাঠাইতে কখনই ধ্যান সমাধি, তীক্ষ্ণ সর্ব্বভেদী ধর্ম্মবুদ্ধি, সর্ব্বজীবে উদার প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও মহানির্ব্বাণ, আমাদের হিন্দুপ্রকৃতিকে এরূপ আকুল ও আর্দ্র করিত না। উপনিষদ্ ও গীতা প্রণেতা মহর্ষিদিগের শিক্ষা সহায়তা বিনা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম রচিত হইতে পারিত, না হে পরব্রহ্ম, আমি তোমার এই অগ্নিময়, আত্মাময়, সর্ব্বময় সত্তা বুঝিতে পারিতাম? তেমনি মহাবিশ্বাসী শিখধর্ম্ম প্রণেতাগণ, তেমনি ধর্ম্মবীর প্রতিভাশালী মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী মুসলমান

আচার্য্যগণ, ভাবুক রসজ্ঞ সুফীগণ ও নানাপ্রকার ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গণ ইঁহারা আমার পরম বন্ধু, চিরন্তন নেতা, উন্নত দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের জীবন চরিত্র আলোচনায় ও চিন্তায় আমার অনিবার্য্য সাধ ও উৎসাহ। ইঁহাদিগের ধর্ম্মবার্ত্তা না পাইলে অ মি কখনই তোমার সারবার্ত্তা পাইতাম না; ধর্ম্মবিদ্বেষ কুসংস্কার ও অপকৃষ্ট সঙ্কীর্ণতা হইতে বাঁচিতাম না। ইঁহাদের জীবন, চরিত্র ও প্রতিভা তোমারই পূর্ণ স্বভাবের অংশ আবির্ভাব। ইঁহারা সকলেই আমার বন্দনীয়, কেবল বুদ্ধিগত ধর্ম্মসমষ্টি সম্পন্ন করিবার জন্য নয়, কিন্তু ধর্ম্মজীবন পরিপক্ক করিবার জন্য আদরণীয়। এই সকল মহাপুরুষদিগকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করি না, কে বড় কে ছোট তাহার বিচার করি না. তাঁহাদের অযথা সংস্কার কি আকস্মিক ভ্রান্তি আমার আলোচ্য নহে। সকলকে আদর ও ভক্তি করি; তবে সকলকে সমান পরিমাণে নহে। সকলের সঙ্গে আধ্যাত্মযোগে মিলিত হইবার জন্য প্রয়াস করি, সকলকে তোমার সাক্ষী, তোমার দ্বারা প্রেরিত মনে করি। কিন্তু সকলে সমানরূপে সাধনের আদর্শ নহেন, অনেক তারতম্য আছে। তাঁহাদের মিলন ও সমষ্টি এক অখণ্ড আদর্শরূপে উপলব্ধি করি। ধর্ম্মার্থীদিগের সঙ্গে জীবন্ত সম্বন্ধ বিনা ধর্ম্মশাস্ত্রের সামান্য মূল্য, ও ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। আমার নিজের জীবনের হীনতা অক্ষমতার প্রতিকার জন্য তুমি এই দেবাত্মাসহবাসকে সোপানরূপে রচনা করিলে, তাঁহাদিগকে আবার ঈশাচরিত্রে একীভূত করিলে, এবং সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে, হে একমেবাদ্বিতীয়ং, তোমার সর্ব্বময় সিংহাসন সংস্থাপন করিলে। তোমাকে লাভ করিলে সকল রহস্য বুঝিতে পারি, তোমাহীন হইলে সকলই বৃথা! সত্যস্বরূপ নারায়ণ, নরপতি, তুমিই ধন্য, ধন্য তুমি!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে না যদি আত্মোন্নতির প্রথম অবস্থাতে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার না করি। যৌবনের পূর্ণ উৎসাহ লইয়া আমি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করি। তখন এই নানা সমাজ ও নানা দল কোথায় ছিল, সন্তান নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে হস্ত ধরিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁর গভীর প্রোজ্জ্বল প্রকৃতি হইতে কত নূতন সত্য শিখাইলেন, কত সহানুভূতি বর্ষণ করিলেন, কত নূতন পথ খুলিয়া দিলেন। তাঁর সেই সুদীর্ঘ সৌম্য মূর্ত্তি, গম্ভীর সুমিষ্ট স্বর, অগ্নিময় উপদেশ, অবিশ্রান্ত

সদ্ভাব ও সচ্চেষ্টা কখনই ভুলিব না। সে সময় তাঁর তাবৎ কথা বুঝিতাম না বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্য কোন দিব্য লোক হইতে অবতীর্ণ বলিয়া মনে হইত, তাহা বুদ্ধিতে ধারণা হইত না, বিশ্বাস ভক্তিতে ধারণা হইত, তাঁর প্রতি এমন একপ্রকার প্রগাঢ় সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, যাহা অন্য আর কাহারও সঙ্গে হয় নাই। তখনকার ধর্ম্মজীবনে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা। তিনি যা কিছু বলিতেন তাই ভাল লাগিত, যা কিছু করিতেন তাই করিতে ইচ্ছা হইত। ধর্ম্মসমাজে প্রথম প্রবেশে ও নূতন ধর্ম্ম গ্রহণে যে কি অদ্ভুত আস্বাদন হইয়া থাকে তাহার প্রথম অনুভূতি হইল। অজ্ঞাতসারে তিনি আমার জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অবধি আমার ধারণা, এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রের সঙ্গে আমার একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। রুচি, ভাব ও আত্মাৎ প্রকৃতিমূলক এই সাদৃশ্য, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তেমন অনুভব করি নাই। বাহ্যসৃষ্টির প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ, ধ্যান চিন্তায় আন্তরিক প্রবৃত্তি, সতত নির্জ্জনতা ও ঐকান্তিকতার অন্বেষণ, সমোষ্ণ সরস ও সমুৎসাহিত ভাবোচ্ছ্বাস, এতাদৃশ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ নৈকট্য বুঝিতে পারি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাঁর স্বভাবে আরও কত মহদ্‌গুণ আছে যার কোন সাদৃশ্য আমার মধ্যে পাই না। সে সময়ে আমরা যেমন তাঁর অনুগত ও অনুরাগী ছিলাম এমন আর কেহ ছিল না। তিনি আমাদিগকে "ব্রহ্মানন্দী দল" বলিয়া আদর করিতেন ও ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর অনেক আশা, বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। পরমাত্মার নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তাঁর সে আশা ইচ্ছানুরূপ পূর্ণ হইল না। এখনও অনেক ব্রাহ্ম তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসভাজন রহিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে আমাদের সঙ্গে সে পূর্ব্ব সম্বন্ধ শিথিল হইয়াছে। যাহাই হউক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা ও পুনঃ সঙ্গঠনের জন্য, এ সমাজকে বৈদান্তিকতা হইতে মুক্ত করিয়া সার সনাতন ধর্ম্মের আকার ও মতাদি প্রদান করিবার জন্য, দেশীয় শাস্ত্র হইতে একেশ্বর-তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণ ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত ও উন্নতি সাধন করিবার জন্য, জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্মকে প্রেম-প্রধান ধর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য, সাংসারিক আদিষ্ট কর্ত্তব্যের সঙ্গে গভীর ধর্ম্ম সাধনের ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য, তোমাকে সাক্ষী করিয়া, হে গুরুর গুরু পরম গুরু পরমেশ্বর, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রথম গুরু ও প্রথম নেতা, তিনি তোমারই দ্বারা আদিষ্ট তোমা কর্তৃক প্রেরিত। তাঁর আদর্শ এখন আর

আমার আদর্শ নয়, নানা প্রকার মতাদি, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে, বিশেষতঃ এই যুগধর্ম বিধান ও ইহার মহাসমন্বয় বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর শিক্ষা আর এখন গ্রহণ করিতে পারি না; কিন্তু তিনি তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, যে সকল মহোন্নত ভাব সম্ভোগ করিলেন ও প্রচার করিলেন, তাহা ব্যতীত এ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উন্নতি কখনই সম্ভব হইত না।

ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর শিক্ষক

আমাদের এই অভিনব ধর্ম্ম-সমাজের উন্নতি কোন একজন বিশেষ শিক্ষকের চেষ্টায় সংসিদ্ধ হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, আচার্য্য কেশবচন্দ্র আমাদের প্রগাঢ় ভক্তির পাত্র বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যদি অন্যান্য সাধক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পরিশ্রম না করিতেন কখনই আমাদের বর্ত্তমান উন্নতি সম্ভব হইত না। নাম ধরিয়া এই সকল মহাত্মাদিগের উল্লেখ করিব না, কিন্তু একথা বলিব, তাঁরা এক সমাজে, কি এক দেশে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা ভারতবাসী ও অন্যান্য দেশবাসীর অন্যান্য জাতীয় লোক। এরূপ নানা শিক্ষক ও বন্ধু আমাদিগকে গভীর সত্য শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের গভীর সন্দেহ মোচন করিয়াছেন, নীতি ও চরিত্র বিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, সময়ে সময়ে সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে উপকৃত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, অর্থ সাহায্যে আমাদের বহু প্রকার কার্য্যকে সার্থক করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা হউন, ধর্ম্মপ্রচারক হউন, আচার্য্য হউন, অনুবাদক হউন, সংস্কৃত কি অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হউন, তাঁরা গায়ক কি সঙ্গীত-রচয়িতা হউন, স্ত্রীলোক হউন, অন্যপ্রকার গুণ বর্জ্জিত হইয়া কেবল পরসেবক হউন; যে কেহ দৃষ্টান্ত দ্বারা, নিষ্ঠা ভক্তি দ্বারা, সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া ধর্ম্ম পরীক্ষায় আমাদিগের বল বুদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তির সদ্গুণের জন্য হে সমাজ-পতি বিধাতা, তোমাকে শতবার ধন্যবাদ করি। তাঁহাদের মিলিত জীবন আমাকে পুনঃ পুনঃ সজীব করিয়াছে, তাঁহাদের কথা, পাত্র, চরিত্র, উপদেশ, পুনঃ পুনঃ তোমার পথে আমাকে দৃঢ়ভূত করিয়াছে। হে বিধাতা, তুমি এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি কর।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

আত্মীয় পরিবারের সদ্ব্যবহার শিক্ষার জন্য, স্বদেশের হিতের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের

উন্নতির জন্য, নিজের পরিত্রাণের জন্য, এ যুগধর্ম্মের আলোক ও আদর্শ অনুসারে ভক্তিবিষয়ে, নীতি বিষয়ে, জ্ঞান ও সদাচার বিষয়ে বহুবর্ষাবধি যাহা কিছু সার দৃষ্টান্তে দেখাইতে পারিলাম, হে ফলদাতা তাহাকে স্থায়ী কর; যাহা কিছু অসদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলাম তাহা রহিত ও নিস্ফল কর; এ জীবন কেবল তোমারই গৌরবার্থে— কেবল তোমারই গৌরবার্থে যেন ইহা অন্যের নিকট উপায়স্বরূপ হইতে পারে। কেবল ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মাদর্শ অনুসারে যদি ঐহিক জীবন যাপন করিয়া থাকি, যদি ঐহিকে ও পারত্রিকে কোন প্রভেদ না রাখিয়া থাকি তবে কোন দিন আমার দৃষ্টান্ত লোকে গ্রহণ করিবেই করিবে। সে আশায় প্রতিদিন নূতন উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করিতেছি। অন্তরাত্মা আমার সাক্ষী ও সহায়।

কোমল কিন্তু দৃঢ়চিত্ত

স্নেহপ্রবণ স্বভাবের সুখ অসুখ দুইই বিলক্ষণ ভোগ করিলাম। মিষ্ট কথা বলিতে রুচি, শুনিতে রুচি; সদয় প্রসন্ন ব্যবহার পাইতে ভালবাসি, দিতে ভালবাসি, তদ্বিপরীতে কিংবা তদ্বিপরীত সম্ভাবনায় জড় সড় হই, বিব্রত হই, ভাবনাকুল হই, এমন কি সময়ে সময়ে অবসন্ন হই। ইহা এক জাতীয় দৌর্ব্বল্য স্বীকার করিতেই হইবে, তবে কিনা যতপ্রকার সূক্ষ্ম রচিত যন্ত্র তাহা শীঘ্র বিকল হইয়া যায়, অতি যত্নে ও সাবধনে সে যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আমার ভাগ্যে সেরূপ ব্যবহার সুলভ হইল না; লোকের কাছে তাহা পাওয়ার অধিকার দেখি না। এদেশেও এ প্রকার জন সমাজে, যেথানে হিংস ও পরশ্রীকাতরতা এমন প্রবল, বরং বিপরীত ব্যবহার পাওয়া স্বাভবিক, তাই পাইলাম। প্রকৃতির কোমলতা হইতে যে আভমান অসহিষ্ণুতা জন্মে তাহা ত্যাগ না হইলে কোন প্রকার সার সতেজ ধর্ম্মজীবন সম্ভব নহে। বিধাতা সেজন্য সময়ে সময়ে আমাকে এরূপ তুমুল পেষণার মধ্যে ফেলিলেন যে তদ্দারা সূক্ষ্ম চর্ম্ম কঠিন হইল। লোকের ভাল মন্দ ব্যবহারে উদাসীন হইয়া নীতি ধর্ম্মের জন্য কঠিন ব্যবহার গ্রহণ করিলাম, অকাতরে নয় সকাতরে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তদ্দারা ধৈর্য্য বাড়িল, চিত্ত সুদৃঢ় হইল, সর্ব্বপ্রকার শত্রুতার প্রতি ঔদাস্য জন্মিল। ইহাতে স্বভাবের কোমলতা কমে নাই, গভীরতা বাড়িয়াছে। কঠিন নির্ম্মম সংকীর্ণ প্রকৃতির প্রশংসা করি না, দুর্ব্বল অসহিষ্ণু প্রসংসালোলুপ প্রকৃতির প্রশংসা করি না; কিন্তু কোমলতা ও মিষ্টতা, দৃঢ়তা, তেজ ও সাহস, কষ্টবহন, ও উদার ক্ষমতাশীল

ইহারই প্রশংসা করি। বিধাতা এরূপ চরিত্র আমাকে ক্রমাগত দান করিতেছেন। আমার স্বাভাবিক কোমলতা সত্ত্বেও সত্যের ও নীতির বশবর্ত্তী হইয়া খুব কঠোর বলিতে পারি, করিতে পারি, আত্মীয় পর বিচার করি না, এজন্য সময়ে সময়ে দুঃখিত হই বটে, কিন্তু ইহাতেই প্রকৃতির সাম্য রক্ষা হয়।

প্রেমবলে রিপুসংযম

আমি পবিত্রতার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম, শেষে প্রেম উপার্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। যদি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ইচ্ছাধীন হওয়াই পবিত্র হওয়া হয় তবে পরমাত্মার প্রতি প্রেম বিনা সে ইচ্ছা কে বুঝিবে, বুঝিতে পারিয়া অনুরাগ বিনা কেই বা তাহার অধীন হইবে? বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, তপস্যায় যাহা সাধন হয় না, সর্ব্বজীবে প্রেমেতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, প্রেমেতে তাহা সহজ হয়। মানুষের প্রতি সপ্রেম সম্বন্ধ বিনা ও বিধাতার প্রতি প্রেমানুগত্য বিনা কি সংসারের দৌরাত্ম্য ও নিজ প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতিক্রম করিতে পারা যায়? কখনই না। কেবল মাত্র ভক্তির জোরে সকল উপদ্রব সহিতে পারি। হে অন্তর্য্যামী, শত উত্তেজনা, শত উৎপীড়ন, আত্মীয় পর সকলের নানা প্রকার ব্যবহারে অচঞ্চল থাকিতে পারা, সর্ব্বপ্রকার কুদৃষ্টান্ত মধ্যে অবিচলিত থাকিতে পারা কি দারুণ কঠিন! কেবল সেই পারে যে আত্মীয় পর ভুলিয়া, স্বার্থ স্বাধিকার ভুলিয়া তোমার প্রতি প্রেম হেতু তোমার সঙ্গে অভিন্ন ইচ্ছা হইয়া সকল কার্য্য করে। অতএব সার ধর্ম্ম বিধানে ইন্দ্রিয় সংযম রহস্য ও প্রেমসাধন রহস্য একই নিগূঢ় বিষয়। প্রেম অর্থে মৌখিক ভাবুকতার ছড়াছড়ি নহে, ক্রন্দন, দীর্ঘ নিশ্বাসও নহে, ইহা পাত্র ভেদে কখন শ্রদ্ধা ভক্তি, কখন দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, সাহায্য, কখনও বা তীব্র তিরস্কার ও অগ্নিময় প্রতিবাদ। একদিকে তাবৎ মানব স্বভাবে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিয়া তৎপ্রতি যোগ্য আদর করা; অপরদিকে মানুষের পাপ, দুর্ম্মতি, পতন দেখিয়া অবিশ্রান্ত আক্ষেপ ও বিরাগ বোধ করিয়া ভগবানের দ্বারে প্রার্থনা করা ও হিতাচার করা—প্রেম নদীতে এই দ্বিবিধ প্রবাহ। তৎসঙ্গে হে পবিত্রাত্মন্ যদি তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস অনুরাগ থাকে তাহা হইলে কি কোন আসক্তি স্বার্থ তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারে? যতক্ষণ নিজ লাভ ও প্রত্যুপকারের অভিলাষ ততক্ষণ অপ্রীতির সম্ভাবনা। যাই প্রেম নিঃস্বার্থ হইল, ভক্তি নিষ্কাম হইল, অমনি তাহার শক্তি দুর্জ্জয় হইল, সে

আপনাকে, লোককে, তাবৎ সংসারকে কোন দিন বশীভূত করিবেই করিবে। হে অতীন্দ্রিয় পুরুষ, ইন্দ্রিয় সংহারের এই বিধি বিশেষ করিয়া আমাকে শিখাইলে। হে ধ্রুব ধর্ম্মরাজ, আমি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন তোমার বিহিত ধর্ম্ম পালন করিব, আত্মশাসনে অলস হইব না, কেবল এই অকপট প্রার্থনা করি আমাকে অজস্র প্রেমানুরাগ দাও, এমন অনুরাগ দাও যদ্দারা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার অভিমান একেবারে অধীন হইয়া যায়। সপ্রেম সেবাতে, উদার ক্ষমাতে ও দৈনিক আত্মোৎসর্গে হৃদয়কে উৎসাহিত কর। এ শিক্ষার জন্য তোমাকে শতবার ধন্যবাদ করি।

নিজ নিয়তি

হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে ত্রিকালদর্শী, সুদীর্ঘ জীবনের পরিণতি কালে তুমি আমার নিকট আর একবার আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তিপ্রকাশ কর। তোমারই প্রেরণা পাইয়া এই ধর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিয়াছি, বারম্বার সেই দিব্য আহ্বান বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে শুনিয়াছি, তোমার দ্বারা মনোনীত ও লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও অভিষিক্ত হইয়াছি। কি করতে সংসারে আসিয়াছি, তাহা বুঝিয়া সুসম্পন্ন করিবার দিকে অগ্রসর হইলাম, আরও অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইব। তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অব্যবহিত নানা প্রকার যোগে একবার হওয়া, যতদূর ইহ সংসারে প্রাপ্য নানা বিষয়ে তোমার সার ও নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করা; নৈতিক ও আধ্যাত্ম জীবন বিষয়ে মহাপ্রভু ঈশা প্রদর্শিত আদর্শ মনুষ্যত্ব লাভ করা; নানা ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য সত্যের মহান্ সমন্বয় ও মহান্ আদর্শ লাভ করা এবং লোকের অন্তরে মুদ্রিত করা ইহাই আমার নিশ্চিত নিয়তি। এ নিয়তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি? কয়জন লোকের অন্তঃকরণ হইতে ইহার সায় পাইলাম, জীবনের বিচিত্র অবস্থা মধ্যে কয় বার ইহার দিব্য উপলব্ধি ভোগ করিলাম? জানি বর্ত্তমান জীবনে, কি এক জীবনে এ মহানিয়তি সম্পূর্ণ হইবার নয়, লোকলোকান্তর, জন্মজন্মান্তর, আমার নিয়তি আমার সঙ্গে যাইবে, আরও তোমার সন্নিহিত হইব, তোমার সদৃশ হইব; বিস্ময় হইতে মহত্তর বিস্ময়ে তোমার আরাধনা ধ্যান করিব আরও কত নূতন সত্য, নবতর ভক্তি, গভীরতার পবিত্রতা উপার্জ্জন করিব, কি অজানিত অবস্থায় পরিণত হইব, তাহা আমি হস্তে লিখিতে, চিন্তায় ধরিতে, কল্পনাতে চিত্র করিতে পারিনা, চাইও না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে আমি তোমার আত্মজ, তোমার বংশজ, তোমার পরমাশ্চর্য্য স্বভাবের

অঙ্কুর ও অধিকারী। তবে নিয়তিমান লোকেরা সকলেই জীবদ্দশায় কতদূর নিজ নিজ নিয়তির পরিচয় জীবনের কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি কি তাহা পারিয়াছি? লোকে যে কেহ কেহ আমার কার্য্য ও আদর্শ স্বীকার করেন তাহা জানি, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে সন্তোষকর নহে, আমি যে তাঁহাদের সঙ্গে একাকার হইতে চাই, ক্রমে ক্রমে কি তাহা হইতেছি? আমি নিজ নিয়তির আন্তরিক আকর্ষণে তোমার সন্তানদিগকে টানিতে চাই এবং সকলের সঙ্গে নূতন ধর্ম্ম প্রবাহে তোমাময় হইতে চাই। ইচ্ছামত ও সাধ্যমত নরনারীকে এই নিয়তির আকর্ষণে টানিয়া আমার সঙ্গে তাঁহাদিগকে তোমাময় করিতে পারিলাম না এই ক্ষোভে আমি বার বার বিষণ্ণ ও আত্ম-সন্দিগ্ধ হই। কিন্তু তা বলিয়া যে এতদূর পর্য্যন্ত সার্থকতা বিধান করিলে, এত লোকের সঙ্গে এক-হৃদয় করিলে তাহা কম কথা নয়, তাহা যেন অস্বীকার না করি। আমার অদৃষ্টে যা লিখিয়াছিলে এ সংসারে বিশেষ রূপে তাহা সিদ্ধ করিব, সে চেষ্টায় যেন কখনও পরিশ্রান্ত না হই, নিরাস না হই। যাঁহাদিগকে সঙ্গী করিলে, যাহা কিছু উপায় অবলম্বন দিলে তার প্রকৃতি ব্যবহারে যেন অনলস হই। মহান্ নিয়তির কথঞ্চিৎ প্রমাণ ও পরিচয় ইহ জীবনেতেই দিয়া, যেন উচ্চতর লোকে উচ্চতর সিদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারি। নিজ নিয়তি বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর কর, সকল ভয় ও অন্ধকার নিবারণ কর।

কি লাভ হইল?

হে সাধকবৎসল, প্রার্থী-জন সহায়, বল তোমার আশ্রয় সার করিয়া এত দিনে আমার কি লাভ হইল? তুমি সাক্ষী যে তোমাকে জানিতে, পাইতে, তোমার মনের মত হইতে আমার অসীম স্পৃহা ও চেষ্টা—এ চেষ্টা চরিতার্থ করিয়া তুমি যে যে বিষয়ে এবং যতদূর আমাকে কৃতকার্য্য করিলে তাহা একবার স্মরণ করি। সাংসারিক স্বার্থ সাধন হইতে তুমি উচ্চ পারমার্থিক জীবনে আমাকে অভিষিক্ত করিলে, অথচ দৈহিক পার্থিব জীবনের নানা অভাব ও অনটন দূর করিলে। তোমার সংসর্গে আমার মানসিক শক্তি উন্মুক্ত ও আয়ত হইল; আমার অন্তরে বিবিধ চমৎকার ভাবরস চিরদিন প্রবাহিত রহিল, প্রেম ভক্তি ক্ষুণ্ণ না হইয়া আরও পুষ্ট ও পরিপক্ক হইল। তোমার শাসনে আমার প্রবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমে ধর্ম্মবিধির অধীন হইল, এবং অতৃপ্ত পুণ্যস্পৃহা ক্রমে জীবন চরিত্রে পরিণত

হইল। মস্তিষ্ক নিগূঢ় ধ্যান ধারণায় দৃঢ়তা লাভ করিল, রসনায় বাক্‌শক্তির মহাবৃষ্টি অবতীর্ণ হইল, এই অবিশ্রান্ত লেখনীতে সত্য প্রকাশের ও লোকশিক্ষার অবিরল শক্তি সঞ্চারিত হইল। জগতের সহানুভূতি পাইলাম, নানা দেশীয় সাধু ও ও সাধ্বীদিগের শুভ ইচ্ছা লাভ করিলাম, আত্মীয়দিগের বিশ্বাস ও সহায়তা প্রাপ্ত হইলাম। যদিও কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরোধ ও উপদ্রব সহ্য করিতে হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট না হইয়া বিশেষ ইষ্ট সংঘটিত হইল। এ সমস্ত পরম লাভের জন্য বিন্দুমাত্র আত্মগরিমার হেতু নাই, আরও বিনম্র অকিঞ্চন কৃতজ্ঞতার হেতু আছে। অযোগ্য পাত্রে, অযোগ্য ধর্ম্মসাধনায় তোমার ঈদৃশ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কেবল আরও পূর্ণ মাত্রায় তোমার অধীন ও আজ্ঞাকারী হইতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মবিশ্বাসের তুল্য অমূল্য বস্তু মানবজীবনে আর কিছুই নাই, সে বিশ্বাসে আমার অনেক ত্রুটী হইয়াছে। তত্রাচ সেই প্রবল বিশ্বাসের আকর্ষণে কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করিলাম না। বিলম্বে বটে কিন্তু যথাসময়ে আত্মার পরিণতি অনুসারে স্বাভাবিক সরল গতিতে অন্তঃকরণের বিশ্বাস তোমার প্রতি ধাবিত হইল; তুমি সরল স্বাভাবিক অনুগ্রহবান বন্ধুর ন্যায় নিকট হইতে আরও নিকট হইলে, আরও হইবে, অন্তরতর হইতে অন্তরতম গুরুরূপে আমার মধ্যে তোমার পবিত্র আশ্রম রচনা করিলে। তোমার মনোনীত "প্রিয় সন্তান" রূপে আপনাকে চিনিতে পারিলাম, আরও অদৃষ্টে কি আছে জানি না। সামাজিক ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া কি হইবে? শারীরিক ক্ষয় দৌর্ব্বল্য আলোচনা করিয়া কি হইবে? তোমা হইতে দিব্যজীবন পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া আরও অমিত আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্যান্য ক্ষতি লাভ বিস্মৃত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী মধ্যে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিলে এ মণ্ডলীর হিতসাধন হইত; না লাভ করায় তাঁহাদের বিশেষ অশুভ সংঘটন হইল. আমার তজ্জন্য আক্ষেপ হইল বটে কিন্তু কোন অনিষ্ট বোধ হইল না. বরং বন্ধনমুক্ত হইয়া উচ্চতর মণ্ডলীমধ্যে ভুক্ত হইলাম, সর্ব্বপ্রকার আদর্শের প্রসার হইল; ভ্রাতৃমণ্ডলীর বিস্তার হইল।

প্রথমতঃ বাহ্য-সৃষ্টির সঙ্গে তুমি নবযোগ ও নিত্যযোগ সংস্থাপন করিলে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনও এত অদ্বৈত পদার্থ নহে, কিন্তু হে আত্মপ্রকাশক, হে শিক্ষক, তুমি এই বাহ্যজগতের প্রাণ, মন, ও হৃদয়রূপে ইহার মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে; আমার নিকট বিশ্বজগতের বদ্ধ কপাট খুলিয়া গেল; আমার আত্মা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে, সর্ব্বত্র তোমার পদচিহ্ন দেখিতে শিক্ষা করিল। আমি দেখি এ সত্যের প্রতি লোকের তেমন সমাদর নাই; তাবৎ নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় রূপে কেহ তেমন

উপলব্ধি করেন না, তুমি যে সর্ব্বব্যাপী ইহা স্বীকার করিয়াই সকলে নিরস্ত হন। বিশ্বসৃষ্টি যে তোমার আকার, তোমার প্রকার ও প্রতিমা, ইহাতে যাহা কিছু ঘটে তোমারই সংকল্পে ও সম্মতিতে ঘটে তাহা কেন উপলব্ধি হয় না? তুমি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কি প্রকারে সৃষ্টির সঙ্গে এমন অভিভূত ও একাকার হইলে, কি প্রকারেই বা তোমা-গত প্রাণ ভক্ত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যোগাবস্থায় একাকার হও? যাহাই হউক তুমি যে এই দীপ্যমান প্রকৃতির প্রাণ, ইহার সার সর্ব্বগত কারণ, ইহার শোভা, ঐশ্বর্য্য, ইহার ধর্ম্ম, শান্তি তাহা আমি তোমার কৃপায় দিব্য চক্ষে দেখিলাম, ক্রমাগত যে তুমি এই জগতের ও এতন্নিবিষ্ট তাবতের রচনা, রক্ষা ও বিনাশ, ও রূপান্তর বিধান করিতেছ, ক্রমশঃ সকলের পূর্ণতা সাধন করিতেছ ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে জানি ও বিশ্বাস করি, সুতরাং আমি জগৎকে আর জড়ময় বস্তু মনে করি না, চিন্ময় ব্রহ্মধাম মনে করি, ও ইহার মর্ম্মে তব সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করি। কিন্তু এ জগতে এত বিষম দৌরাত্ম্য দেখি; এত ভয়, ক্ষয়, মরণ, এত তামসিক উপদ্রব, রাজসিক যথেচ্ছাচার, এত নির্ম্মমতা, নিগ্রহ, নির্য্যাতন, যে ইহার মধ্যে সকল সময় তোমার আত্মপ্রকাশ হৃদয়ঙ্গম হয় না, বুদ্ধিতে বুঝিলেও অন্তরে আশ্বাসিত হইতে পারি না। এইজন্য অধঃস্থিত জড়-জগতের উর্দ্ধে উচ্চতর মানব জগৎ রচনা করিলে, মানব প্রকৃতির মধ্যে তুমি প্রাণময়, মনোময় হৃদয়বিহারী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হইলে। আত্মচিন্তায় ও বহু-দর্শনে খুব জানিয়াছি যে মানুষের স্বভাবে এক বিষম দুষ্প্রবৃত্তি নিহত আছে; যে নামেই তাহাকে অভিহিত করি তাহা সতত তোমার বিরোধী, তমোগুণ রজো-গুণে উত্তেজিত, কিন্তু তাই বলিয়া মানবত্ব ও দেবত্ব মধ্যে যে অদ্ভুত একাকৃতি আছে তাহা কি ভুলিতে পারি? মানব চরিত্রের মহা বৈচিত্র দেখিয়া, ইমার প্রেম এবং তজ্জনিত আত্মত্যাগ, ইহার বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা, অনন্ত-স্পৃহা ও উচ্চ সিদ্ধি, ইহার উত্তম সুকীর্ত্তি ও অমরত্ব, ইহার আত্মবিজয়, দিগ্বিজয় দেখিয়া হে নারায়ণ, হে নরনাথ, আমি মানুষের মুখচ্ছবি, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও প্রকটিত দেখিতে পাই, মনুষের শরণাপন্ন হই, :মানব-শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগকে এবং বিশেষত যিনি মানব-চরিত্রের প্রতিনিধি সেই দেবত্বময় ঈশাকে বরণ করি। হে সর্ব্বাত্মন্, হরি, মানবের আরাধনা কেবল নামান্তরে রূপান্তরে তোমারই আরাধনা। জড়প্রকৃতির শত ত্রুটী তুমি মানব প্রকৃতিতে সংশোধন করিয়া, মানব প্রকৃতির শত ত্রুটী তুমি মহাপুরুষদের চরিত্রে সম্পূর্ণ করিলে, মহাপুরুষদের অভাব, অপূর্ণতা তোমার দিব্য সন্তান ঈশার জীবনে পূর্ণ করিলে। কোন মানব কখনও অশেষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম যে তুমি, তুমি যদি নিষ্পাপ মানবাত্মার মধ্যে অবাধে অবতীর্ণ হও সে আত্মা

তোমার গুণে পূর্ণ হয়, ইহ জীবনে পূর্ণতা বিষয়ে মানুষের যে ধারণা তাহা সার্থক হয়। আমার এ শূন্য জীবনে পূর্ণতা, লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কোথা হইতে আসিল, কেনই বা তাহা অপূর্ণ থাকে, একবার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া আবার কেন অপূর্ণ হয়, কবে তাহা চিরদিনের তরে পূর্ণ হইবে? আমার ক্রটী আক্ষেপ এত বিশেষ ও অশেষ যে মহাজনদিগের সঙ্গে কোন বিষয়ে আমার তুলনা হয় না, এবং তাঁহাদের মধ্যে পরম-দেবতার পূর্ণ প্রকাশ ভাল দেখিতেও পাই না, যদি পাই তাহাতে স্থায়ী তৃপ্তি লাভ হয় না, আমি নিজে তাঁহাদের মত হইতে চাই, ইহজীবনে আমার প্রকৃতি তোমার পূর্ণতা গুণে পূর্ণ হইবে এই চাই। এই জন্যই হে চৈতন্য-ময়, ধ্রুব সত্য সনাতন, তুমি বার বার আমার স্বভাব মধ্যে সমস্ত রূপ ও গুণের আধার হইয়া দিব্য দর্শন দিলে এবং তদবস্থায় পাপ-মুক্ত ও জীবন-মুক্ত হইয়াছি, এবং যেরূপ আমার হইয়াছে ও হইতেছে, যে কেহ সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাপন্ন হইবে তাহারও সেইরূপ বা ততোধিক অবস্থা নিশ্চিত হইবে। জানি আমার এই মহা-প্রাপ্তি এ জীবনে ফুরাইবে না, পূর্ণতার পর প্রশস্ত পূর্ণতা লাভ হইবে। তথাপি হে তিমিরাতীত আদিত্য-বর্ণ আনন্দময়, আমি তোমাকে জানিয়া মৃত্যুর পরপারে উপনীত হইয়াছি। তবে কি বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিব? তুমিই ধন্য, আর তোমাকে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট এই প্রাণী ধন্য।

উপসংহার

যিনি জীবন্ত সত্তা, যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জীবন স্বরূপ তিনিই আমাকে দীর্ঘায়ু করিলেন। ভাবি নাই এত দিন বাঁচিব। এখন পরিণামে এই জীবন দর্পণে পবিত্র দেবতার পরিষ্কার অভিসন্ধি ও আমার নিজ নিয়তি আরও ভাল-রূপে প্রকাশিত হউক। এ দেশে সত্যধর্ম্মের বিস্তার জন্য, মানব মণ্ডলীতে ভ্রাতৃমিলনের জন্য, সর্ব্ব বিষয়ে নায়, সত্য সাত্বিক ভাব সংস্থাপনের জন্য, সর্ব্ব বিষয়ে পরমাত্মার অধীন ও অদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার জন্য, এই অস্থির জীবনে সে সকল অভিপ্রায় ইচ্ছামত সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু এখনও অনেক আগ্রহ ও আশা আছে। অকস্মাৎ দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি; অব্যাহতি পাইব এমন আশা করিতে পারি না। এ সময় পূর্ব্বজীবন স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন সম্মুখে রাখিয়া এই কথা বলি, এতদিন যা সত্য বলিয়া মানিলাম ও লাভ করিলাম ভবিষ্যতে তাহা আরও সত্য এবং সার

আমার আত্মীয়েরা আমাকে বিদায় দিবার সময় ইহা যেন কখনও ভুলিয়া না যান। হে ভগবান, আমার সুদীর্ঘ জীবন-সেতু তুমি যে সকল কৃপা-স্তম্ভের উপর রচনা করিলে তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলাম, পারিলাম কিনা জানি না। বোধ হয় পারিলাম না, কারণ নিগূঢ় আত্ম-তত্ত্ব কথায় প্রকাশ হয় না, যে সকল আশীষ গণনা করিলাম তাহা পরস্পরের সহায় হইয়া একটী অপরটীকে সমুন্নত করিয়াছে, সুদৃঢ় করিয়াছে; একটী ভাঙ্গিলে সকলগুলি অঙ্গহীন হয়, সকল আশীষ মিলিত হইয়া এই জীবন-লীলার দিব্য-মন্দির রচনা করিয়াছে। অতীত ঘটনা, সুখাবহ হউক, দুঃখাবহ হউক, তোমারই অদ্ভুত অলক্ষিত ক্রিয়ার সাক্ষী, ইহাতে বড় ছোট ঘটনার বিচার নাই, পার্থিব অপার্থিবের বিচার নাই, শরীরিক আধ্যাত্মিকের বিচার নাই, ভাবতের মধ্যে সমাকীর্ণ তুমি। মানুষের পুণ্য পাপ, অভাব ভাব উভয়ই তোমার অখণ্ড বিধি সপ্রমাণ করে। সংশয়-বিহীন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমারই অব্যর্থ কৃপার অঙ্গীকার। সেই কৃপার উপর সাদরে সমুৎসাহে নির্ভর করি; করিয়া এই মোহময় বর্ত্তমান কালে আমি নির্ভয়ে চলিয়াছি, নানা চেষ্টা উদ্যমে ব্যাপৃত হইয়াছি। আমার নিকট প্রকৃত জীবন অর্থে ভগবানের সুমঙ্গল প্রেমানুভূতি উপলব্ধি বই আর কিছু নয়। মানুষের কর্ত্তৃত্ব অনন্ত অখণ্ড প্রণালী মধ্যে একটী-মাত্র উপকরণ। আমি যেখানে আত্ম-রচয়িতার পদ গ্রহণ করিয়াছি সেখানে অভাগ্য অকীর্ত্তি ও অগৌরব; আর যেখানে ভগবৎ কর্ত্তৃত্বের উপর আত্ম-সম্প্রদান করিতে পারিয়াছি সেখানে সুখ সার্থকতা। এখন আমার নিজ কর্ত্তৃত্বে রুচি নাই, আর তাহার সময়ও নাই কেবল তোমারই ইচ্ছার প্রতীক্ষা করি। আজ এই ৬৫ বৎসর বয়সে তোমার কল্যাণমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তোমার শুভা-শীষ গণনার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অকূল সিন্ধু-তরঙ্গ কে গণনা করিবে? দেহ ধারণে এই অসংখ্য অবস্থার মহা-পর্য্যায় মধ্যে তোমারই পরিচিত বা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ, তোমারই ক্রমশ আত্ম-আবিষ্কার, তোমার অভিসন্ধি ও অনুজ্ঞা। বৎসর, ঋতু, তিথি, নিমেষ তোমারই ঘূর্ণিত রথচক্র—অবিশ্রান্ত আমাকে তোমার মহাপ্রদেশে লইয়া যাইতেছে; ধরণীর নানা আকর্ষণ ও গতি; আকাশ অন্তর্গত নানা অতীন্দ্রিয় প্রভাব ও প্রবাহ; সূর্য্য নক্ষত্রের নানা আকর্ষণ ও বিকর্ষন; ভৌতিক নানা শক্তি, দেহের নানা আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও অবস্থা; নানা প্রকার উৎসাহ বিষাদ, মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষ, শিক্ষা, রুচি, নীতি, ধর্ম্ম, লোকের দৃষ্টান্ত, নিজের সুখাসুখ, দেহ মনের অদ্ভুত সম্বন্ধ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাকে তোমার মহা-প্রদেশে তোমার মহাসত্তার মধ্যে লইয়া যাইতেছে —আমি জানি না আমি কি, কোথা হইতে আসিয়া কোথা যাইতেছি কিরূপে চালিত হইতেছি, আমার মধ্যে এই বিশ্ব-শক্তি কিরূপে কার্য্য করে। অপরিণত আবেগময়

যৌবন, বয়োবৃদ্ধ অনার্থক জীবন, কুভাব ও কুক্রিয়া জনিত অবসাদ ; গভীর আক্ষেপ, অসংযত প্রবৃত্তি-জনিত অন্ধ চেষ্টা, ধর্ম্মজনিত আশ্চর্য্য উদ্যম-আত্ম-প্রসাদ, ভাল মন্দ মিশ্রিত লোক সহবাস ও শোক সম্বন্ধ আমাকে চিন্তাতীত চক্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মর্ম্মে তোমার দৈবপ্রণালী ক্রমেই দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। আমি অন্ধ শ্রান্ত পথিক তোমার দ্বারা চালিত হইয়া অনন্ত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম ও গম্যধামের নিকট হইলাম। আমার ভ্রান্তি পাপ অকীর্ত্তি তোমারই গুণে রহিত হইল। এখন আমাতে তুমি ও তোমাতে আমি কেবল এই ধারনা, অবশিষ্ট রহিল। এত প্রকার সংঘটন ও বহুদর্শন সত্ত্বেও ইহ-জীবন কতই সংক্ষিপ্ত মনে হয়, ইহা যেন অন্য কোন প্রকাণ্ড অভিনয়ের সামান্য উপক্রমনিকা। হে স্বয়ম্ভু, হে জন্ম-মরণ রহিত, তুমি চির-তরুণ, তুমি জীবন্মুক্ত যোগীজন-বক্ষমধ্যে ক্রমাগত নব নব আদর্শ রচনা করিতেছ, নব নব আত্ম-পরিচয় দিতেছ—আবার সেই সঙ্গে আমাকেও পুনঃ পুনঃ রচনা করিতেছ। ক্রমাগত নূতন জন্ম ও নূতন জীবন না পাইলে কে তোমার জীবন্ত সত্তার নিত্য প্রকাশের অধিকারী হইবে? এক জীবনেই কত বার তুমি আমাকে সৃজন করিলে, সংহার করিলে, আবার গড়িলে, আবার ভাঙ্গিলে, আবার গড়িবে—ইহার কি অন্ত আছে? এই জীবন কি বিচিত্র অদ্ভুত রচনা, কি অমূল্য নিধি, কি অনন্ত অধিকার! ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি অশেষ! তোমার ইচ্ছা আমি যা হই এখনও তা হইতে পারি নাই যত দিন তা না হই, আমাকে ভাঙ্গিতে গড়িতে ছাড়িবে না। মারিতে হয় মার, রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু এই কাতর মিনতি করি যেন, ক্রমে ক্রমে তোমার মনের মত হই, সে বিষয়ে যেন আমার চেষ্টা আগ্রহের কোন ক্রটী না থাকে। আমি অমর ধামের যাত্রী, যাবার জন্য উৎসাহে আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু ইচ্ছামত এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। যাঁদের দেশে যাইব তাঁদের ন্যায় সাদৃশ্য না পাইলে আমি সেখানে গিয়া কিরূপে সুখী হইব, স্বর্গে আমার গতি কি হইবে? এই দূরব্যাপী অস্পষ্ট গত জীবন—ঘটনার পশ্চাতে তরঙ্গায়িত ঘটনা, অবস্থার গভীরে অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা, কত লোকের কত বিচার, প্রভাব, দৃষ্টান্ত আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে—কখনও উন্নত কখনও অবনত, কখনও তোমার প্রতি নিকট কখনও অতিদূর। সৌভাগ্য, সন্তোষ, দুর্দ্দিন, দুর্ভাবনা, আশ্চর্য্য প্রণয়, অসম্ভব বিচ্ছেদ, বিনা চেষ্টায় উত্থান, বিনা দোষে পতন, হেতুহীন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও উর্দ্ধগতি, হেতুহীন স্বাভাবিক নৈরাশ্য, পরিশ্রান্ত ও মৃতবৎ নিশ্চেষ্টা, এই উত্তেজিত মহাতুফানের শিখর দেশে তোমার আরূঢ় অভয় আকৃতি, নিঃশব্দ, নিরন্তর, নিত্য ; হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় কখনও আচ্ছন্ন, অদৃষ্ট, বারম্বার দৃষ্ট, জ্যোতির্ম্ময় বিকার বিহীন—তুমি আমাকে নিয়তির জটিল জালের মধ্য দিয়া টানিতেছ ; আমি ভয়ে, ক্লান্তিতে

অদৃঢ় পদবিক্ষেপে সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু তাহাতেই ধন্য হইয়াছি ও সার মানবত্ব পাইয়াছি। কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, কি হইলাম, কিরূপে হইলাম, পরে কি হইব? কেনই বা মানব দেহ ধরিলাম; কবে হইতে সাক্ষাৎ প্রাণ-রূপে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিলাম? কিরূপে, কাহার নিদারুণ পদাঘাতে তোমা হইতে বিচ্যুত হইলাম, অসার স্বাতন্ত্র্য অহংবুদ্ধি অবলম্বন করিলাম, করিয়া বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে একাকী পড়িলাম, জীবন ভারে পাপ ভারে মহাদায়গ্রস্ত হইলাম। আবার কি অদ্ভুত নির্বন্ধে তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইলাম, হইয়া আধ্যাত্ম লোকে সহস্র আত্মীয় লাভ করিলাম; সমুদয় সৃষ্টির সঙ্গে একাকার হইলাম। যাহা কখনও হারাই নাই তার জন্য কত আক্ষেপ কত অনুযোগ, আকুল অন্বেষণ। যাহা কখনই পাই নাই, পাওয়া কি জানিতামও না, তার জন্য কি অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা; কণামাত্র লাভ করিয়া কি উৎসাহ, কি মত্ততা, কি অনৈসর্গিক আহ্লাদ, আরও লাভ করিতে কি অনন্ত স্পৃহা! যারে কখনই হারাও নাই, হে নাথ হে লোকনাথ, তার জন্য কতই খুঁজিলে, কতই করিলে। যে চিরদিন তোমার, না বুঝিয়া, না চাহিয়া না ধরা দিয়াও তোমার, তাহাকে কেন বারম্বার নির্ব্বাসিত করিলে—আবার কেন বারম্বার ডাকিয়া লইলে? বুঝিলাম ইহাই তোমার বিহার ও ব্যবহার-রীতি—এখন আর প্রতারত কি প্রতিহিত হইব না। এই বিধিতেই জীবের পরিণতি ও পূর্ণাবয়ব লাভ হয়। নিজের স্বেচ্ছায় স্বাধীনতায়—অরোধ অন্ধকারময় স্বেচ্ছায় তোমাকে ছাড়িলাম—অসার্থক শ্রান্ত পরাভূত স্বেচ্ছায় আবার তোমারই পদানত হইলাম। হায়—এই স্বাধীন প্রকৃতি পেয়ে কতই নিগ্রহভাগী হইলাম, ইহারই সুব্যবহারে কত মহত্ত্বে আরোহণ করিলাম, দেবমণ্ডলীর, মানবমণ্ডলীর কত অনুগ্রহভাজন, আশীর্ব্বাদভাজন হইলাম। হে দিব্য পিতা, আমি প্রস্তর-বৃক্ষের ন্যায়, মৃগ-পক্ষীর ন্যায়, প্রত্যাশী, কৃতদাসের ন্যায় তোমার অধীন হইতে ইচ্ছা করি না; বিনা অনুরোধে, কেবল নিঃস্বার্থ প্রেম হেতু, নিজের বিশ্বাস ও স্বাধীন ইচ্ছা হেতু তোমার দিব্য সন্তানের ন্যায় তোমার অধীন হইতে চাই। বল সে অভিপ্রায়ের সিদ্ধি মানসে আমি কোন্ পরিতাপ, কোন্ নির্ব্বাসন, কোন নির্য্যাতন, কোন্ শাসনকে নিন্দা করিব? যাহা কিছু তোমা হইতে ঘটিয়াছে, কিম্বা তোমার অভি-প্রায়ে লোকমণ্ডলী হইতে ঘটিয়াছে, তাহা তিক্ত হউক, মিষ্ট হউক, আমার শিরোধার্য্য। সাধনা দ্বারা, কি তপস্যা দ্বারা আমি তোমাকে ক্রয় করি নাই—কেবল আপনার শত পাপের পেষণ জন্য তোমাকে পাইবার অনিবার্য্য স্বভাবগত আকর্ষণের জন্য চিরকাল তোমার চরণপ্রান্তে অতি আকুলে প্রার্থনা করিয়াছি, আর তুমি আপনার উদার কৃপাগুণে চিরকালের তরে

আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ। আমি এ বয়সে তোমার এ মহাবিধান ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এখন কেবল এই একান্ত মিনতি যেন আমার পক্ষ হইতে নিষ্ঠা, তপস্যা, ও অবিরত চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ রহিত না হয়, যেন তোমার পক্ষ হইতে সহানুভূতি, আশ্বাস, সত্যমুক্তি ও নিত্যমুক্তি লাভ করি; উভয় পক্ষ হইতে যোগ, একত্ব ক্রমেই সম্পূর্ণ হউক। আমার ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রস্ফুটিত করিয়া সমস্ত মানবজাতির সার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এক করিলে, আমার অন্তরে নানা আদর্শের সমন্বয় করিলে, নানা সাধনা ও সিদ্ধির সাম্য দিলে, জীবন মুক্তির আস্বাদন দিলে, দিব্য জীবনের সঞ্চার করিলে, জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির সঙ্গে, তোমার নিজ প্রকৃতির সঙ্গে, আমাকে আশ্চর্য্যরূপে সংযুক্ত করিলে—তোমার মনে আরও কত কি আছে জানি না। আমার সকল চেষ্টা সার্থক হয় নাই, সকল সাধের সিদ্ধি পাই নাই। অনেক আশা ও শ্রম বিফল হইয়াছে, কিন্তু আমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আরও সমুন্নত হইয়াছে, আমি বুঝিয়াছি, হে অনন্ত, এক জীবনে এক জনের জীবনে এ প্রকাণ্ড স্পৃহা পূর্ণ হইবার নয়, আমি একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম আস্বাদন করিয়াছি, এবং তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাবতের মধ্যে তোমার বিধি রীতি ও আত্মবিকাশ দর্শন করিতেছি। হে ইচ্ছাময়, জ্যোতির্ম্ময়, জীবন্ত সত্তা, যদি আর কিছু দিন সংসারে থাকিতে হয় যেন তিলমাত্র তোমাহারা হইয়া, তোমার সেবা সাধনায় অক্ষম হইয়া এক-দিনও বাঁচিতে না হয়, যেন কোন সাধু জীবনের পথে, কোন সাধুমণ্ডলীর পথে জঞ্জাল হইতে না হয়, যেন বান্ধব কি অবান্ধব কাহারও গলগ্রহ হইতে না হয়, যেন জীবন রহস্য কোন দিন পুরাতন ও রসহীন না হয়, যেন ধর্ম্মজীবন প্রগাঢ় ও গভীর হইয়া লোকের জীবনকে আন্দোলিত ও নিগূঢ় করিতে পারে, তোমা পানে আকর্ষণ করে। আরও দাও, আরও দাও, জীবনে, মরণে মরণান্তে আরও আত্মপরিচয় ও আনন্দপূর্ণ আত্ম-দান করিতে থাক। এ দীর্ঘ জীবনে যদি কিছু শিখিয়া থাকি তবে তাহা এই যে, দেহ ধারণ, এই নিম্নধাম সংসারে আমার ন্যায় যে-সে লোক বারম্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময় সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে, তোমার দিব্য রূপ ও গুণের অংশী হইতে পারে। এই কীট জীবনে, এই সামান্য সাধনে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম; আরও অশেষ গুণে তোমাকে পাইবার পথে যাত্রা করিলাম। যেমন এতদিন তেমনি এ সময়ে তোমা বিষয়ক আরও স্বর্গীয় উপলব্ধি প্রদীপ্ত কর, আরও নিকট হও, আরও নিকট হও। প্রত্যেক শক্তি, নীচ উচ্চ প্রত্যেক শক্তি ও প্রবৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখ কর, অন্তর্মুখ কর—আমাকে ও আমার প্রিয়দিগকে দিব্যধামের যোগ্য কর।

শান্তিকুটীর

কলিকাতা, মার্চ্চ ১৯০৫।

আমার ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য

বঙ্গচন্দ্র রায়

ওঁ তৎসৎ

একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্।

"আমার ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য"

জন্ম ও শৈশব

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় রূপগঞ্জ থানার অধীন পাঁচগাও নামক গ্রামে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১২৪৬ সনের ২৪শে শ্রাবণ শুক্রবারে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺রামগতি রায় এবং মাতা চন্দ্রকলা দেবী। আমার জন্মিবার পূর্ব্বে আমার একটী ভগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে আমার জন্মকাল হইতেই আমি মা-বাপের বড়ই আদরের জিনিষ হইয়াছিলাম। আমার মাতা বড় সুন্দরী ছিলেন এবং আমার ভগিনী নাকি মার মতন সুন্দরী হইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেব তত সুন্দর ছিলেন না, আমিও তাঁহার মতনই। পিতা আমার জন্মিবার পরে মাত্র নয় মাসকাল জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার নাম বঙ্গচন্দ্র রাখা হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাজিতপুর মুন্সেফিতে ওকালতি কার্য্য করিতেন। তিনি পারশ্য ভাষায় খুব পণ্ডিত ছিলেন। আমার জেঠামহাশয় ও খুড়ামহাশয়ও পারশ্য ভাষায় বিশেষ রূপে শিক্ষিত ছিলেন। কিছুপূর্ব্বে আমাদের বিশেষ ভূসম্পত্তি ছিল, কিন্তু প্রবলতর জমিদার কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আমার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়সহ আসিয়া পাঁচগাওয়ে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের লোকজনও তথায় বাস করিতে থাকে। আমার জন্মিবার নয় মাস কাল পরে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিবারের অনেকেই পতিবিয়োগে সহমরণ প্রথানুসারে পতির মৃতদেহসহ জীবিত দেহে চিতাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার জেঠিমাও আমার পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র অপগণ্ড শিশুপুত্রকে রাখিয়া পতির চিতাগ্নিতে তাঁহার জীবিত দেহকে দগ্ধ হইতে দিয়াছিলেন। তাহাতে আমার পিতৃবিয়োগের সময় আমার মাতৃদেবীও বা তাহাই করেন এই ভয়ে সকলে ভীত হইয়াছিলেন। আমার পিতা ৩৩ কি ৩৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তখন আমার মাতার বয়স ২৪ কি ২৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

আমার পিতৃদেবের দেহত্যাগের পর আমাকে নিয়া মা কিছু কষ্টে স্বামীগৃহে থাকিয়া দুপতারা গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে মাতার আশ্রয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বাস করিতে বাধ্য হন। আমি এই গ্রামেই

শৈশব এবং বাল্যকাল যাপন করি। আমার যখন ছয় বৎসর বয়স তখন মাতৃদেবী আমার বিদ্যারম্ভের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। আমার মাতুলের অবস্থাও ভাল ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া আমাকে লইয়া তাঁহার ভাগিনালয়ে যান। ভাগিনেয়দের কেহ কেহ পিতৃদেবের সঙ্গে থাকিয়া লিখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান হওয়াতে সেই সঙ্গে আমারও বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার পর মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিয়া আমি লিখাপড়া করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু মার অত্যন্ত আদরের ছেলে ছিলাম বলিয়া মার কাছে থাকিতেই অধিক ভালবাসিতাম এবং অন্যত্র যাইয়া লিখাপড়া শিখিতে তত ইচ্ছা হইত না। এমতাবস্থায় মার গুরুজনদের মধ্যে কোন কোন বৃদ্ধা এই বলিতেন যে মার আদরেই বঙ্গ নষ্ট হইবে। ইহা শুনিয়া মা গোপনে আমার মাথায় চুম্বন করিয়া বলিতেন, বাছা লিখাপড়া শিখ আর না শিখ বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু অন্যকে প্রবোধ দিবার জন্য মা আমাকে লিখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত তাড়না করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মারিতেন কিন্তু হস্তকে এরূপ সঙ্কুচিত করিয়া মারিতেন যে তাহাতে খুব শব্দ হইত অথচ আঘাত খুব কম লাগিত। ইহাতে আমি যেমন মার প্রতি অধিকতর আসক্ত তদ্রূপ লিখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে মা বলিতেন, তুই যে লিখাপড়া করিস তাহার প্রমাণ কি? তোর হাতে তো কালি লাগে নাই। তাহার পর হইতে আমি লিখাপড়া করা অপেক্ষা হাতে গায় কালি মাখিতেই যত্ন করিতাম এবং মাকে দেখাইয়া বলিতাম দেখ কেমন লিখাপড়া করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে মা হাসিয়া বলিতেন এই বুঝি তোর লিখাপড়া। যাহা হউক লিখাপড়া শেষ করিবার সময় যে "লাগ লাগ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ" বলিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া প্রণাম করিতে হইত তাহা খুব হৃদয়ের সহিত করিতাম এবং কলম যেদিন মাথা তুলিয়া ও কপালে সংলগ্ন থাকিতে দেখিতাম সেদিন যে কি আনন্দ মনে মার নিকট ফিরিয়া আসিতাম তাহা এখনও ভুলি নাই। মারও তাহা শুনিয়া আনন্দ হইত এবং বড় আনন্দে যে, সেদিন খাইতে দিতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আমার শৈশবকালে আর একটী অভ্যাস ছিল যে মা প্রস্তাব না বলিলে আমার ঘুম আসিত না। মা প্রস্তাব বলিয়া আমার মাথা হাতাইতেন এবং তাহাতেই আমার ঘুম পাইত। মাও সেই সুযোগে প্রস্তাব বলাচ্ছলে আমাকে নানা উপদেশ করিতেন। তন্মধ্যে এই গল্পটীই অধিক বলিতেন "একটী বিধবার একটীমাত্র পুত্র ছিল। যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইল তখন স্ত্রীর কথায় সে তাহার মাকে বড় কষ্ট দিত। কিন্তু যখন তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল, সে একদিন স্ত্রীর কথায় মার প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া যাইয়া শয়ন করিল। মা অনাহারে অন্যগৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু মাতাকে কষ্ট দিয়া আসিয়া পুত্র শয়ন করিলে কি হইবে, কিছুতেই

তাহার নিদ্রা হইল না। এমতাবস্থায় সে দেখিতে পাইল যে তাহার স্ত্রী শিশুটী মূত্র ত্যাগ করাতে তাহাকে ভাল জায়গায় আনিয়া নিজে মূত্রের স্থানে যাইয়া শুইল। ইহাতে সে জিজ্ঞাসা করিল তুমি এরূপ করিলে কেন? তদুত্তরে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল যে, তাহা না হইলে খোকার পীড়া হইবে। এই কথা শুনিয়া তাহার চৈতন্যলাভ হইল এবং এই বলিয়া স্ত্রীকে শাসন করিতে লাগিল যে, আমার মাও তো আমার জন্য এরূপ করিয়াছেন। এমন মার বিরুদ্ধে তুমি আমার নিকট নানা কথা বল? আর আমি তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করি! আজ হইতে তোমাকে সাবধান করিতেছি, তুমি আর এমন মার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিবে না। এবং এখনই যাইয়া মার জন্য রন্ধন কর। মা যে খান নাই। এই বলিয়া নিজে যাইয়া মাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। মা ভাবিলেন না জানি আবার বউ কি বলিয়াছে, আর আমাকে মারিতে আসিয়াছে। কিন্তু যখন পুত্র তাঁহাকে বলিল, "মা, আর তোমার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিব না। আজ বেশ শিক্ষা পাইয়াছি। তোমার বউ তোমার জন্য রান্না করিতেছে। তুমি উঠ, মা আর আমি কখনও তোমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিব না।" মার এই কথার তাৎপর্য্য আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। যখন আমার বয়স হইল এবং বিবাহ করিলাম তখন মার এই গল্প স্মরণ করিয়া যে, হৃদয় যেমন ব্যথিত হইয়াছে এবং মাকে পুনরায় পাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমার মার মা-ই তাহা দেখিয়াছেন। মাতৃভাষায় মা যে শিক্ষা দেন তাহা যে হৃদয়পটে কিরূপ অঙ্কিত হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বার বৎসর বয়সের আরম্ভ পর্য্যন্ত আমি এমন মার বুকের ধনরূপে লালিত পালিত হইয়াছিলাম।

মার কত কথা মনে পড়ে তাহা লিখিতে গেলে প্রথম পরিচ্ছেদই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাই আর দুই চারিটী কথা বলিয়াই ইহা শেষ করিব। আমার বয়স প্রায় সাত আট হইলে আমি প্রথমতঃ টোলে পড়িতে আরম্ভ করি। এবং চাণক্যের শ্লোক ও সত্যনারায়ণ সেবার পুস্তক অনেকটা মুখস্থ করি। এ সময়ে পূর্ব্ব প্রথানুসারে লোকে আমাকে আমার নাম ও কার পুত্র এই প্রশ্ন করিলে আমি আমার নাম এবং মার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতাম এবং প্রশ্নকারী ও অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা তাহা শুনিয়া হাসিত কিন্তু আমি তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, মাগো আমি আমার মার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলে লোকে হাসে কেন? মাও আমার কথা শুনিয়া হাসিতেন। কিন্তু কিছুই বলিতেন না। বস্তুতঃ শৈশবে আমি মা বৈ কিছু জানিতাম না। আমার যে পিতা বলিয়া একজন ছিলেন সে বিষয়ে আমার একবারেই জ্ঞান ছিল না। আর একটী ব্যাপার এই হইত যে আমি যখন মাকে প্রাঙ্গণে কাজ করিতে দেখিতাম তখন আমি ঘরের উঁচু বারেন্দায় দাঁড়াইয়া মাকে "এই আমি পড়ি" বলিয়া ঝাঁপ দিলেই মা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতেন। একদিনও মা আমাকে এইরূপে পড়িয়া আঘাত পাইতে দেন নাই। আমি দেখিতাম মা যখনই আমাকে আমার কোনও দোষ ধরিয়া মারিতেন

তখনই তাহার পর তিনি আমাকে যাহা আমি ভালবাসিতাম তাহা খাইতে দিতেন। আমিও মা মারিবার সময় মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে কান্দিতে যাইয়া মাকেই জড়াইয়া ধরিতাম এবং মনে মনে ভাবিতাম যে, ইহার পরই তো আমার প্রিয় দুধের সর পাইব। এইরূপে একাদশ বৎসর কাল যে আমি মাকে কষ্ট দিয়াছি এবং মা আমাকে কত স্নেহভরে বুকে করিয়াছেন এবং খাইতে দিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত!

বাল্যকাল

যে কয়েকদিন টোলে ছিলাম তাহাতে কোনও শিক্ষালাভ না করিয়া বাস্তবিকই গুরুমহাশয়কে বারবার তামাক সাজিয়া দিতে হইত এবং তাঁহার একটি গাভী ছিল সেটীকে যাইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে বাঁধিয়া দিতে হইত। সংস্কৃত যে কি জিনিষ তাহার প্রথম অক্ষরও শিক্ষা হইল না। কিন্তু তখন পারশ্য ভাষা শিক্ষা করার প্রথা আমাদের অঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল এবং শ্রীযুক্ত উমাকান্ত মুন্সি নামে আমাদের গ্রামে একজন অনেককে পারশ্য ভাষা শিক্ষা দিতেন। মা আমাকে তাঁহার নিকট যাইয়া পারসি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অন্যান্যের সঙ্গে এইরূপে একদিকে যেমন পারসি শিখিতাম তদ্রূপ বাঙ্গালা লিখাপড়াও করিতাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে, অনেকে বাল্যকাল হইতে সুরাপান করিয়া এবং মন্দ সংসর্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইতে আরম্ভ করিত। কিন্তু আমাকে সকলেই এরূপ ভালবাসিত এবং ভাল মনে করিত যে, মন্দভাবাপন্নেরাও আমাকে একটুকু ভয় করিত। সুরাপান এরূপ প্রচলিত ছিল যে, তাহা মন্দ বলিয়া কেহ মনে করিত না সুতরাং আমারও তাহাতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদের প্রতি আমার এরূপ আস্থা ছিল যে, আমি আমার মাতার এক বৃদ্ধ খুল্লতাতের সঙ্গে ভৈরবীচক্রে যাইয়া দেখি ভদ্রলোক এবং এক ছোটলোক তাহাদের মধ্যে একটী অত্যন্ত কাল চণ্ডাল মেয়ে একত্র হইয়া সুরাপান ও আহার করিতেছে, তাহাতে আমি বড়ই বিরক্ত হই এবং ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়কে খুব মন্দ বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ভৈরবীচক্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে নাই এবং একথা অন্য কাহারও নিকট বলিবে না। ইহার পর যখন আমার কোন আত্মীয়ার নিকট জানিতে পারিলাম যে, আমার পিতৃদেব সুরাপানের বড় বিরোধী ছিলেন, তখন আমার মনে হইল কি এমন বাপের ছেলে হইয়া আমি কেন সুরাপানে যোগ দিব? এই হইতে তাহাতে আমার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ধূমপানের কুঅভ্যাসটি থাকিয়া যায়। বাল্যকালে গ্রামে বাস্তবিকই মন্দ সংসর্গে মন্দ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও আমার অন্তরে কখন কখন এমন ভাবের উদয় হইত যে, তাহা এখন স্মরণ করিয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

একবার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে কোন একটী অধিক বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিকালবেলায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে পর অধিক বয়স্ক সঙ্গী আমাকে একাকী রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। আমি হাঁটিতে কষ্টবোধ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় একেবারে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিবার উপক্রম হইল। আমার সাধ্য নাই দৌড়িয়া বাড়ীতে যাই। তাই আমার এই ভাব হইল যে, এখন একবার জানু পাতিয়া মা কালীকে ডাকি। এবং যেমন এই ভাব হইল অমনি জানু পাতিয়া মাঠের মধ্যে ব্যাকুল অন্তরে মা কালীকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিলাম "হয় তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাইবার শক্তি দেও, না হয় আমাকে মারিয়া ফেল।" এই প্রার্থনা করিতে না করিতেই আমার এরূপ সাহস হইল এবং এরূপ বল পাইলাম যে, সহজে দৌড়িয়া যাইয়া বাড়ীতে মার কাছে উপস্থিত হইলাম। মার কাছে গেলেই আরাম—আমার এই অবস্থা। আমাকে পাইলে মার সব দুঃখ দূর হইত।

মা আমার বড় ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মমত মধ্যাহ্নে পূজা করিতেন এবং প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতেন। পূজান্তে মার শ্রীমুখ চন্দন ফোটার শোভায় এত অধিক সুন্দর দেখাইত যে তাহাতে আমার মনে হইত পূজাতে মার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। পূজার কি মাহাত্ম্য! আমি বড়ই আনন্দের সহিত মার পূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করিতাম! মাকে দেখিতাম সংগৃহীত পুষ্পগুলির মধ্য হইতে পোকায় খাওয়া পুষ্পগুলি ফেলিয়া দিতেন। তাহা দেখিয়া ভাবিতাম, মা কেন এরূপ করেন কিন্তু তখন কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। মার সঙ্গে সঙ্গে আমি শিবরাত্রির উপবাস করিতাম কিন্তু মা আমাকে সায়ংকাল হইলেই খাইতে বাধ্য করিতেন। আমি কালীকে বড় ভয় এবং দুর্গাকে খুব ভক্তি করিতাম। কিন্তু এ অবস্থায়ও মা কালীকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে বলিয়া যখন আমাদের বাড়ীর যেদিকে কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল সেইদিকে মুখ ফিরাইতে বলিতেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতাম মা কালী কি অন্যদিকে নাই। তিনি তো সবদিকেই আছেন। তাহাতে মা কিছু বলিতেন না। দেবতার মধ্যে কালভৈরবকে বড় ভয় এবং গোপীনাথকে বড় ভক্তি করিতাম। একবার মার সঙ্গে ঝুলনের সময় ভোগবেতালে গোপীনাথের বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং মার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন গোপীনাথকে ঝুলাইবার রসি অন্য আর কেহ স্পর্শও করিতে পারে না কিন্তু যে একবার সেই রসি স্পর্শ করে সে পরিত্রাণ পায়। তাহাতে ঝুলন দেখিতে যাইয়া মনে ভাবিলাম যাহা হয় হইবে আমি একবার গোলমালের মধ্যে রসি ধরিয়া টান দিবই দিব। যে কথা সেই কার্য্য। অন্য কেহ তাহা দেখিল না। মাকে আমি তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। মা তাহাতে বড় ভীত হইলেন, না জানি ইহার ফল কি হয়! তিনি অবশ্যই আমার না জানি কোন পীড়া হয় তাহাই ভয় করিয়াছিলেন! এ যাত্রায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইয়া মার সঙ্গে প্রথম কালভৈরব মূর্ত্তি দর্শন করি। সেই হইতে আমার অন্তরে এই দেবতার প্রতি বড়

ভয়ের সঞ্চার হয়। মা তো আমাকে যারপরণাই ভালবাসিতেন; তথাপি মা আমাকে বাড়ীতে দিদি ঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া অনায়াসে গঙ্গাস্নানার্থ অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তখন এ অঞ্চল হইতে বরিশাল ও স্নন্দরবন হইয়া পশ্চিম দেশীয় বড় নৌকাতে যাত্রিকেরা গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কত কষ্ট, কত ভয়। কোথায় বা ছিল রেলের গাড়ী, কোথায় বা ছিল জাহাজ। জলে কুম্ভীরের এবং স্থলে ডাকাতের ভয়েই যাত্রিকদের প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত কিন্তু ধর্ম্মভাব তাহার উপর জয়লাভ করিত। তখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলেই একেবারে জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইতে হইত। এমন কি বাড়ী হইতে ঢাকায় আসিতেও লোকে এইভাবে বিদায় গ্রহণ করিত! ইংরেজ রাজশাসনাধীনে এদেশের কি অবস্থান্তর হইয়াছে তাহা এখনকার লোকেরা বুঝিতে পারে না।

আমি বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মার কাছে মনের আনন্দে দিন যাপন করিতেছিলাম। মা যে আমাকে কখনও ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন ইহা আমি স্বপ্নে কখনও ভাবি নাই। আমার মার সব ক্ষমতা আছে। আমি যা চাই তাই মা আমাকে দিতে পারেন। আমি এরূপ বিশ্বাসই করিতাম। বস্তুতঃ আমার মতে মার প্রতি যে শিশুর বিশ্বাস ইহাই ঈশ্বরে সহজ বিশ্বাসের অব্যর্থ প্রমাণ। "ঈশাও এইজন্যই শিশুর ন্যায় না হইলে স্বর্গে যাওয়া যায় না" বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যেমন পৃথিবীতে তদ্রূপ স্বর্গে শিশুরূপেই আসিতে এবং যাইতে হয়। অন্যরূপ সকলই অভিনয়ের বেশভূষা মাত্র। এই বাল্যকালেই আমার ক্ষুদ্রজীবনে এমন সকল ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছিলাম যে, যে বিষয়ে আমার আগ্রহাতিশয় হইত তাহাতেই আমাকে বিপদে পড়িয়া বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। ইহাতে আমার অন্তরে মানবাতীত এমন এক শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে আমি কোনও বিষয়ে আগ্রহাতিশয় উপস্থিত হইলে ভয় করিতাম না জানি কি বিপদে পড়ি। এই কারণে আমার অন্তর হইতে সকলপ্রকার উচ্চাভিলাষ অন্তর্হিত হইয়াছিল। যা হইবার হউক এই ভাবই বাল্যকাল হইতে আমার অন্তর্নিহিত ছিল।

এইরূপে আমার একাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে পরই বৈশাখ মাসে হঠাৎ আমার মার ওলাউঠা হয়। যেদিন প্রাতে মা এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত হন সেদিন আমি তাঁহার মুখের দিকে যখনই তাকাইতাম তখন তাঁহাকে বড় কাতর ও বিষণ্ণ দেখিতাম। সেদিন তিনি আমার জন্য মাংস পাক করিয়াছিলেন। আমি প্রাতঃকালের পাক করা মাংস রাত্রে খাইতে ভালবাসিতাম, কিন্তু মা সেদিন আমাকে যাহা পাক করিয়া দিলেন তাহার সমুদয়ই খাইতে দিলেন এবং আমি আপত্তি করাতে বলিলেন রাত্রে আবার তোমাকে কে খাইতে দিবে? আমি কিছুই বুঝিলাম না। মা আমাকে খাওয়াইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। পথে বার বার মল ত্যাগ হইয়াছিল। নদীতে ডুব দিয়া নাকি বলিয়াছিলেন আগামীকল্য যেন আমার দেহ এখানে আনীত হয়। মা আমার বাড়ীতে ফিরিয়া

আসিয়া একাদশীর দরুন এমন আহার করেন যে, তাহাতে রোগ বৃদ্ধি পায়। মা আহারান্তে অন্যান্য দিনের ন্যায় আমাকে বুকে করিয়া শয়ন করিলেন। মা জানিতেন আমাকে বুকে করিয়া শোয়ার এই শেষ দিন, কিন্তু আমি তাহা কিছুই ভাবিতে পারি নাই। যে মাকে ডাকিলে কেহ যদি ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, তোর মা নাই, তাহা আমি সহ্য করিতে না পারিয়া কান্দিয়া ফেলিতাম ; আর মা আমার কান্না শুনিয়া আসিয়া এই বলিয়া সামনে দাঁড়াইতেন "এই যে আমি", সেই মা আমার দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ইহা বুঝিতে পারিলে যে আমি কি করিতাম তাহা বলিতে পারি না। যখন শেষ বেলায় মা জাগিয়া আর চলিতে পারেন না ; বারেন্দায়ই তাঁহার দাস্ত হইল, তখনই দিদিঠাকুরাণী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মা আর আমাকে তাঁহার বুকে শুইতে দেন না। মার স্বর ক্রমেই এরূপ হইল যে, তাঁহার কথা আর বুঝা যায় না। সন্ধ্যা হইল, মা আর বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। কিভাবে যে রাত্রি কাটিয়া গেল তাহা এখন ভাবিতে পারা যায় না। আমার মাতুল বাড়ীতে ছিলেন না। আমার দিদিঠাকুরাণী মাকে লইয়া ব্যস্ত। আমি বালক। এ রোগ কখনও দেখি নাই। ইহার নামও শুনি নাই। চিকিৎসামাত্রই হইল না। মা যেন জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সারারাত্রি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমুদয় রাত্র এত টিকটিকির শব্দ হইয়াছিল, সে শব্দ যেন এখনও আমার কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে।

রাত্র শেষ হইবার উপক্রমে যাঁহারা আমার মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট মা আমাকে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। "আমার বঙ্গ রহিল, তাহাকে দেখিবেন" এই ছাড়া মার মুখে অন্য কথা ছিল না। মা কেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে দিলেন না ? না জানি আমার এই ভয়ানক রোগ হয় তাই। বাস্তবিকই মা মহামায়াই বটে !

এযাবৎ আমি মার স্তন্য পান করিতাম। মার দেহত্যাগ হইলে পর আমার যে কি অবস্থা হইল ! এখন মায়ের স্তন্য পানের পিপাসা এমন বলবতী হইল যে আমি মার বুকে পড়িয়া স্তন্য পান করিতে উদ্যত হইলাম ; ইহা দেখিয়া দুই-তিনজন আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন, কারণ আমার শরীরে বড়ই বলের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে শ্মশানঘাটে মার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে আমারও যাইতে হইল। তথায় যাইয়া যখন মার দেহে তৈল মাখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, দেখি কি ! কচুপাতার উপর জল পড়িলে যেমন ফোঁটা হইয়া পৃথক থাকে, তেমনি আমার মার দেহেতেও তৈল এক একটী ফোঁটা হইয়া পৃথকই রহিল। আমি মার মুখে নিজে অগ্নি দিতে পারিলাম না। মা আমার কোথায় গেলেন ইহা ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইল। এইরূপে আমার বাল্য জীবনাকাশের পূর্ণচন্দ্রমা—মা চন্দ্রকলা—কোথায় লুকাইলেন ! সংসার বস্তুতঃই আমার সম্বন্ধে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

আমার কাহাকেও মুখ দেখাইতে লজ্জা হইত এবং ইচ্ছাও হইত না। আমার মনে হইত, আমি যেন মাকে হারাইয়া মহাপাতকী হইয়াছি। মা কেন আমায় ছাড়িয়া গেলেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত "মা" এবং "বাড়ী" শব্দ কাহাকেও উচ্চারণ করিতে শুনিলে বুক ফাটিয়া যাইত। মা-ই যে আমার সর্ব্বস্ব ছিলেন।

কিরূপে মার শ্রাদ্ধটুকু ভালরূপে সম্পন্ন হইতে দেখিব ইহা ভাবিয়া আমি নির্জ্জনে ক্রন্দন করিতাম। এক মাস কাল নিষ্ঠার সহিত হবিষ্য করিয়া মার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মাতুল মহাশয় বাড়ীতে আসিলেন এবং শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মার স্বর্গারোহণের পর হইতে গ্রামস্থ সকলের বিশেষতঃ মেয়েদের অন্তরে যেন মার স্নেহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। মার অনুরোধ সকলেই রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি দীর্ঘকাল পরেও যখন আমি মাতুলালয়ে গিয়াছি, সকলেই আমাকে দেখিয়া যে কি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও আনন্দ বোধ হয়।

মার শ্রাদ্ধ এক রকম আমার মনমতই সম্পন্ন হইল দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। এইরূপে মার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় সুখের বাল্যখেলাও ফুরাইল। পদে পদে কেবলই আমার প্রতি মার অসীম স্নেহের ব্যবহার এবং তাঁহার প্রতি আমার সকল আবদার ও অত্যাচার স্মরণ হইয়া কেবল চক্ষের জলে ভাসিয়া যাওয়াই এখন আমার ভাগ্য হইল। এযে কি ব্যাপার ইহা যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে সেই অনুভব করিতে পারে।

এখন মাতৃবক্ষ চ্যুত হওয়ায় যাহাতে অন্যত্র যাইয়া আমার লিখাপড়া কিম্বা কাজকর্ম্ম শিখিবার উপায় হয়, তৎপ্রতি মাতুল মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে আমি আমার পিশ্‌তাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বাজিতপুর যাই। এই দাদা আমার পিতৃদেবের সঙ্গে তথায় থাকিয়া লিখাপড়া শিক্ষা করিয়া মুন্সেফি আদালতে এক কাজে নিযুক্ত হন। তিনি আগ্রহের সহিত আমাকে তাঁহার সঙ্গে করিয়া বাজিতপুর লইয়া যান। সেখানে যাইয়া দেখি ওখানকার অনেক লোকের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয়। সুরাপান ও ব্যভিচার অবাধে চলিতেছে। যা হোক্, কিছুদিন পর ইহা আমার মনে ততটা লাগিত না।

এক বৎসরান্তে মাতৃদেবীর বার্ষিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া দাদা বিশেষভাবে তাহার আয়োজন করিলেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে আর আনন্দ ধরে না। তথায় সমুদয় দ্রব্যাদি খুব সুলভ। ব্রাহ্মণভোজনের বেশ আয়োজন হইল। তথাপিও দাদা প্রথানুসারে গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে "অনুগ্রহ করিয়া এই জল চিড়া গ্রহণ করুন" বলিতে আমাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যখন বেশ আয়োজন হইয়াছে, তখন আমি কিরূপে বলিব যে জল চিড়া

গ্রহণ করুন ? তিনি তাহাতে আমার প্রতি বিরক্ত না হইয়া হাসিতে লাগিলেন ; এবং ব্রাহ্মণেরাও আমার প্রতি বেশ প্রসন্ন ভাবই প্রকাশ করিলেন। গলবস্ত্র হইয়া আমি তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন। আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এখানকার নৈতিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বস্তুতঃ সেই সময়ে কেহ সপরিবারে কার্য্যস্থলে থাকিতেন না বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে মুন্সেফ, বাবু নন্দকুমার বসু মহাশয়ের আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। বলিতে কি তিনি আমাকে পিতৃমাতৃহীন জানিয়া পিতার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমার দাদা এবং অন্যান্য সকলেই আমার প্রতি বিশেষ আদর প্রকাশ করিতেন। এইরূপে মুন্সেফি আদালতে এপ্রেন্টিসের কাজ কিছুকাল করিলাম।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আমি কিশোরগঞ্জ যাই। তথায় প্রায় দুই বৎসর থাকি। তথায় যাইয়াই পিতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয় যে একটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিছুদিন ইংরেজী শিক্ষা লাভের পরেই আমার পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস এবং জাতিভেদে আস্থা শিথিল হয়। তথায় যাইয়া কিছুদিন স্কুলে যাইবার সময় এবং স্কুল হইতে বাসায় ফিরিবার সময় রাস্তায় কালীকে নমস্কার করিতাম। এবং প্রত্যেক সাপ্তাহিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহা পরিহার করিলাম এবং একটী মোসলমান সমপাঠীর সঙ্গে তাহারা যে বিছানায় আহার করিত তাহাতেই বসিয়া পড়াশুনা করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিতাম না। এমতাবস্থায় ঢাকা হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সভ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সবুবে ডেপুটী কালেক্টর রূপে তথায় উপস্থিত হন। তাহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনি এবং নাম শুনিয়াই ইহাই ভাল ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি হয়। বিশেষতঃ যখন শুনিলাম যে তিনি তাঁহার আহারের জন্য কোনও প্রাণী বধ করিতে দিতে প্রস্তুত নন, তাহাতে যেমন তাঁহার প্রতি, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও মন স্বতঃ আকৃষ্ট হইল। তিনি বিদ্যালয়ে গেলে তাঁহাকে দেখিয়া সেইভাব আরও দৃঢ়ীভূত হইল। আমার ও অন্যান্য ছাত্রের চুল লম্বা ও হাতে বালা দেখিয়া তিনি আমাদের শিক্ষককে ইংরেজীতে একটুকু মন্দ বলিয়াছিলেন ; আমি তাঁহার ভাবভঙ্গিতে ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম। ইহাতে গুরুজনদের সন্দেহ উপস্থিত হইল ; কিন্তু আমার দাদা কখনও কিছু বলেন নাই। এবং কিছু বলিতে সাহসও পাইতেন না। আমার প্রতি মুন্সেফবাবুর ভালবাসাই ইহার প্রধান কারণ। এইরূপে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আমার মন পরিবর্ত্তিত হয়। এমন সময়ে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের গায়ক তথায় আসেন। তাঁহার নিকটে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া হৃদয় বড়ই মুগ্ধ হয়। মনে হয় এরূপ গান শুনিলেও কত উপকার। কিন্তু ইহাতেও চরিত্র গঠনের প্রতি তত দৃষ্টি পড়িল না। এমন কি কুসংসর্গে পড়িয়া কুপথগামী হইবার উপক্রম হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে এমন ভয়ানক রোগাক্রান্ত

হইলাম যে, তাহাতেই সেইবার ভয়ানক প্রলোভন হইতে বাঁচিয়া গেলাম। এস্থানেও চরিত্র দোষ লোকের মধ্যে এরূপ প্রবল ছিল যে, তাহাতে তৎপ্রতি হৃদয়ের ঘৃণা তত রহিল না। তাহাতেই বিশেষ অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে আমার স্বভাবতঃ এরূপ ভাব ছিল যে, একজনের সঙ্গেই এ প্রেম সম্ভব। তাহাতেই আমাকে যৌবনের প্রারম্ভে পাপাচারের পথে যাইতে দেয় নাই। অবশেষে আমাকে শিক্ষকের বাসায় থাকিতে হয়। তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে বাড়ীতেও পড়াশুনার সাহায্য করিতেন। তাহাতে আমার মনে হইত আমি বাড়ীতে মাষ্টার মহাশয় হইতে যে শিক্ষা লাভ করি, সমপাঠীদিগকে তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। সেই হইতে আমি স্কুলে যাইয়া শিক্ষক হইতে যাহা শিখিতাম তাহা সমপাঠীদিগকে বলিতাম। ইহাতে আমার মনে বড়ই আনন্দ হইত এবং অন্যকে বলিয়া নিজেরও বিশেষ উপকার হইত। মধ্যে মধ্যে তৈল অভাবে পাকঘরের চুল্লি নিক্ষিপ্ত কাঠের আলোতে পড়া শিখিতে হইত। এখানে পূজনীয় মুন্সেফ মহাশয়ের চেষ্টায় ফ্রিসিপ পাওয়াতে পড়ার বেশ সুবিধা হইয়াছিল; তাহা না হইলে আমার পড়া বন্ধ হইয়া যাইত। এই প্রকারে তিন-চারি বৎসর পড়া হইলে পর সেই স্কুলে যতদূর পড়াশুনা হইবার কথা ছিল তাহা সমাপ্ত হইল। এখন মনিটারের পদে নিযুক্ত হইয়া নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে পড়াইতে হইত।

কোন এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, তুমি যদি ঢাকায় যাইয়া পোগোজ সাহেবকে ধরিয়া পড় তাহা হইলে তাঁহার স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে। তিনিও একবার আমাদের স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং আমাদিগের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কিছুতেই ঢাকা যাইবার ইচ্ছা হইল না। যাহা হউক বিধাতার এমনই চক্র যে সেই সময়ে নানা জেলায় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হয়। এবং ময়মনসিংহ জিলায় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন আমাদের স্কুল দেখিতে আসেন, এবং আমাদের শিক্ষক তাঁহাকে আমার কথা বলিয়া, একটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। আমার বয়স তখন পনর কি ষোল বৎসর। তাহাতে তিনি বলেন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির নিয়মানুসারে বঙ্গের বয়স অধিক বলিয়া তাহাকে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টর রবিন্‌সন্ সাহেব সেই সময়ে ময়মনসিংহে উপস্থিত হন এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরবাবু তাঁহার দ্বারা আহুত হন এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে তিনি আমার কথা বলাতে তিনি বলেন এরূপ ছাত্রের জন্যই বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি প্রচলিত হইয়াছে। আরও বলিলেন, তুমি শীঘ্র যাইয়া তাহাকে এক বৃত্তি দিয়া জিলা স্কুলে ভর্ত্তি কর। তাহাতেই তিনি তাড়াতাড়ি পুনরায় আমাদের স্কুল দেখিতে যান এবং সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া আমাকে এবং জঙ্গলবাড়ী বাঙ্গালা স্কুলের শ্রীমান শ্যামাচরণ রায়কে বৃত্তি প্রদান করেন। আমরা দুইজনই ময়মনসিংহ জিলায় প্রথম এই বৃত্তি পাইয়া জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমি ময়মনসিংহে যাই। এইরূপে যেমন আমার যৌবনের আরম্ভ

তদ্রূপ বিশেষভাবে পড়াশুনার পথও পরিষ্কৃত হইল। যখন ময়মনসিংহে জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম, তখন তাঁহার ক্লার্ক আমাকে বলেন যে, কেহ যদি আপনি কিরূপে বৃত্তি পাইলেন জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিবেন যে, আমি নিয়মিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছি। আমি তদুত্তরে বলিলাম আমি তাহা বলিতে পারিব না, কারণ আমি তো বিশেষ কোন পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাই নাই। একথা ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর শুনিয়া বলিলেন তুমি কেন মিথ্যা কথা বলিবে? যেরূপে বৃত্তি পাইয়াছ তাহাই বলিবে। তাহাতে আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে কিশোরগঞ্জ স্কুল হইতে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সুবিধা হওয়াতেই আমার আরও পড়াশুনার সুযোগ হইল। কিন্তু ময়মনসিংহে কোথায় থাকিব, কিরূপে চারি টাকার বৃত্তি দ্বারা সমুদায় খরচ চলিবে? ইহাই চিন্তার বিষয় হইল। কি আশ্চর্য্য! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কালেক্টরির সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সেন মহাশয় আমাকে একখানা অনুরোধ পত্র দেন, এবং তাহাতেই সেরেস্তাদার মহাশয়ের আশ্রয়ে স্থান পাই। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় আমাকে পরীক্ষা করিয়া জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু সন্তুষ্ট হন। ইংরেজীতে উত্তর দান করাই তাঁহার সন্তোষের কারণ। এইরূপে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া জিলা স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করি। জিলা স্কুলে উপস্থিত হইয়াই আমাদের এবং জিলা স্কুলের ছাত্রদের ভাবভঙ্গির বিভিন্নতা দর্শনে City and Country Mouse (সহর এবং গ্রাম্য ইন্দুরের) গল্পটী মনে পড়িয়াছিল। যাই আমি চটি জুতা পায়ে শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম অমনি ক্লাশের ছাত্রদের কেহ আমাকে প্রশ্ন করিল, "কবিরাজ মহাশয়ের কবে আসা হয়েছে?" ইহাতে সকলেই হাসিতে লাগিল। তখন ক্লাশে মাষ্টার আসেন নাই। এজন্য কিছুদিন কিশোরগঞ্জ স্কুলের নিমিত্ত মনে বড় কষ্টানুভব করিতে হইয়াছিল।

যৌবনকাল

ময়মনসিংহে কিছুদিন অবস্থিতির পরই স্কুলের ছাত্রদের অবস্থা যে কি প্রকার শোচনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, এবং মনের মধ্যে স্বতঃই অল্পবয়স্ক ছাত্রসমূহের কিরূপে কল্যাণ হইতে পারে সেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। আমার মনের ভাব, আমার একটী শান্ত স্বভাব সমপাঠীর নিকট ব্যক্ত করাতে তিনি তাহাতে সায় দিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে এই পরামর্শ স্থির হয় যে, প্রতি শনিবার বৈকালে নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করে তাহাদিগকে পড়া বুঝাইয়া দিব। ইহা প্রকাশিত হওয়ার পরই কয়েকটী অল্পবয়স্ক ছাত্র স্কুলগৃহে অপরাহ্ণ এক ঘটিকার পরে স্কুল ছুটী হইলে

সমবেত হয়। তখন আমি আমার সমপাঠীসহ পড়া বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করি। এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কার্য্য চলে; তৎপর আমি প্রস্তাব করি যে পড়া বুঝান হইলে ভাল ভাল পুস্তক হইতে এমন বিষয় পাঠ করা যাইবে, যাহাতে আমাদের চরিত্র ভাল হইতে পারে। তাহাতে সকলেই সম্মত হয়। এইরূপে কিছুকাল কার্য্য চলিলে পর আমার প্রস্তাবে শনিবারের সভাতে কেবল ভাল পুস্তক পড়াশুনা হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। এই সভাকে "মনোরঞ্জিনী সভা" নাম দেওয়া হইল। একদিকে যেমন উর্দ্ধ শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলাম অপরদিকে তদ্রূপ "মনোরঞ্জিনী সভার" সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক ছাত্র এই সভার সভ্য হইল। এইরূপে যৌবনে আমার চরিত্র গঠনের পথ খুলিয়া গেল। চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে পড়াশুনাও তদুপযোগী হইতে লাগিল। অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যে সকল ভাল ভাল বিষয় পড়া হইত তাহার মর্ম্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত। তখনকার ইংরেজী ও বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তক (পদ্য ও গদ্য) মহাত্মা বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও মনোনীত হয়। তিনি ছাত্রদের এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, সেইজন্য ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ পুস্তকগুলি মনোনীত করিয়া দিতেন। তাঁহা দ্বারা সংগৃহীত ইংরেজী পদ্য, গদ্য, Readers এবং বাঙ্গলা চারুপাঠ ও ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি সমুদয় পুস্তকই যেমন বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত তদ্রূপ সদুপদেশ এমনকি ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ ছিল। তৎসমুদয় পাঠ করিয়া যে চরিত্র গঠনের কিরূপ সাহায্য হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। তাহাতে সুনীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের ভাবও অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে এবং আমার এরূপ যত্ন হয় যে, "মনোরঞ্জিনী সভার" সভ্যেরাও যেন ক্রমে সমুন্নত চরিত্র হয়। এখন সভাতে গদ্যে ও পদ্যে রচনা পাঠ করার ব্যবস্থা হইল। তাহাতে সভ্যদের মধ্যে বড়ই উৎসাহানল প্রজ্জলিত হইল। কিন্তু যখন সভাতে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হইল যাহার যে চরিত্রদোষ আছে, তাহার তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু তখনই অধিক বয়স্ক সভ্যদের মধ্যে গোল উপস্থিত হইল। এমন কি তাঁহাদের কেহ কেহ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে আমার চরিত্র দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে তাঁহারা একটী বিরোধী সভা সংস্থাপন করেন। জোর করিয়া ছোট বালকদিগকে আমাদের সভা ছাড়িয়া যাহাতে তাঁহাদের সভার সভ্য হয় সেই চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের সভার প্রতি শিক্ষকগণের এরূপ শ্রদ্ধা জন্মে যে, কোনও ছাত্র ক্লাশে অন্যায়াচরণ করিলে অমনি তাহাকে "তুমি কোন্ সভার সভ্য?" প্রশ্ন করিতেন। এবং ভয় দেখাইতেন যে, তোমার অন্যায়াচরণের কথা মনোরঞ্জিনী সভার সম্পাদককে জানান হইবে। আমরা কেহ কেহ যাইয়া মধ্যে মধ্যে বিরোধী সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনাতে যোগ দিতাম। মনোরঞ্জিনী সভার দ্বারা চরিত্র গঠনে আমার যে কি সাহায্য হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ইহাতে যে সকল নৈতিক নিয়মাবলি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ই চরিত্র

গঠনোপযোগী। কুৎসিত নৃত্য দর্শন, অশ্লীল গান শ্রবণ ও অঙ্গীকার না করা, তামাক না খাওয়া, যে বিষয়ে মনে সন্দেহ থাকে, তৎসম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিতে হইলে "বোধ হয়" বলা, জীবহিংসা না করা ইত্যাদি নিয়মাবলির অন্তর্গত ছিল, বলিয়া আমার পক্ষে বড়ই উপকার হইয়াছিল। এ সমুদয় দ্বারা অন্তর কিরূপ খারাপ এবং জীবনে কিরূপ দুর্গতির সম্ভাবনা হয় তাহা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, কিন্তু যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকদের মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ হইতে পারে তৎপ্রতিও বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই অভিপ্রায়ে যাত্রাগান শ্রবণ এবং Phant as magoria প্রভৃতি তামাসা দর্শনার্থ আমরা সদলে যাইতাম। এ সময়ে আমার এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে বাহিরের নিয়মানুসরণ করিলে চরিত্রের বহির্ভাগ ভাল দেখায় বটে কিন্তু চিত্ত তাহাতে বিশুদ্ধ হয় না এবং চরিত্রের অন্তর্ভাগ পূর্ব্ববৎই থাকে। তাহাতে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইল। কি আশ্চর্য্য এই অবস্থাতেই ঘটনাক্রমে "Young Bengal—This is for. you" প্রবন্ধটী আমার হস্তগত হয়। তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। তবু সাহসপূর্ব্বক মনোরঞ্জিনী সভাতে প্রথম শিক্ষক হইতে সমুদয় শিক্ষক মহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে সেই প্রবন্ধটী পাঠ করি। তাহাতে আমার অন্তরদৃষ্টি আরও খুলিয়া যায় এবং অন্তরটী শুদ্ধ না হইলে প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র হওয়া যায় না, ইহা খুব হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহাতে স্বতঃই আমার মনে হয় যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে এক একটী স্তোত্র পাঠ করিয়া মনোরঞ্জিনী সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইবে এবং ধর্ম্মভাব প্রণোদিত অন্তরে নৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ইহাতে এরূপ সুফল ফলিল যে, আমাদের মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচলিত হইতে চলিল এবং আমাদের কাহারও কাহারও অন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে আমাদের হেড্‌মাষ্টার ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় আপন বাসায় রবিবার প্রাতঃকালে কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধুসহ ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিতেন, আমি আর একটী যুবক বন্ধুসহ তাহা শুনিতে যাইতাম। একদিন এমন হইল যে, বাসায় সেই সময়ে সেরেস্তাদার মহাশয় আমাকে ডাকিলেন, এবং আমার জন্য অন্যত্র লোক পাঠাইয়া দিলেন। বাসায় আমার বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোক ছিল, তাহারা মনে করিল আজ দেখা যাইবে বঙ্ক কি বলে। মিথ্যা না বলিলে তাহার আর রক্ষা নাই। এমন সময় আমি বাসায় ফিরিয়া যাইয়াই জানিতে পারিলাম যে, কর্ত্তা আমাকে ডাকিয়াছিলেন। আমি যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি কিছু না ভাবিয়া বলিলাম, ব্রাহ্মসমাজে আমাদের হেড্‌মাষ্টার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন তাহা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া কেবল কালী নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে বলিলেন যাও। ইহাতে সকলে একেবারে বিস্মিত হইল। পূজনীয় মুন্সি রামকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ধর্ম্মভাব বড় সরল ছিল। তাহাতে তিনি অন্যের ধর্ম্মভাবকে আদর করিতেন। এইরূপে আমি সেরেস্তাদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ

সেন এবং তাঁহার পত্নীর বড়ই স্নেহের পাত্র হইয়া পড়ি। তাহাতে আমি পিতৃমাতৃহীন হইয়াও পুনরায় পিতৃমাতৃ স্নেহানুভব করিবার সুযোগ পাই। এইরূপে মনের আনন্দে যুবক ও বালক বন্ধুগণসহ দিনযাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু পরীক্ষা ভিন্ন কি কখনও উন্নতির পথে চলিবার সম্ভাবনা আছে? এখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের হেড্‌মাষ্টার, বাবু উমাচরণ দাস; একদিন তাঁহার নিকট আমার বিরুদ্ধে এক বেনামী চিঠি প্রেরিত হয়। তাহাতে লিখা থাকে যে, মনোরঞ্জিনী সভাতে আপনার প্রিয় ছাত্র বঙ্গচন্দ্র আপনার চরিত্রের বিরুদ্ধে সভ্যদিগকে উপদেশচ্ছলে অনেক কথা বলিয়া থাকে। যখন এই পত্র তাঁহার হস্তগত হয়, তখন শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেই পত্র গোপীবাবু মহাশয়কে দেখাইতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে তিনি বলেন যে, আমি এরূপ কথা গ্রাহ্য করি না। তাহাতে গোপীবাবু নিশ্চিন্ত হন এবং আমাকে তাহা তখন জানান প্রয়োজন বোধ করেন না। ঘটনাক্রমে তার পরদিনই স্কুলে হেড্‌মাষ্টার আমার প্রতি সামান্য কারণে এরূপ বিরক্ত হন যে, আমাকে খুব তিরস্কার করেন। তাহাতে আমি এরূপ আঘাত পাই যে, বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিবার সময় এরকম কাঁদিতেছিলাম যে, যে দেখে সেই জিজ্ঞাসা করে, এরূপ কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে কিছুই বলিতে পারি নাই, অথচ বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে থাকে! এমন কি মনে হইতেছিল যে, এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা শ্রেয় কিন্তু অমনি মনে হইল, আমার তো দোষ নাই, তবে কেন আমি এরূপ ভাবি! ইহাতে আমার কথঞ্চিত সান্ত্বনা হয় এবং বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া রহিলাম। ইত্যবসরে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া আমার মুখ ভার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভাব এরূপ দেখি কেন? তদুত্তরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলাতে তিনি আমাকে ঐ পত্রের কথা জানাইলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন আমি জানিতাম না আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যে কত আরও মিথ্যাপবাদ উপস্থিত হইবে। এরূপ পরীক্ষায় আমার নিরুৎসাহ হইল না। মনোরঞ্জিনী সভার কার্য্যে সমধিক উৎসাহের সহিত লিপ্ত হইলাম। কারণ আমরা কয়েকজন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেও যাহাতে সভার কার্য্য চলিতে পারে তাহার উপায় করিবার জন্য এখন মন বড়ই ব্যাকুল হইল। এই সভা দ্বারা আমার এবং অন্যের কেবল চরিত্র গঠনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা নহে, পরস্পরের সাহায্যে পড়াশুনারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যিনি যে বিষয় ভাল জানিতেন তাঁহাকে সে বিষয়ে সভার নিয়মানুসারে অন্যের সাহায্য করিতে হইত। প্রীতিভাজন ভ্রাতা আনন্দমোহনও এই সভার সভ্য ছিলেন। এইরূপে আরও অনেক ভ্রাতা এ সভার সভ্য হইয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছিলেন। ক্রমে আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। সেবার আমরা ১০ জন পরীক্ষা দেই এবং সকলেই উত্তীর্ণ হই। পরীক্ষা দিতে যাইবার পূর্ব্বে হেড্‌মাষ্টার আমার প্রতি অন্তরে অসন্তুষ্ট থাকার দরুন আমি অঙ্ক ভাল জানি

না বলিয়া একটুকু আপত্তি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাচরণবাবু আমাদের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। যখন হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়ার সম্বন্ধে ঐ কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত জানিতে চাহিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন, যদি কেহ অঙ্কে পাশ হয় তবে বঙ্গ অবশ্যই পাশ হইবে। বস্তুতঃ ঘটনাক্রমে এই হইল যে, আমিই আমাদের স্কুলে অঙ্কে প্রথম হইলাম। আমা অপেক্ষা অনেকেই অঙ্কে ভাল ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আমি প্রথম হওয়ার কারণ এই যে, তাঁহারা অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা কসিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহারা কম নম্বর পাইলেন। ইহা জানার পর দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় প্রথম শিক্ষককে বলিলেন দেখুন, বঙ্গই অঙ্কে প্রথম হইয়াছে এবং যাহারা অঙ্ক জানি বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছে, তাহারাই কম নম্বর পাইয়াছে। আমার কিন্তু ইহাতে আনন্দ হইল না। সাহিত্যে যেরূপ নম্বর পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়াতে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময়ে আমাদের মধ্যে কে কোন্ স্থান লাভ করিব তৎসম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলেই আমি বলিতাম আমি আমার স্থান লাভ করিতে পারিলেই হয়। আমি অন্যের স্থান লাভ করিতে চাই না। ফলে সাহিত্যে আমি আমার স্থান লাভ না করিয়া অঙ্কে উচ্চ স্থান পাইয়া আমাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। বৃত্তি না পাওয়াতে আরও অধিক ক্ষুব্ধ হইলাম। কারণ আর যে পড়াশুনা চলিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। যাহা হউক শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহাশয়ের স্নেহের দরুন আমাকে তত চিন্তিত হইতে হইল না। এমন কি মনোরঞ্জিনী সভার সভ্যেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেও প্রস্তুত হইলেন। মনোরঞ্জিনী সভার সভ্যদের মধ্যে যে কি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমি ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা যাইবার প্রাক্‌কালে "বিদায় গ্রহণ" বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমারও যেমন অশ্রুজলে বুক ভাসিতে লাগিল তেমনি অন্যেরাও অনেকেই ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সভাতে মহাক্রন্দনের রোল উঠিল। সে যে কি দৃশ্য! তাহা এখনও চক্ষের উপরে ভাসে। ইহার পর যে দিন প্রাতঃকালে আমাদের যাত্রার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহাশয়ের বৈঠকখানায় বহুসংখ্যক সভ্যসহ সদালাপে এবং যাহাতে সভা আমাদের অনুপস্থিতিতেও স্থায়ী হয়, এবং অন্য নানা আক্ষেপের কথাতে শেষ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যখন নদীতটে যাওয়া গেল এই গানটী "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে রজনী বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে তারা দশ দিকে ধায়" গাহিতে গাহিতে আমরা কয়েকজন সজল নেত্রে নৌকারোহণ করিলাম। এবং বহুসংখ্যক ভ্রাতা তাহার মধ্যে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবুও ছিলেন, অশ্রুপূর্ণ লোচনে নৌকাপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া নদীতটে দণ্ডায়মান রহিলেন। নৌকা তাঁহাদের চক্ষের অগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা নদীর পারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমরাও যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখা যায় ততক্ষণ নৌকায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইহা কি অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেমের সামান্য দৃষ্টান্ত!

২

বস্তুতঃই আমি যে, কেবল অল্প বয়সে পিতৃমাতৃ হারাইয়াছিলাম তাহা নহে। জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ভাই ছিল না বলিয়াও বড়ই দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু বাল্যকালে খেলার সাথীদল, কিশোরগঞ্জ স্কুলে সমপাঠী দল এবং ময়মনসিংহে মনোরঞ্জিনী সভার প্রিয় দর্শন সভ্যাগণসহ মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃপ্রেমস্রোতে ভাসিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? ইহাতে সোপান পরম্পরায় আমার চরিত্রগঠনের যে কিরূপ উপায় হইল তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপে ময়মনসিংহ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগর ঢাকায় উপস্থিত হইলাম, এবং বেশ বুঝিতে লাগিলাম যে, এখানে কোথায় কাহার আশ্রয়ে কিরূপ সংসর্গে থাকিব কিছুই স্থির নাই। আমার আর একটী হিতৈষী শ্রীহট্ট নিবাসী মুন্সেফ বাবু বৈষ্ণবচরণ দাস মহাশয় আমাকে ঢাকায় আসিবার সময় বিখ্যাত ধনী মধুবাবুর নিকট এক অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইলে তোমার কোনও অভাবে পড়িতে হইবে না। কিন্তু মধুবাবু মহাশয়ের নিকট সেই পত্র দিতে না দিতেই তিনি বলিলেন যে, তোমার পক্ষে আমার আশ্রয়ে থাকার সুবিধা হইবে না। তাহাতে কিরূপ ক্ষুব্ধ হইলাম তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পরে এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, তাঁহার আশ্রয়ে স্থান পাইলে যে আমার কিরূপ সংসর্গে পড়িতে হইত এবং তাহাতে যে আমার ভাগ্যে কি ঘটিত তাহা তখন আমি কিছুই ভাবিতে পারি নাই। এইরূপে আমার ক্ষুদ্র জীবনের কত দুর্ঘটনাও যে, পরে কিরূপ মঙ্গলজনক হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! এ সময়ে পূজনীয় ফেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মুন্সি মহাশয়ের এই ইচ্ছা হইল যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ঢাকায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন এবং আমি তাঁহার সঙ্গে থাকি। তাহাতেই প্রথমতঃ সহজে আমার ঢাকায় থাকার সুবিধা হইল।

এখন আমি কলেজে ভর্তি হইলাম। অঙ্কশাস্ত্রে বিশারদ ব্রেনেণ্ড সাহেব প্রিন্সিপেল, সাহিত্যে পণ্ডিত বেনোট সাহেব সাহিত্যের অধ্যাপক, সমপাঠীগণ নানা বিষয়ে সমুন্নত। এমন শিক্ষকদ্বয়ের আশ্রয়ে এবং এরূপ সহাধ্যায়ীগণের সঙ্গে কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়া মনের অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। দেখি কি অগ্রে অঙ্কশাস্ত্রকে যেরূপ মনে করিতাম তাহা তদ্রূপ নহে, এবং ইংরেজী সাহিত্য স্বদেশীয় শিক্ষকের নিকট পড়িয়া তাহাতে প্রবেশমাত্রও হয় নাই। উভয় অঙ্কশাস্ত্র এবং সাহিত্য যে আমাদের মনের কিরূপ উন্নতি এবং বিকাশ সাধনোপযোগী তাহা সাহেব শিক্ষকদের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিয়াই হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু ইতিপূর্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিউটিনির পর যখন ঢাকা আসিয়াছিলাম তখন আমার অগ্রগামী বন্ধু শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন আমাকে যে গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হয় তাহা দেখাইয়া উপাসনাতে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন আমার সেই অনুরোধ রক্ষার সময় উপস্থিত। আমি যেন একদিকে কলেজে পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম অপরদিকে সমাজে ব্রহ্মোপাসনায় উপস্থিত থাকিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাতে যে সকল ছাত্র সঙ্গে একবাসায় থাকিতাম তাঁহারা আমার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষায় না পড়িয়া কি কোনরূপ উন্নতি সাধনের পথ আছে? তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আমি সমাজ হইতে ফিরিয়া গেলে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিতে চাহিত না এবং যাহাতে আমার কষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করিত, কিন্তু সকলে আমাকে অন্তরে অন্তরে ভয় করিত এবং তাঁহাদের মধ্যে আমার সমবয়স্ক একটী শান্ত স্বভাব ছাত্র ছিলেন। এ সময়ে আমাদিগকে পালাক্রমে কাজ করিতে হইত। আমার পাক করিবার সময় মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস পড়িয়া অশ্রুপাত করিতে হইত। এইরূপে কিছুদিন মাত্র এই সংসর্গে ছিলাম। তাহার পর এমন সংসর্গ লাভ করিয়াছিলাম যে অগ্রণীগণও বড় সচ্চরিত্র তাহারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। এবং নিয়মিত মত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের সংসর্গে কেবল এই সুবিধা হইল তাহা নহে। তাঁহারা আমার সমপাঠী এবং ধনী সন্তান বলিয়া গ্রন্থাদি ক্রয় করিতে সক্ষম ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও নেওয়া হইত। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে মনের আনন্দে ভাল ভাল পুস্তক এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া অন্তরের ধর্ম্মভাব চরিতার্থ করিতে সুযোগ পাইতাম। এ বিষয়ে Blair's Sermons পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষান্তরে কলেজে সাহিত্যে মিল্টনাদি পড়াতে ধর্ম্মভাব বিকাশের বিশেষ উপায় হইল। Mirage of life গ্রন্থে নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র জীবনীতে যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি পাঠ করিয়া যে কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাহার পর যখন পূজনীয় ব্রেনেণ্ড সাহেব Mental and Moral Philosophy পড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন নিজের মানসিক এবং নৈতিক চিন্তা ও ভাবের বিকৃতির প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল যে, আমি প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববোধিনী হইতে একটী স্তোত্র পাঠ করিয়া পড়াশুনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। যখন ভোর সময়ে স্তোত্র পাঠ করিতাম তখন অন্তরের এরূপ অবস্থা হইত যে, চতুর্দ্দিক পবিত্র বোধ হইত এবং কাকের ডাকও বড়ই ভাল লাগিত। ক্রমে স্তোত্র পাঠের সময়ে যেন অন্তর বাহির এক স্বতন্ত্র সত্তাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। যেন আমি এক অতীন্দ্রিয় অবস্থাতে অবস্থিত। ইহাতে যে আমার মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের ভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হইল তাহা না বলিলেও পাঠকের সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবার কথা। এরূপ অবস্থাতে আমাকে বাধ্য হইয়া অন্য সংসর্গে যাইতে হইল। এখন পোগোজ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয়ের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলাম। অর্থাভাবই এসকল পরিবর্ত্তনের বাহ্য কারণ। ইতিপূর্বে সমপাঠীদের সঙ্গে অল্পবয়স্ক বালককে ভাইরূপে পাইয়া বড়ই সুখে দিন যাপন করিতেছিলাম। এখন একজনকে অভিভাবকরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার পরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ইহাতে বিশেষ অবস্থান্তর হইল। দীনবাবু একজন চিন্তাশীল কর্ম্মঠ লোক, চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠে তাঁহার খুব রুচি। তিনি কেবল হেড্‌মাষ্টার নন, তিনি ব্রাহ্মসমাজেরও সম্পাদক।

কিন্তু বড় সরল ও উদার চরিত্র। জীবনের কার্য্যে খুব উৎসাহ ও উদ্যম, স্বভাব বিনম্র। কিন্তু নিজে যাহা ভাল বোঝেন তৎসম্বন্ধে গোঁড়া। কাহারও কথায় টলিবার লোক নহেন। তাঁহার মনটা যেমন দৃঢ়, হৃদয়টা তদ্রূপ কোমল ছিল না। তাহাতে তাঁহার সাধারণ ধর্ম্মমতের যেরূপ বিশুদ্ধতা এবং সমাজ সংস্কারে যেরূপ স্পৃহা ছিল, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভাব তদ্রূপ দৃঢ় ও সরল ছিল না। তিনিই প্রথমতঃ পার্কার, নিউমেন, মিস্ কব প্রভৃতির গ্রন্থাবলী ক্রয়পূর্ব্বক পাঠ করেন। তিনি উপাসনাশীলতার অভাব বোধ করিতেন। তাহাতে আমাকে কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে সায়ংকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত দৈনিক উপাসনাপদ্ধতি পুস্তক হইতে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন পাঠ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইলেও আমি দেখিলাম সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আত্মনিবেদনটী আমার পক্ষে বড় উপযোগী। তাহা যেন ঠিক আমারই আত্মনিবেদন। তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু স্বতঃ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব তৎপ্রতি বড় মনোযোগ। ইহার মধ্যে এমন হইল যে, যাঁহারা আমার কলেজ ফি দিতেন তাঁহাদিগ হইতে নিয়মিত আর তাহা পাই না। এই বিপাকে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ করিতে লাগিলাম। তাহা বুঝিয়া দীনবাবু বলিলেন আমরা যে একটী Poor Boy's Fund স্থাপন করিয়াছি। বেলেট্ সাহেব হইতে অনুরোধ পত্র আনিতে পারিলে, তাহা হইতে সাহায্য পাইতে পার। বেলেট্ সাহেবের আমার প্রতি এরূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল যে, তাঁহার নিকট চাহিবামাত্র "This must be helped by all means" মন্তব্যসহ আমাকে এক অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলেন। কেবল তাহা নহে, তিনি আমার পূর্ব্বে পোগোজ স্কুলে দীনবাবুর নিকট যাইয়া অনুরোধ করিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধপত্র সহ উপস্থিত হইতে না হইতেই দীনবাবু আমাকে তাহা বলিলেন। ইহাতে বেলেট্ সাহেবের প্রতি আমার হৃদয়ে কিরূপ কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপে অনায়াসে Poor Boy's Fund হইতে সাহায্য পাইয়া নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে পোগোজ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হওয়াতে বেলেট্ সাহেব আমাকে বলিলেন যে, তুমি যদি এই কাজ চাও, আমি পোগোজ সাহেবকে অনুরোধ করিতে পারি। আমি তাহাতে সম্মত হই। ইহা ব্রেনেণ্ড সাহেব শুনিতে পাইয়া এইরূপে পরীক্ষার পূর্ব্বে আমাকে কাজ আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না বলিয়া বেলেট সাহেবকে অনুরোধ পত্র দিতে নিষেধ করেন। তিনি অনুরোধ করিলে নিশ্চয়ই আমার সেই কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এ সময়ে লালবিহারী দের সঙ্গে কলিকাতায় কেশববাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ হইতেছিল। ব্রেনেণ্ড সাহেব তাহা পাঠ করিয়া ক্লাসে Philosophy পড়াইবার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করিতেন। তাহা আমার মনে বড় লাগিত। লালবিহারী দের কোন কোন মন্তব্যও আমার মনে বিশেষ চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি যে, কেবল মানবের সহজ

জ্ঞান নহে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশই যে ইহার প্রকৃত ভিত্তি, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে ব্রেনেণ্ড সাহেবের উপাসনার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন আমি আমার বন্ধুবর হরমোহন বাবুসহ Baptist Church-এ কখন কখন যাইতাম। তথায় ব্রেনেণ্ড সাহেবকে উপাসনাতে বিনীতভাবে নিযুক্ত দেখিয়া বিশেষ শিক্ষালাভ করিতাম। একদিকে বিদ্যাভিমানী হইয়া ব্রহ্মোপাসনাতে কতজনকে যোগদান করিতে বিরত দেখি, আর অপরদিকে বিজ্ঞানবিশারদ ব্রেনেণ্ড সাহেবকে বিনম্রভাবে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপাসনাতে যোগ দিতে দেখিয়া বিস্মিত হই। একদিন উপদেষ্টা উপদেশে মানসিক শক্তি অপেক্ষা নৈতিক এবং আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। দেখিলাম তাহাতে ব্রেনেণ্ড সাহেব একটুকুও বিচলিত হইলেন না। উপদেষ্টা অপেক্ষা অন্য বিষয়ে না হউক বিজ্ঞানে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। তবু ব্রেনেণ্ড সাহেব বিনীতভাবে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিলেন। ইহা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল কবে আমাদের দেশীয় বিদ্বানদের এরূপ অবস্থা হইবে ?

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দীনবাবুর সমাজসংস্কার স্পৃহা প্রবল ছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ রায় তাঁহার সহযোগী ছিলেন। তাঁহারা তিন জন পর্য্যায়ক্রমে রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারা শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু মিত্র মহাশয়ের মাতা ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন বলিয়া তাহা হইল না। তাহাতে উদ্‌যোক্তাদের মনোভঙ্গ এবং মিত্র মহাশয়ের প্রতি বিরক্তি উপস্থিত হয়। এইরূপে তাঁহারা বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। ইঁহারা কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত থাকিতেও ক্ষান্ত হন। তাহা দেখিয়া আমরা কয়েকজন ক্ষুব্ধ হই এবং ঢাকাপ্রকাশে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক প্রেরিত পত্র পাঠাই। তাহা প্রকাশিত হইলে দীনবাবুর মনে হয় সেই পত্রের সঙ্গে আমার সংশ্রব আছে। তাই তিনি তাঁহার নিকট বসিয়া আমাকে সেই পত্র পাঠ করিতে বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন এরূপ পত্র লিখা কি ঠিক হইয়াছে? তাহাতে আমি নিরুত্তর থাকি। কেবলমাত্র এই বলি যে কষ্টবোধ করিয়াই পত্রপ্রেরক এরূপ লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ নরমেল স্কুলের কোন এক ছাত্র সেই পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সায় দিয়াছিলাম। এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বড়ই খারাপ। আমার পড়াশুনা শেষ হইবার উপক্রম। কিন্তু আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ক্রমেই প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছিল। বন্ধের সময় বাড়ী যাইয়া কোন একটী অল্প বয়স্ক ভ্রাতার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পড়িতাম এবং সেই ভ্রাতা তাহা শুনিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি ব্রাহ্মসমাজে কেন যাওনা? তদুত্তরে তিনি বলেন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যান তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোক খুব কম দেখিতে পাই। আমি তাহাতে তাঁহাকে বলিলাম অন্যেরা মন্দ বলিয়া কি তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাইবে না? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কাহাকেও মন্দ হইতে বলে? এরূপ

দোষ ধরিয়া যাহা ভাল তাহা কেন গ্রহণ করিবে না? এরূপ কথোপকথনে উভয়েরই উপকার হইল। এমতাবস্থায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে কলেজ ছাড়িতে হয়। এইরূপে আমার পাঠ্যাবস্থার শেষ হয়। ইতিপূর্ব্বেই শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দরবাবু দীনবাবুর নিকট প্রস্তাব করেন যে, যুবক ছাত্রদের যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইতে পারে তন্নিমিত্ত একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহার প্রধান শিক্ষকরূপে একটী ধর্ম্মপরায়ণ সুশিক্ষিত লোক নিযুক্ত করা চাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজেও আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন। ব্রজসুন্দরবাবুর ইচ্ছানুসারে এমন একটী লোক পাঠাইবার জন্য কেশববাবুর নিকট পত্র লিখা হয়। এইরূপে ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হইবার উপায় হয়। এ যাবৎ যেরূপ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিতেছিল তাহা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক। পুস্তক পাঠ করিয়া উপাসনা ও উপদেশ হইত। রাত্র ৯ ঘটিকার সময় "অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিলা" ইত্যাদি গান হইত। "আজ কি আনন্দের দিন, আজ আমাদের বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক" এরূপ উপদেশ পঠিত হইত। যিনি উপাসনার কার্য করিতেন তিনি নিজে নিয়মিত উপাসনা করিতেন না। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইল। ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের জন্য শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় মাসিক ৩০৲ টাকার চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার আরমানিটোলাস্থ বাড়ীতে স্কুল খুলিতে বলিলেন।

সাংসারিক জীবনারম্ভ

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু কিরূপে যে সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এমন সময়ে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত এখানে আসেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হইয়াও কেন অল্প বেতনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন, এ বিষয়ে নগরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে নানা কথা হইতেছিল। আমিও ইহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কেন এরূপ অল্প বেতনে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন? তদুত্তরে তিনি যখন আমাকে বলিলেন, টাকা উপার্জ্জন আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার এই কার্য্যভার গ্রহণের উচ্চ উদ্দেশ্য আছে; ইহা শুনিয়া আমি সমধিক বিস্মিত হইলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, তবে বিষয় কার্য্য করিয়া টাকা উপার্জ্জন ব্যতীত জীবনের অন্য উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। এই চিন্তা উপস্থিত হওয়াতে আমার মনের ভাব একবারে পরিবর্ত্তিত হইল। যথাসময়েই আমার মনে এরূপ

চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে কিরূপে জীবনে ব্যবহৃত হইব এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল হইল। স্বভাবতঃ আমার কোনও সাংসারিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। এখন যাহাতে জীবনে অন্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারি এই ভাবই আমার অন্তরকে অধিকার করিল। ইতাবসরে শ্রদ্ধেয় দীনবাবু বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত। তিনি আমাকে পোগোজ স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আমিও বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আবন্ত করিলাম। একদিকে যেমন স্কুলের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, অপরদিকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জামাতার অভিভাবক হইয়া তাঁহাদিগকে ঘরে শিক্ষাদান এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা অঘোরনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করাতে উপাসনা, প্রার্থনা ও উপদেশ নূতন ভাবে হইতে লাগিল। তাহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইল। আমরা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ধর্ম্মজীবন গঠনের আবশ্যকতা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমি বাসায় বালকদ্বয়সহ প্রত্যহ সায়ংকালে দৈনিক উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনা করিতে আরম্ভ করি। এইরূপে উপাসনা আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই একদিন যাই "মোহকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর" প্রার্থনা উচ্চারণ করিলাম, অমনি মানসচক্ষের উপরে আমার একটী অভ্যস্ত জ্ঞানকৃত পাপ পতিত হইল এবং আমার হৃদয় এরূপ অনুতপ্ত হইল যে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সেদিন আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তাহাতে আমার অন্তর এরূপ পরিষ্কৃত বোধ করিলাম যে, সে অভ্যস্ত পাপের নামগন্ধও আর রহিল না। তাহা হইতে আমি চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম, ইহাই হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহাতে প্রার্থনাই যে ধর্ম্মজীবনের একমাত্র সম্বল এবং অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই দুই বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এমন কি আমার ইচ্ছা হইল যে, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে সাক্ষ্য দান করি কিন্তু মনের ভাব মনেই রহিল। এমতাবস্থায় একদিন আমাকে ডাকিয়া দীনবাবু মহাশয় বলিলেন যে, কাওয়ালীপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হইয়াছে, তুমি চাহিলেই এই কাজ পাইতে পার। ডেপুটী ইন্স্পেক্টরবাবু কাশীকান্ত মুখার্য্যি তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আমাকে সেই কার্য্যের জন্য প্রার্থী হইতে বলিলেন। ইহা আমার পরীক্ষার জন্য উপস্থিত, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলাম কিন্তু মনে মনে এই বিশ্বাস করিলাম যে, এই কার্য্যগ্রহণ যদি ঈশ্বরাভিপ্রেত না হয়, তিনিই আমাকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিবেন। অথচ আমি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা অঘোরনাথকে ইহা জানাইলাম। তিনি অতর্কিতভাবে বলিলেন, তথায় গেলে আপনি কার্য্য করিবার অধিক সুবিধা পাইবেন। অতএব যাওয়াই ভাল। কিন্তু তাঁহার কথাতে আমার অন্তরের সায় পাইলাম না। তিনিও পরে আসিয়া বলিলেন যে "আমি

আপনাকে যাহা বলিলাম তাহা ঠিক নহে।" অপরদিকে দীনবাবুর বিশেষ অনুরোধে কার্য্যের জন্য প্রার্থী হইলাম। কিন্তু যখন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর আমাকে বলিলেন, তথাকার জমিদারগণ ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে তোমার প্রণাম করিতে হইবে। তাঁহাদের বাড়ীতে দেবদেবীর পূজা হয়, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতে এবং দেবদেবীকে প্রণাম করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলাম যে, আমার দ্বারা তাহা হইবে না। তাহাতে তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার পক্ষে এ কাজ নেওয়া ঠিক নয়।

ইতিপূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টর জ্যেষ্ঠ মার্টিন সাহেব আমাকে বগুড়া স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দীনবাবুই তখন আমাকে অন্যত্র যাইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইরূপে আমি বিষয় কার্য্য সম্বন্ধে যে প্রথমতঃ পরীক্ষায় পড়িয়াছিলাম তাহাতে উত্তীর্ণ হই। এখন এখানে থাকিয়াই যুবক ও বালকদের সেবা করিব এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ গুপ্ত উপাসনালয়ে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন যে, সম্পাদক মহাশয়ের বাসায় যে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে পাক করিত তিনি তাহাতে উপবীত পরিত্যাগ করেন। ইহাতে সম্পাদক মহাশয় অঘোরবাবুর প্রতি খুব বিরক্ত হন। এইরূপে ঢাকায় তাহার বিশেষ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ঢাকায় তখনও সামাজিকভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে প্রস্তুত এমন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। ক্রমে অঘোরবাবু এখানে এরূপ উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন যে, তিনি আর এখানে থাকিতে পারিলেন না। তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে আমাদের বাসায় আমাদিগকে লইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় বেদনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তখন কলিকাতায় নানা কথা উঠিয়াছিল। সেইসকল কথা উপলক্ষ করিয়াও অঘোরনাথকে আক্রমণ করা হইত। কিন্তু তিনি যারপরনাই সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করিতেন। ব্রহ্মানন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া তিনি কখনও কাহাকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি যে একজন সাধু চরিত্র লোক ছিলেন তাহা তখনই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার শরীরে রাগমাত্রও ছিল না। তাঁহার সংসর্গে আমার যে কি উপকার হইয়াছিল তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মবন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয়ও সেই সময়ই ঢাকায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে হৃদয় খুব বিগলিত হইত এবং তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম কিন্তু ধর্ম্মবন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। যাই অঘোরনাথ চলিয়া গেলেন ঢাকার অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। আমার মনেও নানা চিন্তা হইতে লাগিল। কিরূপে ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় এসব প্রশ্ন উদিত হইল। বুঝিতে পারিলাম যে, প্রার্থনা এবং সৎসংসর্গই ধর্ম্মোন্নতির প্রধান উপায়। উপাসনাতে একদিন এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, অন্যান্য

যুবকদিগকে সৎপথাবলম্বী হইতে এবং কুপথ পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করাই আমার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। তাহাতেই কয়েকটী যুবকসহ প্রতি শনিবার সায়ংকালে ধর্ম্মালোচনা করা আবশ্যক বোধ হয়। তদনুসারে আমাদের অঞ্চলের কোন কোন পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুকে ইহা জানাই এবং তাঁহারাও অন্তরের সহিত আমার কথায় সায় দেন এবং একজন জিজ্ঞাসা করেন কিরূপে প্রসঙ্গ করা হইবে। তাহাতে আমি উত্তর করি এখন কিছুই বলিতে পারি না। একত্র হইলেই দেখা যাইবে কিরূপে আলোচনা করিতে হইবে। এমন আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই কথাবার্ত্তার পরই আমার হস্তে একখণ্ড Bunnyan's Pilgrim's Progress পুস্তক নিপতিত হয়; তাহা পড়িয়াই দেখি যে তাহাতে ধর্ম্মপথে কিরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং কি কি উপায়ে তাহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। তাই পরের শনিবার সায়ংকালে যখন কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এই পুস্তকের উল্লেখ করিলাম এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে তাহাতে ধর্ম্মজীবনের প্রথম বাধা কি? এবং ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইবার প্রকৃত সম্বল কি? তাহা পুস্তক হইতে পাঠ করিলাম এবং বাঙ্গালাতে বুঝাইয়া দিলাম। প্রথম মিলিত ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রীআদিনাথ দাস এবং শ্রীমান কুমুদচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন। যে দুইজনকে নিয়া আমি তাঁহাদের অভিভাবকরূপে বাস করিতেছিলাম তাহারাও উপস্থিত ছিল। এইরূপে সহজেই ঢাকায় সঙ্গত সভার সূত্রপাত হইল। এখানে আমার একটী কথা মনে পড়িতেছে। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়াই ময়মনসিংহস্থ "মনোরঞ্জিনী" সভার ন্যায় একটী সভা Collegiate স্কুলে স্থাপন বিশেষ যত্ন করি কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অথচ যথাকালে ঢাকা সঙ্গত সভার সূত্রপাত সহজেই হইল।

একদিকে পোগোজ স্কুলে শিক্ষাদান অপরদিকে কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া নিয়মিত মত প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মজীবন লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হইল। প্রত্যহ সায়ংকালে বাসায় দুইজনকে লইয়া প্রার্থনা করা আমার বিশেষ ব্রত ছিল। সঙ্গত সভাতেও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা হইত। এ সময়ে আমার দারপরিগ্রহ করার কথা উপস্থিত হয়। শ্রদ্ধেয় দীননাথ সেন একদিন আপনা হইতে আমাকে বলিলেন তোমার তো কেহই নাই, তুমি স্বাধীন; তোমার ইচ্ছা হইলে অনায়াসে বিধবা বিবাহ করিতে পার। অতএব তুমি কলিকাতা যাইয়া কেশববাবুর সাহায্যে একটী বিধবা বিবাহের চেষ্টা করিতে পার। আমি তাঁহাকে কোন উত্তর দিলাম না। আমার মনে বিধবা বিবাহের প্রতি টান ছিল না। এবং মনে হইল কেশববাবুর ন্যায় লোকের নিকট বিধবা বিবাহার্থী হইয়া যাইব এ কেমন কথা? শ্রদ্ধেয় অঘোরবাবু মহাশয় এখানে থাকিতেই তাঁহার সঙ্গে একটী বিধবার বিবাহের প্রস্তাব হওয়াতে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে আমি এই উত্তর দি যে আপনার পক্ষে

বিধবা বিবাহ কতদূর সঙ্গত তাহা জানি না ; কিন্তু যিনি আপনাকে পতিরূপে পাইবেন তাঁহার উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ঢাকা হইতে যাইয়া কলিকাতায় বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে আমার ভাব এই ছিল যে যাঁহার প্রতি না দেখিয়াও সহজে হৃদয়ের টান পড়ে এবং তাঁহার পিতামাতার বিষয় যদি ভাল জানা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইতে পারে। দেখার উপর আমার তত আস্থা ছিল না। কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে একটী বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে তাহাতে আমার মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। আমার হৃদয়টা যেন অপবিত্র হইয়াছিল। ক্রমে আমার একমাত্র অভিভাবক মাতুল মহাশয় অন্য কাহারও পরামর্শে সেই ব্যক্তির একটী বিধবা আত্মীয়ার কন্যাকে মনোনীত করেন। সেই বিধবার বেশ সম্পত্তি ছিল অথচ একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর সন্তান ছিল না ; তাহাতেই মাতুল মহাশয়ের সেই কন্যাই মনোনীত হয়। কিন্তু আমাকে কিছুই বলিতে সাহস পান না। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন অথচ আমার প্রতি তাঁহার এরূপ ভাব ছিল যে সহজে আমাকে কোন কথা আমার মত না বুঝিয়া বলিতে সাহস করিতেন না। একবার তিনি আমার ছাত্রবৃত্তি পাওয়ার পর আমার সমক্ষে আমার শারীরিক রোগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "বঙ্গের তো ঈশ্বর কৃপায় পড়াশুনায় সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর তাহার শরীরটাকে রোগাক্রান্ত না করিলে ভাল হইত।" এই কথা শুনিয়া আমার মনের বিরক্তিবশতঃ তাঁহাকে কঠোরভাবে আমি বলিয়াছিলাম শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে আমার রোগ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের দোষ কি ? এই কথাতে তিনি মনে বড় কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। তিনি পত্রে আমাকে পরে এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, "তোমার মুখ আমি সেদিন যেরূপ দেখিয়াছিলাম এমন আর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি যে কথা বলাতে তোমার মুখ ওরূপ হইয়াছিল এমন কথা আর আমি কখনও বলিব না।" এই পত্র পাইয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং আমার মাতুল মহাশয়ের প্রতি আমার হৃদয় সমধিক আকৃষ্ট হইল।

দুই পাত্রীর কথাই আমার কর্ণে আসিল। এ সময়ে আমি বন্ধোপলক্ষে বাড়ী গেলাম। প্রায় সারাদিন একটী গৃহে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম। তাহাতে দিদিমা বলিতেন "তুমি বুঝি এখন একাকী ঘরে বসিয়া বিবাহের কথা ভাবছ।" আমি কিছুই উত্তর দিতাম না। আমাকে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া মাতুল মহাশয়ের মনে হইল যে দ্বিতীয় পাত্রীর কথা শুনিয়া বুঝি এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছি। তাই তিনি একদিন আমাকে বলিলেন যে দ্বিতীয় প্রস্তাব আমার নিকট অধিক ভাল বোধ হয়, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারে। আমি তাঁহাকে বলিলাম এ বিষয়ে অন্য কোন কথা বৃথা। যে পাত্রী সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাই ভাল। এইরূপে ক্রমে কথাবার্ত্তা ঠিক হয় এবং কোন কোন সঙ্গতের ভ্রাতা সেই গ্রামে ছিলেন বলিয়া আমি তথায় যাই। কিন্তু প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখিতে চেষ্টা করি নাই। পাত্রী-

পক্ষীয়েরাই আমাকে দেখিবার সুযোগ পাইলেন। এইরূপে আমার ২৪ বৎসর বয়সে আমি দারপরিগ্রহ করি। তাহাতে যে কালীপূজা ইত্যাদি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব ছিল না। কিন্তু বিবাহানুষ্ঠানে যে পৌত্তলিক মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইয়াছিল তাহাতে অন্তরে কোনও আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। বেশ আহারাদি করিয়াই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। বিবাহের সময় আমার হৃদয়ে এরূপ ভাব হইল যে আমাকে না জানিয়া শুনিয়া আমার হস্তে একটী বালিকা কেমন আত্মসমর্পণ করিলেন, আমি কবে ঈশ্বরের নিকট এরূপ আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইব। বস্তুতঃ বিবাহের পর হইতে ঈশ্বরকে সমধিক ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিবার পথ খুলিয়া গেল। ইহাতে স্ত্রীর প্রতি আমার অন্তরে বিশেষ শ্রদ্ধাব সঞ্চার হইল। দেখিলাম তাঁহার নিকট আমার গুরুতর বিষয়ে শিক্ষা লাভ হইয়াছে। তাঁহার বয়স তখন ১২ বৎসর মাত্র। এইরূপে একই সময়ে একদিকে যেমন ধর্ম্মরাজ্যেব অপরদিকে তদ্রূপ সংসারের পথে আমি পাদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পর শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সহ আসিয়া ঢাকায় হঠাৎ উপস্থিত। স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই তাহাই ঘটিল। ব্রহ্মানন্দকে শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমানিটোলার বাড়ীতে রাখিয় অঘোরবাবু আমাদিগকে সংবাদ দিতে আসিলেন। আমি সংবাদ পাইয়াই তাঁহার সঙ্গে গেলাম। যাইয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই ব্রহ্মানন্দ তাঁহার হাত বাড়াইলেন। তাঁহার হস্ত আমি বড়ই সঙ্কুচিত অন্তরে ধারণ করিলাম। তিনি আমাকে বঙ্গবাবু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। "Young Bengal, this is for you" প্রবন্ধটী পাঠ করিবার সময় যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, যাঁহার কথা শ্রদ্ধেয় অঘোরবাবুর নিকট শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে বড়ই সাধ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বকর্ণে তাঁহার মিষ্টি বাক্য শুনিয়া হৃদয়ে কি ভাবের উচ্ছ্বাস হইল তাহা বলিতে পারি না। এতদিন যেন কেবল কয়েকটী কনিষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে ধর্ম্মপথে চলিতেছিলাম, এখন দেখিলাম অগ্রণীরূপে জ্যেষ্ঠ আসিয়া তাঁহার প্রিয় অঘোরনাথ সহ সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিঞ্চিৎ আলাপাদির পর আমি স্কুলের সময় বাসায় যাইতে চাহিলাম তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার কি বন্দোবস্ত হইবে তাহার খবর লইলাম না। ঢাকায় এমন কেহ নাই যে তাঁহাদিগকে আপন বাসায় স্থান দান করেন। শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় তখন কুমিল্লায় ছিলেন। যাহাতে কেশববাবুর আতিথ্যসৎকার সুন্দরমত হয় তৎসম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না যে কেশববাবু কয়েকদিন এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। তিনি আমাদের কয়েকজনকে পাইয়াই আনন্দিত। তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিবার মতি তখনও হয় নাই, সুবিধাও ছিল না। এ সময়ে রজনীতে দীর্ঘকাল বসিয়া আলাপ হইত। তাহাতে তিনি তাঁহার জীবনের কথাই বলিতেন। এ যাত্রা তিনি যে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন তন্মধ্যে

"প্রকৃত বিশ্বাস" বিষয়ের বক্তৃতাটী আমার অন্তরে বড়ই প্রবিষ্ট হয়। বিশ্বাসীর ঈশ্বর ঐতিহাসিক মৃত দেবতা নহে, দর্শনের অনুমিত দেবতা নহে, জীবন্ত দেবতা। এই কথাগুলি আমার কর্ণে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ফরিদপুর হইতে ঢাকায় আসিবার সময় নৌকায় তিনি তাঁহার "True Faith" লিখিয়াছিলেন। ইহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। তখনও তাঁহারা পুরাতন পদ্ধতি অনুসারেই উপাসনা করিতেন। সামাজিক উপাসনা তিনি নিজে করিতেন না। তিনি মাত্র দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্রের ন্যায় একটী সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতেন। এই যাত্রায় তিনি ময়মনসিংহেও গিয়াছিলেন। তথায় বাসস্থান ও আহারাদির সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় রামশঙ্করবাবু এবং গোপীবাবু প্রভৃতি ছিলেন বলিয়াই ওরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ময়মনসিংহ হইতে পীড়িতাবস্থায় তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন এবং সেজন্য তাঁহাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হয়। সে অবস্থায় একটুকু তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হই। রবিবার দিন তিনি এই বলিতে লাগিলেন যে আজ দেখিব আমার প্রতি কিরূপ ভালবাসা। আমাকে ছাড়িয়া সমাজেই যাওয়া হয় না আমার নিকট থাকা হয়। এই কথায় আমার মনে এই প্রশ্ন হইল ; তিনি কি সমাজে যাইয়া উপাসনায় যোগ না দিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন? তাহা কখনও নহে একরূপই বুঝিলাম। তবে কি করিব? উপাসনার স্থানটী খুব নিকটে ছিল। তিনি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেখানে থাকিয়াই উপাসনায় বেশ যোগ দেওয়া যায়। আমি তাই স্থির করিলাম যে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াই উপাসনায় যোগদান করিব। কাজেও তাহাই করিলাম। উপাসনার সময় দেখিলাম তিনি স্থির ভাবে রহিয়াছেন। আমিও সেই সুযোগে উপাসনাতে যোগদান করা আমার পক্ষে যেরূপ সম্ভব তদ্রূপ যোগ দিলাম।

এখন বিশেষ উৎসাহ সহকারে সঙ্গতের কার্য্য চলিতে লাগিল। একদিন এমন হইল সঙ্গতের নিয়মিত প্রার্থনাটা যাই করিতে আরম্ভ করিলাম অমনি অন্তর বাহিরে ঈশ্বর-সত্তা এরূপ অনুভূত হইল যে শরীর নাই, বাহির নাই। কেবলই সত্তামাত্র। আমরা সকলেই যেন তাহাতে নিমগ্ন। প্রার্থনা হইল। কি প্রার্থনা হইল তাহাও আর মনে পড়ে নাই। এইরূপে ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধি হইলে পর যে প্রসঙ্গ হইল তাহা অন্যদিন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধ হইল। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন হইল অন্যেরাও ইহা টের পাইয়াছে কিনা? এইজন্য আমি যাহাকে এ বিষয়ে অমনোযোগী ভাবিতাম তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাহার নিকটও সেই দিনের ব্যাপার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। তাহাতে আমার মনে বড় আনন্দ হইল। এবং সেই হইতেই ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল। ইহার পূর্ব্বে কোন উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম। বলিতে কি যে Rock of Faith-এর কথা শুনিয়াছিলাম তাহার আভাস এখন পাইলাম। এই ঈশ্বর-সত্তাতে দাঁড়াইতে পারিলেই হইল তখন একরূপ মনে হইত। কিন্তু এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিবার

প্রবৃত্তি হইত না। আমাদের অঞ্চলের অনেকে ইতিপূর্ব্বেই সঙ্গতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভুবন ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন। এখন সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক একটী যুবক সভ্যের সঙ্গে বন্ধুতাতে বিশেষ আবদ্ধ যুবক ছাত্রও আসিয়া সঙ্গতে যোগ দিলেন। এইরূপে রজনীকান্ত ঘোষ, শারদাকান্ত হালদার প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা পরীক্ষাও উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিকে আমার সম্বন্ধে এরূপ কথা উঠিল যে আমি কেশববাবুর মতন হইবার জন্যই সঙ্গত করিয়াছি। অপরদিকে যে সকল যুবক সঙ্গতে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিভাবকদের কেহ কেহ নানাকথা বলিতে লাগিলেন। আমার নিজ সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া নীরব রহিলাম। কিন্তু পড়াশুনা ও চরিত্রে সঙ্গতের সভ্য সকলেই খুব ভাল ছিলেন অথচ তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানা কথা হইতেছে শুনিয়া আমি ওরূপ অপবাদকারী একজনের নিকট পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন। এ সময়ে স্নানান্তে উপাসনা করার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে প্রথমতঃ কারও কারও আপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার ফল এমন শুভ হইল যে সকলেরই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিল।

ক্রমে যেমন বিদ্যালয়ের তদ্রূপ সঙ্গতের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এমন সংসর্গই পাইলাম যে তাহাতে সদা সর্ব্বদা থাকিয়া যারপরনাই নিরাপদ আস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কেবলই সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং ভ্রাতাদের সেবাতে আমার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। জীবনের পরীক্ষাও ক্রমে গুরুতর হইতে চলিল। এবার পূজার বন্ধের সময় যখন বাড়ী গেলাম, ভাই ভুবনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আমাকে নির্য্যাতন করিবার আয়োজন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই হইয়াছিল যে আমার পিতামাতার নাম যাহা ছিল আমার শ্বশুর শাশুড়ীর নামও তাই ছিল। এবং তাঁহাদের পুত্র সন্তান না থাকাতে আমাকেই তাঁহারা তদ্রূপ জ্ঞান করিতেন কিন্তু তাঁহাদের কোন কোন আত্মীয়ের তাঁহাদের প্রতি ভাল ভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহারা আমার প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। গ্রামের অনেক ভদ্রলোক একত্র হইয়া পূজার পর একদিন সায়ংকালে এক সভা করিলেন। তাহাতে আমাকে আহ্বান করিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি আমার ধর্ম্ম ছাড়িব না তাঁহাদিগকে ছাড়িব? অবশেষে এই প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে যখন আমি উত্তর করিলাম যে আমি আমার ধর্ম্ম ছাড়িতে পারি না, আপনাদিগকেও ছাড়িতে পারি না, তখন কেহ কেহ এই বলিয়া উঠিলেন তুমি যাহাই কর না, ভুবন প্রভৃতিকে খারাপ করিতে পারিবে না এবং এই বল যে তাহাদিগকে তোমার নিকট যাইতে দিবে না। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম তাহাদিগকে আমি কখনও খারাপ করি নাই বরং তাহারা ভালই হইতেছে। তাহাদিগকে আমি আমার নিকট

আসিতে বাধ্য করিব না, ইহা বলিতে পারি। এই কথার পরই কেহ কেহ আমাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যখন আমার প্রতি আক্রমণ হইবার আশঙ্কা হইল, তখন আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে ধরিয়া বাড়ীতে আনিলেন। বড় আনন্দে পরীক্ষাস্থলে গিয়াছিলাম। এবং এইরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়া আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল। ভাই ভুবন আর আমার নিকট আসিতে পারেন না। অথচ যখন যাহা হয় তাহা আমাকে পত্র দ্বারা জানান। পত্রবাহিকা ছোট ছোট মেয়ে। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে আমার মতন মানুষকে মারিয়া ফেলিলেই কি হইবে এরূপ ভাব কেহ কেহ ব্যক্ত করিতেছেন এবং ভুবনের এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে তাহা অসম্ভব নহে। আমার তাহাতে কোনও ভয় হইল না। কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম না জানি ভুবন আর ঢাকায় যাইয়াও আমার নিকটে না আসে। শুনিতে পাইলাম যে তাহাকে দুইটী প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে। একটী ব্রাহ্মসমাজে না যাওয়া, আর একটী আমার নিকট না যাওয়া। ভুবন প্রথমটীতে সম্মত হন কিন্তু দ্বিতীয়টীতে নয়। তাঁহাকেও তাঁহার গুরুজনেরা একটুকু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতে আমাদের মধ্যে যে কিরূপ টান ছিল সহজে তাহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু ভুবন ভাবিয়াছিলেন যে আমার নিকট যাইতে পারিলেই সমাজে যাওয়াব কার্য্য হইবে। সঙ্গতে যাইতে পারিবেন। যখন তখন সদালাপ কবিবার সুবিধা হইবে। সপ্তাহে একদিন মাত্র সমাজে যাওয়া, ইহাতে সমাজের প্রতি যে তত টান ছিল না তাহাও বুঝা গেল। এবার পূজার বন্ধটী বড় কষ্টে অতিবাহিত হইল। মনে হইতে লাগিল না জানি ভবিষ্যতে আরও কি হয়! সুতরাং বাড়ী হইতে কোথায় অন্যান্য বার আমাদের অঞ্চলের সকলে একত্র হইয়া ঢাকায় ফিরিতাম ; এবার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে আমাকে একা ঢাকায় ফিরিতে হইল। শ্বশুর মহাশয়ের মনে ভয় ছিল না জানি ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার সময় পথে কোনও বিপদ ঘটে। চলিয়া আসিবার দিন প্রাতঃকালে আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রার্থনা করিবার সময় এমন ভাব হইল যেন পুনরায় আর গৃহে ফিরিতে পারিব কিনা সন্দেহের বিষয়। তাহাতে উভয়ের হৃদয় খুব ব্যথিত হইল এবং প্রার্থনাতে অশ্রু বর্ষিত হইল। ইহা টের পাইয়াই শ্বশুর মহাশয়ের মনে ভয় হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে বলেন সকলে পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। তখন আমি তাঁহাকে সাবধান করিলাম একথা অন্যকে বলিবেন না। তাহাতে তাঁহাদের আপনার প্রতি অত্যাচার বাড়িবে। গ্রামের এরূপ পরীক্ষার পর ঢাকায় উপস্থিত হওয়া মাত্র সঙ্গতের মুসলমান সভ্য শ্রীমান্ জালালদ্দিন আসিয়া বলিলেন, ঢাকাতে এরূপ জনরব যে কেশববাবু খৃষ্টান হইয়াছেন এবং সকলে তাঁহার নিন্দা করিতেছে। জালালদ্দিন ব্রাহ্ম স্কুলের ছাত্র। শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তিনি ক্রমে সঙ্গতে যোগদান করেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম কেশববাবু ঠিক বুঝিয়া থাকিলে খৃষ্টান হইয়াছেন তাহাতে আমাদের ভয় কি ? আমরা যখন ঠিক বুঝিব আমরাও খৃষ্টান

হইব। বাস্তব কথা এই কেশববাবু "যিশুখৃষ্ট, ইওরোপ ও এশিয়া" বিষয়ে এই সময়ে বক্তৃতা দেওয়াতেই তাঁহার নামে এই কথা উঠিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পর যখন শ্রীমান *কৃষ্ণগোবিন্দ প্রভৃতি তিন ভাই এবং অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়া আমি শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দরবাবুর আরমানিটোলার বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করি, তখনই সঙ্গতের বড় শ্রীবৃদ্ধি হয়। ক্রমে বহুসংখ্যক ছাত্র সঙ্গতে যোগ দেন। এমন কি পূজনীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত এবং প্রীতিভাজন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণও সঙ্গতে যোগদান করেন। এই গুপ্ত মহাশয় আমাদের অঞ্চলে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এখন যুবক দলের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র নন্দী, কালীনারায়ণ রায়, রজনীনাথ রায় ও প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতিও অগ্রগণ্য হন। ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ীতে আসার পর আমার কোন কোন ক্লাশের কয়েকটী ছাত্র লইয়া প্রতি রবিবার প্রাতে প্রার্থনাদি করিতে আরম্ভ করি। তাহাতে সঙ্গতের সভ্য ছাড়া অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যেও ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। তাহার প্রমাণ এই যে সেই সময়ে কেশববাবু প্রার্থনা বিষয়ে বম্বে একটী বক্তৃতা করেন, তাহা ছাপা হইলে পর আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমি বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা পাঠ করি। তাহা শুনিবার জন্য বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত হয়।

ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ীতে আমরা কয়েক বৎসর বাস করি এবং এখানেই সঙ্গতের অবস্থা অতি ভাল হয়। আমরা এক একজন স্নানান্তে এক এক কোঠায় বসিয়া প্রার্থনা করিতাম, এরূপ প্রার্থনা করার অভ্যাস হওয়াতে আমার জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। আমি স্কুলে যাইয়াও এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে মনে মনে একটুকু প্রার্থনা করিতাম তাহাতে ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় মন খুব খুলিয়া যাইত। এমন কি ছাত্রেরাও তাহাতে আমার নিকট পড়িতে সুখ বোধ করিত। আমাকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সাহিত্য পড়াইতে হইত। তাহাতে বহুসংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে আমার মিলন হয়। তাহাদিগকে আমি প্রিয়দর্শন কনিষ্ঠ ভাইরূপেই দেখিতাম। আমার আর একটী নিয়ম ছিল ছাত্রদিগের সঙ্গে একটুকু আমোদ আহ্লাদের পর যখন তাহাদের মন বেশ প্রফুল্ল হইত তখনই পড়াইতে আরম্ভ করিতাম। এইরূপে সঙ্গতে এবং স্কুলে কয়েক বৎসর বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। যেখানে ভালবাসা সেইখানেই পবিত্রতা ও আনন্দ তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইত। এ সময়ে অল্প বয়স্কদের মধ্যে শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দের কনিষ্ঠ শ্রীমান প্যারীমোহন আমার বড় প্রিয় হন। তিনি স্কুলেও আমার ছাত্র ছিলেন, সঙ্গতেরও একজন প্রার্থনাশীল সভ্য ছিলেন। তাঁহার এবং শ্রীমান জালালদ্দিনের সঙ্গে আমার ধর্ম্মজীবনের একটী গুরুতর বিষয়ে যোগ ছিল তাহাতেই তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত হইল। তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতার আদি সমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশি এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রেরিত হন। পাকড়াশি মহাশয় সঙ্গতে উপস্থিত

হইয়া বড় সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে বলেন আপনি তো সংসারের বিষয় কিছুটা ভোগ করিয়াছেন ; ইঁহারা তো সংসারের কিছুই জানে না। যাহাতে ইঁহারা নিরাপদে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারে তৎপ্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তখন ভ্রাতা আদিনাথ কর্তৃক কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাহা প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে জানান। ইহার পর আমাদের মধ্যে বড় শুষ্কভাব হয় তাহাতে বড় ভয় হয়। কিন্তু তখন আমি এই প্রস্তাব করি যে এবার পূজার বন্ধে বাড়ী না যাইয়া এখানে থাকা যাউক এবং প্রতিদিন সায়ংকালে সঙ্গত হউক। তাহাতে অনেকে সায় দেন এবং এখানে থাকেন। আমার এ সময়ে ঈশ্বর-দর্শন স্পৃহা প্রবল হয় এবং ঈশ্বর-দর্শন লাভার্থ আমি গভীর রজনীতে একাকী প্রার্থনা করি। প্রথম দিন এমন এক আলো আমার নিমীলিত চর্ম্মচক্ষের উপরে পড়ে যে আমি তাহাতে ভয় পাই। কিন্তু তাহাতে আমি নিরাশ না হইয়া ঈশ্বর-দর্শনার্থে আরও ব্যাকুল হই। আর একদিন গভীর রাত্রে যাই প্রার্থনা করিলাম অমনি আমার চিত্তপটে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে "Blessed are the pure in heart, for they shall see God" এই বাক্যটী প্রতিভাত হইল। তাহাতে আমার হৃদয়ের মলিনতার প্রতি এরূপ দৃষ্টি পড়িল যে আমি কিছুদিন অন্তরে বাহিরে কেবলই পাপ মলিনতা বোধ করিতে লাগিলাম। ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যানে "আমি যখন তোমাকে দেখি ইত্যাদি" পড়িয়া যেমন আশার সহিত ঈশ্বর-দর্শনার্থী হইয়াছিলাম তদ্রূপ হৃদয়ের পাপ মলিনতা অনুভব করিয়া ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে যখন নিরাশ হইবার উপক্রম হয় তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী গানের "তিনি দেন দরশন কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে" অংশ শ্রবণে মনের সকল ভয় দূর হয়। বস্তুতঃ প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াই গানে শুনিলাম "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে" আর মনে হইত তবে আমার মতন লোক তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? কিন্তু যাই একটী বাউলের গানে শুনিলাম "বামনে চাঁদ ধরা কভু না যায় পারা, তবে যায় ধরা আপনি দিলে" তাহাতেই যেমন আমার আশা হইয়াছিল, এবারও তাহাই হইল। কিসে কি হয়, কাহার সাধ্য তাহা নির্দ্ধারণ করে? ঈশ্বর-দর্শন প্রার্থী হইয়া যে আমার হৃদয়ের গভীর পাপমলিনতা চক্ষের উপরে পড়িল তাহাতে ঈশ্বর-দর্শনের পথই খুলিয়া গেল। ইহাতে আমার জীবনের উপর যে ঈশ্বরের কিরূপ দৃষ্টি নিপতিত তাহাও অনুভূত হইতে লাগিল। একদিন আমি কোন এক শ্রেণীর প্রশ্নের কাগজ পরীক্ষা করিতে যাই একটুকু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার জন্য নম্বর দিবার উপক্রম করিলাম, অমনি হৃদয়ে এই টের পাইলাম যে ইহা তিনি দেখিতেছেন, আর আমার হস্ত হইতে পেনসিল পড়িয়া গেল। আমি তখনই কাগজ দেখিতে ক্ষান্ত হইলাম। এ সময়ে সঙ্গতেও পাপের কথা দৈনিক বহিতে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহা শনিবার সঙ্গতে পঠিত হইত। তাহাতে রোমেন কেথলিকদের মধ্যে যে পাপ স্বীকারের কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা আমি

ঢাকা সঙ্গতে প্রচলিত করিতেছি বলিয়া আমার বিরুদ্ধে কথা উঠিয়াছিল। ইহার পরই ভয়ানক শুষ্ক অবস্থা হয় এবং আমরা কয়েকজন ঢাকাতে থাকিয়া প্রত্যহ সায়ংকালে সঙ্গত করি। একদিন এমন হইল যে একটী নবাগত বন্ধু এরূপ প্রার্থনা করিলেন যে তাহাতে সঙ্গতে ঈশ্বরের প্রকাশ জাজ্জ্বল্যমান হইল। আমি ঈশ্বর-দর্শনার্থী হইয়া গোপনে যে প্রার্থনা করিতেছিলাম তাহা তিনি প্রকাশ্যে পূর্ণ করিলেন। অন্যান্যেরা তাহাতে মোহিত হইলেন এবং নানা কথা বলিতে লাগিলেন। "রজনীতে সূর্য্যোদয় গানটী সকলে উৎসাহের সহিত গাইলেন।" সেই ঘটনাতে যেমন সঙ্গতে তদ্রূপ আমার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। এখন উপাসনাতে ঈশ্বর-দর্শনার্থ বিশেষ ব্যাকুলতা হইত। এইরূপে যেমন একসময়ে ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধিই উপাসনার সার হইয়াছিল তদ্রূপ এখন ঈশ্বর-দর্শন প্রার্থয়িতব্য হইল। এইরূপে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া গেল। আমার পক্ষে ঢাকা সঙ্গত যে God-send অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত তাহা বলা বাহুল্য। ব্রজসুন্দর বাবুর বাসাতেই সঙ্গতের অনেক গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়। এবং আমার জীবনেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এখানে কোনও ভ্রাতার নিমন্ত্রণে আমাদিগকে ভ্রাতা জালালদ্দিন মিঞার সঙ্গে আহার করিয়া সমাজচ্যুত হইতে হয়। এই কারণে আমি প্রায় দুই বৎসরকাল পরিবার হইতে স্বতন্ত্র থাকি। এখানেই প্রথমতঃ জীবনের বিশেষ কার্য্য কি তাহা উপাসনাতে বুঝিতে সক্ষম হই। যখন তাহা বুঝিতে পারি তখন নিজের নানা প্রকারের অক্ষমতা দেখিয়া বড়ই নিরাশ হয় এবং তাহাতে ব্যাকুল হইয়া উপাসনার সময় প্রার্থনা করাতে তিনি বুঝিতে দেন যে আমার জীবনে তাঁহার যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার আছে তাহা তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন তাহা তিনিই জানেন। ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

এই সময়ে একদিকে শ্রদ্ধেয় দীন বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোমাকে নিয়মিত মত প্রতি বুধবার সায়ংকালে বাঙ্গালাবাজারে রাধিকা বাবুর বাগানবাটীতে যে উপাসনা হয় তাহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইলে পর উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অনুমতিতে প্রবন্ধ পাঠ করিতে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সমাজের কার্য্য করিবার ভারও পাইতে আরম্ভ করি। এইরূপে জীবনের ব্রতপালনে রত হইবার পথ পাই। ক্রমে বন্ধের সময় অন্যত্র যাইয়া প্রচার করিবার পথও খুলিয়া যায়। এই বিষয়ে ভ্রাতা কালীনারায়ণ রায় আমাকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন। আমি প্রথমতঃ যে দুই স্থানে পড়াশুনা করিয়াছিলাম তথায় প্রচারার্থ সর্ব্বাগ্রে গমন করি। প্রথম কিশোরগঞ্জে এবং তথা হইতে ময়মনসিংহে যাইয়া প্রচার করি। তাহাতে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখিয়া উৎসাহিত হই। উভয় স্থানে যাইবার সময়ই পথে বড় ঝড় হয়। তাহাতে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মানন্দকে আমার কুশল সংবাদ জানাইবার জন্য ময়মনসিংহে এক টেলিগ্রাম আসে। ইহা শুনিয়া আমার কার্য্যে

তাঁহার হৃদয়ের বিশেষ সহানুভূতি আছে বুঝিতে পারি এবং উৎসাহিত হই। এই প্রচার যাত্রায় সঙ্গতের কোন কোন অল্পবয়স্ক ভ্রাতা আমার সঙ্গে ছিলেন। এইরূপে প্রচার কার্য্যের পথ খুলিয়া যায়।

আমার সাংসারিক জীবন ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে প্রথম হইতেই এরূপ মিশ্রিত হইয়াছিল যে সাংসারিক জীবনের কথা স্বতন্ত্ররূপে বলিবার কিছুই নাই। এখন ঢাকাতে আমার জীবনের বিশেষ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। জ্যেষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অন্ধ-বিশ্বাসী ও উদাসীন এবং সঙ্গত সভাকে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক মনে করিতে লাগিলেন। এই মনে হওয়াতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপদেশ প্রদত্ত হয়। তাহাতে হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত পাইয়া আমাকে নির্জ্জনে ক্রন্দন এবং প্রার্থনা করিয়া শান্তিলাভ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে কেশববাবু প্রভৃতি বরিশালে এক বিবাহোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি আমার এই পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া গোস্বামী মহাশয়কে এখানে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী আসেন। বিজয় বাবু মহাশয় অনেকদিন এখানে থাকেন। এসময়ে আমি দার্শনিক ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে বড় ব্যাপৃত হই। কিছুদিন পরই আমার বড় জ্বর হয়। এমন কি মরণাপন্ন হই। সেই রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ী যাই। সেখানে যাইয়া ভয়ানক পরীক্ষায় পড়ি। তখন সম্বল কেবল True Faith পড়া এবং প্রার্থনা করা। ইহার পর ঢাকায় ফিরিয়া আসি। কেবল উপাসনাতে ঈশ্বর-সত্ত্বা উপলব্ধি এবং তাঁহার প্রকাশে জীবনের পরীক্ষাকালে দণ্ডায়মান থাকা বড় কঠিন ক্রমে ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহাতে তাঁহাকে জীবনে সাক্ষাৎভাবে দেখিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইতে আরম্ভ করে। যখন যেজন্য অন্তরে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় তখন তাহার উপযোগী যাহা তাহাই সংঘটিত হইবার উপায় হয়। ধর্ম্মজীবনের ইহা একটী নির্দ্ধারিত নিয়ম, এই সময়ে ইহা আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। এই ব্যাকুলতার সময়ই আমাদিগকে কালীকচ্ছে পূজার সময় ব্রহ্মোৎসব করিবার জন্য যাইতে হয়। তাহাতে পথিমধ্যে আমার এরূপ প্রার্থনা হয় যে তুমি যদি সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত না হও তবে কাহাকে লইয়া উৎসব করিব? কিন্তু তখন ভাবিতে পারি নাই যে কালীকচ্ছে যাইয়া ভয়ানক পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। এই প্রার্থনার পর পথিমধ্যে একদিন ঈশ্বর তাঁহার ব্যক্তিত্ব Personality এমনি ভাবে প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এক একটী মানব যেমন অন্যান্য হইতে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি, ঈশ্বরও তদ্রূপ সকল হইতে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি, ইহাই তিনি বুঝিতে দিলেন। তাহাতে বেশ প্রস্তুত হইয়া উৎসবে যাই। কালীকচ্ছে প্রসিদ্ধ দেওয়ানবাড়ীর চণ্ডিমণ্ডপে দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোৎসব হইবে; এই সংবাদেই গ্রামস্থ ভদ্রলোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বিরুদ্ধভাব উদ্দীপিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা উৎসাহী ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী। উৎসব আরম্ভ হইবার উপক্রমেই কোন কোন ভদ্রলোক বাড়ীর মধ্যে মেয়েদিগকে অবলম্বন করিয়া ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহাতে এমন আশঙ্কা হইল যে আমাদিগকে নানারকমে লাঞ্ছিত

হইতে হইবে। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন; তাহাতেই তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এবং কেহ আসিয়া যখন প্রস্তাব করিল আপনারা চলিয়া যান. তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, একখানা নৌকা পাইলেই আমরা চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমি বলিলাম যিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন তিনি আসিয়া আমাদিগকে যাইতে না বলিলে আমরা যাইতে পারি না। তাহাতে বিরোধীগণ উত্তেজিত হইল, উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। হৃদয়বান শ্রদ্ধেয় আনন্দচন্দ্র নন্দী তাঁহাদের কথায় কিছু বিচলিত হইলেন কিন্তু কৈলাসচন্দ্র কিছুতেই টলিলেন না। তিনি এবং তাঁহার পশ্চাতে আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে উপাসনাতে যোগদান করিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তন হইল। এইরূপে জীবনের গুরুতর পরীক্ষায় ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের মহিমা দেখিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। এখন ব্যক্তি ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়া জীবনের পথে—কেবল ধর্ম্মজীবন নয়,—সাংসারিক জীবনের পথেও যে তিনি একমাত্র সহায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে জীবনের ব্রত পালনে আরও উৎসাহের সহিত রত হই। সম্মুখে যেসকল গুরুতর পরীক্ষা প্রতীক্ষা করিতেছিল তন্নিমিত্ত আমাকে এখন ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে দেখা দিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমি যেমন নিয়মিত মত বন্ধের সময় নানা স্থানে যাইয়া প্রচার করিতে লাগিলাম সেই সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ নানা পরীক্ষাও উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কোন কোন জ্যেষ্ঠ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ হইয়াছে। এখন ক্রমে সেই বিরুদ্ধ ভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় দীন বাবু মহাশয় আমাকে স্বর্গরাজ্য বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ-পূর্ব্বক এক পত্র লিখেন এবং আমারও যদি সেই মত হয় তাহা হইলে তিনি আমার সহায় হইতে পারেন এই উল্লেখ করেন। তিনি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক স্বর্গরাজ্যকে কল্পনা মনে করেন। মানব তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিলেই স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারে। স্বর্গীয় ও মানবীয় ধর্ম্মের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তিনি স্বীকার করেন না। আমাকে অবশ্যই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া পত্রোত্তর দিতে হইল। তাহাতেই তাঁহা হইতে আমাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। তিনি এখন বিধিমত সঙ্গতের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেন। জালালদ্দিনকে নিয়া আহার করাতে আমাদের বিরুদ্ধে যেমন গ্রামে তদ্রূপ ঢাকায় নানা গণ্ডগোল উপস্থিত। গ্রামে আমরা সমাজচ্যুত। সহরে আমরা ঘৃণিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জালালদ্দিনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে হিন্দু হইয়াছেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। এ সময়ে মুঙ্গিরে ভক্তির ব্যাপার হওয়াতে অগ্রণীগণ মধ্যে ভয়ানক পরীক্ষানল প্রজ্জ্বলিত। আমরাও তাঁহাদের অনুগামী। সেজন্য আমাদের বিরুদ্ধেও নানা কথা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়া স্বনামখ্যাত মাননীয় শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষ

সহ উপস্থিত হন। তাঁহাদের সহানুভূতিতে আমরা উৎসাহিত। দুর্গামোহন বাবু সমাজচ্যুতির পরিণাম যে ভাল বৈ মন্দ নয় তাহা তাঁহার জীবনের পরীক্ষায় উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের দৃষ্টান্তে সঙ্গতের মধ্যে বিলাত যাওয়ার ভাব উদ্দীপ্ত হয়। এবং প্রথমতঃ প্রীতিভাজন কৃষ্ণগোবিন্দ বিলাত যাত্রা করেন। এইরূপে সঙ্গতে মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত। ইহাতে আমার জীবনে যে কি সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এখন সঙ্গতের সভ্যদের পার্থিব উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

এই সময়ে কয়েকটী বন্ধুসহ কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমি কতিপয় যুবক বন্ধুসহ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় প্রথম গমন করি। তথায় পঁহুছিয়াই কলুটোলার বাড়ীতে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন তাঁহারা উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের উপস্থিতির একটু পরেই উপাসনা শেষ হয়। আমাদের কথা শুনিবামাত্রই তিনি অগ্রসর হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গকে আলিঙ্গন করি" বলিয়া আমাকে আলিঙ্গন দেন। ময়মনসিংহেরও একজন উপস্থিত আছেন, ইহা কেহ বলাতে তিনি উত্তর করিলেন ময়মনসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত। এইরূপে স্নেহাদর পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হয়। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গেও সেই সময়ে সাক্ষাৎ হয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় তাঁহার নিকট আমার পরিচয় দেন। তিনিও আমাকে স্নেহালিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান এবং উচ্চাভিলাষ পরিহার করিতে উপদেশ করেন। আমি যখন তাঁহার এবং ভক্ত কেশবচন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজে সামান্য কারণে আরও বিচ্ছেদ ঘটিবে, ইহার উল্লেখ করিলাম, তিনি এই বলিলেন, আমার হৃদয় তোমাদের সঙ্গে আছে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে বাহিরে যোগ রক্ষা করিতে গেলে আমার পুরাতন বন্ধুদিগকে ছাড়িতে হয় বলিয়া আমি তাহা পারি না। এই উৎসব মুঙ্গিরের আন্দোলনের পরের উৎসব; সুতরাং ইহাতে গোস্বামী মহাশয়কে অনেকটা স্বতন্ত্র থাকিতে দেখিলাম। এবং "The Future Church of India" ভারতবর্ষের ভাবী ধর্ম্মসমাজ বিষয়ে টাউন হলে বক্তৃতা হয়। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কিরূপে পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ এবং অবতারবাদ হইতে বিমুক্ত থাকিতে হইবে সেই বিষয়ের অনেক তত্ত্ব প্রকাশ পায়। উৎসব দিনে ভক্তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন সম্বন্ধে আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে কেশববাবু স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ এই যে যাঁহাকে ভক্তি করা যায় তাঁহার প্রতি কখনও এরূপ ব্যবহার হইতে পারে না যাহাতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় এবং তাঁহার সদ্‌গুণ গ্রহণই ভক্তের প্রতি শুদ্ধ ভক্তির প্রধান লক্ষণ। উৎসবান্তে বিদায় গ্রহণকালে তিনি বলিলেন—আজ বিদায় দিতে পারি না। আগামীকল্য সাধুসেবা হইবে তাহা গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে। এই কথাতে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, আমি তো সাধু নই যে আমি তাহা গ্রহণ করিব। তাহাতেও বিদায় দিলেন না।

উৎসবের সময় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া মন্দিরের নিকটস্থ হইলে পর "চল ভাই সবে মিলে যাই পিতার ভবনে" গানটীতে আমার অন্তরে যেমন আশার সঞ্চার তদ্রূপ আচার্য্য সদলে কেমন অগ্রে পিতার ভবনে যাইতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহার পূর্ব্বে আমি যখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য করিতে আরম্ভ করি তখন যাই এই শ্লোকটী পাঠ করিলাম "যাঁহারা তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের একজন হইবার জন্যই আদিষ্ট"। আচার্য্য এবং তাঁহার বন্ধুদিগের সঙ্গে আমার কি বিশেষ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই কীর্ত্তনের সময় তাহা আরও উজ্জ্বলরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। এইরূপে যারপরনাই উৎসাহান্বিত হইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসি। এখন জীবনের ব্রতপালনে আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম এবং ব্যক্তি ঈশ্বরের কথা শুনিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা হইতে লাগিল।

এই সময়ে কোন কোন বন্ধু আমাকে পরিবার আনয়নের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার মধ্যে প্রিয়দর্শন প্যারীমোহনই বড় তাড়া দিতে লাগিলেন। বয়সে বালক হইলেও চিন্তাতে ও ভাবেতে পরিপক্ক ছিলেন। আমারও অন্তরে এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য আমি যখন উপাসনার সময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া এই বিষয়ে আলোপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থী হইলাম, হৃদয়ে স্পষ্ট এই শুনিলাম "অগ্রে তুমি আমাকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, তাহার পর তোমার পত্নীকে তোমার সঙ্গিনী করিতে প্রবৃত্ত হইও। তাহা না হইলে তোমারও পশ্চাৎপদ হইতে হইবে।" ইতিপূর্ব্বে একবার বাড়ীতে গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাতে তিনি আশ্চর্য্যরূপে আমাকে হাতে ধরিয়া চালাইয়াছিলেন কিন্তু তখন তাঁহার কথা এরূপ স্পষ্ট শুনি নাই। সেই পরীক্ষাটী উল্লেখযোগ্য। হিন্দু প্রথানুসারে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করার সময় উপস্থিত হয়। তাহাতে আমি বড়ই চিন্তিত হই এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করি। তাহাতে আমি এই বুঝিতে পারি যে তিনি যেরূপ পরিচালন করেন আমাকে তদ্রূপ পরিচালিত হইতে হইবে। তদনুসারে আমি বাড়ী যাই। নানাপ্রকারে তাড়িত হই। এমন কি বিবাহের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমি অন্তরে এই বুঝিতে পারি যে শারীরিক বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াও ঈশ্বরের হাতে সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। কাজেও তাই হইল। কয়েকজন আমাকে জোর করিয়া বিবাহের স্থানে নিয়া দণ্ডায়মান করিল। আমার সমক্ষে আমার পত্নীকে আনিয়া উপস্থিত করা মাত্র আমি "কোথা হে নাথ" ইত্যাদি সঙ্গীতটি করিয়াই একটী প্রার্থনা করিলাম। সেই প্রার্থনাতে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক একটী উপদেশ হয়, তাহাতে সূর্য্য যে জড় পদার্থ, তাহার পূজা হইতে পারে না, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। উপদেশ শেষ হইতে না হইতেই আমি চলিয়া যাই। ব্রাহ্মণ এবং বাদ্যকরেরা কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা দেখিয়া শুনিয়া অবাক। যেসকল মেয়েরা আমি কি করি দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহাদের

কেহ কেহ "জামাই তো বেশ নিজের ধর্ম্মটা প্রচার করিলেন" এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। এই ব্যাপারটীতে আমার ঈশ্বর-চালনার উপর বিশ্বাস বড়ই দৃঢ় হইয়াছিল। বলিতে কি আমার আর পরীক্ষার ভয় রহিল না। কিন্তু সঙ্গতের কোন কোন উৎসাহী ভ্রাতা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে ঢাকায় ফিরিয়া আমাকে একটু পরীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। ভ্রাতা রজনীকান্ত ঘোষ আমাকে পূর্ব্ববৎ এমন কি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে উপাসনার কার্য্যাদি করিতে দেখিয়া এই বলিলেন যে, আপনি বিপথগামী হইলে কখনও এইভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই কথায় আমার বড় আরাম লাভ হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। যথাসময়ে পত্নীর সঙ্গেও পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। তিনি কেবল পিতামাতার সম্মতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাই তাঁহাদের সম্মতি পাইলেন অমনি আমার সঙ্গে ঢাকায় আসিতে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে আমার সাংসারিক জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। এযাবৎ কেবল ভাইদিগকে লইয়া দিবারাত্র কাটাইতাম, এখন পরিবারের ভার স্কন্ধে পড়িল। আমি যদিও ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষা দিবার ভারপ্রাপ্ত হইলাম কিন্তু টাকা উপার্জ্জন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উন্নতি হইল না। এমন কি প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন পাওয়ার সম্বন্ধেও বিঘ্ন উপস্থিত। যখন একা ছিলাম ইহাতে কষ্ট পাইতে হইত না। যখন বেতন পাওয়া যাইত তখন নিজের ব্যয়ের জন্য কিছু রাখিতাম আর বক্রি যাহা তাহা বাড়ীতে পাঠাইতাম। এই কষ্টের সময় এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে ঈশ্বর আমার জীবনের বিশেষ কার্য্য সাধনে প্রস্তুতির জন্যই আমাকে এরূপ কষ্টে ফেলিতেছেন। আমি ইতিপূর্ব্বেই মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করি। যখন আহারের পূর্ব্বে ভগবচ্চরণে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার করুণার দান বলিয়া আহারের দ্রব্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিতাম তখনই মৎস্য মাংস আহার করিতে সঙ্কুচিত হইত। তাহার পর একদিন সন্ধ্যাকালে যাই পাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছিলাম অমনি তিনি আমাকে বুঝিতে দিলেন যে জানিয়া শুনিয়া জীবহিংসা করিবার পাপ এখনও ছাড়ি নাই। সেই হইতে আমি মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করি। আমার ছোটকাল হইতে মৎস্য মাংসে বড় আসক্তি ছিল; কিন্তু তাহা সহজে দূর হওয়ার ঘটনাতে ঈশ্বরানুগ্রহই উজ্জ্বল দেখিলাম।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোককে তিনি ক্রমে তাঁহার বিশেষ কাজের জন্য এইরূপ প্রস্তুত করিলেন। এখন প্রতি বৎসর বন্ধের সময় প্রচারে বাহির হই এবং মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসবের সময় কলিকাতায় যাই। ঢাকায় মধ্যে মধ্যে সমাজের কার্য্য করি। এসময়েও আচার্য্যের কার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় করিতেন। প্রথমে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হই। তিনি বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষালাভ না করিয়াও নিজে পড়াশুনা করিয়া বিদ্বান হইয়াছেন এবং সুন্দর উৎসাহ ও ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া ঘরে পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার বড় উৎসাহ হয়। পূর্ব্বে মহাত্মা পার্কার প্রভৃতির ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়িতে সাহস পাইতাম

না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্তে Channing, Parker, Newman, Missa Cobbe প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হই। কিন্তু Bible, Pilgrim's Progress, Anxious Enquirer, Ecce Homo Reason in Religion, Scientific Basis of Faith প্রভৃতি পড়িয়া আত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাই। সঙ্গতে থাকিয়াই এ সকল উপায়ে অগ্রসর হইতে থাকি। এমতাবস্থায় একদিকে যেমন সঙ্গত সভা ঢাকার উন্নতিশীল ব্রাহ্মমণ্ডলীতে, তদ্রূপ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইবার উপক্রম হয় এবং একটি মন্দির এই সহরের মধ্যস্থলে প্রশস্ত স্থানে নির্ম্মিত হইবার আয়োজন হইতে থাকে। শ্রদ্ধেয় দীন বাবু প্রধান উদ্যোগী। পূজনীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন সহায়কারী। ইতিমধ্যে আমাকে একটী গুরুতর পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল। এখানে উচ্চশ্রেণীর ডেপুটী বাবু রামকুমার বসু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গতে যোগদান করাতে আমার প্রতি বড় ক্রুদ্ধ হন এবং আমাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তুমি খারাপ শিক্ষা প্রদান কর। তাহাকে তুমি আর তোমার নিকট যাইতে দিও না। তদুত্তরে আমি লিখি আপনার পুত্রকে কখনও খারাপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। সঙ্গতে আসিয়া ভাল শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আমার নিকট আসিতে অনুরোধ কিম্বা নিষেধ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আপনি তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন। তিনিও ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। ইহার পর একদিন আসিয়া আমাকে খুব গালাগালি করেন এবং তাঁহার পুত্রকে মারিয়া ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া যান। তাহাতেও তাঁহার পুত্র সঙ্গতে যোগ দিতে ক্ষান্ত না হওয়াতে তিনি ঢাকা কলেজের Principal Brennand সাহেব এবং Prof. Livingstone সাহেবকে ইহা জানান কিন্তু ব্রেনেণ্ড সাহেব তাঁহাকে বলেন যে আমি যতদূর জানি যে সৎসংসর্গ তোমার পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তাহার পিতা হইলে ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম এবং তাহাকে উৎসাহ দিতাম। লিবিংষ্টোন সাহেব বলিলেন তোমার পুত্র পড়াশুনাতে ভাল। তাহা না হইলে তাহাকে আমি শাসন করিতাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাহার সেই স্বাধীনতার উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ইহাতেও পরাস্ত না হইয়া শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর বাবুর নিকট আমার বিরুদ্ধে এক পত্র লিখেন এবং আমাকে তাঁহার আরমানিটোলাস্থ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা সমপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই রামকুমার বাবু Junior scholarship পাইয়া Senior scholarship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ পরীক্ষা না দিয়া মুন্সেফ হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার দরুন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হন। তাঁহার পত্র পাইয়া পূজনীয় মিত্র মহাশয় প্রথমতঃ উভয় সঙ্কটে পতিত হন। আমাকেই বা কিরূপে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলেন এবং তাঁহার বন্ধুর অনুরোধই বা কি প্রকারে রক্ষা না করিয়া পারেন। কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে বঙ্কের বিরুদ্ধে তো নিশ্চিত দোষের উল্লেখ হয় নাই। তাহা মনে হওয়াতে তিনি

কয়েকটী বড় বড় দোষের নাম করিয়া বন্ধুকে লিখেন—এই সকল দোষের যদি একটী দোষও বঙ্গের আছে তুমি জানিয়া থাক, তাহা পত্রোত্তরে আমাকে জানাইবা মাত্র আমি তাঁহাকে আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব। এই পত্র লিখিয়া আমাকে সব জানান এবং লিখেন যে তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। এক একটী গুরুতর পরীক্ষার সময় তাঁহার এরূপ পত্র পাইয়া আমি উৎসাহিত হইয়াছি। বস্তুতঃ তিনি আমার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে পিতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয় যেমন ছাত্রজীবন সম্বন্ধে, মিত্র মহাশয় তদ্রূপ ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমার পিতা। এইরূপে পিতৃহীন মাতৃহীন হইয়াও এই সংসারে যে কত পিতামাতার স্নেহ ভোগ করিয়াছি তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। ভ্রাতৃহীন হইয়াও বিদ্যালয়ে, সঙ্গতে এবং ব্রাহ্মসমাজে যে কত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাইলাম তাহা সংখ্যা করা যায় না। আমার ভাগ্য ও জীবন সামান্য হইলেও বড় বিস্ময়জনক এবং ইহাতে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত না দেখা অসম্ভব। তাহাতেই সাহস-পূর্ব্বক আমার ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য নিজে লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি।

এখন সঙ্গতের মহা পরিবর্ত্তনের সময় নিকটবর্ত্তী। একদিকে আমাদের অঞ্চলের কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্যের মধ্যে অনেকে কলিকাতায় যাইয়া পড়াশুনা করিতে প্রবৃত্ত এবং কেহ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সময়ে পুনরায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এখানে আসেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে রুষ্ট বৈ তুষ্ট নন। কারণ মুঙ্গেরের আন্দোলনে তাহাদিগের বিরুদ্ধভাব অত্যন্ত প্রজ্বলিত। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে কে বাধা দিতে পারে? কেশবচন্দ্র এ যাত্রা আসিয়া ঢাকাতে অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা একটী গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। বিশেষভাবে উপাসনা ও উপদেশ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। কিন্তু যখন সভ্য নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হয় তখন দেখিতে পাইলেন যে এখানেও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যে বড় গোল। তাহাতে তিনি আমাকে কলিকাতায় বিভক্ত হওয়াতে ব্রাহ্মদের কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা জানাইয়া এখানে যাহাতে তাহা না হয় তৎসম্বন্ধে সাবধান করেন। এমন কি এখানে যদি তাহা হয় তজ্জন্য তোমাকে দোষ দিব, এরূপ বলেন। আমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে তাঁহার দ্বিতীয়বারের আগমনে এই ঘটে যে তাঁহার "ভক্তি" বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণে আমি বিশ্বাস ও ভক্তির মধ্যে যে গুরুতর সম্বন্ধ ও প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি বিশ্বাসকে সূর্য্যের এবং ভক্তিকে পূর্ণচন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন। বিশ্বাস সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়কে অনুতপ্ত করে এবং ভক্তি পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় শান্তি ও আরাম প্রদান করিয়া থাকে। বক্তৃতার শেষ ভাগে ঢাকাতে কি কেহ পূর্ব্ববঙ্গের সেবা করিবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিবে না! এই বলিয়া খুব উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন। তাহা যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলেন আমার এরূপ প্রতীতি হয়। সেই রাত্র পূর্ণিমার রাত্র ছিল, আমি বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই

নদীতটে যাইয়া পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নার মধ্যে বসিয়া ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করি। তাহাতে স্পষ্ট এই কথা শুনি "প্রতীক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে আমার যেরূপ ব্যবহার করিবার আছে তদ্রূপ ব্যবহার করিব।" ইহাতেই আমি আরাম পাই। ইহার পর আমি ভক্তের নিকট যাইয়া উপস্থিত হই। অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এ যাত্রা যাওয়ার প্রাক্কালে আমাকে তিনি এই বলেন—"তুমি এতদিন ভাইদিগকে লইয়া বড় আনন্দে দিন কাটাইয়াছ। এই আনন্দ আর ভোগ করিতে পারিবে না। শীঘ্রই নিরানন্দ উপস্থিত হইবে।"

ইহার কিছুদিন পরেই স্নানান্তে মিলিতভাবে উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করি। এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া কেবল ভ্রাতা প্যারীমোহন এবং জালালদ্দিন মিঞার সহানুভূতি পাই। অন্য কেহই ইহাতে সায় দিলেন না। এই দুইজনকে লইয়া প্রথমতঃ প্রত্যহ স্নানান্তে উপাসনা আরম্ভ করি। ইহাতে প্যারীমোহন এবং জালালদ্দিন মিঞা বিশেষভাবে আমার ধর্ম্মবন্ধু হন। এই সময়ে আমাদের ব্রজসুন্দর বাবু মহাশয়ের বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হয়। এই বাড়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতেরও অবস্থান্তর উপস্থিত হয়। এখন পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মালোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আমি সপরিবারে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গালাবাজারে বাস করিতে আরম্ভ করি।

উভয় সাংসারিক এবং ধর্ম্মজীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন

এখন মাত্র দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার সঙ্গে বাস করিতেন। পারিবারিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্ত্তনের কারণ উপস্থিত। এমতাবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্ত্তী। কলিকাতা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কয়েকটী বন্ধুসহ এখানে আসিলেন। তাহাতে আমাদের মধ্যে খুব উৎসাহ। এসময়ে সঙ্গতস্থ পুরাতন অনেক যুবকবন্ধুই কলিকাতায় ছিলেন। অনেকে তথায় বিশেষ উৎসাহসহকারে মন্দিরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতে কেহ কেহ সেই সময়ে পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। উৎসাহীদের মধ্যে ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র এবং কালীনারায়ণ এখানে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের ব্যাপার আরম্ভ হইল। এই উৎসবে আমার ধর্ম্মজীবনের এই বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। নগরকীর্ত্তনে বাহির হইবার প্রাক্কালে আচার্য্যদেব যখন প্রার্থনা করেন তখন এই উপলব্ধি করিলাম যে পরমপুরুষ পরমেশ্বর সত্য সত্যই উপস্থিত হইয়া নগরকীর্ত্তনে সকলকে নিয়া বাহির হইলেন। ইহাতে ব্যক্ত ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল। নগরকীর্ত্তন আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু আয়োজন কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। এই সময়ে আমরা বহুসংখ্যক দীক্ষিত হই। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ভ্রাতা অম্বিকাচরণ সেন ছিলেন।

উৎসবান্তে আচার্য্যদেব তাঁহার কোন কোন বন্ধুসহ কলিকাতায় ফিরিয়া যান। আমরা কয়েকজন ময়মনসিংহে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আহূত হইয়া তথায় যাই। শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও আমাদের একজন হইলেন। এইরূপে বিশেষভাবে আহূত হইয়া এই প্রথম প্রচারে বাহির হই। তথায় উৎসব আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হয়। তথা হইতে প্রচারার্থ সেরপুরে যাওয়া হয়। এই হইতেই বন্ধের সময় উৎসবোপলক্ষে নানাস্থানে আহূত হইয়া যাইতে আরম্ভ করি। বলিতে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া পরিচিত হই। কিন্তু এখনও স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করি নাই। আচার্য্যদেব উৎসবান্তে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের পক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে অনেকদিন কার্য্য করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু কখনও বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া না দিলে মন্দির ছাড়িবে না।

এখন পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত। শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় আমাকেই আচার্য্যপদে বরণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় দীন বাবু আমার বিরুদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন বঙ্গ কেশব বাবুকে অবতারের মত মনে করে। ইহাতে মিত্র মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমাকে এক পত্র লিখেন এবং আমি কেশব বাবুকে কিরূপ মনে করি এই প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে আমি এই লিখি, আমি কেশব বাবুকে একজন এমন লোক মনে করি যে তিনি বাস্তবিকই ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের ধর্ম্ম করিবার জন্য ব্যগ্র এবং তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করাই আমি আমার জীবনের ব্রত মনে করি। ইহা ব্রজসুন্দর বাবু সভাপতিরূপে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে জানিতে দেন। তাহাতে আমিই আচার্য্য পদে বরিত হই। শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় আমাকে বলেন যে আমি ঈশ্বরাভিপ্রায় বুঝিয়াই তোমাকে আচার্য্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু তাহাতে গোল উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি জানিতাম যে কেশব বাবুকে তুমি কখনও অবতার মনে কর না। তবু অন্যের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি এরূপ প্রশ্ন করিয়া তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কিছু মনে করিবে না। এইরূপে গুরুতর সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমাকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ইহার পর আমিও একজন কমিটীর সভ্য হই।

মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় কেশব বাবু এখানেই প্রথমতঃ তাঁহার শীঘ্র বিলাত গমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। আমি যখন মাঘোৎসবোপলক্ষে কলিকাতায় যাওয়ার কথা শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর বাবুকে জানাই তখন তিনি বলেন এখানে মন্দিরের কার্য্য করিবার জন্য একজনকে ঠিক করিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। তাহা না হইলে যাইতে পারিবে না। একদিকে স্কুলেও যেমন কাহাকে রাখিয়া যাইতে হইত ; এখন দেখি মন্দিরেও তাহাই করিতে হইবে। একটী নিম্নশ্রেণীর বন্ধুর নাম উল্লেখ করাতে মিত্র মহাশয় বলিলেন তুমি যে আচার্য্যের কার্য্য কর ইহাই যথেষ্ট। নবকান্তকে এই কার্য্যে রাখিয়া যাইতে পারিলে

ভাল হয়। যাহা হউক কোনপ্রকারে বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় গেলাম। তথা হইতে উৎসবান্তে ফিরিয়া আসিবার সময় আচার্য্যদেব বিশেষভাবে বিদায় প্রদান ও গ্রহণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন "যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, এই পথে অগ্রসর হইয়া এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হওয়া চাই, সেই অবস্থা হইতে যদি আর ফিরিতে পার ফিরিবে। কিন্তু সেই অবস্থাতে উত্তীর্ণ না হইয়া কখনও ফিরিও না।" আরও বলেন "ভ্রাতাদের সম্বন্ধে এই ভাব অন্তরে থাকা চাই, যে একজনের মৃত্যু অপেক্ষা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ অধিকতর শোকের ব্যাপার।" এইরূপে বিশেষ দুঃখিত অন্তরে ঢাকায় ফিরিয়া আসি। সেই বৎসর অনেকে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত, আনন্দচন্দ্র নন্দী এবং গুরুপ্রসাদ ভৌমিক ছিলেন। শেষোক্ত ভ্রাতা জাহাজে আমাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য কিনা? এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন। তদুত্তরে তাঁহাকে আমি বলি যে হয় ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানবমণ্ডলীর সেবাতে নিযুক্ত হওয়া চাই, না হয় দারপরিগ্রহ করা প্রয়োজন। ইহার পরই ইনি দারপরিগ্রহ করেন। ইনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি একজন সাধক। প্রধান আচার্য্যের প্রিয়পাত্র। ইঁহার ধ্যান ধারণাতে বড়ই অনুরাগ ছিল। ইহার দৃষ্টান্তে আমার বিশেষ উপকার হয়। এখন একদিকে মন্দিরের কার্য্য অপরদিকে বঙ্গোপলক্ষে প্রচার কার্য্য করাই আমার ধর্ম্মজীবনের ব্রত। স্কুলে ক্রমে সাহায্যকারী দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। এ সময়ে আবার দীন বাবু আমাকে আচার্য্যপদ চ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে যুবকদের মধ্যে মহাগোল উপস্থিত হয়। আমি একজন কমিটীর সভ্য। আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। কিন্তু উপাসনাতে আমি এই বুঝিলাম যে আমারই আচার্য্য থাকা প্রয়োজন। তাহাতে আমি সাহসী হইয়া তদ্রূপই মত দি। ইহার পর কিছুদিনের জন্য গোস্বামী মহাশয় আসিয়া এখানে থাকেন। তাঁহার থাকাকালীন তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করেন। ইহার মধ্যে একটী বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব হয় এবং কমিটীর অনুমতি চাওয়াতে দীন বাবুর প্রস্তাবানুসারে খোলকর্ত্তাল ব্যবহার না করিয়া উৎসব করিতে অধিক সংখ্যক সভ্য অনুমতি দেন। আমি তাহাতেই সম্মত হই। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় এবং কোন কোন উৎসাহী ভ্রাতা এক বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন; তাহাতে আমি অসম্মত হওয়াতে গোস্বামী মহাশয়ের সন্দেহ হয় যে আমি মন্দির হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া এরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ এইরূপে একবার বিভক্ত হয়। উৎসব স্বতন্ত্র স্থানে সম্পন্ন হয়। তাহাতে আমার উপদেশের বিষয় ছিল "প্রকৃত অনুতাপ" এবং মধ্যাহ্নকালে আমাদিগকে কিরূপ মেষপালের ন্যায় মিলিতভাবে চলিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ হয়। ব্রজসুন্দর বাবু প্রভৃতি সায়ংকালে বিজয় বাবুকে মন্দিরে যাইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা করিতে প্রস্তুত

হইলেন না। তিনি যাইয়া কাজ করিলেই সেই সময়ে মন্দির পরিত্যাগ করিতে হইত না।

ইহার পর কুলীন কন্যা বিধুমুখীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার দরুণ ঢাকাতে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ঘটনাক্রমে গোস্বামী মহাশয় এবং অঘোরবাবু মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে প্রচারার্থ যাওয়া হয়, তথা হইতে আমাদের গ্রামে গেলে পর সকলকে ভয়ানকরূপে নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হইতে হয়। তখন আমার প্রথম পুত্র জন্মে। সকলে মনে করেন যে আমি তৎসম্বন্ধে বাড়ীতে বিশেষ অনুষ্ঠান করিবার জন্যই সকলকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তাহাতেই তাঁহারা বড় ক্রুদ্ধ হন এবং অত্যাচার করেন। এইরূপে নিপীড়িত হইয়া বাড়ীতে না যাইয়াই আমাকে দলের সঙ্গে ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে হয়। অঘোর বাবু মহাশয়ের অনুরোধে মন্দিরে একদিন মিলিতভাবে উপাসনা হইয়াছিল। কিন্তু যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহা কি আর সহজে বিদূরিত হইবার কথা। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কয়েক বৎসর যুবক ভ্রাতাদিগের সঙ্গে নানা প্রকারে কষ্ট পাইতে হয়। অপরদিকে মন্দিরেও বিধিমত কার্য্য চলে না। মাননীয় অভয় বাবু বলিলেন আপনারা থাকিতে মন্দিরে মধ্যে মধ্যে উপাসনা পর্য্যন্ত হইতে পারে না এ কেমন কথা! আমরাও অর্থাভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া কিছুদিন সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করি। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকাতে তিনি ইহা জানিতে পারিয়া তাহার আফিসের এক কামরায় প্রতি রবিবার সায়ংকালে উপাসনা করিতে অনুমতি দেন। এইরূপে অনেক দিন বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং টাকাকড়ির ভাবনাও আমাকেই ভাবিতে হয়। তাহার পর মাননীয় দুর্গামোহন বাবুর চেষ্টায় আমরা পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে স্থান পাই। প্রাতঃকালে আমাদের বিশেষ প্রণালী অনুসারে এবং সায়ংকালে কিছুটা অন্য প্রণালীতে আমারই উপাসনা করিতে হইত।

ইতিমধ্যে আমি পোগোজ স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হই। বন্ধুবর্গ বিশেষ উৎসাহ সহকারে “Boys Academy” নামে একটী স্কুল স্থাপন করেন এবং আমাকে কিছুদিন ইহার ভার বহন করিতে অনুরোধ করেন। ইহা লইয়াও আমাকেই অবশেষে বিশেষ গোলে পড়িতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আমাকে সেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব স্কন্ধে বহন করিতে হয়। এ সময়ে ক্লার্ক সাহেব আমার প্রতি সদয় হইয়া যাহাতে কিশোরী বাবুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে Boys Academy মিশিয়া যাইতে পারে তাহার উপায় করেন। তাহাতেই রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই স্কুলের কার্য্যাধ্যক্ষগণ আমাকে ছাড়িতে সম্মত নন। তাঁহাদের অনুরোধে আমাকে এই স্কুলেও কিছুদিন কার্য্য করিতে হয়। এমতাবস্থায় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আসিয়া আমাকে কয়েকটী বন্ধুসহ বন্ধের সময় চট্টগ্রামে উৎসবোপলক্ষে লইয়া যান। তথায় প্রচার কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হয়। এখানেই মানবাত্মা যে ব্রহ্মচর তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পায়। উৎসবান্তেও

সকলের ইচ্ছা যে আমি তথায় থাকি। কিন্তু একদিকে ঢাকায় স্কুল খুলিবে এবং অপরদিকে আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মিবার সময় নিকটবর্ত্তী আমি কিছুতেই ঢাকায় না ফিরিয়া পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে প্রীতিভাজন গোবিন্দচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় রাজেশ্বর বাবু উপাসনার কার্য্য করিতেন। আমি তখনই তাঁহাকে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে দেখি। এইরূপে ঢাকায় ফিরিয়া আর কোন মতেই স্কুলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হৃদয় চায় না এই অবস্থাপন্ন হই। ছাত্রেরাও ইহা অনুভব করিতে পারিয়া আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারি না। একদিকে আমার মনের এরূপ অবস্থা অন্যদিকে আমার পরিবারের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু আমি আর কিছুতেই স্কুলের কাজে থাকিতে না পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার বিরুদ্ধে আমার পরিবার একটী কথাও বলিলেন না। তখন আমার পারিবারিক অবস্থা যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। এই কারণে এবার মাঘোৎসবে যাইতে অক্ষম হই। তাহাতে আচার্য্যদেব বড় ব্যথিত হন এবং ভ্রাতা রজনীকান্তের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে জানাইতে বলিয়া দেন। কেশবচন্দ্র আমার পরম ধর্ম্মবন্ধু এবং বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি কেবলই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন আমি কবে বিষয়কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচার কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিব। ইতিপূর্ব্বে আমার কোন যুবক বন্ধু কলিকাতায় যাইয়া তাঁহাকে ঢাকায় সংস্থাপিত প্রচারসভার প্রতি সহানুভূতি করিতে অনুরোধ করেন; তাহাতে তিনি বলেন বঙ্গচন্দ্র কি করিবেন তাহা না জানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এমতাবস্থায় মাঘোৎসবের সময় আমার অনুপস্থিতি তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

আমার বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ভ্রাতা বিহারীলাল সেন স্বতঃই আমার সাহায্যকারী হন। তিনি প্রথমতঃ আমার, পরে বহুদিন আমার এবং প্রচারকমণ্ডলীর সাহায্যকারীরূপে এখানে কার্য্য করেন। তাঁহার পরে ভ্রাতা অন্নদাপ্রসন্ন সেন সেই ভার বহন করেন। আমি এখন প্রচার কার্য্যে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া ক্রমেই গুরুতর পরীক্ষায় পড়িতে বাধ্য হই। তাহাতে বিশেষ শিক্ষালাভ করি।

প্রচারক জীবন

আমি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারকের জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ একাকীই ছিলাম। মণ্ডলী মধ্যে গোলমাল থাকার দরুণ মণ্ডলীর কার্য্য তত সুন্দর মতন চলিত না। এমন কি দৈনিক মিলিত উপাসনাতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে

লাগিল। কোন কোন আমার ভ্রাতা ত্রুটী দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। ইহার সূত্রপাত পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এখন তাহা প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় দুই তিনটী পরিবারসহ ভ্রাতা বিহারীর বিশেষ সাহায্যে একত্র বাস করিবার উপায় হওয়াতে দৈনিক পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রতিদিন কেবল কয়েকটী ভ্রাতাসহ উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম; এখন ভ্রাতা ভগিনীসহ পারিবারিকভাবে উপাসনা করিবার অধিকার পাইলাম। যেমন এখানে সামান্যরূপে আমার সঙ্গে তদ্রূপ আচার্য্যদেবের সঙ্গে গুরুতরভাবে পূর্ব্ববঙ্গের যুবক ভ্রাতাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ স্বর্গাভিমুখে যাত্রীদলের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের গতিরোধ হইবার উপক্রম হয়। এ সময়ে আমি ভ্রাতা ভুবনের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতায় যাই। তিনি একটী ব্রাহ্মণ বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই সর্ব্বপ্রথম তিন আইনানুসারে সম্পন্ন হয়। আচার্য্যদেবের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ভাবগতি দেখিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হই।

পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে এখন প্রচারকার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল এবং যথাসময়ে প্রচারকমণ্ডলী গঠিত হইবার উপক্রম হইল। এক একজন আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমি আশা করিতে পারি নাই যে এইরূপে আসিয়া তিনি প্রচার ব্রতে ব্রতী হইবেন। আমার জীবনের একদিক—আমার দিক—যেমন কাল, ইহার অপরদিক—ঈশ্বর ক্রিয়ার দিক—তদ্রূপ ভাল এবং আশ্চর্য্য। আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই তাহা তিনি আশ্চর্য্যরূপে আমার মলিন ক্ষুদ্র জীবনে সংঘটন করিয়াছেন। এখন কলিকাতার অগ্রণী মণ্ডলসহ ক্রমে অধিকতর মিলিত হই। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই এরূপ ভাব দেখা যায় যে তাঁহারা ইচ্ছা করেন আমি কলিকাতায় যাইয়া একেবারে তাঁদের দলভুক্ত হই, তাহাতে আমি তথাকার Missionary Conference-এ এক লিখিত প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করি। আচার্য্যদেব সভাপতিরূপে তাহা সকলকে জানাইলে পর সকলেই আমাকে সাদরে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সকলের পর আচার্য্যদেব বলেন, না তাহা হইতে পারে না। ইহার পর আমাকে বিশেষভাবে এই বলেন পূর্ব্ববঙ্গে তোমাকে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে তোমার ভাবে (spirit-এ) যোগ রাখিতে হইবে। তাহাতে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে আমাকে পূর্ব্ববঙ্গেই থাকিতে হইবে। ইহাতে আমার কার্য্যক্ষেত্র তখনই নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, এবং আমি অনন্যমনে একাগ্রচিত্তে পূর্ব্ববঙ্গে আমার প্রচার ব্রত উদ্‌যাপনে রত হইয়া আচার্য্যদেবের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে এরূপ লক্ষিত হইতে লাগিল যে আমাদের মধ্যে পরিমাণে সামান্য হইলেও ঈশ্বরালোক কলিকাতার ন্যায় প্রকাশিত। আমরা সেই আলোতে চলিতেই বাধ্য। তাই যখন "Behold the light of Heaven in India" বিষয়ে আচার্য্যদেব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে ঢাকাতেও সেই

আলো আমাদের উপযোগী রকম প্রকাশ পাইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বস্তুতঃ কি কলিকাতায় কি ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মানবীয় দিকের প্রতি ব্রাহ্মদের যেরূপ দৃষ্টি, ঐশ্বরিকদিগের প্রতি তদ্রূপ নহে, ইহা ক্রমেই স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঢাকাতেও আমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আচার্য্যদেব যখন সাধকশ্রেণী বিভাগ করেন তখন আমি তথায় ছিলাম। সেই সময়ে আমার হৃদয়ে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়েই আচার্য্যদেবের সঙ্গে কিছুকাল বেলঘরিয়া বাগানে অবস্থিতি করি। আমি উৎসবান্তে সাধকশ্রেণী বিভাগ হইলে পর চট্টগ্রামে যাই। ভ্রাতা দুর্গানাথ আমার সঙ্গী ছিলেন। তথায় যাইয়াই গোলপাহাড়ে আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরকে নির্জ্জনে প্রকাশিত দেখিয়া "এই লও আমার প্রাণ মন" ইত্যাদি গানটী করিয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক হৃদয়ের ভার বিমুক্ত হই। বিশেষভাবে সেইবার নোয়াখালী ও বরিশালে প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। ভ্রাতা ভুবন তখন নোয়াখালী, ভ্রাতা জগবন্ধু ও রজনীকান্ত তখন বরিশালে ছিলেন। প্রচারক জীবনেও প্রথম ভাগে আমি ময়মনসিংহে এবং চট্টগ্রামে যাইয়াই বিশেষ আলো প্রাপ্ত হই। এই দুই স্থানের বন্ধুগণ আমার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে গ্রথিত। একবার ঘোর পরীক্ষার সময় যখন ময়মনসিংহে প্রচারার্থ যাইতেছিলাম তখন পথিমধ্যে নৌকায় ঈশ্বর তাঁহার চিরপ্রসন্ন দৃষ্টি এরূপ প্রকাশ করিলেন যে আমার অন্তরের ভয় ভাবনা একেবারে বিদূরিত হইল। সেবার ময়মনসিংহে আমি দীর্ঘকাল থাকি এবং শ্রদ্ধেয় গোপী বাবু মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তখন আমি যেমন সাংসারিক অভাবে তদ্রূপ কোন কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধ ভাবে নিপীড়িত। ইহাতেই প্রচারক জীবন ক্রমে বিকশিত হয়। কেবল ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর রাখিয়াই যে এ জীবন যাপন করিতে হইবে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই প্রকারে কিছুদিন ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পুনরায় আলোতে উপস্থিত হইবার উপক্রম হয়। এই সময়ে বিলাতস্থ বন্ধুগণ আনন্দমোহন বসু এবং প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিয়া আমার পরিবারের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। ভ্রাতা বিহারীলালের নিকট এই সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হই। কোথা হইতে ভগবান অযাচিতরূপে কি করেন তাহা কাহার সাধ্য বুঝিয়া উঠে?

এখন আশ্রম সংস্থাপিত হইল। অপরদিকে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোপযোগীরূপে পূর্ব্ববাঙ্গালা হিতসাধিনী সভা সংস্থাপিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য সভাসমিতি আহূত হয়। ঢাকা কলেজের প্রিন্‌সিপেল Ewbauk সাহেব এক সভার সভাপতি হন। সভাতে "Religious Sense" বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করি। ব্রাহ্মসমাজে "Improvement of the Whole Man" বিষয়ে একটি উপদেশ পাঠ করি। এবং মিস্ কার্পেণ্টারের ঢাকায় আগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, সেই উপলক্ষে "We walk by Faith, not by Sight" বিষয়ে মন্দিরে উপদেশ পাঠ করি। তাহাতে বাঙ্গালী দ্বারা ঢাকাতে একখানা ইংরাজী পত্রিকাও পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া

আক্ষেপ করি। তাহার কিছুদিন পরই ভ্রাতা শশীভূষণ দত্ত East পত্রিকা বাহির করেন। তিনি তখন আসামে শিক্ষা বিভাগের Deputy Inspector ছিলেন। কয়েক মাসের জন্য বিদায় লইয়া আসিয়া এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহার পর ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র ও কালীনারায়ণ ইহার ভার গ্রহণ করেন। এখন আমাদের সুদিন উপস্থিত। প্রচারকমণ্ডলী গঠিত। ভাই ঈশানচন্দ্র, দুর্গানাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, গণেশচন্দ্র, বিহারীলাল প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহযোগী। ভাই কৈলাসচন্দ্র এবং কালীনারায়ণ বিশেষভাবে কার্য্যক্ষেত্রের সহযোগী। তখন বঙ্গবন্ধু পত্রিকা দ্বারা আমাদের কার্য্যের বিষয় সাধারণ্যে প্রচারিত। আশ্রমে কতকগুলি পরিবার সম্মিলিত। ইহা সঙ্গতের ন্যায় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমানিটোলাস্থ ভবনে উন্নত অবস্থাতে অবস্থিত। আবালবৃদ্ধবনিতা মিলিতভাবে দৈনিক উপাসনাতে কৃতকৃতার্থ। মহা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আশ্রম সংস্থাপন কালেও যেমন মধ্যভাগেও তেমন কোন কোন ভ্রাতা হইতে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। বাধা ভিন্ন কোনও কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে এ জীবনে দেখিতে পাই নাই। আচার্য্যদেব কখনও আমাকে অনেক বিষয়েই সাক্ষাৎভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই কিন্তু চারিটী বিষয়ে তাহা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে বলাতে যখন আমি তাঁহাকে বলিলাম ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তিনি বড় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ East কাগজ হস্তগত হওয়া চাই। তৃতীয়তঃ চট্টগ্রামে যাইবার সময় তিন মাসের অধিককাল ঢাকা হইতে অন্যত্র থাকিতে পারিবে না। চতুর্থতঃ প্রচারক ভ্রাতাদের কয়েকজনকে পূর্ব্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে কেন্দ্রস্থলরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে ফল্গু নদীর ন্যায় হইলেও সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইবার উপক্রম আশ্রমেই হইয়াছিল। প্রাণযোগ এবং হৃদয় যোগার্থীরূপে ভাই বৈকুণ্ঠনাথ এবং দুর্গানাথ সাধনে রত হইয়াছিলেন। যোগ কি, ভক্তি কি, ইহার কিছুই আমি পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কেবল ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহে এক উৎসবের সময়ে "প্রেমিক সাধক" বিষয়ে আমাকে উপদেশ করিতে হইয়াছিল। সেই উপদেশে আমার অন্তরে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ঈশ্বর এই ক্ষুদ্র জীবনে ক্রমে ক্রমে কেমন তাঁহার সত্বা উপলব্ধি, তাঁহার প্রকাশ দর্শন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব অবলোকন এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে দিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সেই "প্রেমিক সাধক" বিষয়ক উপদেশে প্রকাশিত তাঁহার প্রতি "রতি এবং প্রীতি" তত্ত্বসুধারসে অভিষিক্ত কবিবার উপায় করিলেন। কিন্তু প্রকৃত রতি ও প্রীতি তাঁহার প্রতি জন্মিতে পারে না যদি তাঁহার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত না হওয়া যায়। তাই ঈশ্বর এই দ্বিবিধ যোগ সম্পন্ন হইবার পথ খুলিয়া দিলেন। এমন গুরুতর ব্যাপারের পর যেরূপ গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইবার তাহাই হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতায়ও প্রীতিকুল ব্যতীত ঈশ্বর অনুকূল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন এই উপদেশ হয়। এবং বেলঘরিয়া বাগানে আচার্য্যদেব একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পে একটী মধুমক্ষিকাকে অনুপ্রবিষ্ট

এবং একটী পোকাকে তাহার পশ্চাতে বিচরণে রত দেখিয়া উচ্চৈস্বরে আমাকে ডাকিয়া তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন "দেখ মউমাছি ভক্তের ন্যায় গুণ গুণ রব করিতে করিতে এই গোলাপে অনুপ্রবিষ্ট, আরও দেখ এই পোকাটি নীরবে তাহার পশ্চাৎগমনে কেমন রত। উভয়ই একপথাবলম্বী।" এই সময়েই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন আমাকে যদি কেহ এখন "চৈতন্যদাস" বলেন তাহা হইলে আমি বড় তুষ্ট হই। আরও এই বলেন আমার ভাব, কি ধর্ম্মবন্ধুগণ, কি সংসারী বন্ধুগণ, হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নন। কারণ আমি যেমন ধর্ম্মরাজ্যের তদ্রূপ সংসারের লোক। আমার ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া সংসারিগণ আমাকে বুঝিতে অক্ষম হন এবং আমার সাংসারিক ভাব দেখিয়া ধর্ম্মবন্ধুগণ বিস্মিত হন। আমার এই ভাগ্য। তাঁহার সঙ্গে এক গাড়ীতে বেলঘরিয়া উদ্যান হইতে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর নিকট দিয়া আসিবার সময় লালাবাবুর আশ্চর্য্য বৈরাগ্যের বিষয় আমাকে বলিতে বলিতে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নির্জ্জন সংসর্গ পূর্ব্বে আর আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। ইহার পরই আমি আত্মসমর্পণার্থ চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। আচার্য্যদেব ইহার কিছুই জানিতেন না। বেলঘরিয়া উদ্যানে আর একটী ঘটনা হয়। আচার্য্যদেবকে আমি কি প্রণালীতে দৈনিক জীবন যাপিত হওয়া চাই এই প্রশ্ন করি। তিনি কিছু না বলিয়া এক টুকরা কাগজে তাহা লিখেন এবং বিছানার উপর ফেলিয়া রাখিয়া উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হন। আমার দৃষ্টি হঠাৎ সেই কাগজ-টুকরার উপর নিপতিত হয়। আমি তাহা পড়িয়া দেখি আমার প্রশ্নোত্তর তাহাতে লিপিবদ্ধ।

এখন সেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইবার উপক্রম যে আন্দোলনে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলিত এবং বিভক্ত হয়। এখনও ঢাকায় আমরা তাহার আভাস পাই নাই; তখন এখানে East পত্রিকা এবং E. B. Press লইয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছিল। ইহাতে আশ্রম ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইল। এমতাবস্থাতে আমি মাঘোৎসবে কলিকাতায় যাইয়া তথা হৈতে মুঙ্গেরে যাই। ঢাকায় কিছুদিন পূর্ব্বে "Early Marriage" বিষয়ে আমি প্রকাশ্যে এক প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে বাল্যবিবাহ যে অস্বাভাবিক, এমন কি পাপজনক, তাহা ব্যক্ত করি। ইহার পর কলিকাতায় পহুঁছিয়াই আচার্য্যদেবের প্রথমা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হওয়াতে তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু কলিকাতায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত দেখি। সে বিষয়ে তাঁহারা আমার সহানুভূতি প্রত্যাশা করেন ইহাও বুঝিতে পারি। এ বিষয়ে আচার্য্যদেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া এই জানিলাম যে তিনি মহারাজার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বুঝিয়া সম্মতি দিয়াছেন কিন্তু উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিবাহকার্য্য যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অবশেষে রাজাকে অবিবাহিত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত নন বলিয়া বিবাহকার্য্য এরূপ সম্পন্ন হওয়ার প্রস্তাব ঠিক হইল যে রাজা এবং রাণী যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হন সে পর্য্যন্ত স্বামীস্ত্রীরূপে অবস্থিতি করিতে

পারিবেন না। তাহাতে আচার্য্য সম্মত হওয়াতেই মহান্দোলনের আয়োজন হইল। তিনি সেই বৎসর টাউন হলে "The King cometh robed in Righteousness and Mercy" (অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় এবং দয়ার সমন্বয়) বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাহা গণ্ডগোলের দরুন ছাপা হইতে পারে নাই। আমি এই মহাগণ্ডগোলের উপক্রম সময়ে কলিকাতা হইতে মুঙ্গেরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। যখন আচার্য্যদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম তিনি আমাকে বিবাহে তাঁহাদের সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলেন। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালানবিশ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিবাদে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন আপনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, এখানেও নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইলে, আপনাকে তাহার আচার্য্য হইতে হইবে। মহালানবিশ মহাশয়কে তাহাতে এই জানাই যে আমি যতদূর ঠিক বোধ করি তাঁহাদের সঙ্গে সহানুভূতি করিব। এবং এই বলি যে তাঁহারা যেন আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না করেন, তাঁহার প্রতি যেন দোষারোপ না করেন।

মুঙ্গেরে যাইয়াই ঈশ্বরের শ্রীচরণে আচার্য্যদেবের কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার জন্য প্রার্থনা করি। তাহাতে তিনি আমাকে এই জানিতে দেন যে "এই ব্যাপারে কেশব ঈশার কেমন অনুগামী এবং নিজের ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া আমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিবার ব্যাপারটা কি তাহাই প্রমাণিত হইবে।" ইহাতে আমার প্রাণ সুস্থির হইল এবং আমিও যাহাতে এই উপলক্ষে ঈশ্বরেচ্ছাই জীবনে সম্পন্ন হইতে দিতে পারি তজ্জন্য প্রস্তুত হইবার ব্যাপারে ক্রমে ব্যাপৃত হইতে লাগিলাম। বস্তুতঃ মুঙ্গেরে যে কিছুদিন ছিলাম সেই সময়ে ঈশ্বর আমাকে আচার্য্য-রূপে ভাবী পরীক্ষার জন্য মন্দিরের উপাসনাতে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই হৃদয়ঙ্গম করিতে দিলেন যে "কাটামুণ্ড" হইয়াও পূর্ব্ববঙ্গে মার গুণানুকীর্ত্তন করিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য মুঙ্গেরে যাইবার কথা শুনিয়াই শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় বলেন "পূর্ব্বদিকের চন্দ্র কেন পশ্চিমে উদিত হইবার উপক্রম?" তদুত্তরে আমি অতর্কিতভাবে বলি "অস্তমিত হইবার জন্য।" মুঙ্গেরে থাকাকালীন ভ্রাতাদের প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ তাহাতে আচার্য্যদেবের চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ কটাক্ষ দেখিলাম। ইহাতেই তাঁহারা সাধারণের মনকে খুব উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কারণ বিরুদ্ধ কথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমি প্রতিবাদকারী বন্ধুদিগকে আচার্য্যদেবের প্রতি এরূপ আক্রমণে বিরত থাকিবার জন্য করযোড়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহান্দোলনে কাহার কথা কে গ্রাহ্য করে? মুঙ্গেরে থাকিয়াই ঢাকার সংবাদ পাইতে লাগিলাম। আশ্রম আর নাই। প্রতিবাদ করিবার আয়োজন হইতেছে। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ শীঘ্র ঢাকায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ পত্র লিখিলেন। তাঁহার অন্তরেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এই লিখিলাম যে "আমি আছি" জীবন্ত ঈশ্বরকে যখন আমরা বিশ্বাস

করি তখন আর ভয় কি? তাহার পর ভাগলপুরে সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসি। সেই উৎসবে ঈশ্বর তাঁহার "সত্য-শিব-সুন্দর" রূপ আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করেন। ভাই দুর্গানাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। মুঙ্গেরে শ্রদ্ধেয় কালীকুমার বসু, নবকুমার রায় এবং তথাকার উপাচার্য্য মহাশয়ের সংসর্গে বড়ই উপকার হয়। পুণ্ডরীক মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হই। ভাগলপুরের উৎসবে উপদেশের পর তিনি তাঁহার মধুর সঙ্গীত "সত্যং শিবং সুন্দরম্ রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে" গানটী করিয়া বড়ই মোহিত করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় যত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম ততই ঘোর অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া "Lily Cottage"-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একেবারে বাড়ী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিলাম। তখনও আচার্য্যদেব কোচবেহার হইতে ফিরেন নাই। কোন কোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহাপরীক্ষাতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে অনেককেই ঘোর অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল। মুঙ্গেরে না যাইয়া সেই সময়ে ঢাকায় থাকিলে না জানি আমার ভাগ্যে কি ঘটিত! ঈশ্বর যে সামান্য লোককে কেমন হাতে ধরিয়া রক্ষা করেন তাহাই প্রমাণিত হইল। এখন ঢাকায় ফিরিয়া শুনি আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য কোন কোন বন্ধু আমার স্ত্রীকে নানা ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া আমার দিকেই চাহিয়াছিলেন। এবং আমি ঢাকায় ফিরিলে কেবল তাহাই জানাইলেন।

আমার প্রচারক জীবনের প্রথম মহাপরীক্ষা

ঢাকায় মহান্দোলন। আমাকে বেদীচ্যুত করিবার আয়োজন। জনরব যে আগামী রবিবার আমাকে বেদীচ্যুত করা হইবে। তাহাতে আমার পুরাতন ছাত্রগণ দলে দলে সেদিন মন্দিরে আসিতে লাগিল। আমি যাহাতে বেদীচ্যুত না হই সেজন্য তাঁহারা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত, এরূপ শুনিতে পাইলাম। যাহা হউক ছাত্রগণ এবং অধিকবয়স্ক লোকে মন্দির পরিপূর্ণ। আমি নির্ভয়ে মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক যথাসময়ে বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম। উপাসনান্তে উপদেশে স্পষ্টাক্ষরে ইহা ব্যক্ত করিলাম যে স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত যেমন বেদীতে বসিবার অধিকার পাই নাই তদ্রূপ বেদীচ্যুত হইতে হইলে তাঁহার ইচ্ছাতে হইব ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক। এই বলিয়া উপদেশ শেষ করিলাম। ইহার পর সপ্তাহেই প্রকাণ্ড সভা করিয়া আমাকে বেদীচ্যুত করা হয়। কিন্তু কিছুদিন আমরা তথাপিও রবিবার প্রাতঃকালে মন্দিরে পূর্ব্ববৎ আমাদের

প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিতে থাকি। ক্রমে তাহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মন্দির হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর এরূপ অবস্থা যে আমরা একত্র হইয়া দৈনিক উপাসনাও করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের সমবেত ভাব বিনষ্ট হইবার উপক্রম। এমতাবস্থাতে এখন নির্জ্জনে কোনও উদ্যানে যাইয়া ধ্যানস্থ হওয়াই একমাত্র সম্বল হইল। মনে হইল ঢাকায় বুঝি আর থাকা যাইবে না। দলমাত্র গঠিত হইতেছিল, এমতাবস্থায়ই তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। এখন কি উপায়? এইভাবে যাইয়া ঈশ্বর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে না করিতেই তিনি প্রকাশ করিলেন; "তুমি জান না এই অন্ধকারের ভিতর হইতে আমি কি বাহির করিব?" ইহাতে এমন আশার সঞ্চার হইলে যে খুব উৎসাহের সহিত নির্জ্জনে সংগোপনে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে রত রহিলাম। ক্রমে অন্যান্যেরাও আসিয়া নির্জ্জনে তাঁহার শ্রীচরণে মাথা রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন মুসলমান উদ্যানস্বামী কয়েকটী সঙ্গীসহ সেই সময়ে বাগানে উপস্থিত। ইহার পূর্ব্বেই আমার অন্তরে যেন কেমন কেমন বোধ হইয়াছিল। যাই আমি উঠিলাম অমনি উদ্যানস্বামী বলিলেন আমাদের ধর্ম্মমতানুসারে ভূতপ্রস্থিকে আমাদের স্বকীয় ভূমিতে পূজা করিতে দেওয়া নিষেধ। তাহাতে তাঁহার সঙ্গী একজন বলিলেন ইঁহারা ভূৎপ্রস্থি নন। ইঁহারা ব্রাহ্ম। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া সেই বাগানে যাইয়া আর উপাসনা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে পুনরায় আমাদের মিলিত দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হইল। এবং অপরাহ্ণে রমনার টিলায় যাইয়া ধ্যানধারণা প্রার্থনাদির পর সমবেতভাবে সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এইরূপে ঈশ্বর নিজগুণে অন্ধকারের ভিতর হইতে যাহা বাহির করিবেন বলিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইল। সেই বিহারীলাল ইতিপূর্ব্বেই আমাদিগকে ছাড়িয়া ঢাকা হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন। এখন নূতনভাবে একটী খাটী দলরূপে দাঁড়াইবার জন্যই হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। বিশ্বাস ভিন্ন দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই এ বিষয়ে প্রার্থনা হইতে লাগিল। তাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগিল। বিরোধীদের মধ্যে কি কেহই বিশ্বাসী নহে? এমন কি প্রতিবাদকারীদের মধ্যে কলিকাতার কোনও অগ্রগণ্য ব্যক্তির নাম করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও কি বিশ্বাসী নহেন? তাহাতে বেশ বুঝা গেল ধর্ম্মজীবনের পথে যে বিশ্বাসে দণ্ডায়মান হইয়া কেবলই অগ্রসর হইতে হয় তাহা তখনও পরিগৃহীত হয় নাই। এই সময়ে ইষ্টের সম্পাদক আমাকে বলিলেন আপনি কেন এই বিবাহের প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত নন তাহা প্রবন্ধাকারে লিখুন। তাহা ইষ্টে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রবন্ধে আদেশের মতটী সমর্থনপূর্ব্বক যাহা লিখা হইয়াছিল তাহা তিনি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। বঙ্গবন্ধুতেও তাহার সম্পাদক সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহা ছাপাইয়াছিলেন। এ সময়ে আচার্য্যদেবের এক পত্র পাই, তাহাতে তিনি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও আমি বিচলিত হই নাই, এজন্য সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক যাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছি-

তাঁহাদের প্রতি প্রীতিপোষণ করিতে ক্ষান্ত না হইয়া যে দুই চারিজন এখনও সঙ্গে আছেন তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গে রত থাকিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেল। এ সময়ে আচার্য্যদেবের কথানুসারে প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন আমাকে ভাই দুর্গানাথসহ যতশীঘ্র পারি কলিকাতায় যাইতে লিখেন। তখন একটী Expedition-এর ভাব আচার্য্য অন্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে যোগদান করিবার জন্যই এই আহ্বান। কলিকাতায় যাইয়া অনেকদিন অপেক্ষার পর নানা আপত্তি সত্বেও আচার্যদেবের অনুগ্রহে Expedition দলের একজন হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত উপায়ে ভাই দুর্গানাথকেও সঙ্গে রাখিয়া নানাস্থানে একমাস কাল পরিভ্রমণ করি। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ সেই সময়ে দেরাদুনে ছিলেন। ভাই ঈশানচন্দ্র তখন ময়মনসিংহে ছিলেন। এই Expedition-এ যোগদান করিয়া আচার্য্যদেবের অটল বিশ্বাস এবং নির্ভর দেখিয়া গুরুতর শিক্ষালাভ করি। তখন আমার পরিবারের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। আর একটী সন্তান জন্মিবার সময় উপস্থিত। তাহা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা যাঁহার আশ্রিত তাঁহার সব বিষয় নির্দ্ধারিত আছে। তাঁহার কাজে কোনও গোল হইতে পারে না। আমরা দুইজন দলসহ কলিকাতায় ফিরিয়া তথা হইতে ঢাকায় আসি, এবং তাহার পর আমার সন্তান জন্মে। তাহার পরই আবার মাঘোৎসবোপলক্ষে কলিকাতায় যাই। তথায় যাইয়া আচার্য্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করেন বাড়ীর অবস্থা কি? তদুত্তরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তাঁহাকে জানাইলাম, অমনি তিনি বলিলেন, দেখ ঈশ্বরের কার্য্যশৃঙ্খলা কিরূপ! তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাকে তথাকার মণ্ডলীর সঙ্গে কার্য্যতঃ সংসৃষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম তিনি আমাকে এক উৎসবে জীবনে প্রকাশিত তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে বলেন। তাহার পর প্রচার বৃত্তান্ত পাঠ করিতে দেন। একবার মন্দিরে যখন তিনি উপদেশদানে ক্ষান্ত ছিলেন তখন এক রবিবার উপদেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহার পর আমাকে সমস্ত দিনের উৎসবে মধ্যাহ্নে উপাসনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা বাধাবিঘ্ন সত্বেও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে অগ্রণীদলের সঙ্গে ক্রমে অধিকতররূপে সংসৃষ্ট হই। ইতিমধ্যে একবার ভাদ্রোৎসবে যাইয়া তাঁহাকে পীড়িত দেখি। তিনি উপাসনা করিতে পারেন না। এমন অবস্থা, তাহাতে শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ বলেন, এবার কিজন্য আসিলেন? যাহাতে তাঁহার উপাসনাতে যোগদান করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। আমি তদনুসারে আচার্য্যদেবকে আমাদিগকে লইয়া উপাসনা করিবার সুবিধা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলেন নিয়মিত উপাসনান্তে তোমরা আমার নিকটে আসিলে আমি উপাসনা করিতে পারি। কিন্তু আমি বসিয়া উপাসনা করিতে পারিব না। তাহা অন্যান্যকে জানাইলে আমরা কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হওয়ার পর তিনি শায়িত অবস্থাতেই উপাসনা করিলেন।

প্রথম দিনই প্রার্থনাতে নববিধানের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল। কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একটী নূতন দলরূপে কেমন জন্মিবার পূর্ব্বেই বিশ্বাসীদিগকে মনোনীত হইতে হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই বীজই ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া নববিধানরূপে বিঘোষিত হইয়াছিল। নববিধান বিঘোষিত হওয়ার সময় তিনি আমাকে পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের প্রেরিতরূপে গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃগণ কৈলাসচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, বৈকুণ্ঠনাথ, দুর্গানাথ, দীননাথ, এবং চন্দ্রমোহন আমার সহকারীরূপে গৃহীত হন। প্রীতিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্যারীমোহন চৌধুরী মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার করিবেন ইহাও প্রকাশিত হয়। ইহার পর আচার্য্য আমাকে বলেন এখন আর তুমি কলিকাতার কাহাকেও চাহিও না। তোমরা পূর্ব্ববঙ্গে দলবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে থাক। তোমরা সকলে ঐক্যভাবে কার্য্য করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান সংস্থাপনে ব্যবহৃত হও। তদনুসারে উৎসবের পরই আমরা কলিকাতা হইতে দলবদ্ধভাবে প্রচার কার্য্যে বাহির হই। আমাদের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় যোগদান করেন। ইহার পূর্ব্বে আমরা ঢাকা হইতেও বিশেষভাবে আয়োজন করিয়া প্রচার যাত্রীদলরূপে বাহির হইয়াছিলাম। উভয় সময়েই বড় গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার পরই আমার হৃদয়ের প্রিয় সন্তান যতীশকে হারাইতে হয়। এই উপলক্ষে আমার হৃদয় খুব ব্যথিত হয় এবং এই ঘটনায় ভগবানের ইচ্ছা সম্পন্ন হউক বলিয়াই সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। এইরূপে ঢাকাতে নববিধান সমাজ সংস্থাপিত হওয়ার সূত্রপাত হয়। এখন East এবং East Bengal Press ক্রয় করা যায়। একদিকে যেমন নববিধান সংস্থাপনোপযোগী গূঢ় গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হইতে থাকে অপরদিকে বাহিরেও মন্দির ও পল্লী সংস্থাপনের আয়োজন হয়। এবং ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী সমাজ সংস্থাপিত হয়। যে ভাদ্র মাসে আমাদের মধ্যে একটী বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল সেই ভাদ্র মাসেই এই সমাজ সংস্থাপনোপলক্ষে উৎসব হয়। এই উৎসবে একদিকে ঈশ্বর জননীরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শিশুসন্তানরূপে আমাদিগকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে হইবে এই আদর্শ দেখিতে দেন; অপরদিকে পবিত্রাত্মার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ক্রমে ঈশ্বর সন্তানত্ব লাভ করিতে হইবে তাহাও প্রকাশ করেন। এই উৎসবেই আমাদের মধ্যে মহাপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই যে পুরাতন মানবরূপে আমাদের এক একজনকে এবং সকলকে কেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পবিত্রাত্মা নূতন মানুষ করিয়া লইবেন এবং অবশেষে শিশুসন্তানরূপে মাতৃক্রোড়ে স্থান দান করিবেন। আমার ন্যায় নরাধমকে তিনি ভ্রাতা ভগিনীর সেবাতে ব্যবহারপূর্ব্বক এই গুরুতর ব্যাপার সংঘটনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার সহকারীরূপে যে কয়েকজনকে ব্যবহার করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেবাই আমার বিশেষ ব্রত হইল। তাঁহারা যাহাতে পবিত্রাত্মার একটী খাঁটী দলরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন তৎপ্রতিই আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

কোথায় মহাত্মা কেশবচন্দ্র কলিকাতার বন্ধুদিগকে লইয়া অগ্রণীরূপে অগ্রসর হইতেছেন। আর কোথায় আমি নানামতে অনুপযুক্ত ক্ষুদ্রলোক কয়েকটী বন্ধুসহ তাঁহার পশ্চাতে অনুগামী দলরূপে অগ্রসর হইবার জন্য আহূত এবং মনোনীত। নববিধানেই এইরূপ নূতন ব্যাপার সম্ভব। এক পবিত্রাত্মাই উভয় দলের নেতা। কিন্তু আমার মতন কাল আত্মাকে কয়েকটী ক্ষুদ্র আত্মাসহ পবিত্রাত্মা ভগবান পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত ইহা অত্যন্ত নূতন। তাহাতে পবিত্রাত্মা নিজকে প্রকাশ এবং স্বর্গীয় লীলা প্রকটন করিতে এইরূপ সুযোগ পাইলেন যে প্রথমতঃ তিনি কেমন "সত্যেতে গঠিত কায় জ্ঞান জ্যোতি শোভে তায়" এই পরিচয় দিয়া অবাক করিলেন। এই সঙ্গীতটী যখন যেখানে গীত হইয়াছে সেখানেই সকলে স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাহার পর "আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে ষোল আনা প্রেম দে আমারে ইত্যাদি" কথা শুনাইয়া যখন দলে প্রকাশ পাইয়াছিলেন তখন সকলের অন্তরের কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পর তিনি যে আর কাহারও প্রাপ্য প্রেম হরণ করিতে প্রস্তুত নন তাহাও প্রকাশ করেন। তখন ঢাকায় যে সকল নূতন সঙ্গীত হইত তাহা আচার্য্যদেব শুনিতে ভালবাসিতেন। এমন কি "আমি পবিত্রাত্মা হরি" সঙ্গীতটী নববৃন্দাবন নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে পবিত্রাত্মা ভগবান যাহাতে আমাদের হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাস্তবিকই প্রত্যেকের প্রাণপতি, জীবনসখা এবং দলের দলপতি এবং দলসখা হইতে পারেন তাহার উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা যে কি অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার! কলিকাতায় আচার্য্যদেব যদিও কেবলই পবিত্রাত্মা ভগবানকে এইরূপে দেখিতেন, অন্যের চক্ষে তিনিও প্রতিভাত না হইয়া পারিতেন না। এইরূপে তাঁহাতে পুরাতন এবং নববিধানের সমন্বয় সম্পন্ন হয়। এবং তিনি নিজেকে উপদেষ্টা বলিতেও প্রস্তুত না হইয়া কেবলই নববিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানে কালতে ভাল হরি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত। যাহাতে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত এবং সকলে সমবেতভাবে তাঁহাকেই দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হই এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত হৃদয় হইয়া যাহাতে অগ্রে তাঁহার এক একটী লোক এবং তাঁহার একটী দল হইতে পারি তাহারই উপায় যথেষ্টরূপে হইতেছিল। ইহার মধ্যে আমাদের মানবীয় দুর্ব্বলতা এবং মলিনতাও প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু এখনও আমাদের এরূপ অবস্থা যে তাঁহার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের দৃষ্টি এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই সকলের এবং প্রত্যেকের আগ্রহ। সুতরাং আমাদের দুর্ব্বলতা মলিনতার প্রতি কাহারও কটাক্ষ করিবার অবসর নাই। এখন কিরূপে যে জীবন বহিয়া যাইতেছে তাহাও ভাবিবার জো নাই। অনুকূল বায়ুতে এবং অনুকূল স্রোতে পড়িয়া সকলের জীবনতরীই এক কাণ্ডারীর দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে পরিচালিত হইতেছিল। একটী প্রচার যাত্রায় ভাই বৈকুণ্ঠ ও দুর্গানাথ মিলিতভাবে পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বরিশালে আশ্চর্য্যরূপে ব্যবহৃত হন। এখানে "ঈশ্বর দেখা" দল বলিয়া আমরা পরিচিত হই। যেখানে যাই সেখানেই আশ্চর্য্য ব্যাপার।

ঈশ্বরের প্রকাশ, তাঁহার বাণী, তাঁহার ক্রিয়া জাজ্জল্যমান। কাহারও সাধ্য নাই ইহা অস্বীকার করে। ভালভাবে স্বীকার না করিলেও বিদ্রূপ করিয়া স্বীকার করে। একি যে সে কথা! ইহাতে আমার জীবনে—পাপজীবনে ফল্গু নদীর ন্যায় হইলেও—পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রতি হৃদয়ের প্রীতিস্রোত এমনি বহিতেছিল যে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। এইরূপে পবিত্রাত্মা ভগবান সদলে আমাকে একেবারে পরাস্ত করিলেন। ভাই শশীভূষণ ও মহিমচন্দ্র আসিয়া মিলিত হইলেন। ভাই অন্নদা ইহার পূর্ব্বেই অপ্রকাশিতরূপে দলের অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের এক একজনকে পবিত্রাত্মা ভগবান আমার নিকট বিশেষরূপে পরিচিত করিতে লাগিলেন। এইদিকে যেমন সুখের দিন যাইতেছে ঐদিকে আচার্য্যদেবের ক্রমেই রঙ্গভূমি হইতে তিরোধানের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। হিমালয় হইতে শেষপত্রে আমাকে লিখেন "মার দুধ উথলিয়া পড়িতেছে, খুব খাও, খুব খাও। মার কথা যে আমাকে বলে তাহাকে আমি খাইয়া ফেলি। আরও কত দেখিবার ও শুনিবার আছে। শেষপর্যন্ত কি আমার থাকিবে?" "তোমার দল। আমার দল, তোমার দুর্গানাথ আমার দুর্গানাথ" ইতিপূর্ব্বে একপত্রে এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে আমার ও আমাদের জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করিবার সাধ্য কি? যেমন ভক্তবৎসল তেমনি ভক্ত! আমাদের যারপরনাই সৌভাগ্য। এরূপ সৌভাগ্য সম্ভোগের সময় এই পৃথিবীতে কি সুখেরই সময়! আমার ন্যায় নরাধমকে পবিত্রাত্মা ভগবান জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে দিলেন ইহা কি তাঁহার সামান্য লীলা। এই জীবন লীলাকাহিনী বিবৃত না করিয়া কি থাকা যায়? কত ভগবদুক্তি যে এই জীবনে শুনা গিয়াছে। কত ভগবৎক্রিয়া যে স্বতঃপরত জীবনে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সে সমুদয় সাধ্য কি লিপিবদ্ধ করি! এখানে তো মানবীয় দিক অতি সামান্য, তাহাতে আবার তাহা মলিন ও জঘন্য। এবং ঈশ্বরের দিক বড় উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল। তাহা দেখিয়াই আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত। কে আর নিজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে? ভাল ছাড়িয়া কাল দেখিতে কার ইচ্ছা হয়? এমন কি নিজের পাপের কথাও উল্লেখ করিতে গেলে রসভঙ্গ হয়। অন্তরে অনুতপ্ত হওয়াই সার। তাহাতে নরকে স্বর্গের অবতরণ দেখা সম্ভব হয়। পাপ পাপ বলিয়া চীৎকার করিলে পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রকাশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। সাধুর সাধুতা যেমন তাঁহার প্রকাশকে উজ্জ্বল করিতে পারে না তেমনি পাপীর পাপও তাহা ঢাকিতে পারে না। কিন্তু পাপী পাপী বলিয়া আত্মকীর্ত্তন করিলে পবিত্রাত্মার প্রকাশ দেখিতে অক্ষম হইতে হয়। সাধুর নামই যদি গোমূত্ররূপে নিপতিত হইয়া পবিত্রাত্মা হরির নাম কীর্ত্তনকে নষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে পাপীর নাম মহাগোমূত্ররূপে পবিত্রাত্মার নাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য নষ্ট করিবে ইহা আশ্চর্য্য কি?

প্রচার যাত্রা উপলক্ষে দলবদ্ধভাবে আমরা নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহকুমায় গিয়াছিলাম। সেখানে যেমন প্রচার কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল

তদ্রূপ এক একজনের আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব প্রকাশিত হইবার পথ খুলিয়া গিয়াছিল। ক্রমে দলের দেহের প্রাণ, মন, হৃদয় এবং বিবেকরূপে এক একজন পরিচিত হইলেন। এই চতুর্ব্বিধ যোগে পবিত্রাত্মা ভগবানের সঙ্গে দলটী মিলিত হইয়া তাঁহার দলরূপে দাঁড়াইবে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রত্যেকে অনায়াসে চতুর্ব্বিধ যোগ লাভ করিবার পথ পাইবে। এইরূপে দল পূর্ব্ববঙ্গে পবিত্রাত্মার দল হইয়া তাঁহার নববিধানের নব বিশ্বাসীদল কি তাহা সপ্রমাণ করিবে। এই দলের সেবকরূপে তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাকে যেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন তদ্রূপই সদলে অবতীর্ণরূপে তাঁহাতে বিশ্বাসী হইবার অধিকার দিলেন। ভাই অন্নদার এইরূপ বৈরাগ্যের ভাব ছিল যে তিনি অবাধে এই দলের সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভাই মহিমচন্দ্র দলে বিশ্বাসীরূপে পরিচিত হইলেন। এইরূপে দল এখানে গঠিত হইতে না হইতেই আচার্য্যদেব কলিকাতায় একদিন তাঁহার প্রার্থনাতে এই দল সম্বন্ধে অন্তরের বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের প্রেরিতরূপে তাঁহার অনুসরণই আমার জীবনের গতি এবং পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ভাব সংস্থাপনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে অন্যান্যের ন্যায় আমার সম্বন্ধেও তাঁহার অন্তরে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। একবার মাঘোৎসবের সময় যাহাতে কলিকাতায় প্রেরিতদের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারে এবং আমার প্রতিও যাহাতে কাহারও অসদ্ভাব না থাকিতে পারে এইজন্য পবিত্রাত্মার নির্দ্দেশে বলিলেন, আমাদিগকে অদ্য রজনীতে একত্র শয়ন করিতে হইবে। এবং যাঁহার বিরুদ্ধে যাঁহার অন্তরে অসদ্ভাব আছে, অসদ্ভাবাপন্ন ভ্রাতাকে তাঁহাব যাঁহার প্রতি অসদ্ভাব তাঁহার পা টিপিতে হইবে। তদনুসারে সকলেই একঘরে শয়ন করিলাম। আচার্য্যদেবও ছিলেন। প্রাতঃকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কি তোমার পা টিপিয়াছিল ? আমি যখন বলিলাম, হঁা, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে পা টিপিয়াছিল তাহা কি বলিতে পার ? আমি বলিলাম, ঠিক করিতে পারি নাই। এইরূপে তিনি প্রেরিত দলকে পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাবে মিলিত দেখিবার জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। ক্রমে তাহা যখন তিনি অসম্ভব বুঝিলেন, তখনই নানা দুঃখের কথা তাহাকে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে দেহত্যাগের পূর্ব্বে নব দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মার নিকটও তিনি একই সময়ে যেমন নিজের সম্বন্ধে আনন্দ তদ্রূপ মণ্ডলী সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার কথা এই বলিয়াছিলেন যে, মা তুমি ভক্তিপদ্মফুল যেমন আনন্দে গ্রহণ কর, ভক্তির দ্রোণফুলও তদ্রূপ আনন্দে গ্রহণ করিয়া থাক, ইহা আমি দেখিয়াছি। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে এবার অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবে যাইবার পূর্ব্বেই এখানে প্রার্থনা হইয়াছিল "মা, এবার তো তোমার ভক্তের বক্তৃতা শুনিতে পাইব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চুপে চুপে তাঁহার দুই একটী কথা শুনিতে পাইলেই, মা, ধন্য হইব।" বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। "ঐ দেখ আনন্দময়ী মা এসেছেন ধরাতলে, তাঁহার কোলে তাঁহার প্রিয় শিশু কেমন হাসে

খেলে" এই মধুর সঙ্গীতটীও হইয়াছিল। দেহত্যাগের প্রাক্কালে এই সঙ্গীতটী গীত হওয়াতে ভক্তমুখে বড় মধুর হাসি ফুটিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা "দেখ আমার মহাদেব হাসিতেছেন" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। এইরূপে আমার প্রচারক জীবনের প্রথম এবং প্রধান ভাগ কাটিয়া গেল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই একাদশ বৎসর কি আনন্দে ও উৎসাহেই চলিয়া গেল।

এই সময়ে ঢাকার বিধানপল্লী এবং মন্দির সংস্থাপিত হওয়ার বিশেষ আয়োজন হয়। কলিকাতায় মহাগণ্ডগোল। এমতাবস্থায় কলিকাতায় থাকার সময় ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই বুঝিলাম যে, আমাকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের কি দলবিশেষের সঙ্গে না মিলিয়া সকলের প্রতি একই ভাবাপন্ন থাকিতে হইবে। ইহাতে যে কি গুরুতর পরীক্ষায় পড়িতে হইবে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই তাহার আভাস পাইলাম। এই অবস্থায় কলিকাতা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসি। ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কেশবচন্দ্র হইতে যাহা পাইয়াছ সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কি করিতে পার? যদি সেজন্য তোমার প্রাণটি যায় তাহাও তোমাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে হইবে। এই মহাবাক্য অন্তরে সহজেই মুদ্রিত হইল। এখন ঢাকায় আসিয়া ক্রমেই পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পবিত্রাত্মা ভগবান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতে এবং স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বড়ই আশা হইল যে, এখানে তাঁহার যাহা করিবার ইচ্ছা তাহা আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইবে। ভক্তের স্বর্গারোহণের পরই পবিত্রাত্মা ভগবান আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে "বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার" বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এবং ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বিশ্বাসী যখন জীবনে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেয়, তখন আমাকে বড়ই নিপীড়িত হইতে হয়। ইহাও আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইল যে, নববিধি পালনের দুইটী উপায়। একটী শ্রেষ্ঠ আর একটী নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ উপায় "সকলে মিলিতভাবে দেখিয়া শুনিয়া আমার দ্বারা পরিচালিত হওয়া।" নিকৃষ্ট উপায় "আচার্য্যকে দলের সেবকরূপে ব্যবহার করিয়া দলকে যাহা দেখিতে শুনিতে সক্ষম করি তদ্দ্বারা পরিচালিত হওয়া।" এইরূপে পবিত্রাত্মা ভগবান যেমন তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন তদ্রূপ আমাদের মধ্যে এমন সকল ঘটনা সংঘটন করিতে লাগিলেন যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত ও দলগত বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। বলিতে কি পদে পদে, কথায় কথায়, বিশ্বাসের পরীক্ষা উপস্থিত। এখন যেন এ যাবত তিনি যাহা যাহা দেখাইয়াছেন এবং যে সকলকথা শুনাইয়াছেন তাহা যাহাতে ব্যক্তিগত ও দলগত জীবনে পরিণত হয় তাহার উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে ক্রমেই আমার জীবনের গুরুতর দায়িত্ব আমি বুঝিতে লাগিলাম। আমার যে ক্রমেই নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইবে তাহারও সূত্রপাত দেখিলাম। প্রথমতঃ মন্দির সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ প্রচারকদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরীক্ষা উপস্থিত হইল। এইরূপে

মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল, সামান্যরূপে পল্লী হইল, দেবালয় হইল। দেবালয়ে গূঢ় গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই ধর্ম্ম ও সাংসারিক ভাবের অসামঞ্জস্য হেতু বড়ই গোল বাধিতে লাগিল। যাহা হউক ইত্যবসরে আমাদের ভিতরে কত গুরুতর বিষয়ের যে অনুষ্ঠান হইল তাহা দেখিয়া এই বুঝিতে পারিলাম যে, পবিত্রাত্মা ভগবানের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেই হইবে। এমন কি আমরা যেন একদল ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি বাহ্য ব্যাপার তাহাই অন্যের প্রতীতি জন্মিবার উপক্রম অথচ প্রকৃত বিশ্বাসই এখন পর্য্যন্ত দাঁড়ায় নাই। তাহাই কার্য্যতঃ ঘটনাসূত্রে প্রমাণিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে নিপতিত হইয়া যে কি ভয়াবহ ব্যাপার আমাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত জীবনে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোক দলের সেবক। ক্রমে পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রতি দৃষ্টি স্থির না থাকিয়া আমার প্রতি যখন ইঁহার উঁহার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তখন আর রক্ষার উপায় কি? এবং আমি তো একেবারে নিরুপায়। আমার সাধ্য কি আমি আমার চরিত্র ও জীবন দ্বারা কাহাকেও কোন বিষয় প্রবোধ দি! এমতাবস্থায় আমাদিগকে যতই পবিত্রাত্মা ভগবান পরাস্ত করিতে ব্যস্ত, ততই জীবনে পরীক্ষানল প্রজ্বলিত। ইহা কি নিবাইবার জো আছে? যাহা হউক এখনও মিলিত উপাসনা এরূপ জমাট ছিল যে তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ চক্ষের পলকে পরিষ্কার হইয়া যাইত, কুবাতাসের পরিবর্ত্তে সুবাতাস সহজেই বহিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু ক্রমে প্রচারকদের সপরিবারে বাসোপযোগী স্থানাভাবে বিশেষ ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহাতে হঠাৎ এমন একটী স্থান পাওয়া গেল যে, সেই স্থানে অনায়াসে প্রচাকরচমণ্ডলী এবং অন্যান্যেরও বাস করিবার সুবিধা হইল। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্য হইতে ভাই কৈলাসচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে বৈরাগ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রদ্ধেয় শ্যামাচরণ সেনের ঢাকায় অবস্থিতি কবিবার উপায় হয়। আমি পবিত্রাত্মা ভগবানের আলোতে বেশ দেখিলাম যে, প্রস্তাবিত স্থানটীতে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে সপরিবারে বসবাস করিতে দিবার উপায় করিতেছেন। ইহাতে ভ্রাতাদেরও সায় পাওয়া গেল কিন্তু সমাজের সম্পাদক মহাশয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আলোতে বুঝিলেন যে, এস্থান অস্বাস্থ্যকর হইবে। তাহাতেই তিনি এস্থানে বাস করা নিষেধ বুঝিলেন। এই কারণে বিশেষ গোল উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি অন্তরে এই আলো পাইলেন যে দলের অনুসরণ করিতে হইবে তাহাতেই একখণ্ড ভূমি রাখিলেন। অন্য কোনও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ইহাতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের বিরোধ দেখিলেন। সেই সময়ে দেবালয়ের প্রার্থনাতে এই প্রকাশিত হয় যে, ঈশ্বরনির্দ্দেশ সাক্ষাত প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাতে ফলাফল চিন্তা কিম্বা মরণ বাঁচনের প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে না। তাহাতে আমার সঙ্গে তাঁহার ভাবী মহাবিরোধের সূত্রপাত হইল। ইহা দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, তাঁহার দ্বারা আমাকে ভয়ানকরূপে পরীক্ষিত হইতে হইবে এবং তাহাতেই আমার জীবনে পবিত্রাত্মা ভগবানের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংসিদ্ধ হইবে। তিনি প্রথমতঃ আমার

অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি আমার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার এক বক্তৃতাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে আমার ভয় হইয়াছিল, না জানি ইহার পরিণাম কি হয়! ইতিপূর্ব্বে কতজনের দ্বারা অগ্রে আদৃত হইয়া পরে আমাকে ঘৃণিত হইতে হইয়াছে তাহা আমি বিস্মিত হই নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বরাশ্রিত মহৎ লোককে উপলক্ষ করিয়া যেমন মানুষ তাঁহাতে যাহা দেখে তাহাই ভাল মনে করে, ঈশ্বরাশ্রিত ক্ষুদ্র লোককে উপলক্ষ করিয়া মানুষ যে তাঁহাকে কেমন কথায় কথায় সংশয় করে তাহা আমি বিলক্ষণ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার কাল জীবনে ভাল ভগবানকে না দেখিয়াই ক্রমে আমার অত্যন্ত হৃদয়বন্ধনও আমাকে সন্দেহ করিতে বাধ্য হইলেন তাহাই ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাঁহার জীবনে পবিত্রাত্মা ভগবান তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ করিয়া নিজে গৌরবান্বিত এবং তাঁহাকে তাঁহার করিয়া লইতে চান তিনি তাহাই করেন। এই বিষয়ে আমাদের বাঙ্‌নিষ্পত্তি বৃথা। পবিত্রাত্মা ভগবান আমাদিগকে পুরাতন পল্লীতে যেরূপ শিক্ষা দিবার তাহা দিয়া যথাসময়ে বিশেষভাবে সকলকে বিশ্বাসী করিয়া লইবার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতাকে মিলিতভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে সক্ষম করিলেন। একি সামান্য ব্যাপার। নূতন পল্লীতে আনিয়া পবিত্রাত্মা ভগবান আমার ও অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল কাণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কতরূপে কতভাবে দেখা দিলেন, কথা বলিলেন এবং ব্যবহার করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার প্রকাশ ও তাঁহার কথা সঙ্গীতাকারে এরূপ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইলে পূর্ব্ববঙ্গ কেন, পৃথিবী একদিন বুঝিতে পারিবে পবিত্রাত্মা ভগবান তাঁহার ক্ষুদ্র দলে কি করিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র জীবন ইহাতে গঠিত এবং ধন্য হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিতে সযত্ন। যত দুঃখ, কষ্ট, নিন্দা, অপমান এবং নিপীড়ন ভাগ্যে ঘটিয়া থাকুক না কেন তিনি পূর্ব্বেই জানিতে দিয়াছিলেন "সমুদয় ঘটনা আমারই বিধান" তাহাতে কোনও ঘটনা আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাহাতে নিজের ও অন্যের অনেক অপরাধ প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবন পরিবর্ত্তিত এবং তাহাতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবার পথ খুলিয়াছে। তিনি তো আমার ন্যায় কালকে ভাল দেখাইবার জন্য একটী ভাল দল লইয়া আসেন নাই। কাল জীবনে তাঁহার ভালরূপ দর্শন, তাঁহার ভাল কথা শ্রবণ এবং তাঁহার ভাল ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতে দিবার জন্যই তাঁহার এরূপ অবতরণ!

নবপল্লীতে পবিত্রাত্মার নবলীলা

পবিত্রাত্মা ভগবান এখন সত্য সত্য যাহাতে আমরা এক একজন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হৃদয় হইয়া তাঁহার একটী প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে এবং ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিত দল হইতে পারি এবং অবশেষে তাঁহার শিশুসন্তান দলরূপে পিতামাতা পরমেশ্বরের বক্ষে স্থান লাভ করিয়া নববিধানের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে দিতে পারি, এইজন্য তাঁহার নবপল্লীতে যেরূপ নবলীলা প্রকটন করিবার তাহা করিতেই তিনি প্রবৃত্ত। এমতাবস্থায় অবস্থিত হইয়া যে কিরূপ নাকাল হইতে হয় তাহা এই জীবনে ভালরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আমাদের কে কি এবং কাহার কি আছে তাহা একপ্রকার প্রত্যেকেরই জানা হইয়াছে। কিন্তু মিলিত হইলে যে কে কি হইব এবং কাহার কি লাভ হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অজানিত। এবং যেরূপ বিনীত ও অবনত হইয়া তাহা হইতে এবং পাইতে হইবে সে বিষয়ে অনুপযুক্ত। তাহাতেই যাহার যেরূপ বিড়ম্বিত হইবার প্রায় প্রথম হইতেই তাহার তদ্রূপ বিড়ম্বনা আরম্ভ হইয়াছিল। একদিকে যেমন ঈশ্বরাধীনতাতে অটল অপর দিকে তদ্রূপ বিনীত অন্তরে দলের সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁহার বিধি পূর্ণ হইতে দিতে ব্যস্ত না থাকিয়া কাহার সাধ্য পবিত্রাত্মা ভগবানের নবলীলাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ব্যবহৃত হন! এইজন্যই একদিকে যেমন নবদেবালয়ে ভগবানের আশ্চর্য্য ব্যবহার অপব দিকে আমাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত জীবনে তাহার বিপরীত কাণ্ডকারখানা। এই বিপরীত দৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের প্রতি দূরে থাকুক পবিত্রাত্মা ভগবানেব প্রতি বিশ্বাস ঠিক থাকাই কঠিন ব্যাপার। এইজন্য পবিত্রাত্মা ভগবান পূর্ব্বেই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শরীর মনের বিকার দেখিয়া যেন আমরা কেহ কাহাকে অস্বীকার না করি। কোনও মহাত্মার কি সাধ্য আছে তাঁহার দলের জন্য এরূপ করেন। পবিত্রাত্মা ভগবান আমাদের ন্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র দলের জন্য যেরূপ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন ইহা দেখিয়াই তো এই জীবনে বিস্মিত হইয়াছি এবং কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এক একটী মহাত্মার যশের কথা যেমন তাঁহাতে বিশ্বাসী দলের লোকেরা পরস্পরের এবং সাধারণের নিকট বলিয়া নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে। আমরা যাহাতে তদ্রূপ পরস্পরের এবং সাধারণের নিকট পবিত্রাত্মা ভগবানের যশের কথা বলিয়া ধন্য জীবন হইতে পারি এই উদ্দেশ্যেই তিনি এখন আমাদের প্রত্যেকের এবং দলের জীবনে সংসাধনার্থ ব্যস্ত। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে তাঁহার এমন রূপ দেখাইতে লাগিলেন এবং এমন কথা শুনাইতে লাগিলেন যাহাতে আমাদের অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ এবং অন্য কথা শ্রবণ করিবার স্পৃহা না থাকে। কিন্তু যখন তাঁহার প্রকাশতত্ত্বের এবং তাঁহার ব্যক্ত অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইল

তখনই আমাদের মধ্যে মহাগোলের সূত্রপাত দেখিলাম। কাল মানুষের মুখ দিয়াও ভাল ভগবান ভাল কথা কন ইহাতে বিশ্বাসের ক্রটী প্রমাণিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের অবিশ্বাস, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখিয়া পবিত্রাত্মা ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন "নূতন বিধানে এবার এই মম আকিঞ্চন, বিশ্বাসী দাসদল নিয়ে করি নরকে স্বর্গ স্থাপন। যারা কেবল আপনাদেরে আমার দাস ব'লে স্বীকার ক'রে অবাধে দিবে আমারে করিতে বিধিপূরণ। বিশ্বাসী দাসদল সঙ্গে দাঁড়াইয়ে পূর্ব্ববঙ্গে পতিত দেশে করিব নববিধান স্থাপন। বিশ্বাসী দাসদল বিনে কে দেখবে আমায় ধরাধামে, কেমন নববিধানে করিতেছি বিচরণ।" এই ঘোষণা দ্বারা তিনি তাঁহার গূঢ় গভীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমাদের আর অন্য কথা বলিবার জো রহিল না। ইহার পরও যখন আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এবং বিশেষভাবে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র দাসের প্রতি প্রথমতঃ নানা বাহ্য এবং অবশেষে আধ্যাত্ম বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল তখনই আমার জীবনের অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হইল। আর কি আমার রক্ষা আছে? এই অবস্থাতে পবিত্রাত্মা ভগবান আমাকে বেশ বুঝিতে দিলেন যেমন নিজকে তদ্রূপ অন্যান্য প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইতে দিতে রত থাকিতে হইবে। তাহাতেও এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে দল ভাঙ্গিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য এবং নিজে সুখে থাকিতে পারিলেই হয় এই আমার মনোগত ভাব। এইরূপে আমার জীবন যে কিরূপ দগ্ধ হইতে লাগিল তাহা যিনি দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত তিনিই অবগত। আমিও তাহা তিনি যতটুকু জানিতে দিয়াছেন, জানিতে পারিয়াছি। এইরূপে নবপল্লীতে পবিত্রাত্মা ভগবানের নবলীলা চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়াছি।

এই সময়ে বিশেষভাবে খৃষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁহার জীবন ও চরিত্র মানবমাত্রেরই বিশেষ আদর্শরূপে পৃথিবীতে ফুটিয়াছে। তিনি চরিত্র ও জীবনে বাস্তবিকই ঈশ্বরপুত্রত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে মানবজাতির সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহার প্রতি প্রথম হইতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার অনুসরণ করিয়াই তিনি তাঁহার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। এবং পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পবিত্র চরিত্র যিশুর অনুগামী হন। যিশু বিশেষভাবে পাপী আত্মার পরম বন্ধু। কারণ তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র হইয়াও পাপীর জন্যই জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিয়াই তিনি মানবজীবন কিরূপে ও কিজন্য ধারণ করিতে হয় তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধু জোহন তাঁহার সম্বন্ধে যে গুরুতর কথা বলিয়াছেন "শব্দই ঈশ্বর ছিল, ঈশ্বরের নিকটে ছিল তাহাই রক্তমাংসে প্রকাশিত হইল" ইহার তাৎপর্য্য আশ্চর্য্যরূপে পবিত্রাত্মা ঈশ্বর আমার ন্যায় পাপাত্মা মানবের নিকট প্রকাশ করিলেন। এ শব্দ "আমি"। বস্তুতঃ মানবসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ঈশ্বরই এই শব্দ ছিলেন, তাঁহার নিকটই এই শব্দ

ছিল। মানবেতেই এই শব্দ রক্তমাংসে প্রকাশিত হইল। মানব 'আমি' বলিবার অধিকার পাইল। কিন্তু যে জন্য মানব এই অধিকার পাইয়াছিল তাহা সম্পন্ন হইতে না দিয়াই প্রাকৃতিক মানবের পতন হইল। মানব এইজন্য "আমি" বলিবার উচ্চ অধিকার পাইয়াছিল যে অনাদি মহা "আমি" ঈশ্বরকে "তুমি" সম্বোধনপূর্ব্বক "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আত্ম-ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিবে এবং জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিবে। মহাত্মা ঈশার জীবনে ইহা সর্ব্বাগ্রে সুন্দরমত সম্পন্ন হওয়াতেই তিনি ইশ্বরপুত্রত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত হইলেন। পিতা মহাব্যক্তি। পুত্র তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহার পরেই এক ব্যক্তি। তাহাতেই ঈশা জীবন দান করিবার প্রাক্কালে "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহাতে পবিত্রাত্মা ভগবানেরই মহিমা প্রকাশিত হইল। পবিত্রাত্মা ভগবান দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কেবল ঈশার মতন পূতচরিত্র মানব নয়—মহাপাপী মানবকেও মহা "আমি" ঈশ্বরকে স্বীকারপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত হৃদয় হইতে হইবে এবং অবশেষে ঈশ্বরসন্তান চরিত্র ও জীবন লাভ করিয়া পিতার ইচ্ছার নিকট আত্ম-ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা না হইলে পাপীর নিস্তার নাই। মানবমাত্রই 'আমি' 'আমি' এবং 'আমার ইচ্ছা' 'আমার ইচ্ছা' এই করিয়া অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়। তাহাতেই তাহার পতন। বস্তুতঃ নীচ প্রকৃতি তাহার পতনের কারণ নয়। বলিতে কি নীচ প্রকৃতি দ্বারা অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী পতিত মানব শাসিত হয়। শাস্তি পায়। অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারই মানবের পতনের একমাত্র কারণ। শিশু কেমন নানা প্রাকৃতিক দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নির্দ্দোষ ও পবিত্র। তাহাতেই "শিশুর ন্যায় না হইলে স্বর্গে যাইবার সম্ভাবনা নাই" যিশু বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শিশু হইয়াই যেমন পৃথিবীতে তদ্রূপ স্বর্গে প্রবেশ করিতে হয়। মানবশিশুরূপে যেমন সংসারে তদ্রূপ দেবশিশুরূপেই স্বর্গে উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সকলেই দেবশিশু। তাহাতেই ঈশা বলিয়াছিলেন:—"শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, নিবারণ করিও না; ঈদৃশ লোকের দ্বারাই স্বর্গ পরিপূর্ণ।" মহাত্মাদিগকেও ধরাধামে রঙ্গভূমিতে যে মহত্ত্বের বেশভূষায় সাজিয়া রঙ্গ করিতে হয় তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবশিশুরূপে স্বর্গে যাইতে হয়। এইরূপেই ঈশা পিতার ইচ্ছা ধরাধামে পূর্ণ হইতে দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতী তনুধারী হইয়াই স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখান হইতে সোজাসোজি স্বর্গে উত্তীর্ণ হওয়া সকল মহাত্মার ভাগ্যেও ঘটে না। ইহলোকেই হউক পরলোকেই হউক পিতার নিকট আত্ম-ইচ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাহা সম্যকরূপে জীবনে সম্পন্ন হইতে দিয়াই দেবশিশুরূপে স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হয়। ইশ্বরতনয়ত্বই ঈশার দেবত্ব। কিন্তু এই দেবত্ব পিতার সঙ্গের সঙ্গীরূপে তাঁহার সঙ্গে একত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই একত্ব দ্বৈতাদ্বৈত। ঈশার দেবত্ব একটা মত কিম্বা ভাব নহে। ইহা সকল মানবকেই প্রাপ্ত হইতে হইবে। যথাসময়ে ঈশা চরিত্র ও জীবন প্রকাশ করিয়া পবিত্রাত্মা ভগবান আমার ন্যায় পাপাত্মার প্রতি

বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহাতেই আশার সহিত জীবনের অগ্নিপরীক্ষা বহনে অবিচলিত থাকিতে সক্ষম হইলাম। কিন্তু ইহাতেও পরীক্ষানল সমধিক প্রজ্বলিত হইল। কোন কোন খৃষ্টান ভ্রাতা খৃষ্টান হইব বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং অগ্রণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও এ বিষয়ে আশঙ্কা হইয়াছিল। যাহা হউক ইহা এখন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইল যে, পাপাত্মাকে পবিত্রাত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধৃত ও মনোনীত, উপদিষ্ট ও আদিষ্ট হইয়া আলো ও অন্ধকার, অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা, মিলন ও বিচ্ছেদ, প্রশংসা ও নিন্দা, সহানুভূতি ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া পরিচালিত এবং নানাভাবে নানা মহাত্মার দৃষ্টান্তানুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলের অনুগামী হইয়া পরিবর্ত্তিত অন্তর হইতে হয়। ইহাই নববিধানের ব্যাপার। এবং স্বর্গের জ্যোতিতেই ইহা প্রকাশিত। মানবীয় ধর্ম্মজ্যোতি যতই উজ্জ্বল হউক না কেন ইহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। এইজন্যই ঈশার ন্যায় ঈশ্বরতনয়কে দেখিয়াও তাঁহার অনুগামীগণ তাঁহার পিতা এবং পিতৃআত্মা পবিত্রাত্মাকে সন্দর্শন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্ণ ঈশ্বর প্রকাশের জ্যোতিই ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্যোতিঃ! এই জ্যোতিতেই ঈশ্বর পবিত্রাত্মারূপে মানবজাতিতে, মানবমণ্ডলীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানবজীবনে ক্রিয়া করিয়া যে মহাব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন, করিতেছেন এবং চিরদিন করিতে থাকিবেন—ইহাই নববিধানের মহাব্যাপার। এই মহাব্যাপারে ক্রমে ব্যাপৃত হইয়াই যত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন আশার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে বুঝিলাম। আমার অন্তরে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই অন্যান্যসহ অগ্রসর হইবার ভাব প্রবল ছিল। তাহাতে ঘাটে ঘাটে অনেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াতে বড় কষ্ট বোধ করিতে হইয়াছে। মনে এইজন্যই বিশেষ কষ্ট বোধ করিতে হইয়াছে যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ব্যবহার করিয়া আমার যেরূপ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আমার দ্বারা তাঁহাদের তদ্রূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অবশেষে তিনি আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দিলেন যে আমার ভাগ্যই এইরূপ। ইহাতে রাজী হইয়াই শেষপর্য্যন্ত জীবনের ঈশ্বরেচ্ছা পূর্ণ হইতে দিতে হইবে। দুই একজনও যদি শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গী থাকেন তাহা হইলেই মহাসৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। খৃষ্টান প্রচারক ভ্রাতা হে সাহেব এবং ভগিনী মিস্ ইউয়িং প্রভৃতিসহ মিলিত হইয়া কয়েকদিন বড় উপকৃত এবং আনন্দিত হইয়াছিলাম।

নবপল্লীতে এইরূপে ক্রমে পবিত্রাত্মা ভগবানের নবলীলার ব্যাপারে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপের প্রকাশ দেখিবার অধিকার পাইলাম। এইরূপে তিনি মানবকে তাঁহাতে সজ্ঞান, যোগযুক্ত, জাগ্রত, বিবেকী ও অনুরাগী আত্মারূপে অন্তরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে দিয়া জীবনে পুরুষপ্রধান ভগবানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কেমন লীলাবিহার করিতেছেন তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার অনুগত দাস করিয়া লইতেই তিনি কেমন ব্যস্ত তাহা প্রকাশ করিলেন। এইজন্যই এত অন্ধকার, এত অগ্নিপরীক্ষা, এত বিচ্ছেদ সংঘটন

করিয়াছেন তাহা বুঝিতে দিলেন। কিন্তু ইহাতে অন্যান্যের সহানুভূতি ভালরূপে না পাওয়াতে বাহিরে সাধারণের সমক্ষে ইহা যেরূপ বিঘোষিত হওয়ার তাহা হইল না। কিন্তু ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন ত্রিবিধ রূপ—ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপের প্রকাশই ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি। এই জ্যোতিতেই মানবাত্মাকে ব্যক্তিরূপে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছাধীন জীবন লাভ করিতে হইবে। ইহাতেই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় হয়। ইহাতেই নবজীবন লাভ হয়। নূতন মানুষ না হইয়া দেবশিশু হওয়া অসম্ভব। নূতন মানুষই ঈশ্বর প্রেমে মজিয়া তাঁহার সহবাসে পুণ্যশান্তি পূর্ণ জীবন হইয়া তাঁহার সঙ্গী হন। এবং ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছামত সেই জীবনে বিহারপূর্ব্বক তাঁহার বিধি পূর্ণ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ মানবকে তিনি তাঁহার শিশুসন্তান চরিত্র ও জীবন দান করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। এই উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মালোক প্রকাশিত, এই উদ্দেশ্যেই নববিধান প্রকটিত। ইহার আরম্ভ কে নির্দ্ধারণ করিবে! কেই বা ইহার শেষ কল্পনা করিবে? ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান প্রকাশিত হওয়া অবধি আর আংশিক ভাব পোষণ করিবার জো রহিল না। ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মহাত্মাগণও নানাজন ঈশ্বরকে নানা ভাবে স্বীকার করাতেই তাঁহার অনুগামীগণ নানা সম্প্রদায় হইলেন। এমন কি ব্রাহ্মসমাজও এই বিপদ হইতে সম্যক নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নাই। তাহাতেই ইহা বিভক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিকতা, কিম্বা কোনও মহাত্মাতে বিশ্বাসের ভূমিতে সংস্থাপিত ধর্ম্মসমাজ দ্বারা কখনও স্বর্গের ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং স্বর্গের বিধান—নববিধান ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত কিম্বা প্রচারিত হইবার নহে। সূর্য্যের আলো যেমন মুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মও তদ্রূপ মুক্ত। সূর্য্যের আলো যেমন সূর্য্য-প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, বাতাস যেমন কোথা হইতে আসে কোথায় যায় তাহা কাহারও নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার নাই, নববিধানের উৎপত্তি ও পরিণাম মানবের সাধ্য নাই নির্দ্ধারণ করে। বস্তুতঃ যোগী ঋষিগণ হইতে যাঁহারা অন্তরের সহিত মাত্র ঈশ্বরের নাম করেন তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি বিধাতারূপে ধরাধামে বিধান প্রকটন করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিতে এই অখণ্ড ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মরাজের প্রজারূপে স্থানগ্রহণপূর্ব্বক নববিধানের প্রভাবে অখণ্ড বিধানের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া মানবজাতিকে, দলে দলে এক একটী মানবমণ্ডলীকে এবং প্রত্যেক মানবকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই এখন সুন্দররূপে পরিগ্রহ হইল। আমার মতন ক্ষুদ্র মলিন মানব ইহাতে ধন্য হইয়াছে। জীবনের শেষ ভাগে সংসারের এবং পৃথিবীস্থ ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা অবলোকনে মনে যাহাই হউক না কেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের প্রকাশে উভয় সংসার ও ধর্ম্মরাজ্য যে তাঁহারই ইহাতে আর সংশয় করিবার জো নাই। তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই এবং সকলই তাঁহার, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি, স্বর্গলোক, পরলোক ও ইহলোক যেমন তাঁহার, স্বর্গলোকস্থ এবং ইহলোকস্থ সকলেই তদ্রূপ তাঁহার বৈ আর কাহারও নয়। নরকই

বা আর কাহার? নরকস্থেরাই বা আর কাহার? তিনি স্বর্গেও যেমন নরকেও তেমন পূর্ণভাবে স্থিতি এবং ক্রিয়া করিতেছেন। স্বর্গের স্বর্গত্বও তাঁহারই গৌরবে, নরকের নরকত্বও তাঁহারই মহিমাতে। কে বা স্বর্গে যাইত তিনি তাঁহাকে স্বর্গে না নিলে? কে বা নরকে পতিত হইত তিনি তাহাকে তাহাতে না ফেলিলে?

এইরূপে নবপল্লীতে, নবদেবালয়ে একদিকে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের প্রকাশে, কথাতে এবং ক্রিয়াতে নবলীলা প্রকটিত, অপর দিকে দলস্থদের বিশ্বাস, নির্ভর এবং আনুগত্যের অভাবে সকলের যেরূপ নাকাল হওয়ার কথা তাহাও সংঘটিত এবং আমাদের মধ্যে যুগপৎ আলো ও অন্ধকার স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। যাহাতে আমরা প্রত্যেকে খাটী বিশ্বাসী, নির্ভরকারী এবং অনুগত দাস হইয়া তাঁহার একটী খাটী দল হইতে পারি, ইহাই ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান চান; তাহাতেই এরূপ বিধান। তাঁহার দিক যেমন আলো আমাদের দিক তেমনি অন্ধকার। বস্তুতঃ তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে সত্যেতে, জ্যোতিতে এবং অমৃতেতে নিবার জন্য সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অপার করুণাস্রোতে ভাসাইয়াছিলেন। এখনও সেই স্রোতে ভাসাইয়াই তাঁহার দিক কেমন আলো এবং আমাদের দিক কেমন অন্ধকার তাহা প্রদর্শন করিলেন। আপন আপন অন্ধকারে পড়িয়া পরস্পরের বিচারপূর্ব্বক এক একজনকে ঈশ্বরের আলোর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে অক্ষম ও বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছে। দল ছিন্নভিন্ন। ইহাতে আমার জীবনে যে কি ঘটিল তাহার সাক্ষী স্বয়ং ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান ব্যতীত আর কেহই নহে। তিনিই আমাকে এই অবস্থাতে অবস্থিত করিলেন। ইহাতেও তাঁহার গুরুতর উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার আছে, ইহাই প্রকাশ করিলেন। তাই এই অবস্থাতে অবস্থিত হইয়াও যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে পারি সেইজন্যই প্রস্তুত হইলাম। এমতাবস্থাতে আবার অবশেষে এরূপ আশঙ্কা হইল যে বিধানপল্লীর স্থান গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে গবর্ণমেণ্ট বিধানপল্লী ছাড়িয়া ইহার উত্তর ও পশ্চিমের স্থান গ্রহণ করিলেন। এবং গেজেটে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা গৃহীত স্থানের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণের সীমারূপে বিধানপল্লীর নাম উল্লেখিত হইল। ইহাও ঈশ্বরের বিশেষ লীলার ব্যাপার। ইহাতে বিধানপল্লীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

এখনও আমরা দুই তিন জন মাত্র বিধানপল্লীর দেবালয়ে একত্রিত হইয়া ব্রাহ্ম-আত্মা-ভগবানের শ্রীচরণতলে বসি। তিনি তবু প্রকাশিত হইয়া আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা প্রকাশ এবং তাঁহার সেই ইচ্ছা ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে যাহাতে আমরা জীবনে সম্পন্ন হইতে দিতে পারি তদুপযোগী আলো প্রদান ও ঘটনা সংঘটন করিতেও ক্ষান্ত নহেন। বস্তুতঃ তাঁহা দ্বারা বিধৃত হওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত কেবলই তাঁহার আশ্চর্য্য কারবার ক্রমেই অধিকতর রূপে দেখিবার অধিকার লাভ করিয়া এই জীবনে ধন্য হইয়াছি—ইহা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। কেবল মহৎ লোকের জীবনে নয়, কেবল সাধুজীবনে নয়, ক্ষুদ্র ও পাপ জীবনেও যে ভগবানেরই

লীলা, ইহারই সাক্ষী আমি। আমার মহত্ত্ব কিম্বা সাধুতা ছিলও না, লাভও করি নাই। কিন্তু জীবনের প্রথমে অজ্ঞাতসারে, মধ্যে কম জ্ঞাত ও অধিক অজ্ঞাতসারে ভগবানের কারবার দেখিয়া অবাক হইতে হইয়াছে। অবশেষে আমার কথা শুনিতে পায় কাহারও স্পৃহা ছিল না। তবু প্রার্থনাতে ও উপদেশে এবং কখন কখন বক্তৃতাতে প্রাণের কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। ক্রমে আমার ভাগ্যে এই ঘটিল যে আমার উপদেশ কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। এমতাবস্থাতে আমার জীবন ধারণ যে কি এক পরীক্ষার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, যিনি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলেন তিনিই তাহার সাক্ষী হইয়া রহিলেন। কিরূপে জীবন শেষ হইবে তাহা এখনও জানি না। ইতিমধ্যে তিনটী বার বিশেষ আহ্বান আসিয়াছিল কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। যিনি পাঠান, রাখেন এবং নিয়া যান তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কেহ আসে না, থাকে না, এবং যায় না। "আমি আছি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" এই কথা বলিতে যে কেবল মুসাকেই ঈশ্বর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রত্যেক মানবের প্রতি মহা "আমি" ঈশ্বরের এই অনুজ্ঞা। মহাত্মামাত্রই যাহা প্রকাশ করিতে প্রেরিত হন, তাহা সমুদয় মানব জাতির, প্রত্যেক মানবের প্রতিনিধিরূপেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহাত্মা ঈশার যে দুই মহাবাক্য (১) "এব্রাহেমের পূর্ব্ব হইতে আমি আছি," (২) "আমি আর আমার পিতা এক" তাহাও তিনি মানবজাতির বলিতে কি বিশ্বাসী মানবমাত্রের প্রতিনিধিরূপেই বলিয়াছিলেন। যে দুই কথাতে খৃষ্টান জগত তাঁহার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন সেই দুই কথাই সমুদয় প্রকৃত বিশ্বাসী মানবের সাধারণ সম্পত্তি। যে মানব এই জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও পিতার বক্ষে ছিল তাহা বিশ্বাসচক্ষে না দেখে সে মানবকে প্রকৃত বিশ্বাসী বলা যায় না। এবং যে মানব দ্বৈতাদ্বৈতভাবে "আমি আর আমার পিতা এক" স্পষ্ট এই দেখিতে না পায় তাঁহার বিশ্বাসের পূর্ণতা হইল বলা যায় না। ইহাতে মানবীয় কোনও গৌরব নাই। মানবসন্তানের যেমন "পিতা হইতে আমার উৎপত্তি" এবং "আমি আর আমার পিতা এক" বলিবার অধিকার স্বাভাবিক। ঈশ্বরসন্তানেরও তদ্রূপ "পিতা হইতে আমি আসিয়াছি" এবং "আমি আর আমার পিতা এক" বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার। মানবসন্তানের মধ্যে "আমি আর আমার পিতা এক" এই কথা মুক্তকণ্ঠে পিতৃভক্তিপূর্ণ অন্তরে যেমন অতি অল্প লোকই বলিতে পারে, তদ্রূপ বিশ্বাসীদের মধ্যেও "আমি আর আমার পিতা এক" এই কথা মুক্তকণ্ঠে পিতার ভক্ত সন্তানরূপে বলিবার অধিকার অতি কম লোকই এখানে পাইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ লোক যাহাতে দলে দলে ধরাতলে দাঁড়াইতে পারে এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিবালোকরূপে প্রকাশিত এবং নববিধানের ব্যাপার স্বর্গের বাতাসরূপে ধরাতলে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি অল্প লোকই ব্রহ্মস্বভাবে সংস্থিত এবং ব্রহ্মস্বভাবের প্রকাশে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মালোক গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার নিশ্বাসরূপ মহাবাতাসস্বরূপ নববিধানের অঙ্গ ঢালিয়া দিতে এখনও প্রস্তুত। এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মানবকে

একেবারে শূন্য অন্তর হইতে হয়। নিজেকে একেবারে অস্বীকার করিতে হয়। এই মহাবিধানে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে হইলে যে জীবনে আত্ম কি অন্যকর্ত্তৃত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একবার যখন পূর্ব্বদিকে এই ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইতে এবং এই মহাবিধানের বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জঘন্য লোকও যখন এই আলো দেখিতে এবং বাতাস স্পর্শ করিতে অধিকার পাইয়াছে, তখন যাহা হইবার হইবেই হইবে। একবার দলবদ্ধভাবে আমরা দুই চারিজনও যদি এ জীবনে এই আলোকে আলোকিত এবং এই বাতাসে সঞ্জীবিত হই তাহা হইলেই পথ খুলিয়া যাইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা নিশ্চয়, ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া জীবনে কার্য্যতঃ স্বীকার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে পবিত্র আত্মারূপে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত এবং তাঁহার সঙ্গে প্রেমে মিলিত হইতে হইবে। এইরূপে পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে পাপাত্মা মানবকেও প্রেমে মিলিত হইয়া এমন পরিবর্ত্তিত হৃদয় হইতে হইবে যে সে ঈশ্বরকে জননীরূপে নিরীক্ষণ করিবে এবং বস্তুতঃই "মা বৈ জানি না, মা আমার সর্ব্বস্ব ধন। মার রক্তমাংস করি পানাহার, পুণ্য শান্তি নাম জগতে যাহার। মার গুণ গাই নাচিয়ে বেড়াই লভি অমর জীবন।" বলিয়া বিশ্বাসী শিশু হইবে। এরূপ বিশ্বাসীই ক্রমে ঈশ্বরকে পিতারূপে দেখিয়া শুনিয়া জীবনে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিবার এবং তাঁহার বাধ্য পুত্র হইবার অধিকার পাইয়া থাকে। আমার ক্ষুদ্র জীবনেও ইহার আভাস পাইয়া আমি আমাকে মহাসৌভাগ্যশালী মনে করিতেছি। শরীররূপ স্থূল, তাহা অপেক্ষা মনরূপ সূক্ষ্ম এবং তাহা অপেক্ষা আত্মারূপ সূক্ষ্মতর আবরণে প্রত্যেক মানব "আমি" আবৃত। প্রত্যেক মানব-আত্মাকে এই ত্রিবিধ আবরণে আবৃত হইয়াই পৃথিবীতে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বরও কেমন বাহ্যজগত, মনোরাজ্য এবং অধ্যাত্মলোক ধারণপূর্ব্বক মানবসন্তানকে তাহাতে জড়াইয়া রাখেন; মানবসন্তানের শরীর, মন ও আত্মাকে পরিপোষণ করেন। ক্রমে মানবসন্তান "আমি" ও "আমার" বলিতে আরম্ভ করে। এরূপ শরীর, মন ও আত্মাবিশিষ্ট মানবসন্তানকে লইয়া ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কত লীলা করেন কাহার সাধ্য তাহা বর্ণনা করে? তিনিই যেমন মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্রবীজরূপে নিহিত করিয়া ক্রমে দেহধারী মানবসন্তানরূপে জন্মদান করেন, তদ্রূপ শরীর, মন ও আত্মাবরণে আবৃত মানবসন্তানকে পরিপোষণ করিয়া এক ব্যক্তিরূপে দণ্ডায়মান করেন। মাতৃগর্ভে অজ্ঞাতসারে শরীরী মানবসন্তানরূপে জন্মলাভ করিতে হয় কিন্তু সংসারগর্ভে শরীর, মন ও আত্মাবিশিষ্ট মানবসন্তানরূপে "আমি" ও "আমার" অথবা অহং ও স্বার্থভাবাপন্ন হইয়া সামান্য রকম আত্মজ্ঞান ও বাহ্যজ্ঞানরূপ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুই চক্ষুবিশিষ্ট অথচ ঈশ্বর-জ্ঞানহীন অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে হয়। এই অবস্থায়ই মানবের মনে অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান, দর্শনও তাহাকে এই অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচার হইতে সম্যক নিষ্কৃতি দিতে পারে না। এবং যে ধর্ম্ম মানবসন্তান সংসর্গগুণে প্রাপ্ত হয় তাহাতে

ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার ধর্ম্মভাব অথবা আত্মিকভাব চরিতার্থ হইতে পারে। এবং তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার বিশ্বাসচক্ষুও একটুকু খুলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে মানবের অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচার বিকার দূর হইবার উপায় হয় না। মতে ঈশ্বরকে স্বীকার করা এক কথা অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার গুণে কিম্বা তাঁহার বিধানে তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে সত্য ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা অন্য কথা। ইহা নানা উপায় নানা জীবনে ঈশ্বর স্বয়ং সংঘটন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সংসর্গে, যাঁহার যাঁহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে ইহা সংঘটিত হয় তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধু এবং সেই ব্যক্তি উপদেষ্টা এবং দৃষ্টান্ত বলিয়া আদৃত হন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে সহজে বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্রমে সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ হয়। বহু বচন, শ্রবণ এবং মেধা দ্বারা, এমন কি গভীর মনন ও চিন্তা দ্বারাও সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারেন না। যে হৃদয় "তিনি আছেন" এই স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই হৃদয়ে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। এই জ্ঞানচক্ষেই ক্রমে তাঁহাকে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপে দেখিয়া তাঁহার মহাপ্রকাশের জ্যোতিতে অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আচ্ছন্ন হইতে হয় এবং তিনি কেমন পুরুষপ্রধান পবিত্রাত্মা ভগবানরূপে ধর্ম্মরাজ্যে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে এবং সংসারে ও পরিবারে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় বিধান করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাসী, নির্ভরকারী ও তাঁহার অনুগত দাসরূপে নূতন মানব হইতে হয়। ইহাতেই মানবের অন্তর হইতে অহঙ্কার অন্তর্হিত এবং জীবন হইতে স্বেচ্ছাবিদূরিত হইবার উপায় হয়। এইরূপে মানবসন্তান ক্রমে দেবসন্তান হইবার পথ পায়। ইহা নিজের জীবনে যেরূপ একটুকু প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার পাইয়াছি তদ্রূপ ইহা ব্যক্ত করিলাম। যাহা ক্রমে ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ করিলাম। উপাসনাতে এরূপ বিশ্বাস এবং আনুগত্য অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বরকে অন্তরে নানারূপে প্রকাশিত দেখিবার ও তাঁহার নানা কথা শুনিবার এবং নানা অভিপ্রায় বুঝিবার অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু জীবনের নানা অবস্থাতে, নানা ঘটনার মধ্যে, নানা সংসর্গে এবং অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুক্তভাবে তিনি বিরাজমান থাকিয়া সমুদয় বিধান করিতেছেন এই স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবনে যেরূপ মুক্তভাবে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইবার তাহা এখনও হইতে পারি নাই। এইজন্য জীবন এক এক সময় বড় ভয়াবহ বোধ হয়। যেমন অন্তরে উপাসনাতে তদ্রূপ জীবনে কাজে তাঁহাতে বিশ্বাসী, নির্ভরশীল এবং তাঁহার ইচ্ছাধীন না হইতে পারিলে নিজেকে কিরূপে তাঁহার লোক মনে করিতে পারি? তাঁহার লোক না হইলে কিরূপে মনে করিতে পারি যে, মানবজন্ম সফল এবং মানবজীবন সার্থক হইল? বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত অন্তরে ও জীবনে নবভক্তির সঞ্চার না হয় সে পর্য্যন্ত মানবজন্ম সফল ও মানব-জীবন সার্থক হইতে পারে না। এই সুনির্ম্মলা নবভক্তি আমার অন্তরে সঞ্চারিত এবং জীবনে ফল্গু নদীর ন্যায় হইলেও প্রবাহিত করিবার জন্যই তাঁহার যাহা করিবার

এই যাবত করিয়াছেন—ইহা নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারিয়া এখন সেই ভক্তি লাভের নিমিত্তই হৃদয় ব্যাকুল। ইহা দেখিয়াই ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান এই ভক্তি কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট এই বুঝিতে দিয়াছেন, যেমন অন্যান্য বিধানে কোনও মহাত্মাকে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধানে বিশ্বাসীগণের স্বয়ং ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অন্তরে বাহিরে অবতীর্ণ দেখিয়া নবভক্তি লাভ করিতে হইবে। তিনিই জড়, জীব এবং নরপ্রকৃতিতে বিরাজমান মহাব্যক্তিরূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পরম ব্যক্তি। অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া এই ত্রিবিধ প্রকৃতিতে মুক্তভাবে লীলাবিহার করিতেছেন—নানারূপে প্রকাশিত হইয়া নানাকথা বলিয়া তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতেছেন! তাঁহার এই মহা অবতীর্ণরূপ দেখিয়াই নবভক্তি লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি যেমন ত্রিবিধ প্রকৃতিতে মুক্তভাবে বিরাজ ও বিহার করিতেছেন, তাঁহাতে প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত মানবও এই ত্রিবিধ প্রকৃতিতে মুক্তভাবে মহাব্যক্তি পূর্ণব্রহ্ম পবিত্রাত্মা পুরুষ প্রধান ভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া কেবলই তাঁহার ইচ্ছাধীন জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। ইহা প্রকাশিত হওয়াতে অন্তরের মোহ দূর হইল এবং জীবন ভারশূন্য বোধ হইতে লাগিল। এখন সেই ভক্তি লাভ করিয়া যাহাতে প্রাণ ভরিয়া "তোমার নবলীলা, নূতন খেলা, দেখি প্রাণ ভরি। তুমি ঘোর নরকে, অন্ধকূপে অবতীর্ণ হরি॥ তবে আর নিরাশা কেন, থাকতে হরি বর্ত্তমান, তুমি নিজগুণে পাপীজনে, দিচ্ছ চরণতরী॥" এই স্বীকার-পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতে পারি ইহাই হৃদয়ঙ্গম হইল। ভক্তি হৃদয়ের ভাব মাত্র নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধই মানবের ভক্তি। জ্ঞানেতে নির্ব্বাণ, যোগেতে দ্বৈতাদ্বৈত এবং ভক্তিতে দ্বৈতভাবই প্রধান। এইজন্যই পুরাতন ভক্তি-মার্গাবলম্বীমাত্রই অবতারবাদী। ভক্তির ব্যাপার জীবনের ব্যাপার। জীবনে মানবকে দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক নবভক্তি লাভ করিতে হয়। বস্তুতঃ ভক্তি প্রকৃত বিশ্বাসেরই বিকাশ। বিশ্বাসকে যদি ফুলের কলির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহা হইলে ভক্তি প্রস্ফুটিত ফুল। তাহার মধু ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের প্রীতি—এই মধুর ভাবে সত্য জাগ্রত পবিত্রাত্মা জীবন্ত পুরুষ-প্রধান ভগবানের সঙ্গে জীবনের মিলনই জীবের প্রকৃত সদ্গতি। আমরা যত কেন ভাবেতে উপাসনার সময় কিম্বা অন্যান্য সময় ঈশ্বরের আত্মিক মিলন হৃদয়ঙ্গম করি না, তাহাতে নবভক্তি লাভ হইল বলা যায় না। নবভক্তি লাভ করিয়াই নূতন মানুষরূপে নবভাবে চির পুরাতন ও নিত্য নূতন ভগবানের সঙ্গে জীবনে কার্য্যতঃ মিলিত হইয়া তাঁহার নিত্য নবলীলাস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়। তাহা না হইলে মানবজন্ম সফল ও মানবজীবন সার্থক হইতে পারে না। ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের নানা ভাব যেমন সংসারে ও ধর্ম্মরাজ্যে নানারকমে ফুটিয়া থাকে, তাঁহার প্রেমও তদ্রূপ সংসারে দাম্পত্য প্রেমে ও ধর্ম্মরাজ্যে গূঢ় গভীর ধর্ম্মবন্ধুতাতে ফুটিয়া থাকে। কি সংসারে, কি

ধর্ম্মরাজ্যে মানব অন্তরে যে সকল ভাব ফোটে তৎসমুদয়েরই পরিণতি কিম্বা পূর্ণতা ঈশ্বরের প্রতি মানবের নবভক্তি ও প্রীতিতে। এই ভক্তিদানে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানবকেও জন্ম সফল ও জীবন সার্থক করিতে দিবার জন্যই আমার প্রাণেশ্বরের, জীবনেশ্বরের এত আয়োজন, এত পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে হইয়াছে। আমার জীবনে তিনি নববিধানে পাপী উদ্ধারের নবলীলা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কবে যে আমি উদ্ধার পাইব তাহা জানি না, তাহা জানিতে চাহিও না। কেবলই যাহাতে নববিধানের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই জীবন শেষ করিয়া চরমে যাইয়া পরজীবনও তদ্রূপই যাপন করিবার অধিকার পাই তাহাই চাই। এই অধিকারই আমার ন্যায় নরাধমের উদ্ধার।

বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে পাপী উদ্ধারের সাধারণ ও বিশেষ আয়োজন

ধর্ম্মরাজ্যের আদিপুরুষগণ (যোগী ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত) যেমন একদিকে, বিশ্বাসরাজ্যের আদিপুরুষস্বরূপ এব্রাহাম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধু পল পর্য্যন্ত অপরদিকে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান তাঁহার এই দুই শ্রেণীর লোকজনসহ পাপী উদ্ধারের জন্য সোপানপরম্পরায় মহা আয়োজনপূর্ব্বক তাঁহার স্বভাব সংস্থিত মহাধর্ম্ম-ব্রাহ্মধর্ম্মজ্যোতিঃ পৃথিবীতে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশপূর্ব্বক ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহাবিধানের—নববিধানের ব্যাপার সংঘটন করিলেন, ইহাই বর্ত্তমান সময়ে পাপী উদ্ধারের বিশেষ আয়োজন। খণ্ডালোক প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণভাবে পশ্চিমে এবং বিশেষভাবে পূর্ব্ব দিকে ঈশ্বর এই আয়োজন করিলেন। "Broken Lights" নামে যে মিস কব এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহাতে পশ্চিমে যে খণ্ডালোক প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্ব দিকে যখন দিবালোকস্বরূপ পূর্ণধর্ম্ম-ব্রাহ্মধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তাহা খণ্ডালোকরূপে পশ্চিমের মহা অন্ধকার ভেদ করিয়া বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক পূর্ব্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে বিকীর্ণ স্বর্গের আলো গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামমোহন ঐশ্বরিক কৌশলজালে জড়িত হইয়া কি আশ্চর্য্যরূপেই সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মজ্ঞানালোক-সত্য ধর্ম্মালোক গ্রহণপূর্ব্বক পাপী উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত হইলেন। তাহাতেই আমরা তাঁহাকে আমাদের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাতের জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহার পূর্ব্বে হজরত মহম্মদ "ঈশ্বর বৈ ঈশ্বর নাই" এবং "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়" এই মাত্র ঘোষণা করিয়া গেলেন। তাঁহার অগ্রগামী ইহুদি প্রেরিত মহাজনগণও ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক গূঢ় গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই

একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর কিরূপ তাহা যেমন আধ্যাত্মিকভাবে আর্য্য ঋষিগণ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন একদিকে আর্য্য মহাত্মাদের এবং অপরদিকে প্রেরিত ইহুদি মহাজনদের এবং বিশেষভাবে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ও প্রেরিত মহাজন মহম্মদের অনুগামীরূপে তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ জ্ঞান নয়নে সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওঁ তৎসৎ এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই দুই মূল সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি যেমন একদিকে অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানালোক লাভে অপরদিকে তদ্রূপ জীবনে তাঁহার ধর্ম্ম—সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। তাহাতেই ব্রহ্মোপাসনা সাধারণ ও সামাজিকভাবে অথবা হিন্দু ও মুসলমানের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নিমীলিত নয়নে অন্তরে ঈশ্বরচিন্তাকে উপাসনার সারভাগরূপে হিন্দুধর্ম্ম হইতে এবং সমাজে একত্রিত উপাসনার প্রথাটী তিনি মুসলমান ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিলেন। পর্ব্বতোপরি প্রদত্ত যিশু উপদেশগুলিকে তিনি ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব পশ্চিম ব্রহ্মজ্ঞানালোক অভাবে যখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন মহাত্মা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মালোক গৃহীত হওয়াতে ইহা দিবালোকের ন্যায় পূর্ব্ব দিকে এবং খণ্ডালোকস্বরূপ পশ্চিমে বিকীর্ণ হইল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানালোকে যেমন পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মজ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবার পথ খুলিয়া গেল; পশ্চিম দিকে বিদ্যালোকের সঙ্গে যিশুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবার মত প্রবল থাকাতে তদ্রূপ হইতে পারিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যিশু বিভীষিকার ভয়ে ভীত ছিলেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। মহাত্মা রামমোহনকে ব্যবহার করিয়া সত্য জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বর যে কি মহাব্যাপারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহা পৃথিবী একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। পূর্ব্ব দিকেই যে সূর্য্যের আলোর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানালোক যেমন পুরাকালে তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে উদিত হইল তাহা কি অস্বীকৃত থাকিবে? তাহা কখনও নহে। এইরূপে পাপী উদ্ধারের জন্য বিশেষ রূপে মহা আয়োজনের আরম্ভ হইল। মহাত্মা রামমোহন ঈশ্বরের সৎরূপেরই "সত্যকে ভাব" বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ করিলেন এবং এইরূপই আত্মাতে আত্মারূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সুখী হইতে হইবে বলিয়া আশা প্রদান করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ব্যবহারপূর্ব্বক পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন যেমন ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বনের তদ্রূপ সমাজে উপাসকমণ্ডলী গঠনের উপায় করিলেন। যাহাতে উপাসকমণ্ডলী মধ্যে আত্মাতে আত্মারূপে ঈশ্বরদর্শনের বিমলানন্দ লাভ হয় তাহারও উপায় করিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে তাহা গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে আদর করিলেন। তাঁহাকে ধর্ম্মপুত্রের ন্যায় ভালবাসিলেন। এমন কি তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দান ও আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলী গঠিত হইবার উপায় হইল। ইহাতেই ব্রাহ্মমণ্ডলীও গঠিত হইবার সূত্রপাত হইল। ক্রমে এইরূপে প্রকাশিত সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাঁহাকে আত্মারূপে আত্মাতে দেখিয়া বিশুদ্ধ

ব্রহ্মযোগ এবং তাঁহাকে আত্মারূপে সন্দর্শন করাতে যে আনন্দ লাভ হয় তাহা প্রমাণিত হইল। "আনন্দরূপমমৃতম্" বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করার গুরুতর ব্যাপার মহর্ষি জীবনেই সংঘটিত হইল। কিন্তু সত্য জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের এমনি মহিমা যে, মহর্ষিকে তিনি অদ্বৈতভাবাপন্ন হইতে দিলেন না এবং আত্মিকভাবে তাঁহার মহাব্যক্তিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগীরূপে প্রতীয়মান করিলেন। ইহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানালোকে ব্রহ্মকে অন্তরাত্মারূপে নিজ অন্তরে এবং সর্ব্বাত্মারূপে চিদাকাশে সন্দর্শনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভের পথ খুলিয়া গেল। ইহাতে ভারতের মহা সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরায় উদিত হইল। রামায়ণে রামের সঙ্গে সীতার যেরূপ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, বলিতে গেলে ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের তদ্রূপ সম্বন্ধ। রামকে হারাইয়া সীতার যে দশা হইয়াছিল, ব্রহ্মজ্ঞানালোক অভাবে ব্রহ্মকে হারাইয়া ভারতের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। সীতা যেমন স্বর্ণমৃগপ্রিয় হইয়া রামকে হারাইয়াছিলেন তদ্রূপ ভারতও ধর্ম্মার্থকামনার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মকে হারাইয়াছিলেন। সীতা উদ্ধারের ব্যাপার যেমন মহা আয়োজনে সংঘটিত হইয়াছিল, ভারত উদ্ধারের ব্যাপারের জন্যও তদ্রূপ মহা আয়োজন হইল। রাবণ যেমন ধর্ম্মাভিমানের অবতাররূপে বর্ণিত। তাহা কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত। তদ্রূপ ভারতও ধর্ম্মাভিমানে আক্রান্ত হইয়াই পতিত। স্বয়ং ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান ব্যতীত কাহার সাধ্য পতিত পৃথিবী কিম্বা ভারতকে উদ্ধার করে? তাহাতেই তিনি মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রেরণ ও ব্যবহারপূর্ব্বক পতিত ভারত, এমন কি পতিত পৃথিবী উদ্ধারের মহাসূত্রপাত করিলেন। ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত কি পতিত মানব উদ্ধার পাইতে পারে? ব্রহ্মোপাসনার সাহায্যে ব্রহ্মকে আত্মারূপে আত্মাতে না দেখিয়া কি কেহ কখনও বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়? ইহার দৃষ্টান্তস্থলই তো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। কেবল কি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানে পাপীর জীবনের পরিবর্ত্তন এবং তাহার উদ্ধারের ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে? তাহা কখনও নহে। কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মযোগই ধর্ম্মজীবনের মূল ও কাণ্ড। এই মূল ও কাণ্ডহীন ধর্ম্মজীবন কিছুই নহে। পাপী মানবকে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া ঈশ্বরানুগত বিশ্বাসী দাসরূপে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হয়। এইরূপ জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নব্যভারতে প্রদর্শন করিলেন। তিনি সহজে উত্তরাধিকারীরূপে মহাত্মা রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞান এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মযোগপ্রিয় হইয়া ব্রহ্মকে আত্মাতে আত্মারূপে সন্দর্শন করিবার পথাবলম্বী হন এবং তাহাতে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পরমপুরুষরূপেই ঈশ্বরকে তিনি স্বতঃ স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। ইহাতেই মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী এবং উত্তরাধিকারী হন। ইহাতেই পাপী উদ্ধারের ব্যাপার বিশেষরূপে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয়। অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুলতার সহিত মহা ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার পথ এইরূপে খুলিয়া যায়। যাহাতে

পারিবারিক এবং সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগত জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রামিত ও সত্যরূপে ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে পারে তাহার পথ খুলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পাপীর পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ক্রমে ক্রমে এইরূপে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজে এবং ভারতে বিশেষভাবে ব্রহ্মজ্ঞানালোক, ব্রহ্মযোগভোগ এবং ব্রহ্ম-আত্মাকে পরম ব্যক্তিরূপে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিলাভের মহা ব্যাপার সংঘটিত হয়। ইহারই সূত্রপাত মুঙ্গেরে হইয়াছিল। ভক্ত কেশবচন্দ্র ক্রমে ভক্তিপথে সবান্ধবে এমন অগ্রসর হইলেন যে, তাহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে বাস্তবিকই মহাসমন্বয়ের ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইতে এবং মহাবিধানের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। স্বয়ং ঈশ্বর সমুদয় ধর্ম্মের সমন্বয় তাঁহার নিজের স্বভাবে প্রকাশপূর্ব্বক এবং তিনি নিজেই যোগী ঋষিগণ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত মহাত্মাদিগকে ব্যবহার করিয়া যেমন প্রাচ্য আত্মিকভাবমূলক, এব্রাহাম হইতে সাধু পল পর্য্যন্ত মহাজনদিগকে ব্যবহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মবিধান প্রকটন করিলেন। যমুনা ও গঙ্গার ন্যায় এই দুই বিধানস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানে মিশিল। সকল মহাত্মা ও মহাজনদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ প্রকাশিত হইল এবং সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় মহা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল। ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান যেমন নিত্য নূতনত্বের দরুণ, তদ্রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডবিধান হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্যের দরুণ, নববিধান নামে বিঘোষিত হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সত্য সত্যই ব্রহ্ম-আত্মাকে পরম ব্যক্তিরূপে বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া জীবনে পরিচালিত হওয়াতেই এইরূপ নবব্রহ্মজ্ঞান ও নবব্রহ্মযোগমূলক নবভক্তিস্রোতে ভাসিতে সক্ষম হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষভাবে ও ভারতে সাধারণভাবে নবভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এইরূপে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের উপায় হইল। মহাপাপীর উদ্ধারের পথ খুলিয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসীদের অন্তরের জাতীয় ধর্ম্মাভিমান এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর খণ্ড ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব এই নবভক্তির স্রোত অবাধে দেশময় প্রবাহিত হইয়া দলে দলে পাপী উদ্ধারের ব্যাপারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। মহেশ্বরের ইচ্ছাতে এই নবভক্তির স্রোত ভারতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে কি প্রকারে প্রবাহিত হইবার উপায় হইবে তাহা তিনিই জানেন। ইহা নিশ্চয়ই হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধরাতলে দলে দলে পাপী উদ্ধারের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মভক্তি ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান স্বয়ং বিধান করিলেন তাহা কি পৃথিবীময় বিস্তৃত না হইয়া পারে? যিনি ইহা প্রকটন করিয়াছেন, তিনিই ইহা জগন্ময় বিস্তার করিতেছেন এবং করিবেন। এখন ইহা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত; ক্রমে ইহা পদ্মার ন্যায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম, মানবীয় মতকল্পনা ও ভাব দূরীকরণপূর্ব্বক, দলে দলে বিশ্বাসীদিগকে প্রেমসমুদ্রের দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে।

এইরূপে মহাত্মা রামমোহনের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ

এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ ব্রহ্মভক্তি মিলিতভাবে মহাবিধান নববিধানরূপে প্রকটিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে পুনরায় সমুদিত। পশ্চিমেও তাহার জ্যোতিঃ প্রতিভাত হওয়াতেই চিকাগোতে মহাধর্ম্ম মিলনসভা সম্ভব হইল। কিন্তু পশ্চিমে শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞানালোক এবং ধর্ম্মসমাজে যিশুই পূর্ণ ঈশ্বরাবতার এই মতের প্রাবল্যবশতঃ যেমন প্রারম্ভে তদ্রূপ এসময়েও ব্রাহ্মধর্ম্মালোক কেবলমাত্র সার্ব্বভৌমিক মতের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত এবং ভারতে ঐশ্বরিক ব্যাপারসমূহকে একটী মহাবিধান-নববিধান বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত না হইয়া কয়েকটী মহাজনের ক্রিয়াকলাপরূপে পরিচিত হইয়াছে। বলিতে কি ভক্ত কেশবচন্দ্র ইহা যেরূপ স্বীকার করিলেন তদ্রূপ অন্যান্যের দ্বারা ইহা স্বীকৃত না হওয়াতে পূর্ব্ব দিকেও দলে দলে পাপীদের উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইল। মহাত্মা কমট যেমন বলিয়াছিলেন "Heavens do not declare the glory of God, but the glory of Galleleo and Newton" ঈশ্বরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যেমন বর্ত্তমান মহাবিধানেও তদ্রূপ ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া মহাত্মাদের মহত্ত্ব এবং ক্রিয়া স্বীকার করিলে দলে দলে পাপী উদ্ধারের পথে কণ্টক রোপিত হইবে। ভক্ত কেশব যেমন ইংলণ্ডে "The work of the Living God in India" তদ্রূপ স্বদেশে "Behold the Light of Heaven in India" ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার কত কথাই পূর্ব্ব পশ্চিম শুনিল এবং তাঁহার কত প্রশংসাই করিল! কিন্তু তিনি ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকাশ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যে সকল জীবন্ত সাক্ষ্যদান করিলেন তাহা পূর্ব্ব পশ্চিম কোথায় গ্রাহ্য করিল!! তাই তিনি বলিয়া গেলেন "সেই সময় আসিতেছে যে সময়ে হরিই বলিবেন, হরিই শুনিবেন।" বস্তুতঃ জগবদ্ভক্তি পরিগৃহীত না হওয়াতে যে তিনি কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন এই বিষয়ে তাঁহার কাতরোক্তি যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তবে কি ঈশ্বর যে এবার ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপে প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মভক্তি সমন্বিত মহাধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করিলেন এবং সেই জ্যোতিতে দলে দলে পাপী উদ্ধারের যে মহাবিধান প্রকটন করিলেন তাহা কি ব্যর্থ হইবে? তাহা কখনও নহে। এইজন্যই যেমন পুরাতন এক একটী বিধানের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে মহাপাপীর জীবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমান মহাবিধানে-নববিধানেও যাহাতে তাহাই হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে আমার ন্যায় মহাপাপীকে কয়েকটী বন্ধুসহ ধরিয়া ভগবান ইহার সূত্রপাত করিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভক্ত কেশবচন্দ্র কেবল ইহা দেখিয়াই এই দলকে স্নেহ করিলেন। এবং পূর্ব্ববঙ্গেই বর্ত্তমান বিধানে দলে দলে পাপী উদ্ধারের বিশেষ আয়োজন হইল। এই ব্যাপার অবশেষে কিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তাহা যিনি গোপনে ইহার সূত্রপাত করিলেন তিনিই জানেন। জগাই মাধাই মধুর হরিনামে উদ্ধার পাওয়াতে সেই নামের মাহাত্ম্য জগতে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া আমাদের ন্যায় পাপীদিগকেও কিরূপ আশ্বস্ত করিবে তাহা কে জানিত? তদ্রূপ নববিধানে আমাদের ন্যায় পাপীদিগকে তাঁহাকে দেখিতে, শুনিতে এবং তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে দিয়া

পবিত্রাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বর্ত্তমান বিধানে পাপী উদ্ধারের যে বিশেষ আয়োজন করিলেন তাহা ক্রমে উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়া দলে দলে পাপীদিগকে কিরূপ আশ্বস্ত করিবে তাহা কি কাহারও ভাবিয়া নির্দ্ধারণ করিবার সম্ভাবনা আছে? কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনাদি অনন্ত অথচ সত্য জাগ্রত জীবন্তভাবে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কখনও অসংসিদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছামতই তাঁহার উদ্দেশ্য জীবনে সংসিদ্ধ হইতে দিবার জন্যই তাঁহা কর্ত্তৃক বিধৃত। ইহা জানিয়াই আমরা আশ্বস্ত। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহারই বিধানে আশ্চর্য্যরূপে ধীরে ধীরে সংসিদ্ধ হইতেছে দেখিয়াই ধন্য হইতেছি। অন্ধকার ও আলো, অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা, প্রশংসা ও নিন্দা, মিলন ও বিচ্ছেদ, সকলই তাঁহার উদ্দেশ্য সংসাধনোপযোগী। তাহা না হইলে কি কেহ অন্তরে তাঁহাকে পাইতে এবং জীবনে তাঁহার হইতে পারে? পাপী উদ্ধারের ব্যাপার তো যে সে ব্যাপার নহে। পাপী উদ্ধারের জন্য যে মহাজনগণের জীবনে ঈশ্বর মহাব্যাপার সংঘটন করেন তাহা অপেক্ষাও পাপী উদ্ধারের ব্যাপার বড় গুরুতর। "অন্ধ দেখিতে পায়, বধির শুনিতে সক্ষম হয়, বোবা কথা কয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে এবং মরা মানুষ বেঁচে যায়" ইহা কি যে সে ব্যাপার? ইহা দেখা দূরে থাকুক, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদ্ধারের পথ খুলিয়া যায়। মানুষের অলৌকিক ক্রিয়াতে অবিশ্বাসী হইয়া যাহারা ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাহারা বড়ই অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিপতিত। পাপীকে সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইতে হয় "যাহা অদৃশ্য বিষয়ের অব্যর্থ প্রমাণ এবং আশ্বস্ত বিষয়ের সারাংশ।" তাহা হইলেই ঈশ্বর স্বয়ং কিরূপে ক্রমে অন্ধকে দেখিতে, বধিরকে শুনিতে, বোবাকে কথা বলিতে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিতে এবং মৃতকে বাঁচিতে সক্ষম করেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া ও আপন জীবনে তাহার প্রমাণ পাইয়া পাপীও তাহার সাক্ষ্যদান করিতে পারে। ইহা পাপী উদ্ধারের আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহাঁতে পাপী আত্মা মহাত্মা কিম্বা সাধু আত্মা হয় না। পাপী পাপীরূপেই এরূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া উদ্ধারকর্ত্তা পবিত্রাত্মা পুরুষপ্রধান ভগবানের যশের কথা বলিয়া বোবাও যে কিরূপে কথা বলিতে পারে তাহা সপ্রমাণ করিয়া থাকে। ইহাতে যতই পাপী অধিকতর ব্যাপৃত হয় ততই তাহাকে তাহার নানারকমের অপরাধ, ত্রুটী এবং হীনতা ও জঘন্যতার দরুণ নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইতে হয় এবং দেখিতে হয় যে মহাজনের জীবনে যেমন মানুষ তাঁহার মানবীয় ভাবকেও স্বর্গীয় মনে করিয়া বিভ্রান্ত হয়, ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধৃত পাপীর জীবনের স্বর্গীয় ভাবকেও মানুষ মানবীয় মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই মহাভ্রম হইতে উদ্ধারকর্ত্তা জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত আর কে উদ্ধার করিতে পারে? এই কারণে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যাপৃত পাপীতাপীকে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। ইহাতেও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই গভীর বেদনাপূর্ণ অন্তরেই পাপীকে ভবধাম হইতে অমরধামেও যাইতে হয় কিনা তাহা এখনও বলিতে পারি না। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হয়, ইহা স্বীকার করাতেই এই

গভীর বেদনায় যখন উপশম হয়, তখন তাঁহার ইচ্ছা জীবনে তাঁহার ইচ্ছামত পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপী কিরূপে এই গভীর বেদনাবিমুক্ত হইবে ?

বস্তুতঃ যাহাতে ধরাতলে দলে দলে পাপীগণের নিস্তার পাইবার পথ খুলিয়া যায় এইজন্য ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান যুগে যুগে নানারূপে প্রকাশিত হইয়া নানা বিধান প্রকটনপূর্ব্বক যেমন নানা ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ তদ্রূপ নানা শ্রেণীর বিশ্বাসী দল দণ্ডায়মান করিয়া অবশেষে তাঁহার ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান রূপ প্রকাশ এবং মহাধর্ম্ম বিধান প্রকটন করিলেন। তাহাতে পাপীদিগকে দলে দলে উদ্ধার করিবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। এখন দলে দলে পাপীগণ যাহাতে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপে ঈশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মহাবিধানের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া উদ্ধার পাইতে পারে তাহার পথও খুলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বিশ্বাসী দল ইহার সাক্ষী। এই সাক্ষীদলের দাসরূপে নিয়োজিত হইয়া আমি ১৮৭৩ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভক্ত কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুগণসহ অগ্রণীরূপে স্বীকারপূর্ব্বক আমার পাপজীবনে মহা প্রভু পরমেশ্বরের দাসত্বব্রত পালনে আনন্দে রত ছিলাম। ভক্ত কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর ১৮৮৪ হইতে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিরূপে এই দাসত্বব্রত উদ্‌যাপনে রত রহিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এখন এই ব্রত পালনে রত থাকিয়া আমার অন্তর ও জীবনের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহাতে কি গুরুতর শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিব। ইহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমাকে এই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাতে কেবলই অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম পবিত্রাত্মা পুরুষপ্রধান ভগবানেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে যত্ন করিব এবং তাঁহার আশ্চর্য্য বিধানে আমার ক্ষুদ্র অথচ মলিন অন্তর ও জীবন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

আমার অন্তর ও জীবনের বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ পরিবর্ত্তন

২৪ বৎসর বয়সে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আমার অন্তর ও জীবন আমার জ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়ে ঈশ্বর একদিকে আমাকে যেমন কয়েকটী যুবক বন্ধুসহ মিলিত হইয়া ধর্ম্মজীবন, তদ্রূপ অপরদিকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাংসারিক জীবনও আরম্ভ করিতে দিলেন। সুতরাং আমার অন্তরে বাহিরে উভয় স্রোত মিলিতভাবে বহিতে আরম্ভ করে। স্বভাবতঃ আমার অন্তরে কাম ও ক্রোধ শারীরিক প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস ও নির্ভর আত্মিক প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। আমার মনে হয় যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মা কালী বলিয়া যখন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে প্রত্যক্ষ ফল ফলিয়াছিল, তখন হইতে যদি আমি সরল প্রার্থনার পথাবলম্বী হইতাম তাহা হইলে আমাকে প্রায় বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

কাম ক্রোধের হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইতে হইত না। যে বিবেক বুদ্ধি এবং ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে যৌবনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়াও মানব কতক পরিমাণে অন্তরের ও জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় আমার তাহা বড় দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবই আমাকে কাম ও ক্রোধ প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্বাস ও নির্ভরের দরুণও আমাকে পাপে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমার ইচ্ছাশক্তির দৌর্ব্বল্য-বশতঃ আমি নিজ ইচ্ছাতে পাপে লিপ্ত হই নাই। ইহাতে আমার যে কি কল্যাণ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ইহা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা। এবং আমার হৃদয় স্বভাবতঃ বড় সঙ্গপ্রিয় ছিল। তাহাতেও আমাকে গুরুতর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে। যতদিন মা পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন মার সঙ্গেই থাকিতে এবং খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করিতে ভালবাসিতাম। ইহাতে ভালই ছিলাম। এইরূপে ১২ বৎসর বয়স হইল। ইহার পরে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে এমন সংসর্গে থাকিতে হইয়াছিল যে, ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা না করিলে তাহাতে একেবারে পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইত। এখন মনে হয় আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপে লিপ্ত হই নাই বলিয়াই বুঝি ঈশ্বর আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে ঈশ্বরেচ্ছায় ময়মনসিংহে নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যাপারে ব্যাপৃত হওয়াতে আমি আমার হৃদয়ের ও জীবনের মলিনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এবং ধর্ম্ম ছাড়া যে নৈতিক জীবন লাভ করা যায় না তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইতে বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে চরিত্র গঠনের ব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকিলে আমার হৃদয় ও জীবনের কি অবস্থা হইত তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। আমার মন্দ যাহা তাহাতেও আমার ইচ্ছা শক্তির কার্য্য কম দেখি, অবশ্য সায় দেওয়াতে যতদূর ইচ্ছাশক্তির কার্য্য তাহাই দেখি, ভাল যাহা তাহাতে একেবারেই আমার ইচ্ছাশক্তির কার্য্য দেখি না। কিরূপে ঈশ্বরেচ্ছা আমাকে ভাল যাহা তাহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছে তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। কেন যে ময়মনসিংহে চরিত্র গঠনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তি হইল তাহা ঈশ্বরই জানেন। বিবেক বুদ্ধি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি যাঁহাদের প্রবল তাঁহারাই ভাল হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক যত্ন করেন এবং তাহাতে প্রশংসিত হইতে পারেন। আমার ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ২১ বৎসর বয়স হইতে ২৪ বৎসর বয়সের আরম্ভ পর্য্যন্ত ঢাকায় আসিয়া ভাল সংসর্গে থাকিয়াও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আপনা আপনি আমার অন্তরে ও জীবনে ভাল ভাল মত ও ভাব উদ্দীপিত এবং প্রবল হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাতে যখন জ্ঞানকৃত পাপের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইয়া হৃদয় অনুতপ্ত হইল তখনই আমার অন্তর ও জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবং সেই পরিবর্ত্তন কয়েকটী যুবক ও বালক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনাতে প্রবৃত্ত এবং দারপরিগ্রহ করিয়া দাম্পত্য প্রেমের আরম্ভ হওয়াতেই ক্রমে অধিকতররূপে প্রবল হইতে লাগিল। যতই আমি ধর্ম্মরাজ্যে ও সংসারে অগ্রসর হইতে লাগিলাম

ততই আমার অন্তর ও জীবন সমধিক পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আমার বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়িতে লাগিল, কাম ও ক্রোধ যে আসঙ্গলিপ্সা ও যাহা মন্দ তদ্বিরুদ্ধে ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। নীচপ্রবৃত্তিগুলিও যে উচ্চ প্রবৃত্তির অপকৃষ্ট কিম্বা নীচ দিক তাহা বুঝিতে পারিলাম। উচ্চ প্রকৃতির উন্নতিতে নীচ প্রকৃতির নীচতা দূর হয় এবং উচ্চ প্রকৃতির উন্নতি না হইলে নীচ প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর উচ্চ প্রকৃতির উন্নতির জন্যই তাহার সঙ্গে নীচ প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন যোগ স্থাপন করিয়াছেন। নীচ প্রকৃতিকে নষ্ট করিয়া যে মানব উচ্চ প্রকৃতির উন্নতি সাধন করিতে চায় তাহা উন্নতির স্বাভাবিক কিম্বা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নহে। ইহাতে মানবের আত্মগৌরব হয় এবং মহা পতন হয়। এইজন্য ধর্ম্মরাজ্যের লোকদের পতন সংসারের লোকের পতন অপেক্ষা গুরুতর। বস্তুতঃ সংসারে নীচ প্রবৃত্তির অধীন হওয়াতে মানবের যে পতন হয় তাহাতে পতিত মানব নিজকে নীচ বলিয়াই জানে এবং তাহাতে অবনত থাকে কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের লোকেরা নীচ প্রকৃতিকে নষ্ট করিয়া ধর্ম্মাভিমানী হয়। তাহাতে মানবের যে পতন হয় সেই পতনে সে অবনত না হইয়া উন্নত মস্তক হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মজগতে যে লোকের কি বিড়ম্বনা হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বলিতে কি যত রকমের আধ্যাত্মিক অধোগতি হইবার তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে শরীর, মন ও আত্মা-বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে 'আমি' বলিবার অধিকারী করিয়াছেন। ইহাতেই আমরা এক এক ব্যক্তি হইয়াছি। শরীর নষ্ট করিয়া যেমন মনের উন্নতি হইতে পারে না তদ্রূপ শরীর ও মন নষ্ট করিয়া আত্মার উন্নতি হয় না। পক্ষান্তরে মনকে উপেক্ষা করিয়া শরীর শরীর করিলে যেমন পাশব প্রকৃতি প্রবল হয়, আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া মন মন করিলে মানবের গুরুতর অধোগতি হয়। বিদ্যাভিমান মানবকে ঈশ্বরের বিচারে প্রবৃত্ত করে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধোগতি আর কি হইতে পারে? কিন্তু আত্মা আত্মা অথবা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া যিনি আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপেক্ষা করেন কিম্বা কেবল আত্মার্থ চরিতার্থতার জন্য তাঁহাকে স্বীকার করেন, তাহাতে তাঁহার যে মহাদুর্গতি হয় তাহার তুলনায় অন্য পতন ও দুর্গতি কিছুই নয়। ইহা হইতেই মধ্যবর্ত্তী বাদ ইত্যাদির উৎপত্তি। এই "বাদ" সকল উপস্থিত হইয়া মানবকে যে সত্য ঈশ্বরকে বাদ দিতে কিম্বা পশ্চাতে রাখিতে প্রবৃত্ত করে তাহাতে ধর্ম্মরাজ্যের লোকদের সর্ব্বনাশ হয়। ইহাতে কেবল বাদানুবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়। ইহাতে যে ধর্ম্মপথাবলম্বীদের যুগে যুগে কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে? ঈশ্বর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বিশ্বাসীকে ইহা পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে দিয়া আমার প্রতি যে কি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তিনি যেমন সঙ্গতে তদ্রূপ পরিবারে—সঙ্গতে যুবক ভ্রাতাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ এবং পরিবারে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাকে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি আশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্রের সঙ্গলাভে যে ইহার

কি জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত দেখিলাম তাহা আমার গতিনাথই জানেন। তাঁহাকে আমি যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম তখনই তিনি যে ঈশ্বর অনুগামীরূপে সত্য জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহা আমাকে আমার প্রাণেশ্বরই পরিগ্রহ করিতে দিয়াছিলেন। সেই হইতেই আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে স্থান পাইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতেই সংসারে সপরিবারে এবং ধর্ম্মরাজ্যে সবান্ধবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলাম। উভয় সংসারে ও ধর্ম্মরাজ্যে যে ঈশ্বরই আমার একমাত্র নেতা এবং হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তাহা আমি ধর্ম্মজীবনের আরম্ভেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহার উপরই কি সাংসারিক কি ধর্ম্ম বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের একমাত্র সম্বলরূপে আমাকে প্রথম হইতেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কি সংসারে কি ধর্ম্মরাজ্যে ঈশ্বর কতজনকে লইয়া কত কি করিয়াছেন, তিনি কেমন শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথকে ব্যবহার করিয়া আমাকে জীবনের ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতে তাঁহার পথকে পথিক করিয়া লইবার উপায় করিলেন! তিনি কেমন শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ব্যবহারপূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে প্রবৃত্ত করিলেন! তিনি কেমন ধর্ম্মজীবনের পিতৃস্থানীয়রূপে পূজনীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে আমার সহায় করিলেন! তিনি কেমন আমার বিষয়কার্য্যের এক পরীক্ষাতে শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়কে ব্যবহার করিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন! এইরূপে কত গুরুজন, কত স্নেহের পাত্র ও প্রীতিভাজন বন্ধুকে ব্যবহারপূর্ব্বক আমার অন্তরের ও জীবনের কত গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটন এবং আমাকে কত শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন তাহা আমার সাধ্য কি গণনা করি! একদিকে যেমন ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি, প্রকাশ দর্শন, ব্যক্তিরূপে তাঁহাকে দেখাশুনা এবং তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে ক্রমে ব্যাপৃত হওয়াতে নানাজনের সঙ্গে মিলিত হইতে হইয়াছে, তদ্রূপ নানারূপে আমার অন্তর ও জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে আমার এই শিক্ষা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানব অবিচ্ছিন্ন যোগে কেবল আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, পার্থিব জীবনেও সংযুক্ত। সংসারেই কি আর ধর্ম্মরাজ্যেই কি ঈশ্বর মানব লইয়া কত কাজ করেন এবং মানব ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ঈশ্বরের কাজেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগকে তিনি জানাইয়া শুনাইয়া ব্যবহার করিতে সুযোগ পান। প্রকৃত বিশ্বাসচক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবকে এবং মানবের সঙ্গে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়। যখন এই দর্শন লাভ হয় তখনই প্রকৃত বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া যায়। তাহা হইলেই কি ধর্ম্মরাজ্যে কি সংসারে নরনারায়ণরূপ দেখিবার অধিকার লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত এই দর্শন লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত নরলোকে মানবকে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হয়। কারণ সত্য জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরই যে নরলোকে কি সংসারে কি ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার লোকজনসহ কার্য্য করিতেছেন তাহা না দেখিয়া যে অসত্য অন্ধকারে ঘুরিতে হয়, ইহাই মোহ। কত লোক ধর্ম্মরাজ্যেও এরূপ মোহান্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাই ঈশ্বর বড় দয়া করিয়াই যত সামান্যরূপে হউক না কেন, ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই আমার

বিশ্বাসচক্ষু ক্রমে উন্মীলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অন্যের জীবনে ঈশ্বর ক্রিয়ার প্রতিই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মানবের প্রশংসা করিতেও পাইতে আমার তত প্রবৃত্তি হয় নাই। আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, মানব নিজের ক্ষমতাতে এমন কিছু করিতে পারে যাহাতে তাহার প্রশংসিত হইবার অধিকার আছে ; তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় সুতরাং তাঁহার মহিমাই কীর্ত্তনীয়। এইজন্যই বহুকাল হইতে আমার এই প্রতীতি যে মানব পুতুলের নিন্দন-বন্দন পরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই বিশ্বাসের পথে মানবমাত্রকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই ধর্ম্মপথে সোজাভাবে অগ্রসর হইবার ব্যাঘাত হয়। এই সরল বিশ্বাসের পথ ছাড়িয়াই এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিপথগামী হইয়াছে। মহাত্মামাত্রই এই বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন অথচ যে মহাত্মা যত অধিকতররূপে এই বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন তাঁহাকেই মানবগণ তত অধিকতররূপে ঈশ্বরের স্থান প্রদান করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। ঈশ্বর যে তাঁহার এইসকল জীবন্ত পুতুল অপেক্ষা মাটির পুতুল সম্বন্ধে অধিক Jealous তাহা কখনও নহে। মহাত্মারা যে বিশ্বাস ও বাধ্যতার পথে গিয়াছেন সেই পথ দিয়াই যাইতে হইবে। তাহাতেই বলা হইয়াছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" ঈশা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, আমাকে প্রভু প্রভু বলিলে হবে না, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। হরিনামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখিত হওয়াতে দুগ্ধে গোমূত্র নিক্ষিপ্ত হইল বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যোগতত্ত্ব কথা পুনরায় তাঁহার মুখে শুনিতে চাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণও কেমন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, আমি এখন সেই কথা কিরূপে বলিব? তাহাতে তিনি তাঁহার অনুপ্রাণিত যোগযুক্ত অবস্থা যে তাঁহার অন্য অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাত্মার জীবনে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত ভাবই একরূপ, আর তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাব অন্যরূপ। কিন্তু যোগযুক্ত অবস্থাতেও দুইয়ের মধ্যেই যোগ বুঝায়। মনুষ্য কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর কখনও মনুষ্য হন না। তাহাতেই ঈশা কেমন চরমে তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গকে বলিলেন, "ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর এবং আমাকেও বিশ্বাস কর।" বস্তুতঃ এই সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বকই বিশ্বাসের পথে চলিতে হয়। আমি মানব-মাত্রকে বিশ্বাসীরূপে যেমন ঈশ্বরকে তদ্রূপ অগ্রগামী বিশ্বাসী মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিয়াই বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পথের পথিক করিয়াই ঈশ্বর আমাকে ক্রমে পরিবর্ত্তিত অন্তর ও জীবন করিয়াছেন। আমি ঈশ্বর হইতে তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তকে স্বতন্ত্র করা আর বৃক্ষ হইতে তাহার ফুল ছিঁড়িয়া ফেলা এক মনে করি। আর মহাত্মাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া বৃক্ষের ফুলগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার প্রকাশিত সৌন্দর্য্য নষ্ট করার ন্যায় ঈশ্বরের সুন্দর প্রকাশ অগ্রাহ্য করা বৈ আর কিছুই নহে। বলিতে কি এক একটী মহাত্মার জীবনে মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এক একটী কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহাই প্রকাশিত। সুতরাং মহাত্মাগণসহ মহেশ্বরকে

মহাপুরুষদের সঙ্গে পুরুষপ্রধান ভগবানকে না দেখিলে আমরা অন্তরে ও জীবনে তাঁহার সঙ্গে এবং তাঁহার মধ্য দিয়া মহাত্মাদের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারি না। এইরূপে তাঁহার এবং তাঁহার লোকদের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিবার জন্যই ঈশ্বর কেমন তাঁহার বিশ্বাসীমাত্রের হৃদয় ও জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়া লন—ইহা এই ক্ষুদ্র জীবনে দেখিতে পাইয়া বিশ্বাসের পথে চলিতে সক্ষম হইয়াছি। স্বর্গের প্রলোভনই এই। এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বিশ্বাসীকেও কেবলই স্বর্গের দিকে প্রধাবিত হইতে হইয়াছে। যতই বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হই ততই ঈশ্বরসহ মহাত্মাদিগকেও ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রকাশিত দেখিতে অধিকার পাই। এইরূপে হৃদয় এবং জীবনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তাহাতেই এই বিশ্বাস করি যে ভগবান তাঁহার লোকজন লইয়া আমার হৃদয়েও স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য এবং আমার জীবনেও তাঁহার উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ ব্যস্ত। তিনি যেমন স্বর্গে লইয়া যাইতে একাকী আসেন নাই আমিও তদ্রূপ একাকী স্বর্গে যাইতে পারিব না, ইহা নিশ্চয়। ইহাই বিশ্বাসের বিকাশ। কেবল ধর্ম্মবন্ধুগণসহ নয়, সপরিবারে স্বর্গে যাইতে হইবে; তাহা না হইলে স্বর্গে যাওয়া হইবে না। স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁহার পরিবার ও তাঁহার বন্ধুগণসহ মানবকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্যই অবতীর্ণ। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলী ও পরিবাররূপ জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া আমার জীবনেশ্বর আমাকে যে কিরূপ নিষ্পেষিত হৃদয় ও জীবন করিয়াছেন এবং তাহাতে আমার হৃদয় ও জীবন যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমার সাধ্য নাই বাক্যে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি এইরূপেই আমাকে তাঁহাকে পাইবার এবং তাঁহার হইবার পথে প্রথম হইতেই নিজহাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমার সঙ্গে ছিলেন, ইহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি বলিলেন, "জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান, নিত্যকাল আছি রে সঙ্গে দিতে পরিত্রাণ।" এই কথা শুনিয়াই তাঁহাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। এবং জীবনে ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই কথার প্রমাণ যতই পাইতে লাগিলাম ততই বিশ্বাসের পথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাকে সংসারে ও পরিবারে এবং ধর্ম্মরাজ্যে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে রাখিয়া ভগবানই পরিত্রাণ বিধান করিতেছেন তাহা দেখিতে দিলেন। "What shall I do to be saved? (আমি উদ্ধার পাইবার জন্য কি করিব?) আমার অন্তরে কখনও এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই। ঈশ্বর কেমন আমার পরিত্রাণের আয়োজন আমার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন এবং জন্মিবার পরে অজ্ঞাতসারে সেই আয়োজনই কত করিয়াছেন কিন্তু জ্ঞাতসারে যখন সেই আয়োজন করিবার উপায় করিলেন তখনই তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহাকে বিশ্বাস, তাঁহার উপর নির্ভর এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত আমার আর কি করিবার আছে? ইহাতে যেমন স্বাভাবিক বিশ্বাস ও নির্ভরের পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ হয় তদ্রূপ তাঁহার কথা শুনিয়া বিবেক এবং তাঁহার বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ইচ্ছাশক্তি পবিত্র হয়। এমন কি প্রবল নীচ প্রবৃত্তি কাম ক্রোধেরও পরিবর্ত্তন হয়।

দেখিলাম যোগস্পৃহারই নীচ ভাগ কাম এবং অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষেরই নীচ ভাগ ক্রোধ। যাহা আধ্যাত্মিক তাহার নীচ ভাগই শারীরিক। মানবের আত্মার বিকাশের জন্যই নীচ শারীরিক পাশব প্রকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। চিরদিনই মানব তাহার নীচ প্রকৃতিকে তাহার আত্মার উন্নতির অন্তরায় মনে করিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান মহাধর্ম্ম বিধানে ইহা জাজ্বল্যমান যে নীচ প্রকৃতি উচ্চ প্রকৃতির উন্নতির অন্তরায় নহে। উচ্চ প্রকৃতির সাহায্যে মানব উচ্চের উচ্চ মহা উচ্চ যিনি তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে—প্রার্থনা করিলে—তাহার নীচ প্রকৃতি তাহার সহায় হয়, আর তাহা না করিলে নীচ প্রকৃতি দ্বারাই মহান ঈশ্বর তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। তাহাতেই মানব নীচ প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে বাধ্য হয়। ইহা মানবের মহাভ্রম। তাহার নিজেকে ঘৃণা করিবার আছে কিন্তু নীচ প্রকৃতিকে ঘৃণা করিয়া তাহাকে যিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন তাঁহারই বিরোধী হইতে হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর যেমন অধ্যাত্ম প্রকৃতির তেমনি নীচ পাশব প্রকৃতিরও ঈশ্বর। মানবকে শরীর ও আত্মাধারীরূপে সৃজন করিবার পূর্ব্বে তিনি নিজে কেমন বাহ্য প্রকৃতি, নীচ জীব প্রকৃতি এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতি ধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন এবং তাহার পর শরীর মন আত্মাবিশিষ্ট মানবকে রঙ্গভূমিতে আহ্বান করিলেন। ইহাতেই যে মহাশব্দ 'আমি' কেবল ঈশ্বরের কাছে ছিল তাহা মাংসরক্তে গঠিত দেহধারী, মন ও আত্মাবিশিষ্ট মানবে প্রকাশ পাইল। যাঁহাকে স্বীকারপূর্ব্বক শরীর, মন ও আত্মা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য মানব সৃজিত, অহঙ্কারী হইয়া তাঁহাকে অস্বীকারপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হওয়াতেই মানব পতিত। এই পতিত মানবকে উদ্ধার অথবা নিজ হইতে উত্থিত করিয়া আপনাতে গ্রহণ করিবার ব্যাপারই ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধান। ইহাই সমুদয় ধর্ম্মবিধানের উদ্দেশ্য। এই কারণেই অবশেষ যথাসময়ে ঈশ্বর সর্ব্বাঙ্গীণভাবে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাঁহার স্বভাবে সংস্থিত মহাধর্ম্মালোক—বিকীর্ণ এবং তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের সমন্বয়স্বরূপ মহাবিধান প্রকটন করিলেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোক কয়েকটী বন্ধুসহ ব্রাহ্মধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অবশেষে এই মহাবিধানের ব্যাপারে ব্যাপৃত। তাহাতেই আমার অন্তর ও জীবন ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবার এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নানা শিক্ষালাভ ও ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় হইল। ইহাতে অবশেষে এই জ্ঞান লাভ হইল যে, ঈশ্বরকে জড়, জীব এবং অধ্যাত্মপ্রকৃতিধারী পরম ব্যক্তিরূপে দেখিয়া শুনিয়া শরীর মন ও আত্মা তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছাধীন জীবনযাপন করিয়া মানবজন্ম সফল ও মানবজীবন সার্থক করিতে হইবে। ইহাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে পরিমাণে যে মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া জীবনে এই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে দিতে প্রস্তুত হন, সেই পরিমাণে সেই মানব ঈশ্বরকে অন্তরে পাইয়া জীবনে তাঁহার হন। এবং পরলোকে যাইয়াও ক্রমে এইরূপে তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার হইতে থাকেন। যখন মানবের হৃদয় অথবা অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের

হয় ও ঈশ্বরেচ্ছার নিকট জীবনে সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছা সমর্পিত হয় তখনই সে নিজ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতে স্থান লাভ করে। ইহাই তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি। তাহাতেই ঈশা বলিতে পারিয়াছিলেন "আমি পিতা হইতে আসিয়াছিলাম, পিতার নিকট যাইতেছি, তোমরা আমার বন্ধু হইলে ইহাতে ব্যথিত না হইয়া আনন্দিত হইতে।" বস্তুতঃ মানব যেমন নীচ প্রকৃতিকে নিস্তেজ করিতে পারিলেই ভ্রমবশতঃ আত্মার উন্নতি হইল মনে করে তদ্রূপ এই দেহত্যাগ হইলেই স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মনে করিয়া থাকে। পৃথিবীর উপরে যেমন আকাশ এবং তাহার উপর গ্রহউপগ্রহের প্রকাশ, তদ্রূপ ইহলোকের উপর পরলোক এবং পরলোকের উপর স্বর্গলোক। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ইহলোকে ঈশ্বরকে স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ হইতে দেন! এইরূপে যাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে যে পরিমাণে হউক অন্তরে এবং জীবনে মিলিত হইয়া পরলোকে গমন করেন তাঁহারা এখানেই চিদাকাশে স্বর্গলোক সেই পরিমাণে প্রকাশিত দেখিতে সক্ষম হন। সেই স্বর্গান্বেষণে রত হইয়া পরলোকগত হন। মানবাত্মা কখনও একাকী জন্মগ্রহণ করে না এবং একাকী পরলোকে গমন করে না। পরমাত্মা প্রত্যেক মানবাত্মাকে লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হন, সমগ্র জীবন তাহার সঙ্গে থাকেন এবং তাহাকে পরলোকে লইয়া যান। তাহাকে স্বর্গে অথবা তাঁহাতে উত্তীর্ণ করিয়া নিত্যধামে তিনি কেমন সকলসহ প্রকাশ পাইতেছেন তাহা দেখিতে এবং চিরমোহিত হইয়া পুণ্য শান্তিতে বাস করিতে দেন। ইহলোকে রাখিয়া এবং পরলোকে নিয়া ঈশ্বর প্রত্যেক মানব-অন্তরে এবং জীবনে তাঁহার এই উদ্দেশ্যই সংসাধন করিয়া থাকেন। তিনি নিজে কেমন মুক্তস্বভাব, মানবকেও তাঁহার স্বভাবের প্রভাবে মুক্তস্বভাব করিয়াই তাহার অন্তরে ও জীবনে ইচ্ছামত তাঁহার উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে সুযোগপ্রাপ্ত হন। কিন্তু মানব-অন্তরে ধর্ম্মার্থকামনা বিবর্জ্জিত হইয়া জীবনে ঈশ্বরেচ্ছার নিকট স্বেচ্ছাবিসর্জ্জন না দিলে তিনি মানবকে মুক্ত অন্তর এবং মুক্ত জীবন করিয়া তাহার প্রিয়তম এবং জীবনসখা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ মানবাত্মামাত্রকেই তিনি অহঙ্কারশূন্য অন্তর এবং স্বেচ্ছাশূন্য জীবন করিবার জন্যই তাহার সঙ্গে অবতীর্ণরূপে জন্মাবধি বর্ত্তমান থাকেন। তাহাকে অহঙ্কার এবং স্বেচ্ছা হইতে উদ্ধার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যেমন পরিবারে ও সংসারে তদ্রূপ ধর্ম্মমণ্ডলী ও ধর্ম্মসমাজে তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি মানবাত্মাকে তাহার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছা হইতে উদ্ধার করেন। এইরূপে তিনি মানবাত্মাকে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাসী অনুগত লোক করিয়া লন। এই ব্যাপারই আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাই আমার জীবনে নববিধানের ব্যাপার। আমি আমার ধর্ম্মজীবনের ঊষাকালেই একটী যুবক ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছিলাম। এবং সেই সময়ই দারপরিগ্রহ করিয়া সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে ভগবান আমাকে তাঁহার প্রতি যেমন ধর্ম্মজীবনে তদ্রূপ সাংসারিক জীবনে প্রকৃত বিশ্বাসী করিয়া লইবার সূত্রপাত করেন। তাহাতেই

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের "বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। সঙ্গতস্থ যুবক ধর্ম্মবন্ধুগণ মধ্যে রাখিয়া ভগবান আমাকে তাঁহাতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে শুনিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে নিযুক্ত করিয়া কয়েকটী ধর্ম্মবন্ধুসহ একটী বিশ্বাসী দাসদলরূপে দণ্ডায়মান করিবার সূত্রপাত করেন। এইরূপে ক্রমে তিনি আমাকে তাঁহার অনুগত দাস করিয়া তাঁহার অবতীর্ণরূপ প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার যে বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার ইচ্ছা তাহা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যথাকালে তিনি আমাদিগকে তাঁহার মহাধর্ম্মবিধানজালে জড়িত করিবার জন্য মহাপরীক্ষায় ফেলেন। তাহাতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মবন্ধু হইতে আমাকে বিভিন্ন হইয়া কয়েকটীমাত্র ধর্ম্মবন্ধুসহ পূর্ব্ববঙ্গে একটী নববিধান-বিশ্বাসী দাসদলরূপে দণ্ডায়মান হইবার ব্যাপারে ব্যাপৃত হই। যেমন একদিকে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল তদ্রূপ অপরদিকে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানকে নানারূপে প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহার নানা উপদেশ, নির্দ্দেশ এবং নিষেধবাণী শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যাঁহাদের সঙ্গে এইরূপে পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল শেষপর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত অন্তরে অগ্রসর হইতে থাকিব। কিন্তু ক্রমে ভগবান দেখিতে দিলেন যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটিবার নহে। বিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরই পবিত্রাত্মা ভগবান প্রকাশ করিলেন "বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার, বিশ্বাসী রেখেছে নাম জগতে আমার, বিশ্বাসী জীবনে আমি যখন করি আমার ইচ্ছা পূরণ, পাষণ্ড সংসার তাহাকে করে আক্রমণ" ইত্যাদি। ইহাতেই আমার এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ক্রমে আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাস আরও অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইবে। তাহা না হইলে আমার জীবনে পবিত্রাত্মা ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিবে না। কাজেও ক্রমে তাহাই ঘটিতে লাগিল। আমার প্রতি আমার প্রিয়তম পবিত্রাত্মা ভগবানের এই আশ্চর্য্য করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে তিনি আমাকে পূর্ব্বে প্রস্তুতি করিয়াই এক একটী গুরুতর পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন এবং তাহাতেই আমার তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর অটল করিয়া লইবার উপায় করিয়াছেন।

অনেক পরীক্ষার পর আমাকে এক মহাপরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। যে রাজভক্তি ভক্ত কেশবচন্দ্র নববিধানের একটী মূলসত্যরূপে প্রকাশপূর্ব্বক নিজ জীবনে তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং আমাকে রাজকীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য East পত্রিকা যাহাতে হাতে রাখা যায় তাহার উপায় করিতে বলিয়াছিলেন, আমার ক্ষুদ্র জীবনেও সেই রাজভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইল। যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামকে ভক্ত কেশবচন্দ্র আমার জীবনে নববিধানের ভাব সংস্থাপনের কার্য্যক্ষেত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম সম্মিলিতভাবে একটী নূতন প্রদেশরূপে যখন ঘোষিত হয় তখনই আমার জন্য মহাপরীক্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ করে। এই পরীক্ষানলে আমাকে বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়া বিশেষভাবে

রাজভক্তির পক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছে। যেমন কোচবিহারের বিবাহের আন্দোলনে পূর্ব্ববঙ্গের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মবন্ধু কর্ত্তৃক আমাকে পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল, তদ্রূপ বঙ্গবিভাগের আন্দোলনে আমাকে কেবল ব্রাহ্মবন্ধু নয় অন্যান্য বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হয়। এই পরীক্ষাতেও অন্যান্য পরীক্ষার ন্যায় আমার বিরুদ্ধে এমন সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে আমি কেবল স্বার্থ-সাধনার্থই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী। এমন কি অন্যান্য পরীক্ষায় যাঁহারা এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই, তাঁহারাও এমন কি আমার অত্যন্ত নিকটস্থ বন্ধুরাও বর্ত্তমান পরীক্ষায় আমার প্রতি স্বার্থসাধনের অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোক যে, কখনও স্বার্থসাধন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণের মতবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে।

বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার ভক্তদের প্রতি ভক্তি যেমন ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, রাজা এবং রাজশাসনকার্য্যে নিয়োজিত লোকদের প্রতি ভক্তি পার্থিব জীবনের ভিত্তি। যেমন প্রথম তদ্রূপ দ্বিতীয় মহাপরীক্ষায় স্বয়ং ঈশ্বরই যে অবতীর্ণরূপে ভক্তবিশ্বাসী ও তাঁহার সঙ্গীগণসহ আমাদের ধর্ম্মজীবনের এবং রাজার রাজারূপে পৃথিবীর রাজাও রাজশাসনকার্য্যে নিয়োজিত লোকসমূহসহ পার্থিব জীবনে লীলা করেন তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। তাহাতে যেমন ধর্ম্মজীবনে তদ্রূপ পার্থিব জীবনে অবতীর্ণ ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাসী দাস করিয়া লইবার জন্যই তিনি প্রথম হইতেই আমাকে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তাহা না হইলে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের কখনও তাঁহার বিশ্বাসী দাস হইবার উপায় হইত না। যেমন ধর্ম্মরাজ্যে, অবতীর্ণরূপে তাঁহার ভক্ত ও বিশ্বাসীগণসহ, তদ্রূপ সংসারে রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিগণসহ ঈশ্বরই আমাদের ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনরক্ষা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নাম করিয়াই যেমন ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তিবিরোধীগণ ভক্ত ও বিশ্বাসীদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, রাজার নাম করিয়াই তদ্রূপ প্রকৃত রাজভক্তি বিরোধীগণ রাজপ্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। উল্লেখিত উভয় পরীক্ষায় পড়িয়া আমি ইহারই যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু বিরোধীগণ লইয়াও যে ঈশ্বর তাঁহারই উদ্দেশ্য আমাদের ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনে সংসাধন করিয়া থাকেন নববিধান বিশ্বাসীরূপে তাহা স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনের ভিত্তি অটল হইতে পারে না। উভয় পরীক্ষায় পড়িয়াই আমার জীবন দৃঢ় হইয়াছে। ' বিশ্বাসীরূপে ঈশ্বরভক্তি এবং রাজভক্তি বিরোধীদের ভক্তিবিরুদ্ধ ভাবের সহিত সহানুভূতি না করিয়াও তাঁহাদের প্রতি প্রীতিরক্ষা করিতেই হইবে। তাঁহাদের সঙ্গেও অবতীর্ণ ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহার এবং তাঁহার বিধানে আমরা কখনও প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে পারি না। কাহারও সাধ্য নাই ঈশ্বরকে অতিক্রম করে। কাহার সাধ্য তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম

করে? তিনি যেমন পূর্ণ পরমপুরুষ তাঁহার ইচ্ছা তদ্রূপ পূর্ণ কর্ম্মঠ। কাহারও সাধ্য নাই তাঁহাকে এবং তাঁহার ইচ্ছাকে বিন্দুমাত্রও অতিক্রম করে। যাঁহারা তাঁহাতে এবং তাঁহার বিধানে বিশ্বাসী তাঁহারা যেমন ধর্ম্মরাজ্যে, তদ্রূপ সংসারে তাঁহাকে অবতীর্ণরূপে ভক্ত ও বিশ্বাসীগণ এবং রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণসহ স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তিপথাবলম্বী হন। যাহারা তাঁহাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার বিধান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় তাহারাই ধর্ম্মরাজ্যে ও সংসারে ভক্তিবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের উদ্দেশ্য সংসাধনের কখনও ব্যাঘাত হইতে পারে না।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে অবতীর্ণ ঈশ্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশেষে সকলকেই তিনি তাঁহার প্রেমরাজ্যে স্থান দান করিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রেমরাজ্যে স্থান দান করিবার জন্যই তিনি মানবমাত্রের ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনে নানাপ্রকারে লীলা বিহার করেন। আমার ক্ষুদ্র জীবনেও আমি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতেই আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য লিখিতে সাহসী হইয়াছি। স্ব স্ব জীবনবেদই জীবন্ত বেদ এবং স্ব স্ব জীবনপুরাণই জীবন্ত পুরাণ। এই বেদ ও পুরাণই বিশুদ্ধ ঈশ্বর-জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ঈশ্বর-ভক্তি লাভের উপায়। নিজ নিজ জীবনবেদ ও পুরাণ পাঠ করিয়াই মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন সেইপথে যাইবার উপায় হয়। বস্তুতঃ আমি আমার জীবনে নববিশ্বাসী ভক্তের অনুসরণ করিবার অধিকার কখনও পাইতে পারিতাম না যদি প্রথম হইতে স্বকীয় জীবনবেদ ও পুরাণ পাঠ করিবার অধিকার না পাইতাম। বন্ধুগণসহ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ক্রমে যতই স্বকীয় জীবনবেদ ও পুরাণ পড়িতে শিক্ষা করিয়াছি ততই নববিশ্বাসী ভক্তের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। স্বকীয় জীবনবেদ ও পুরাণ পাঠ করিয়াই ভক্তিপথে অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের হাতে পরিচালিত হইবার অধিকার লাভ হয়। এই বেদ অবতীর্ণ পরমপুরুষ ভগবানের প্রকাশ ও বাণী ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং এই পুরাণ অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম পবিত্রাত্মা ভগবানের লীলা-বিহার ব্যতীত আর কিছুই নহে। গঙ্গাযমুনার ন্যায় জীবনবেদ ও পুরাণের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে পারিলেই শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। যাহাতে এই শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া জীবনে নববিধি পূর্ণ হইতে দিতে পারি এই নিমিত্তই অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান আমার ক্ষুদ্র জীবনেও আশ্চর্য্যরূপে নানা ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন এবং আমাকে কত আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, প্রশংসা ও নিন্দা এবং অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া নিজ হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন—ইহা স্বীকার করিয়াই বাঁচিয়া আছি। তিনি এক পরম ব্যক্তি। আমাকেও তিনি এক ক্ষুদ্র ব্যক্তিরূপে তাঁহাকে ভক্তি করিতে, তাঁহার অনুগত দাস হইতে দিবার জন্যই অবতীর্ণ—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়াই আমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি। আমার ধর্ম্ম তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং আমার কর্ম্ম তাঁহার আজ্ঞা পালন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিশ্বাসী দাস না হইলে অহঙ্কার এবং স্বেচ্ছা দূর হয় না এবং শুদ্ধ ভক্তি ও

আনুগত্য লাভ করা যায় না। আমাকে আমার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছা হইতে নিস্তার করিবার জন্যই অবতীর্ণ ভগবান আমার জীবনে সমুদয় ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন এবং যাহাতে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে স্বীকার এবং তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্ম ইচ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিতে পারি আমার জীবনে এখনও এই উদ্দেশ্য সংসাধনেই ভগবান ব্যস্ত।

পরিশিষ্ট

আমার জীবনালেখ্য সম্প্রতি পরিসমাপ্ত হইল। এখন আমার কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিবার আছে। আমি যখন প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও সাংসারিক জীবন আরম্ভ করি তখনই ঈশ্বরের প্রতি সরল ও স্বাভাবিক বিশ্বাস আমার মূলধন ছিল। তাহাতেই বিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্র যখন প্রথম ঢাকাতে আসিয়া "বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা আমার হৃদয়কে বড়ই স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাতে আমার এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আমাকে ইঁহারই অনুগামী হইতে হইবে। এবং ইহাও আমার প্রতীতি হয় যে কেশবচন্দ্র মহাত্মা ঈশার একটী প্রকৃত অনুগামী ভারতবাসী। আমার এই প্রতীতির দরুণই আমি ভক্ত কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে থাকি। বস্তুতঃ বিশ্বাসের পথই যে ধর্ম্মের পথ ইহা আমি প্রথমতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু মহাত্মা ঈশা এবং তাঁহার অনুগামী ভক্ত কেশবচন্দ্র বা কে আর আমিই বা কে—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি বুঝিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, আমাকে প্রার্থনা ও প্রসঙ্গ অবলম্বন এবং প্রার্থনা ও প্রসঙ্গে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহাই জীবনে পালন করিতে হইবে। ইহাতে ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটিবে। এইরূপে যতই প্রার্থনা ও প্রসঙ্গ করিয়াছি ততই আমার অন্তরে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত এবং সত্যালোক বিকীর্ণ হইয়াছে। এইরূপেই আমার ধর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগ যাপিত হয়। যখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমাকর্তৃক প্রাপ্ত সত্যালোক কেবল সঙ্গতস্থদের মধ্যে নয়, অন্যান্যের মধ্যেও প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন তখন আমি আমার নানাপ্রকারের অক্ষমতা দেখিয়া কাতর হই। এবং যাই কাতর অন্তরে নিয়মিত প্রার্থনা করিতে বসিলাম অমনি ঈশ্বর আমাকে এই বুঝিতে দিলেন যে "আমি তোমাকে সৃজন করিয়াছি, তোমার জীবনে কি প্রকারে কি করিব, তাহা আমি জানি।" ইহাতে আমার সমুদয় ভয় ভাবনা বিদূরিত হয় স্বয়ং ঈশ্বরই এমন ঘটনা সংঘটন করেন যে তাহাতে আমি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে সুযোগ পাই। আমি যে ভক্ত কেশবচন্দ্রের পদরেণুও নই আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু ঢাকা সঙ্গত স্থাপিত হইতে না হইতেই আমার নিকটস্থ বন্ধুদের এই মনে

হইয়াছিল যে, আমি ঢাকাতে কেশবচন্দ্রের ন্যায় দাঁড়াইবার জন্যই অভিলাষী হইয়াছি। তাহার পর যখন ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে রত হই তখন কেহ কেহ এই বলিয়া আমার বিরোধী হন যে আমি কেবল অন্ধবিশ্বাস এবং শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করিয়া যুবকদের মহা অনিষ্ট সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। ইহার পর যখন ঢাকাকে কেন্দ্রস্থল করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ধর্ম্মতত্ত্বালোক প্রকাশার্থ আমার ব্যবহৃত হইবার পথ খুলিয়া যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের পদে শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হই, তখন এতদুপলক্ষে আমাকে এই বলিয়া পরীক্ষিত হইতে হয় যে, আমি ভক্ত কেশবচন্দ্রকে প্রায় অবতাররূপে বিশ্বাস করি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার বিশ্বাস পরীক্ষানলে দগ্ধ হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ প্রথম হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এইরূপে পরীক্ষিত হইয়াই নববিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্রের অনুগামীরূপে আমাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানে বিশ্বাসীরূপে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্তই ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিধৃত, পরীক্ষিত এবং নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হৃদয় হইয়া আমাকে বিশ্বাসের কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতে হইয়াছে। ঈশ্বরদর্শন, শ্রবণ এবং অন্যান্য যত অনুকূল ও প্রতিকূল ব্যাপার আমার জীবনে সংঘটিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়, উজ্জ্বল এবং অটল করিয়াছে। আমি তাহাতেই ধন্য হইয়াছি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদেও আমার বিশ্বাসই পরীক্ষিত হইয়াছে। এখনও পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া একেবারে অহঙ্কার বিমুক্ত অন্তর ও স্বেচ্ছাশূন্য জীবন হইতে পারি নাই। ইহলোক হইতে প্রকৃত বিশ্বাসী হইয়া যাইতে পারিলেই আমার জন্ম সফল এবং জীবন সার্থক হইবে। সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারবিমুক্ত এবং স্বেচ্ছাশূন্য জীবন হইয়া ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসী দাস হইলেই উদ্ধার পাইলাম বলিতে পারিব। এইরূপে উদ্ধার করিবার জন্যই যে ঈশ্বর প্রত্যেকের সঙ্গে বর্ত্তমান তাহা তিনি নিজেই যখন "জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান, নিত্যকাল আছিরে সঙ্গে দিতে পরিত্রাণ" স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন তখনই আমি তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা অবতীর্ণ ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিশেষভাবে সক্ষম হইয়াছিলাম। বলিতে কি, ঈশ্বর স্বয়ং সদলে প্রকাশিত হইয়া নানাকথা বলিয়া এবং নানাপ্রকারে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের প্রতি আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াই তাঁহার অবতীর্ণরূপে এবং তাঁহার নববিধানে আমাকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাহা না হইলে আমি কখনও প্রকৃত বিশ্বাস কি তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। আমাকে তিনি যখন স্পষ্ট বুঝিতে দিলেন যে, যেমন তাঁহাকে তদ্রূপ বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিয়াই বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তখনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য ভগবান স্বয়ং আমার জীবনে যখন যাহা সংঘটন করিবার তাহাই করিয়াছেন, করিতেছেন এবং শেষপর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমার ন্যায় লোক নববিধানে অহঙ্কার এবং স্বেচ্ছা হইতে উদ্ধার পাইয়া ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দাস

হইয়া গিয়াছে ভবিষ্যতে আমার জীবনে ইহা প্রমাণিত হইলেই আমি ধন্য হইব। আমি বড়লোক হইতে তো কখনও চাহিতে পারি নাই ; এমন কি ধার্ম্মিক হইতে চাহিয়াও পদে পদে কেবলই বিপদে পড়িয়াছি। আমার পার্থিব ও ধর্ম্মজীবন প্রথম হইতেই কেবল আমার বিশ্বাসী হইবার উপযোগী ছিল। পার্থিব জীবনের প্রারম্ভেই পিতৃহীন হইয়া মা বৈ জানি না এরূপ অবস্থাতে অবস্থিত হই এবং ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে অন্য কাহাকেও চালকরূপে না পাইয়া কেবলই প্রার্থনা ও যুবকবন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার সাহায্যে চলিতে বাধ্য হই। এইরূপে যেসব পার্থিব জীবনের তদ্রূপ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে একদিকে মার প্রতি বিশ্বাস অপরদিকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই মাকে হারাইয়া যেমন পার্থিব জীবনে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তদ্রূপ সঙ্গতস্থ বন্ধুদের বিচ্ছেদের আরম্ভে ধর্ম্মজীবনেও অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল। তাহাতে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই উভয় পার্থিব ও ধর্ম্মজীবনের একমাত্র সম্বল হইল। এইরূপেই আমার ক্ষুদ্র জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহাতে যে আমাকে উভয় পার্থিব ও ধর্ম্মজীবনে কত নিকটস্থ ও দূরস্থ, কত জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কত কনিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট লোকের সংশয়ভাজন হইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তদ্দ্বারা ভগবান একদিকে আমার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছা বিনাশের অপরদিকে আমার বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধিরই উপায় করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ক্ষুদ্র বিশ্বাসকেও যে ভয়ানকরূপে পরীক্ষিত হইতে হয় তাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনে যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাতেই আমার জীবন ধন্য। আমাকে ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দাসরূপে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমার জীবনে স্বয়ং ভগবান যাহা যখন বিধান করিবার তাহা বিধান করিয়াছেন। তিনি যে নববিধানের বহির্ভাগে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপে তাঁহার দলবলসহ এবং নববিধানের অভ্যন্তরে আনন্দময়ী মা রূপে সসন্তানে ও সপরিবারে অবতীর্ণ, ইহাতে তিনিই আমার বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন। এখন সত্য সত্য এই বুঝিতে পারিয়াছি যে সত্যজাগ্রত ভূমামহান্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্তরে স্বতঃপরতঃ সজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে অন্তরাত্মারূপে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত এবং তিনি পুরুষ প্রধানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় ঘটনা সংঘটন করিতেছেন ইহা বিশ্বাসপূর্ব্বক জীবনে তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মইচ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত অন্তর ও জীবন হইতে হইবে। এইরূপে জীবনে নববিধি পূর্ণ হইতে দিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে মিলিত হইয়া একদিকে নূতন মানুষ এবং অপরদিকে ঈশ্বরের নবশিশুসন্তান হইতে হইবে। ইহাই নববিধানের বিশেষ উদ্দেশ্য।

মানবমাত্রকে নূতন মানুষ এবং ঈশ্বরের নবশিশুসন্তান করাই যে নববিধানের উদ্দেশ্য তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক মানবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান জন্মাবধি বর্ত্তমান এবং সদলে নববিধানে অবতীর্ণ। এই নববিধানে তিনি তাঁহার সমুদয় প্রেরিত মহাজনগণসহ বর্ত্তমান থাকিয়া দলে দলে

পতিত মানবদিগকে উদ্ধার অর্থাৎ অহঙ্কার ও স্বেচ্ছা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ব্যস্ত। তিনি সদলে অবতীর্ণ—ইহা স্বীকারপূর্ব্বক জীবনে তাঁহার হইতে দিতে ইচ্ছা করিয়া নববিধানে বিশ্বাসী হইতে হয়। তাঁহার সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান দান করিয়াই তিনি নিজে প্রকাশিত হইয়া অহঙ্কারে অন্ধ ও বধির এবং স্বেচ্ছাচারে পঙ্গু মানবকে ক্রমে ক্রমে চক্ষু ও শ্রোত্রদান ও নিজ হাতে ধরিয়া গিরিলঙ্ঘনে সক্ষম করেন—ইহা আমার ক্ষুদ্র জীবনে ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার দৃশ্য ও অদৃশ্য দলের প্রতি আমার বিশ্বাস ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি এই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার বিধানে আমার অন্তর ও জীবনকে ক্রমে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি যতই এইরূপে আমার অন্তর ও জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন ততই তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস ও বাধ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহুদিন এইরূপে আমার অন্তর ও জীবন পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর আমি এই বুঝিতে পারিয়াছি যে, জানিয়া শুনিয়া সদলে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে বিশ্বাস এবং জীবনে তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার ইচ্ছাসম্পন্ন হইতে দিতে ইচ্ছা করাই মানবের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াই মানব উদ্ধার পায়। সদলে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও তাঁহার বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক পতিত মানবকে স্পষ্ট দেখিতে হয় যে অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারই মানবের পতনের একমাত্র কারণ। তাহার শরীর ও ইহার নীচ প্রবৃত্তিসকল যেমন তাহার পতনের প্রকৃত কারণ নহে, তাহার আত্মা ও ইহার উচ্চ প্রবৃত্তিসকলও তাহার উদ্ধারের প্রকৃত কারণ নহে। মানবকে অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধানেই শরীরে ইহার নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইতে হয় এবং আত্মাতেও উচ্চ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করিতে হয়। প্রত্যেক মানবকে ঈশ্বরের বিশ্বাসী দাস হইয়াই উদ্ধার পাইতে হয়। শরীর ও নীচ প্রবৃত্তি যেমন মানবকে নিকৃষ্ট করে তদ্রূপ আত্মা ও উচ্চ প্রবৃত্তি তাহাকে উৎকৃষ্ট করে। ইহাতে কেবল এই প্রমাণিত হয় যে তাহার দুইটী প্রকৃতি আছে—একটী নীচ, আর একটী উচ্চ। এবং ইহাও সত্য বটে যে মানবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার নীচ প্রকৃতি, তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চ প্রকৃতি প্রবল হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মানব ধার্ম্মিক হয় বলিয়াই যে উদ্ধার পায় তাহা নহে। এই অবস্থাতেও মানব আবার ধর্ম্মের অহঙ্কারে অহঙ্কারী এবং ধর্ম্মভাব চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। সে নীচ প্রবৃত্তির অধীন না হইয়া উচ্চ প্রবৃত্তির অধীন হয়। উদ্ধারকর্ত্তা ভগবানের মানবের প্রতি এমন কৃপা যে, যে পর্য্যন্ত তাহার অন্তর ও জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার উচ্চ প্রকৃতির সঙ্গে নীচ প্রকৃতি সংযুক্ত থাকেই থাকে। তাহাতেই তাহাকে এই প্রত্যক্ষ করিতে হয় যে তাহার আত্মা ধর্ম্মভাবে সমুন্নত হইয়াও আবার শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক নীচ প্রকৃতির অধীন হয়। এরূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই স্বয়ং ঈশ্বর পতিত মানবকে উদ্ধার করেন। আমি আমার পাপজীবনে তাহাই যথেষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাকে পাপী বলিয়া কেহ

নিরাশ কিম্বা নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। আমি অবিশ্বাসকে যেরূপ ভয় করিয়াছি আমার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছার শাস্তিস্বরূপ পাপবিকারকে তদ্রূপ ভয় করি নাই। আমি ঈশ্বরের পূর্ণবিশ্বাসী দাস হইয়া একবার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচার হইতে নিস্তার পাইতে পারিলেই আমার আর ঐরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না এই আশা করিয়াই আমি নববিধানে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ক্রমে পরিবর্ত্তিত হৃদয় ও পরিবর্ত্তিত জীবন হইতে পারিয়াছি। আমি দেখিয়াছি ঈশ্বর এমন লজ্জানিবারণ যে তিনি আমার কাল অন্তর ও জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত আমার কত পাপ প্রথমতঃ অন্যকে দেখিতে দেন নাই, আবার সেই নিমিত্তই পরে আমাকে পাপী বলিয়া ঘৃণিত হইতে দিয়াছেন। বলিতে কি যতই তিনি আমার হৃদয় ও জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন ততই আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা পাপীরূপে প্রতীয়মান করিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত করিয়াছেন। তদ্দ্বারাও তিনি আমার বিশ্বাস ও বাধ্যতার পরীক্ষা করিয়াছেন। আমাকে তিনি অবশেষে এই স্বীকার করিতে দিয়াছেন যে "আমি চিরদিন দীনহীন অকিঞ্চন রহিব, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কিছুই না ভাবিব। চাহিয়ে তোমার পানে দীন হীন নয়নে, দোষ গুণ সব তোমার চরণে নিবেদিব। না রবে পাপের যাতনা, না হবে ধর্ম্মের গরিমা, দেখব কেবল সব তুমি মা, আর পদে মাথা রাখিব॥"

প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর আমাকে তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তের অনুগামী করিয়া তাঁহার নববিধানে যাহাতে আমি ক্রমে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাসী দাস হইতে পারি ইহাই আমার জীবনে সংঘটন করিয়াছেন। আমি এই দেখিয়াছি যে তিনি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উপলব্ধি, প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে, আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে চিনিতে, কথা বলিয়া তাঁহাকে শুনিতে সক্ষম করিয়াছেন। এমন কি অন্তরে-প্রাণে, মনে ও আত্মাতে শুদ্ধ জ্ঞান, যোগ ও অনুরাগ সঞ্চারপূর্ব্বক তিনিই নিজে নির্দ্দেশ ও নিষেধ করিয়া নিজ হাতে ধারণপূর্ব্বক ভক্তের অনুসরণ করিতে আমাকে সক্ষম করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পাপীর বন্ধু আর কেহ নাই ইহাই তিনি আমাকে বুঝিতে দিয়াছেন। তাঁহার বিধানেই যে দলে দলে সকল ধর্ম্মবন্ধু পাইয়াছিলাম তাহাও বুঝিতে সক্ষম করিয়াছেন। আমার ন্যায় কে দলে দলে সকল ধর্ম্মবন্ধু পাইয়াছেন? এবং পাপী বলিয়া, ক্ষুদ্র বলিয়া কেমন আবার আমাকে তাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছে। পাপী ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে উদ্ধার পাওয়া যে কি গুরুতর ব্যাপার এবং তাহা কেমন দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয় তাহাও আমি বিশেষভাবে জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ক্ষুদ্র জীবন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জন্যই আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। যাঁহার গৌরব প্রকাশার্থ এবং মহিমা প্রদর্শনার্থ এই ক্ষুদ্র জীবনী লিপিবদ্ধ হইতেছে, ইহাতে তাঁহারই গৌরব ও মহিমা প্রমাণিত হউক, ইহাই আমার অন্তরের গভীর প্রার্থনা।

নববিধানের এই নূতন সমাচার—যে স্বয়ং ঈশ্বরই সদলে অবতীর্ণ হইয়া মহাপাপীকে উদ্ধার করেন। পাপীকে কেবল তাঁহার নিকট নিজকে অস্বীকার ও তাঁহার ইচ্ছার

নিকট নিজের ইচ্ছা জানিয়া শুনিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। তাহাও স্বয়ং ঈশ্বরই পাপীর জীবনে সংঘটন করিয়া থাকেন। বলিতে কি মহাপাপীদিগকে দলে দলে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান তাঁহার প্রেরিত আর্য্য ঋষি হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত এবং এব্রাহাম হইতে সাধু পল পর্য্যন্ত প্রেরিত মহাজনগণসহ নববিধানে অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের মহাযোগ এবং শ্রীঈশার মহাবাধ্যতা দলে দলে পাপীদেব অন্তরে ও জীবনে বিধানপূর্ব্বক তাহাদের মলিন হৃদয় ও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা ও পবিত্রাত্মা ভগবানই ব্যস্ত ইহা সপ্রমাণার্থই নববিধান প্রকটন করিয়াছেন। বর্ত্তমান ঈশ্বর এবং তাঁহার বর্ত্তমান নববিধানে বিশ্বাসই পাপীতাপীদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। নিজকে অস্বীকার-পূর্ব্বক বর্ত্তমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াই তাঁহার বর্ত্তমান নববিধানের গুণে পাপী মানবকে ঈশ্বরের বিশ্বাসী দাস হইয়া উদ্ধারের পথে অগ্রসর হইতে হয়—ইহাই আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দৈহিক জীবনের মূল যেমন নিশ্বাস ও শোণিতপ্রবাহ, অধ্যাত্মজীবনের মূল তদ্রূপ প্রকৃত বিশ্বাস ও বাধ্যতা। ইহার অন্যথা হইলে সকলই বৃথা।

আমি যেমন ঈশ্বরের প্রতি সহজ প্রত্যয় ও তাঁহার একটী ক্ষুদ্র লোক হইবার সরল ইচ্ছার সহিত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, ঈশ্বর তদ্রূপ তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাসীসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার সেই সহজ প্রত্যয় এবং সরল ইচ্ছাকে তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসে ও তাঁহার আনুগত্যে পরিণত করিবার উপায় করিয়াছিলেন। আমার ক্ষুদ্র মলিন জীবনে একদিকে ধর্ম্মবন্ধু বান্ধব ও অপরদিকে স্ত্রীপুত্রকন্যা পরিবারসহ অবতীর্ণরূপে নানা পারত্রিক ও ঐহিক ঘটনা ঈশ্বরই সংঘটন করিয়াছেন। এবং এ সমুদয় ঘটনা দিবারাত্র, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ এবং নানা ঋতু-পরিবর্ত্তনের ন্যায় আমার ধর্ম্মজীবনে আশ্চর্য্যরূপে সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলী ও সাংসারিক পরিবারে অবতীর্ণ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস ও আনুগত্য যেরূপ পরীক্ষিত তদ্রূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাতন পতিত মানবের ভিতরে অবতীর্ণ ঈশ্বর কি প্রকারে জ্ঞাতসারে তাঁহাতে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল তাঁহার অনুগত নূতন মানুষকে গঠন করেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। পুরাতন মানুষের হ্রাস এবং নূতন মানুষের বৃদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়াছি। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নূতন মানুষের বৃদ্ধির সঙ্গে পুরাতন মানুষ একদিকে যেমন হ্রাস পাইয়াছে, হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ তাহার প্রকাশ অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাতেই নূতন মানুষের বিশ্বাস, নির্ভর এবং আনুগত্য গূঢ়তর ও গভীরতর হইয়াছে। প্রাকৃতিক মানুষ অজ্ঞাতসারে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে চক্ষুকর্ণনাসিকা ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহধারীরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহার পর দেখিয়া শুনিয়া, চলিয়া ফিরিয়া, অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী মানুষরূপে পতিত হয়। তাহাতে শারীরিক নীচ প্রবৃত্তিসকল তাহার জীবনে ঈশ্বরের বিধানেই প্রবল হইয়া সে

যে কেমন দুর্ব্বল তাহা সপ্রমাণ করে। এই অবস্থাতে অবস্থিতরূপেই অবতীর্ণ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানের প্রভাবে আমি জ্ঞাতসারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হই। আমি ক্রমে অন্তরে বিশ্বাস ও নির্ভর ও আনুগত্য লাভ করি। তাহার পর একটী বিশ্বাসী ক্ষুদ্র লোকরূপে নববিধানে অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা ভগবানকে সদলে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে শিক্ষা পাই। অবশেষে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া ঈশ্বরেচ্ছার নিকট আত্মইচ্ছা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক উদ্ধার পাইতে আরম্ভ করি। তাহাতে আত্মার উচ্চভাবসকল পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রভাবে প্রবল হইয়া আমি পাপী জীবও যে কেমন ঈশ্বরবলে বলী হইতে পারি তাহার প্রমাণ পাইতে সক্ষম হই। এবং ক্রমে আমি আমার জীবনে ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে উপাসনাতে যেমন অবতীর্ণ ভগবানকে অন্তরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক উত্থিত হই, কাজের বেলা জীবনে তদ্রূপ তাঁহাকে না দেখিয়া না শুনিয়া তাঁহার অবাধ্য হইয়া পতিত হই।

এই উত্থানপতনের মধ্য দিয়াই আমাকে এখনও চলিতে হইতেছে। যে পর্য্যন্ত আমি জীবনে কার্য্যতঃ অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা ভগবানকে ধর্ম্মমণ্ডলীতে ও পরিবারে—ধর্ম্মরাজ্যে ও সংসারে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার অনুগত লোকরূপে দণ্ডায়মান হইবার অধিকার প্রাপ্ত না হইতেছি সে পর্য্যন্ত আমি উদ্ধার পাইলাম বলিতে পারি না। তাহাতেই অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান আমাকে সংসারে ও পরিবারে ধর্ম্মরাজ্যে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে পতিত মানবরূপে যেরূপ লাঞ্ছিত করিবার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এইরূপেই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দাসকে তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তের অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বিশ্বাসী এইরূপে ধর্ম্মরাজ্যে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে এবং সংসারে ও পরিবারে লাঞ্ছিত না হইলে তো মহাপতনে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে এই এক গভীর বেদনা রহিয়াছে যে আমার উদ্ধারের জন্য তাঁহারা ব্যবহৃত হইয়াছেন; তাঁহারা পবিত্রাত্মা ভগবানের একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট দলরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। আমার অন্তরের এই গভীর বেদনা কবে দূর হইবে তাহা পবিত্রাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই জানেন। আমি ক্ষুদ্র বিশ্বাসী জীবনের প্রথম, মধ্য এবং শেষভাগে কি ঘটিবে তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমার হৃদয়নাথ এবং জীবনসখা পবিত্রাত্মা ভগবানই তাহা জানিয়া আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার তাহা করিয়াছেন, করিতেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত করিবেন। তিনিই জানেন তিনি সদলে অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা ভগবানরূপে কি প্রকারে পূর্ব্ববঙ্গের বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নববিধান সপ্রমাণ করিবেন। বলিতে কি দ্রৌপদীর ন্যায় আমাকে পঞ্চপাণ্ডবসদৃশ একদলসহ পবিত্রাত্মা ভগবান তাঁহার নববিধানে পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিবার তাহাই বিধিমত করিয়াছেন। আমাকেও কেমন দলের সমক্ষে ধর্ম্মবস্ত্রহীন হইবার ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখীনভাবে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা পারত্রিক ও ঐহিক জীবনে সম্পন্ন হইতে দিবার অধিকার প্রদান করিবার জন্যই অবশেষে যাহা সংঘটন করিবার করিয়াছেন।

তাহা না হইলে কি আমি কখনও পবিত্রাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে একটুকু সম্মুখীনভাবে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা (যত সামান্যরূপে হউক না কেন) ধর্ম্ম ও পার্থিব জীবনে সম্পন্ন হইতে দিতে পারিতাম ?

প্রথমে কেবলই অনুকূল অবস্থাতে অবস্থিত করিয়া আমাকে যখন যেরূপ ব্যবহার করিবার করিয়াছিলেন। ক্রমে যেরূপ প্রতিকূল অবস্থাতে অবস্থিত করিবার করিয়াছেন। তাহা না হইলে কি আমার উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল? তাহা না হইলে কি আমার অহঙ্কার ও স্বেচ্ছা বিনষ্ট হইবার উপায় হইত? তিনি আমাকে কিরূপে শেষ করিয়া ওপারে লইয়া যাইবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি একাকী আসি নাই, একাকী থাকি নাই, একাকী যাইব না। সত্যজাগ্রত বাঙ্ময়, ইচ্ছাময় ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানই আমাকে সঙ্গে করিয়া যেমন আনিয়াছিলেন, তদ্রূপ সঙ্গে রাখিয়া যাহা করিবার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন এবং এই জীবনান্তে ওপারে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাইবেন। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বলিতে কি আমি যেমন মনুষ্যসন্তানরূপে মাতৃগর্ভে কিছুকাল অজ্ঞাতসারে থাকিয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেহধারীরূপে 'আমি' 'আমি এবং 'আমার' 'আমার' বলিয়া ধরাধামে বিচরণ করিয়াছি, তদ্রূপ ঈশ্বরের ভিতরে অজ্ঞাতসারে থাকিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের নিশ্বাসে এবং তাঁহার আনুগত্যের শোণিতে সঞ্জীবিত আত্মাবিশিষ্ট ঈশ্বর-তনয়রূপে তাঁহার বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক 'তুমি' 'তুমি' 'তোমার' 'তোমার' বলিয়া আমি যাহাতে অমরধামে বিচরণ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারি এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন। বস্তুতঃ আমি পৃথিবীতে জন্মিয়াই যেমন মা সর্ব্বস্ব হইয়াছিলাম, তদ্রূপ অমরধামে জন্মিয়া যাহাতে ব্রহ্ম-মা সর্ব্বস্ব হইয়া "মা বৈ জানি না, মা আমার সর্ব্বস্ব ধন, মার রক্তমাংস করি পানাহার পুণ্যশান্তি নাম জগতে যাহার, মার গুণ গাই নাচিয়ে বেড়াই লভি অমর জীবন।" গাহিতে গাহিতে অমরদলে মিশিতে পারি ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। মার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।

অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা ভগবান আমাকে নববিধানে স্থান দানপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে সরল শিশুর বিশ্বাসে পরিণত করিতে তিনি ব্যস্ত। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস-মুকুল ক্রমে ভক্তিফুলে পরিণত হয় এবং সেই ফুলের মধুস্বরূপ যখন অবতীর্ণ ভগবানের প্রতি নিগূঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়, তখনই বিশ্বাসী অনুগত ভক্ত তাঁহার সঙ্গে প্রেমে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রেম এবং তাঁহার প্রিয় বলিয়া তাঁহার দলস্থদিগকে আত্মবৎ প্রীতি প্রদান করিতে অধিকারী হন। ইহা স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবান আমাকে নববিশ্বাসী ভক্তজীবনে প্রত্যক্ষ করিতে দিয়া শেষপর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশে আদিষ্ট হইয়া নববিধানে অবতীর্ণ পবিত্রাত্মা ভগবান কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে আমি কখনও নববিধানে অনুসরণ-ব্রতপালনে রত থাকিতে পারিতাম না। কোচবিহার বিবাহের ভয়ানক আন্দোলনে ফেলিয়া পবিত্রাত্মা ভগবান আমাকে এই

দেখিতে দিয়াছিলেন যে তাঁহার ভক্ত এই মহা ব্যাপারে কেবলই তাঁহার আদেশ পালনে ব্রতী হইয়া ঈশার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ক্রমে পরীক্ষার পর গুরুতর পরীক্ষায় এবং অবশেষে বঙ্গবিভাগের মহা আন্দোলনের মহা পরীক্ষায় ফেলিয়া স্বয়ং ভগবান আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বিশ্বাসীকে তাঁহার ভক্তের অনুসরণে রত না রাখিলে আমার যে কি দশা হইত বলিতে পারি না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যেমন তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি, তদ্রূপ তাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি ভক্তিরূপে অন্তরে ও জীবনে প্রকাশ পায়। উভয়ই তাঁহার বিধান। তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে যেমন তাঁহার ভক্ত ও বিশ্বাসীদিগকে, তাঁহার সংসার রাজ্যে তদ্রূপ তাঁহার নিয়োজিত রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগকে শ্রদ্ধা দিয়া তাঁহার রাজভক্ত প্রজা হইতে হয়। তাহা না হইলে তাঁহার নববিধানে নববিশ্বাসীরূপে তাঁহার নবভক্তের অনুসরণ করিতে কখনও সক্ষম হইবার সম্ভাবনা নাই।

অবশেষে আমার ক্ষুদ্র জীবনে কি বিশেষ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহারই সাক্ষ্যদান করিয়া আমি সম্প্রতি আমার জীবনালেখ্য সমাপ্ত করিতেছি। নানা গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বালোক প্রাপ্ত হইয়া আমি এই সাক্ষ্যদান করিতে বাধ্য যে, পবিত্রাত্মা ভগবান ২৪ বৎসর বয়স হইতে বর্ত্তমান ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস, নির্ভর এবং জীবনে তাঁহার ইচ্ছানুগত্য বিধানপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার নববিধানের ক্ষুদ্র সাক্ষী করিয়াছেন। আমার মলিন অন্তরে এবং মলিন জীবনে আনুগত্য, বিশ্বাস ও নির্ভর সঞ্চার করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাকে তাঁহার ধর্ম্মে—ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থানদানপূর্ব্বক ক্রমে আমার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার ২৪ বৎসর বয়স হইতে ৪৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবানরূপে ঈশ্বর আমার অন্তরের ও জীবনের গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটন করিলেন। যথাকালে তিনি তাঁহার এবং তাঁহার বিশ্বাসীর প্রতি আমার প্রকৃত বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্ত কোচবিহার বিবাহের মহাপরীক্ষানলে আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা না হইলে আমি কখনও নববিধান বিঘোষিত হইলে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইতাম না। এইরূপে তিনি ষোল বৎসরে আমাকে তাঁহার বিধান বিশ্বাসী হইতে সক্ষম করিলেন। ইহার পর ২৪ বৎসর (১৮৮০ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত) তিনি আমাকে নববিধান বিশ্বাসীরূপে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় ফেলিয়া তাঁহার এবং তাঁহার নববিধানে আমার বিশ্বাসকে এরূপ দৃঢ় করিলেন যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের মহান্দোলনে ফেলিয়া তিনি ইংরেজ শাসন যে নববিধান প্রকটনের জন্য পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভারতে বিধান করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক রাজভক্তি এবং রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে সক্ষম করিলেন; তাহাতে আমার বিশ্বাসও বৃদ্ধি পাইল। ঈশ্বরকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ধর্ম্মরাজ্যের রাজা এবং মহাজনগণও তাঁহাদের প্রতি দলে দলে বিশ্বাসীগণ তাঁহারই ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে স্থাপনের নিমিত্ত প্রেরিতরূপে স্বীকার করা যেমন নববিধানের বিশ্বাসান্তর্গত, নানা রাজ্যে বিভক্ত পৃথিবীর সমুদয় রাজা ও

রাজপ্রতিনিধিগণ যে ঈশ্বরেরই রাজশাসন ধরাধামে বিস্তারের জন্য নিয়োজিত ও নিয়মিত তাহা স্বীকার করাও তদ্রূপ নববিধানে বিশ্বাসের অন্তর্গত। সেই বিশ্বাস না হইলে এই মহাপরীক্ষায় পড়িয়া যে আমার দশা কি হইত তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। পিতৃমাতৃভক্তি যেমন ঈশ্বর-পিতামাতার প্রতি ভক্তির সোপান, রাজভক্তিও তদ্রূপ রাজার রাজা ঈশ্বরের প্রতি রাজভক্তির সোপান। ঈশ্বরকে ধর্ম্মজ্ঞানরূপে ভক্তি করিতে হইলে যেমন তাঁহার প্রেরিত মহাজনগণকে শ্রদ্ধা করা স্বাভাবিক, তদ্রূপ রাজাকে ভক্তি করিতে হইলে তাঁহার প্রতিনিধিদিগকে শ্রদ্ধা করা স্বাভাবিক। ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহাতেই বঙ্গবিভাগের আন্দোলনে আমার হৃদয় বিচলিত হইতে পারে নাই। বিশেষ কথা এই, যখন নববিধানের প্রেরিতরূপে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামই আমার কার্য্যক্ষেত্র তখন বঙ্গবিভাগে তাহা গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন বিভাগে পরিণত হইতে দেখিয়া আমার বিশ্বাসের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ আসামের অন্তর্গত হইবে বলিয়া আমার ভয় হইয়াছিল বটে কিন্তু যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপিত হইল, তখন আমার ভয় ভাবনা তিরোহিত হইয়া নববিধান পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে সংস্থাপিত হইবার পথই প্রশস্ত দেখিলাম। এইরূপে নববিধানে আমার বিশ্বাস বিস্তৃত হইল। আমি একদিকে ধর্ম্মরাজ্য ও ধর্ম্মমণ্ডলীকে, অপরদিকে সংসার ও পরিবারকে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলাম। তুমি তোমার বলিয়া ঈশ্বরকে সদলে ধর্ম্মরাজ্যে এবং সপরিবারে সংসারে অবতীর্ণরূপে স্বীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যে এবং সংসারে তাঁহার মহাবতারণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অধিকার পাইলাম। নববিধানে প্রত্যেক বিশ্বাসীর শরীর ও আত্মা যেমন মিলিত, তদ্রূপ তাহার উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মমণ্ডলী ও পরিবারে বিশেষভাবে, পরম পুরুষরূপে ধর্ম্মরাজ্যে ও সংসারে মহাভাবে বিরাট পুরুষরূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ। ডিম্বে আবদ্ধ পক্ষীশাবক যেমন কুলায় সংরক্ষিত হইয়া যথাকালে আকাশে মুক্তভাবে উড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, দেহে আবদ্ধ জীবাত্মাও তদ্রূপ মণ্ডলী ও পরিবারে অবতীর্ণ ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান কর্ত্তৃক তাঁহার ও তাঁহার নববিধানের প্রতি বিশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে ও সংসারে মুক্তভাবে বিশ্বাসীরূপে বিচরণ করিবার অধিকার লাভ করে। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বাসী-ভক্ত কেশবচন্দ্রের অনুগামীরূপে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিবার জন্যই নববিধানে স্বয়ং ভগবান আমাকে স্থান দানপূর্ব্বক ক্রমে আমার বিশ্বাসকে বিধিমত পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাতে আমার জীবন ধন্য হইয়াছে।

নববিধানের নববিশ্বাসে আমার অন্তরে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভগবান আমাকে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী করিবার জন্যই নরকে অবতীর্ণ। নর, অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা করে তাহাই নরক। এই নরকে নিপতিত হইয়াই নর-কে অন্তরে বাহিরে অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে নরক ভোগ করিতে হয়। এই নরকে অবতীর্ণ হইয়াই প্রেমময় শুদ্ধপ্রসন্ন স্বভাব ভগবান পাপীর পরিত্রাণ করেন। ইহা আমার জীবনে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই, তিনি আমাকে তাঁহার নববিধানে স্থান দানপূর্ব্বক আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাকে তিনি তাঁহাতে ও তাঁহার বিধানে বিশ্বাসী

করিয়া লইবার জন্য সদলে ধর্ম্মরাজ্যে এবং পার্থিব পরিবারসহ সংসারে ঘেরিয়া না দাঁড়াইলে আমি কখনও তাঁহার অবতীর্ণরূপে এবং তাঁহার নববিধানে বিশ্বাসী হইতে পারিতাম না। এই নিমিত্তই আমাকে ধর্ম্মরাজ্যে সদলে ঘেরিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম কালেই তিনি আমাকে দারপরিগ্রহ করাইয়া সংসারে পার্থিব পরিবারে পরিবেষ্টন করিবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে প্রাণহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন এবং অবাধ্য আত্মাকে তাঁহার আবির্ভাবে প্রাণ, তাঁহার প্রকাশে জ্ঞান, তাঁহার সংস্পর্শে ভক্তি এবং তাঁহার চালনায় আনুগত্য লাভ করিতে সক্ষম করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি যে দলসহ আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই দলেই শুদ্ধ যোগ, জ্ঞান, ভক্তি এবং বাধ্যতায় দৃষ্টান্ত উপযোগীরূপে আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন, তাহা না হইলে আমি নব যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও সেবার মর্ম্ম-পরিগ্রহ করিতে পারিতাম না। তিনি আমার নিকট আশ্চর্য্য বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তও দলের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমার নিকট স্বর্গ হইতে প্রেরিত বলিয়া আমাকে অবশেষে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গেই ভগবানকে নরকে অবতীর্ণ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। ইঁহাদিগকে সহ ভগবানকে তুমি তোমার বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক নরকে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিবার অধিকার পাইয়াছি। অবতীর্ণ ভগবানকে তাঁহার দলসহ সর্ব্বান্তঃকরণের প্রীতি এবং দলের প্রত্যেককে আত্মবৎ প্রীতি করিয়াই মলিন অন্তরে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিবার অধিকার পাইতে হয়। এইরূপে স্বয়ং ঈশ্বরই আমার অন্তরকে তাঁহার নববিধানে নানারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি এইরূপে আমাকে নরকে নিপতিতদের মধ্যে, অবতীর্ণরূপে তাঁহার নববিধানে ব্যবহারপূর্ব্বক তাঁহার দাসত্ব করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। নববিধানে অবতীর্ণ ভগবানের একটী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দাস হওয়াই আমার মহাসৌভাগ্যের কথা। যথাকালে তিনি আমাকে তাঁহার বিশ্বাসী-দাস বলিয়া আমার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেই আমার সৌভাগ্যের সীমা রহিবে না।

আমার অন্তরে স্বর্গের কোনও সম্পদ লাভের কামনা হয় নাই। কেবলই কিরূপে ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দাস হইব ইহাই অন্তর চাহিয়াছে। ইহাতেও পাপ অন্তরে ঈশ্বর কৃপার নিদর্শন পাইয়াছি। যে ক্ষুদ্র মলিন অন্তরে কোনও উচ্চাভিলাষ উপস্থিত হইতে পারে নাই, সেই অন্তরে কি কখনও ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত, তাঁহার বিশ্বাসী-দাস হইবার মহোচ্চ অভিলাষ উপস্থিত হইতে পারিত? বলিতে কি সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ভগবান তাঁহার প্রেরিত বিশ্বাসী-ভক্তসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াই আমার মলিন অন্তরে এই মহোচ্চ অভিলাষ বিধান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি আমাকে ক্রমে তাঁহার একটী ক্ষুদ্র দাসরূপে পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার নববিধানের ভাব সংস্থাপনার্থ ব্যবহার করিবার উপায় করিয়াছিলেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই মানবজীবনে পূর্ণ হয়; কাহার সাধ্য তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করে! তাই আমার মলিন জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। ইহাই আমার ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহাই আমার পরিত্রাণ।

বর্ত্তমান সময়ে আমার দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতা ঘটায় আমি আর আমার জীবনের কোন ঘটনাই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না; সুতরাং এইস্থানেই আমার জীবনালেখ্য পরিসমাপ্তি হইল।

আত্ম-জীবন

অর্থাৎ

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত আত্ম-জীবন বৃত্তান্ত

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি॥

আত্ম-জীবন

এই ১৩০১ সালে আমার বয়ঃক্রম ৭১ বা ৭২ বৎসর হইয়া থাকিবে। বহুকাল হইল আমার জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে, আমি নিজের বয়স নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয় ৭০ অতীত হইয়াছে। মা বলিয়াছেন, আমি বৈশাখ মাসে মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কোন্ সালের বৈশাখ মাসে এবং বৈশাখ মাসের কোন্ তারিখে জন্মিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলেন নাই, আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হই নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তখন প্রয়োজন বোধ হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলেও যে তিনি সন তারিখ বলিতে পারিতেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। জন্মবার মঙ্গলবার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জন্মবারে কোথাও যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয় ভাবিয়া মাতৃদেবী মঙ্গলবারে বিদেশে আমাকে যাত্রা করিতে দিতেন না। আমি বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বড় দিদী ছোট দিদী প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন, উহা নিশ্চিত।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি কুলগুরু স্বর্গগত বিশ্বনাথ পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ আছে, তিনি সরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। খড়ি মাটীর ঢেলা দ্বারা ভূতলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকল লিখিয়া আমাকে একটি একটি করিয়া অক্ষর পড়াইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কদলীপত্রে বর্ণমালা লিপি করা অভ্যাস করিলে পিতৃদেব মাধব রাম রায় মহাশয় আমাকে পারস্য ভাষার চর্চ্চায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দ্দেশে একজন মোল্লা আসিয়া নমাজ পড়িয়া পারস্য বর্ণ-মালা আলেফ্, বে, তে, সে ইত্যাদি পড়াইয়া যান। আমি সিন্নি দিয়া তাঁহার নিকটে রীতিপূর্ব্বক "বেস্মাল্লা আর্ রহমান্ আর্ রহিম" বচন উচ্চারণ করিয়া আলেফ্, বে, তে, পড়িতে ও লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পারস্য বর্ণমালা কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইলে পর পিতৃদেব স্বহস্তে শেখ সাদী প্রণীত 'পন্দনামা' পুস্তক লিখিয়া আমাকে পড়িতে দেন। বোধ করি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি রীতিপূর্ব্বক পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হই।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে দেওয়ান বংশে আমার জন্ম।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মোর্শেদাবাদের নবাব সরকারে একটি উন্নত পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বদান্য ও দয়ালু লোক ছিলন, জনহিতকর নানা সৎকার্য্য করিয়া স্বদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অতীব পুণ্যাত্মা বলিয়া লোকে তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাবেই আমাদের বংশের গৌরব ও সম্মান। কিন্তু তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ নিজচরিত্রদোষে সেই সম্মান বিনষ্ট করিয়াছে; তাঁহাদের দ্বারা বংশ কলঙ্কিত হইয়াছে। আমার পিতামহ স্বর্গগত মোন্‌শী রামমোহন রায় মোর্শেদাবাদের নবাব সরকারে অন্যতর উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।* তাঁহার তিন পুত্র মোন্‌শী রাধানাথ রায়, মাধবরাম রায়, গঙ্গাপ্রসাদ রায়; ইঁহারা সকলেই মোর্শেদাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্যভাষাবিদ্‌ বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। পিতামহ রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। আমার পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্য সকলেই সুলেখক (খোশ্‌নবিস) ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধানাথ রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পারস্য লিপির আদর্শের (তালিমের) অনুকরণে সুন্দর লিখিবার জন্য দেশ দেশান্তরের লোক তাহা গ্রহণ করিত। সাধারণতঃ পারস্য বর্ণমালা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "শেকস্ত" ও "নোস্তালিক"। পিতামহদেব এবং পিতৃব্য রাধানাথ রায় শেকস্ত লেখক ছিলেন তাঁহাদের অক্ষরাবলী মুক্তাবলীর ন্যায় নয়নরঞ্জন সুন্দর ছিল। পিতৃদেব এবং পিতৃব্য গঙ্গাপ্রসাদ রায় নোস্তালিক অক্ষরে লিখিতেন। তাঁহাদের দুই জনের এবং পিতামহ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি পারস্য পুস্তক আমাদের গৃহে ছিল, আমার অযত্নে সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে। পিতামহ ঠাকুর আমার জন্মগ্রহণের বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। পিতৃব্যদ্বয়কেও আমি দর্শন করিতে পারি নাই।

---

* স্বর্গগত দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষ নারায়ণ রায় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আমার প্রপিতামহ ইন্দ্রনারায়ণ রায়, অপিচ পুত্র সন্তান এবং আমার পিতামহ রামমোহন রায় এই কয়েকজন আমার পূর্ব্ব-পুরুষের স্বাক্ষরিত ১১৬৭ সালের লিখিত ভূমিসম্বন্ধীয় একখানা অতিকায় জীর্ণ দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণ ১৩১৩ সাল। সুতরাং সেই দলিল পত্র ১৩৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন সম্ভবতঃ দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের বার্দ্ধক্যাবস্থা ছিল।

বাল্য-জীবন

আমার তিন ভ্রাতা তিন ভগিনীর মধ্যে আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। মাতৃদেবীর জীবদ্দশাতেই দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চাশী-ত্যধিক বর্ষবয়স্কা বিধবা ভগিনী দেবী বরদেশ্বরী গুপ্ত বিগত ৭ই ভাদ্র পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া বাল্যকালে মার অধিকতর স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলাম। আমি যে বিষয়ের জন্য আবদার করিতাম, মা আমাকে তাহাই দিতেন। তিনি আমাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। আমার গলায় হার, হাতে বালা, বাহুতে বাজু নামক ভূষণ, কোমরে ঘুঙ্গুর বা গোট, পদে নূপুর ও মল ছিল। আমি মস্তকে শিখা অর্থাৎ টিকী ধারণ করিতাম, আদুল গায়ে থাকিতাম। আমার রূপের ছটার সীমা ছিল না। সেই অদ্ভুত বেশভূষা স্মরণ করিলে এক্ষণ আমার হাসি পায়। আমি যেন আদুরে গোপাল ছিলাম। তখন আমি অতিশয় ক্ষীণাঙ্গ দুর্ব্বল ভীরু প্রকৃতি ছিলাম; দুষ্ট দুরন্ত বালকগণের সঙ্গে কখনও মিশিতাম না; প্রায় কোন খেলাই জানিতাম না। ক্রীড়ামোদের জন্য যেরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রয়োজন সে বিষয়ে আমি দরিদ্র ছিলাম। আমি গৃহে একাকী জীবনযাপন করিতাম। আমাদের বাড়ীতে বিক্রমপুরনিবাসী দুর্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত নামক একজন বৈদ্য চিকিৎসক স্থিতি করিয়া বহুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কবিরাজ দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতাম; প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ঘরে তাঁহার নিকটে বসিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। তাঁহা হইতে নাম জিজ্ঞাসাপ্রণালী ও অনেক নূতন নূতন শ্লোক শিক্ষা করা হইয়াছিল। তিনি যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতেন আমি সে সকল মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিতাম, তাঁহা হইতে লবঙ্গাদি, নৃপবল্লভ ইত্যাদি বড়ী প্রস্তুত করিবার তালিকা লিখিয়া লইয়াছিলাম এবং মাতৃদেবী হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক ঔষধের উপকরণ লবঙ্গ জয়িত্রী জায়ফল পিপ্পলী ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিতাম, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে একত্র পেষণপূর্ব্বক গুলি প্রস্তুত করিতাম, পল্লীর কাহারও জ্বর বা উদরাময় কিংবা শিরঃপীড়া হইয়াছে শুনিলে তাহাকে ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতাম। সকলে আমোদ করিয়া হউক বা যে ভাবে হউক আমার প্রদত্ত ঔষধ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে ইহা একটী ক্রীড়া ছিল।

আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে প্রধান ক্রীড়া ছিল ঠাকুর পূজা। পিত্তলনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গণেশ, ও গোপাল এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ছিল, সে সকল আমা কর্ত্তৃক গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে এই সমস্ত মূর্ত্তি-পূজার জন্য আমি পুষ্প চয়ন করিতাম। স্নান করিয়া বা বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য এবং ধূপ দীপযোগে নিবিষ্ট মনে সেই প্রতিমূর্ত্তি সকলের পূজায় নিযুক্ত হইতাম। ক্ষুদ্রাকারের দীপকোষা টাট পুষ্পপত্রাদি পূজার বাসন এবং ক্ষুদ্র কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য আমার ছিল। আমি বৈদ্যবংশীয়, আমাদের দেশে বৈদ্যজাতি উপবীত ধারণ করে না, কিন্তু আমি বিগ্রহপূজা করি বলিয়া অনেক সময় স্কন্ধে উপবীত ধারণ করিতাম। আমি কি প্রকার মন্ত্র পড়িয়া সেই সকল ক্ষুদ্র পুতুলকে সচন্দন পুষ্প অর্পণ করিতাম, তাহা আমার মনে নাই। ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ছিল। আমাদের পরিবারে লক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বেতনভোগী পূজক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সেই বিগ্রহের পূজা করে, সেই ঠাকুরপূজার সময় আমি ঠাকুর ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইতাম, ভক্তিপূর্ব্বক চরণামৃত গ্রহণ ও প্রণাম করিতাম, নৈবেদ্যের চিনি কলা প্রসাদেরও প্রত্যাশী হইতাম। সায়ংকালে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া বৈকালী প্রসাদের জন্য দেবালয়ের দ্বারে দৌড়িয়া যাইতাম। আমি সেই পারিবারিক পুতুল সকলকে চূড়া, হার ও স্বর্ণময় উপবীত এবং বিচিত্র বসন দ্বারা সাজাইয়াছি, সুবর্ণনির্ম্মিত তুলসীপত্র ও চম্পক কুসুম উপহার দিয়াছি, উৎকৃষ্ট সিংহাসন, শয্যা ও মশারি দান করিয়াছি। দোলযাত্রার সময় আমি ঠাকুরকে দোলমঞ্চে আরোহণ করাইতাম। আমার জন্য ক্ষুদ্রাকারে দোলমঞ্চ, সিংহাসন ও মকর কাঠাম ছিল। কুলপুরোহিত রীতিমত হোম ও পূজা করিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামক শালগ্রামকে দোলমঞ্চের উপর সিংহাসনে স্থাপন করিতেন। পারিবারিক বৃহৎ দোলমঞ্চের পার্শ্বেই আমার ক্ষুদ্র দোলমঞ্চ নির্ম্মিত হইত। যথাবিধি সকল কার্য্য সম্পাদন করা যাইত। দোলের উৎসবোপলক্ষে ভোজও হইত। স্নেহময়ী জননী আমার মনস্তুষ্টির জন্য এ সকল বিষয়ে অর্থসাহায্য করিতেন। কিন্তু ক্ষুদ্রাকারে আর দুর্গোৎসব করিয়া উঠিতে পারিতাম না, পারিবারিক দুর্গোৎসবেই উৎসাহ, আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করিতাম। আমি একজন গোঁড়া হিন্দু পৌত্তলিক ছিলাম। পারিবারিক বিগ্রহাদিসম্বন্ধে আমার অত্যন্ত গোঁড়ামী ছিল। আমি মনে করিতাম আমাদের বাড়ীর ঠাকুর-দেবতার ন্যায় এবং আমাদের শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবের ন্যায় অন্য কোন্ দেবতা

জাগ্রত নহে। আমি শাক্তপরিবারের বালক ছিলাম, শৈশবকালে সময়ে সময়ে কদলী তরু কাটিয়া আনিয়া তাহাকে মহিষ বা পাঁঠা কল্পনা করিয়া পুতুলের সম্মুখে বলিদান করিতাম। অনেক পক্ষীর ছানা পোষা গিয়াছে; কখন কখন আমি পাখীও বলিদান করিয়াছি, কখন কখন তুলসী তরুর সেবা করিয়া তুলসীভক্ত বৈষ্ণবদের অনুকরণ করিয়াছি।

আমি একজন পাক্কা হিন্দু ছিলাম, উচ্চ-নীচ জাতি বলিয়া আমার ভেদজ্ঞান প্রবল ছিল। মোসলমানের ছায়া মাড়ালে আমি যেন অপবিত্র হইলাম, মনে করিতাম। আমাদের ঘরে একজন শূদ্র জাতীয় চাকরাণী ছিল, সে বহুকাল আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিল; আমি তাহার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি। তাহার বার্দ্ধক্যকাল পর্য্যন্ত সে আমাদের কাজে নিযুক্ত ছিল। তাহাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, তাহার নাম করুণা ছিল। এক দিন রাত্রিতে আমি ভোজন করিতে বসিয়াছি, করুণা মাসী আমার পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, তাহার আঁচল আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনে নিবৃত্ত হইয়া অন্নপাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলাম। শূদ্র জাতির স্পর্শ হইল, আমি কেমন করিয়া সেই অন্ন গ্রহণ করি। তখন আমার বয়ঃক্রম ৯।১০ বৎসর হইবে। ইহার কিয়দ্দিন পরে আমি বড় দাদা স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে নিজালয় হইতে জলপথে ঢাকা নগরে যাইতেছিলাম। ঢাকার অনতিদূরস্থ বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী ফতুল্লার বাজারের পার্শ্বে নৌকা সংলগ্ন হয়। ফতুল্লার পাতক্ষীর প্রসিদ্ধ। দাদা বাজারে যাইয়া কিছু পাতক্ষীর ও সরু চিড়া ক্রয় করিয়া লইয়া আসিলেন। একখানা ক্ষুদ্র চালাঘরে গোয়ালা ক্ষীর বিক্রয় করিতেছিল, সেই ঘরে জয়ঢাক বাজাওয়ালা প্রবেশ করিয়াছিল, আমি নৌকায় বসিয়া ইহা দেখিতে পাইয়াছিলাম। চালার ভিতরে ফিরিঙ্গী বাজাওয়ালা প্রবেশ করাতে ক্ষীর অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া আমি তাহা স্পর্শ করিলাম না। দাদা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহা আমাকে খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি ও নৌকাস্থিত অন্য লোক আনন্দে ক্ষীরের ফলার করিলেন, জাতির মায়ায় কেবল আমিই বঞ্চিত রহিলাম। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরও বহুকাল পর্য্যন্ত মোসলমানের প্রস্তুত পাঁউরুটি ভক্ষণ করি নাই, সভ্যলোকের প্রিয়খাদ্য কুক্কুট মাংস জীবনে কোন দিন রসনায় স্পর্শ করি নাই।

১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চাননের নিকটে

শিবমন্ত্র গ্রহণ করি। আমি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন পুষ্প চন্দন যোগে শিব পূজা করিতাম। আমার পূজার নিষ্ঠা ও হিন্দুওয়ানি দেখিয়া, আমার খুড়তত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত দেবীপ্রসাদ রায় বলিয়াছিলেন, আমাদের বংশে এ একজন ধার্ম্মিক লোক হইবে।

আমাদের গ্রামে সখীসংবাদ গানের দল ছিল, আমাদের প্রজা শিবচন্দ্র সিংহ সেই দলে নেতৃত্ব করিত। শিব সিংহের সখীসংবাদের বা কবির দল আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। বড় বড় ওস্তাদ কবির দল শিব সিংহের দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণে এই দলের গান হইত, বহু দূরের পথ হইতে লোক সকল ব্যাকুল হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে আসিত। আমি এই দলের একজন পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলাম। আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে গান শ্রবণ করিতাম, তাঁহাদের গান শিখিবার সময় গানের খাতা দেখিয়া গান বলিয়া দিতাম, তাহাদিগকে গাঁজা তামাকু যোগাইতাম।

যে বালকের উৎসাহ ও আমোদ পুতুল পূজায়, যে বালক ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়ায়, এবং কবির দলের সরকারের কাজ করে, সেইরূপ বালকের কি কখনও লেখাপড়া শিক্ষা হয়? আমার বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বোধ হয় তখন আমার অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। তিনি যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার শাসনাধীনে থাকিয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে বা অন্য কোন গুরুজনের নিকটে পন্দনামা বা গোলস্তান পুস্তক পড়িতেছিলাম। বাঙ্গালা লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই হইতেছিল না। তখন পারস্য ভাষা শিক্ষার প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না, বহু বৎসর পর্য্যন্ত অর্থ না বুঝিয়া ছাত্রদিগকে কেবল পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত। এইরূপ পাঠ মুখস্থ করাকে "যতন পড়া" বলে। এই প্রকার যতন পডায় আমার জীবনের অনেক বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। পিতৃদেব স্বর্গগত হইলে পর আমি স্বাধীন হইলাম, পড়াশুনায় অধিকতর অনাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। একদিন সবক (পাঠ) গ্রহণ করিলে তিন দিনেও তাহা ইয়াদ (আবৃত্তি) করা হইত না। শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না, মার অত্যধিক স্নেহ ও আদরে আমাকে অধিকতর বয়ে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় পাঁচদোনা গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নীতির বন্ধন ছিল না, চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ ছিল, আমি প্রায় কাহারও মুখে ভাল কথা সদুপদেশ শুনিতে পাইতাম না।

অধিকাংশ জ্ঞাতিকুটুম্ব পুরুষ ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিল। আমি মদ্যপ্রিয় শাক্ত বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি মদ্যপান করে নাই, আমাদের বাড়ীতে কখনও সুরা পানের ঘটা হয় নাই। তথাপি আমি মাতালের সংসর্গে অনেক কাল বাস করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে সুরার আস্বাদ কখনও প্রাপ্ত হই নাই, কোনরূপ মাদকদ্রব্য এমন কি ধূম পানাদি আমাকে বশীভূত করে নাই; কিন্তু আমার চরিত্রে নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়াছিল। আবশ্যক হইলেই আমি মিথ্যা কথা কহিতাম, গৃহে সুরস খাদ্য ও মিষ্টান্নাদি চুরি করিয়া খাইতে পাপ বোধ করিতাম না, আরও কোন কোন বস্তু চুরি করিয়াছি। সর্ব্বদা চতুর্দিকে কুকথা শ্রবণ ও কুদৃষ্টান্ত দর্শনের অভাব ছিল না। নানা কুভাব ও কুচিন্তায় অন্তর কলুষিত হইয়াছিল, চরিত্রের স্খলনও ঘটিয়াছিল। মঙ্গলময় মঙ্গলহস্তে কেশমুষ্টি ধারণ করিয়া আমাকে অনেক প্রকার পাপ দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বহু প্রলোভন ও কুশিক্ষা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার হৃদয়কে পবিত্র ধর্ম্মালোকে আলোকিত ও স্বর্গাভিমুখীন করিয়াছেন। এই পাপীর জীবনে সেই করুণাময়ের স্নেহ করুণার এবং তাঁহার জীবন্ত প্রেমলীলার সাক্ষ্য দান করাই আমার আত্ম-জীবন লিপি করার মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য অভিসন্ধি কিছুই নাই।

ছাত্রীয়-জীবন

আমার দশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইতে আমার পিতৃদেব স্বর্গগত হন। তখন আমার বড় দাদা স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র রায় ঢাকা নগরে বিষয় কার্য্যোপলক্ষে স্থিতি করিতেন, তিনি সুবর্ণগ্রামনিবাসী স্বীয় শ্বশুর মহাশয় মোন্‌শী রুদ্রেশ্বর গুপ্তের সঙ্গে উক্ত নগরে বাস করিতেছিলেন। দাদা আমাকে বাড়ী হইতে ঢাকায় লইয়া গিয়া ইংরাজি শিক্ষার জন্য পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেই সময় বোধ হয় আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর। আমি এক পক্ষ কাল উক্ত স্কুলে Spelling পড়িয়া থাকিব। প্রাত্যহিক পাঠে মাষ্টার বাবু ও পণ্ডিত মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় দুই তিন জন ছাত্রকে কোন অপরাধে আমার সম্মুখে অত্যন্ত বেত্রাঘাত করেন, তাহা দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমি ভাবিলাম, হয়তো এক সময় এরূপ গুরুতর দণ্ডে আমাকেও দণ্ডিত হইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া আর ইংরাজি স্কুলে পড়িব না, আমি এই স্থির করিলাম। পরদিন স্কুলে যাইবার

সময় আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বড় দাদাকে বলিলাম, আমি স্কুলে পড়িব না, সেখানে বড় মার হয়; আমি বেত্রাঘাত সহ্য করিতে পারিব না। তিনি স্কুলে যাইবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ করেন, এবং বলেন, "দুষ্ট ছাত্রেরাই বেত্রাঘাত পাইয়া থাকে, তোমার ভয় নাই।" কিন্তু আমি কিছুতেই স্কুলে পড়িতে সম্মত হইলাম না, অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। স্কুল গৃহের এক স্থানে একাসনে ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে বসিয়া থাকাও আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল, স্কুল পরিত্যাগের তাহাও অন্যতর কারণ ছিল। আমার মনে হইতেছে বিধাতার বিধানের চক্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি স্কুলে ইংরাজি শিক্ষায় নিরন্তর রত থাকিলে সময়ে একটা বড় কেরাণী হইয়া বড় লোক হইয়া বসিতাম, আমাকে আর পরিণত বয়সে লক্ষৌ নগরে যাইয়া কষ্ট করিয়া আরব্য ভাষার চর্চ্চা করিতে হইত না, কোরাণ ও হদিস ইত্যাদির অনুবাদ, আমা দ্বারা হইয়া উঠিত না। পরে বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজি শিক্ষার চেষ্টা করা গিয়াছিল, সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আমি পুনর্ব্বার পারসী পড়িতে আরম্ভ করিলাম, ঢাকা নগরে কিয়দ্দিন মোন্‌শী রুদ্রেশ্বর গুপ্তের নিকটে, পরে কিয়দ্দিন একজন মোসলমান মোন্‌শীর নিকটে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমি পাঠে অনাবিষ্ট ছিলাম, আবার প্রণালীমত আমার শিক্ষা কিছুই হয় নাই, শিক্ষাসম্বন্ধে আমার কোন উন্নতি হইয়া উঠে নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত হামছাদি পল্লীতে মাতামহ আলয়ে মাতৃদেবীর সঙ্গে স্থিতি করিয়াছিলাম। উক্ত পল্লীর অদূরে আমার পিসা মহাশয় স্বর্গগত উমানাথ গুপ্তের আলয়। তখন তিনি ও পিসীমাতা রুক্মিণী দেবী জীবিত ছিলেন, পারস্য ভাষায় পিসা মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ছিল। কতিপয় ছাত্র তাঁহার নিকটে নিয়মিতরূপে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেছিল। আমি কিয়দ্দিন পিসা মহাশয়ের আলয়ে স্থিতি করিয়া উক্ত ছাত্রদিগের সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষা করিয়াছি।

ঢাকা নগরে অধিককাল স্থিতি হয় নাই, ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি বৎসর আমি নিজালয়ে স্থিতি করি। আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা পল্লীর অর্দ্ধ মাইল অন্তর শানখলা নামক ক্ষুদ্র পল্লী। সেই পল্লীতে মোন্‌শী কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাস করিতেছিলেন। তিনি পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন, উক্ত ভাষায় বচনবিন্যাসে তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি অতিশয় রসিক পুরুষ ছিলেন, বাগ্‌নৈপুণ্য ও রসিকতায় লোকদিগকে হাসাইতেন ও মুগ্ধ করিতেন। লোকের নিকটে তিনি

বাঁকা কৃষ্ণ রায় সম্বোধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে পারস্য ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই; প্রতিদিন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে কেতাব বগলে করিয়া শানখলা গ্রামে যাইয়া সবক লইতে থাকি। কিছুকাল পরে তাঁহার গৃহে স্থিতি করিয়া পারস্য ভাষার চর্চ্চা করি। বাঁকা কৃষ্ণ রায় মদ্যপায়ী ছিলেন, প্রত্যহ মদ্যপান করিতেন। ভদ্র পরিবারের একটি বিধবা নারী তাঁহার গৃহে স্থিতি করিয়া তাঁহাকে দুই বেলা রাঁধিয়া দিত, এবং তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিত। সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তাঁহার অপবিত্র যোগও ছিল। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়াই মদ্যপান করিতেন, মদ না খাইলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, ভাল শিক্ষা হয় না, এরূপ বলিয়া কখন কখন আমাকে সুরাপানে প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তাঁহার আশীর্ব্বাদে ওস্তাদজির সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া কারণ স্পর্শ করি নাই। বাঁকা কৃষ্ণ রায় এই মদ্যপানে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অন্নবস্ত্রাভাবে অতি ক্লেশে শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার থালা-ঘটী ভিটা-মাটি পর্য্যন্ত সুরানলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। যাহা হউক বাঁকা কৃষ্ণ রায়ের নিকটে স্থিতি করিয়া আমি তওয়ারিখ জাহাঁগির, মাদনোজ্জওয়াহের, মহব্বতনামা, বহরদানেশ, সেকন্দরনামা, রোক্কাতে ইয়ার মোহম্মদ ইত্যাদি বড় বড় পারস্য গ্রন্থ পূর্ণ বা আংশিক অধ্যয়ন করি। পরে আমি পারস্য গদ্য-পদ্য কাব্যাদি পুস্তকের মর্ম্ম উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া পড়িতাম; প্রায়ই বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু তখনও বাঙ্গলা বা পারস্য বচন বিন্যাস করিয়া দুই ছত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে আমার ক্ষমতা হয় নাই, এবং মাদনোজ্জওয়াহের মহব্বতনামা বহরদানেশাদি অশ্লীল কাব্য পড়িয়া আমার মন বিকৃত ও কলুষিত হইয়াছিল। আমি এইরূপ পাঠ্যাবস্থায় কিয়দ্দিন সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া পল্লীতে ভগিনীর আলয়ে স্থিতি করিয়া একদল মোসলমান মোন্‌শীর নিকটে গোলস্তানের কতক দূর অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। শানখলানিবাসী বাঁকা কৃষ্ণ রায়ের নিকটে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমি ছোট দাদা হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ময়মনসিংহ নগরে যাইয়া স্থিতি করি। তিনি সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও বিশেষ কবিত্ব ছিল। ছোট দাদা হরচন্দ্র রায় ময়মনসিংহের ফৌজদারী আদালতের মোহরের পরলোকগত সৃষ্টিধর রায়ের আবাসের এক অংশে বাস করিতেন। সৃষ্টিধর রায় জ্ঞাতি সম্পর্কীয় দাদা ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ১০ টাকা মাত্র ছিল, কিন্তু উপার্জ্জন বোধ হয় তিন শত টাকারও অধিক হইত। তিনি

ডিঃ মাজিষ্ট্রেট ও কাজী মৌলবী আবদোল করিম সাহেবের সেরেস্তায় নিযুক্ত ছিলেন। আমি ময়মনসিংহ নগরে স্থিতি করিয়া কিয়ৎকাল উক্ত মৌলবী সাহেবের নিকটে রোকাতে আল্লামী অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তৎপর আমি উক্ত মৌলবী সাহেবের উপদেশ ও দাদার ইচ্ছামতে মৌলবী সাহেবের কাছারিতে নকলনবিশী কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। প্রথম বয়সে এ পর্য্যন্ত আমার পারস্য ভাষার চর্চ্চা হয়। তখন আমার ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি পারসী শিক্ষার জন্য পরলোকগত বাঁকা কৃষ্ণ রায়ের নিকট অধিকতর ঋণী। আমার এরূপ শিক্ষাকার্য্যে বোধ করি আমার পৈতৃক সম্পত্তির দশ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। যেমন অর্থব্যয় তদ্রূপ বিদ্যাও হইয়াছে। পুস্তক ক্রয় করিতে হইত না, গৃহে পুঞ্জ পুঞ্জ হস্তলিখিত পারস্য পুস্তক রক্ষিত ছিল; অনেক পুস্তক আমার পিতৃদেবের ও পিতৃব্য গঙ্গাপ্রসাদ রায়ের এবং পিতামহদেব রামমোহন রায়ের স্বহস্তলিখিত ছিল; অপরের একখানা পুস্তকও নকল করিয়া বা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আমাকে পড়িতে হয় নাই। দুঃখের বিষয় সেই সকল মূল্যবান্ পুস্তক সমস্ত অযত্নে নষ্ট হইয়াছে, একখানাও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক্ষণ আমাকে মুদ্রিত আরব্য পারস্য পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িতে হইতেছে। এই সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পুস্তক ও ছাত্রবেতনাদিতে কত রাশি রাশি অর্থব্যয় হয়, ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একটি একটি সন্তানের অধ্যয়ন-ব্যয় যোগাইতে সামান্যাবস্থাপন্ন অভিভাবকগণ ঋণজালে জড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হন। তাহার উপর অবোধ বালকগণ এরূপ বাবু হইয়া উঠে যে, ৪।৫ টাকা মূল্যের জুতা ব্যবহার না করিলে, মূল্যবান্ বস্ত্রের উৎকৃষ্ট ফ্যাসানের কোট পেণ্টুলন না পরিলে, এবং লুচি মণ্ডা লালমোহন পান্তোয়া দ্বারা জল খাওয়া না হইলে তাহাদের মান রক্ষা হয় না, ও কষ্ট বোধ হয়। পিতামাতার দুঃখক্লেশের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। পিতা মাতা নিজে না খাইয়া ও না পরিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ক্রমাগত ঋণ করিয়া এইরূপ মূর্তিমান্ সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইতে বাধ্য হন। অনেকে বড় আশা করিয়া পুত্রকে বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া পরে বিষম বিপন্ন হইয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে পুত্র সেখানে অদ্ভুত ভূত সাজিয়া পিতা-মাতাকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়াছে, কেবল সাহেবদের কতকগুলি কুনীতি শিক্ষা করিয়াছে। কুলাঙ্গার পুত্রের ব্যবহারে পিতা সর্ব্বদা নয়ন জলে অভিষিক্ত হইয়াছেন, পরে শোক দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব

নাই। আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবানা রূপে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছি, চিরকাল গরিবানা চালে চলিয়া আসিয়াছি। আমি এক টাকা দেড় টাকার অধিক মূল্যের বিনামা বোধ হয় কখনও চরণে স্পর্শ করি নাই, বাল্যকালে তিন চারি আনা মূল্যের তালতলার চটি জুতা ব্যবহার করিয়াছি। তাহাও প্রায় তোলা থাকিত, আমি সর্ব্বদা এক আনা দেড় আনা মূল্যের কাষ্ঠপাদুকাই ব্যবহার করিতাম। কখনও কোন কুটুম্বালয়ে যাইতে হইলে বিনামা জোড় চরণ স্পর্শ করিত। এইরূপ জুতা ও খড়মে তিন চারি বৎসর কাটিয়া যাইত। একবার বড় দাদা মখমল বস্ত্রে জড়িত এক জোড়া চটি জুতা আমার জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা পাইয়া আমার যে, কত আনন্দ হইয়াছিল আমি তাহা ভুলিতে পারি না। সেই বিনামা জোড়ার মূল্য ছয় আনার অধিক হইবে না। একদা আমি ঢাকা নগরে কল্কাদার ঢাকাই চাদর ও বার্নিশ করা জুতা ব্যবহার করিয়াছিলাম। সেরূপ চাদর গায়ে জড়াইয়া ও চকচকে জুতা পরিয়া রাজপথে বাহির হইলে আমার মন একটু অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল। আমি ছাত্রীয় জীবনে সামান্য পিরাণ বা মির্জাই কখন কখন ব্যবহার করিতাম, সর্ব্বদা নয়। বিকালে জল খাওয়ার জন্য চিড়ে মুড়ি লাড়ু ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি সেই মুড়ীর মায়া এক্ষণও ছাড়িতে পারি নাই, বিকালে জল খাওয়ার জন্য অর্দ্ধ পয়সার মুড়ী বরাদ্দ আছে। পরে আমি মুড়ীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়ি, তজ্জন্য এক বৎসরের জন্য মুড়ী খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন ছাত্রগণ বাটি বাটি চায়ের জল পান করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। এ সকল বিলাসিতার সঙ্গে আমার কখনও সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। বাল্যকালে চা কিরূপ বস্তু জানিতাম না, এখন অনেক পরিবারে চায়ের স্রোত চলিয়াছে, মেয়েরা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া চা-পানি পান করেন, কিন্তু আমাকে কেহ সহজে চা পান করাইতে পারেন না। তাহার গুণের শত গুণ বর্ণনা শুনিয়াও আমি মুগ্ধ হই না। আমি চায়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় লেখনী চালনা করিয়াছি, তাহাতে চায়ের ভক্তগণ আমার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু আমি রোগবিশেষে ঔষধস্বরূপ চা পান করিয়া থাকি।

স্কুল-কলেজের বর্ত্তমান ছাত্রগণ রন্ধনে নিতান্ত অক্ষম, একবেলা রন্ধন করিতে হইলে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখে, অনেকে উপবাস করিয়া থাকিতে বরং রাজি হয়, কিন্তু রন্ধনশালায় যাইয়া রাঁধিতে রাজি হয় না। তাহারা রাঁধিতে গেলে

হয়ত ভাতের ফেন গালিতে হাত পা পুড়াইয়া ফেলে, অথবা ডাইল-তরকারিতে লবণ মসলার যোগ না করিয়া সিদ্ধ না হইতে নামাইয়া বসে। যুবক ছাত্রদের কথা আর কি বলিব? অনেক যুবতী ছাত্রীরও এই দশা। ডাইলে ফোঁড়ন দিলে ঝাঁৎ করিয়া যে একটা শব্দ হয়, সেই শব্দে আমার এক যুবতী নাত্নীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়া থাকে। তিনি ফোড়নের সময় দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া রন্ধনশালা হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, আমি বাল্যকালে ও যৌবন কালেতে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছি। তখন জাতি-ভেদের বড় আঁটাআঁটি ছিল, এখন মোসলমানে রাঁধিলেও যেমন হিন্দুর চলে, তখন শূদ্র চাকরে রাঁধিলেও খাওয়া হইত না। পূর্ব্ববঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ সুলভ ছিল না, এখনও নয়। সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের কি আর পাচক রাখা ঘটিয়া উঠে? আমি যখন ছোট দাদার সঙ্গে ময়মনসিংহে স্থিতি করিতেছিলাম, এক বেলা তিনি রন্ধন করিতেন, এক বেলা আমি রাঁধিতাম। আমার জীবনের এই সকল সভ্যতা বিরোধী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অনেকে হয়তো আমাকে একজন অদ্ভুত জানোয়ার মনে করিবেন। 'আমি কখনও নিজের সুখ-বিলাসের জন্য অর্থশোষণ করিয়া অভিভাবকদিগকে ক্লেশ দান করি নাই; সামান্য অর্থব্যয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া সামান্য চাকুরী করিয়াছি, অমিতাচারী কখনও হই নাই, নিজের সামান্য আয় হইতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রতিবৎসর বড় দাদার হস্তে সমর্পণ করিতাম।

বৈষয়িক জীবন ও পুনর্ব্বার লেখাপড়ার চর্চ্চা

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমি পারস্য ভাষার চর্চ্চা পরিত্যাগপূর্ব্বক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আব্দোল করিম সাহেবের কাছারীতে নকলনবিশী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দাদা সৃষ্টিধর রায়ের সেরেস্তাতেই নকলনবিশ হই। তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় বহুকাল হইতে তাঁহার অধীনে নকল-নবিশ ছিলেন, তাঁহারা প্রতিমাসে এক এক জন ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, আমি তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া কাজ করিতে থাকি, তাঁহারা চাপ্-কান পরিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া কাছারীতে যাইতেন; আমি ধুতি-চাদর পরিয়া কানে কলম গুঁজিয়া সাদাসিধেরূপে সেরেস্তায় যাইয়া বসিতাম। তাঁহারা লিখিতেন, "জাদুকৃষ্ট জাত্রাপুরে জাইয়া জাদুনাথকে অকারণ মাইর পিট করিয়া যন্ত্রণা দিয়াছে।" ছোট দাদার সাহায্যে আমার কিছু সত্ব নত্ব জ্ঞান হইয়াছিল;

আমি তাঁহাদের লিখিত বিষয় নকল করিবার সময় শুদ্ধরূপে নকল করিতাম, তাঁহাদের অশুদ্ধ লিখিত বর্গীয় জ স্থানে অন্তস্থ য, দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ স্থাপন করিতাম, যথা "যদুকৃষ্ণ যাত্রাপুরে যাইয়া যদুনাথকে অকারণ মারপিট করিয়া যন্ত্রণা দিয়াছে।" আমার এরূপ লেখা দেখিয়া তাঁহারা উপহাস বিদ্রূপ করিতেন। কি করিব, পরে আমি তাঁহাদের ন্যায় অশুদ্ধরূপে লিখিতেই বাধ্য হই। তাঁহারা সায়ংকালে বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় অফিসের কালি ও কাগজ গৃহে নিজেদের লেখাপড়ার জন্য সঙ্গে আনিতেন, আমিও সেরূপ কাজ করিয়াছি। উহা অধর্ম্ম ও অনীতি বলিয়া বোধ ছিল না। বোধ হয় ছয় মাস কাল আমি এইরূপ আফিসে গমনাগমন করিয়াছিলাম, এই ছয় মাসে আমার এক টাকামাত্র উপার্জ্জন হইয়াছিল, তাহাও নিজযোগ্যতায় নয়, উপরিস্থ যোগ্য নকলনবিশগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। কাছারীর সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক এ পর্য্যন্ত হয়। এই সময় আমার অন্তরে ঘন বিষাদের ছায়া পড়ে, আমি মনে একবিন্দু শান্তি পাইতেছিলাম না, যেন অনলে দগ্ধ হইতে-ছিলাম। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ্যতা কিছুই নাই, আমি মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত, এই ভাব সর্ব্বদা মনে হইত, আর আপনাকে ধিক্কার দিতাম। আমি দুই তিন বার মানসিক যন্ত্রণায় আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলাম। ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ নগরে একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হয়, সেই পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী তদানীন্তন জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত ভগবান্ চন্দ্র বসু ছিলেন। বিক্রমপুরনিবাসী স্বর্গগত পার্ব্বতীচরণ তর্করত্ন সেই পাঠশালায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে শিক্ষা দান করিতে থাকেন। অনেকগুলি ছাত্র সংস্কৃতশিক্ষার্থী হইয়া উক্ত পাঠশালায় প্রবিষ্ট হয়। আমি ছোট দাদার অনুমতি গ্রহণ করিয়া নকলনবিশী চির জীবনের জন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সংস্কৃত পাঠশালায় প্রবৃত্ত হই। প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও ঋজু পাঠ প্রথম ভাগ পড়িতে আরম্ভ করি। আমি ছাত্রগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলাম। আমার বুদ্ধি স্থূল, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, কেবল অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম যত্নের গুণে আমি প্রাত্যহিক পাঠে পণ্ডিত মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছি, অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। প্রতিদিন তর্করত্ন মহাশয় বা ছোট দাদা পণ্ডিত

হরচন্দ্র রায় এক একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন, আমি তাঁহাদের হইতে শ্লোকের অন্ত্যচরণ পাইয়া সেই ভাব অবলম্বনে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন চরণ পূরণ করিয়া দিতাম। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। উপক্রমণিকা ও ঋজু পাঠ পড়িয়া এরূপ সমস্যা পূরণ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল। আমি সংস্কৃত কবিতায় ষড়্ ঋতু বর্ণনা করিয়াছিলাম। কবিতা লিখিতে আমার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ হইয়াছিল। ময়মনসিংহের তদানীন্তন থাকবস্তের ডি কলেক্টর চট্টগ্রাম নিবাসী পরলোকগত প্রাণকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিপুরাচরণ সেন আমার পরম বন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও সমস্যা পূরণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার রচনা অপেক্ষা আমার রচনা পণ্ডিত মহাশয় অধিক পছন্দ করিতেন। পরে আমি ছোট দাদার নিকট কিছুকাল সংস্কৃত চর্চ্চা করি। কিয়ৎকাল পর তর্করত্ন মহাশয় জিলা স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তখন ছোট দাদা তাঁহার কার্য্যে বরিত হইয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, বাল্মীকি রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইত্যাদি পুস্তকের কিছু কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলাম। এক্ষণ পড়া আর না পড়া একপ্রকার তুল্য হইয়াছে। বহুকাল সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়, সেই ভাষাতে যে কিঞ্চিৎ সামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় অতি প্রাচীন ও তাহার অবস্থা উন্নত ছিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, স্থানীয় কোন ব্যক্তির অর্থসাহায্যের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই হার্ডিঞ্জ স্কুলের সঙ্গে তখন শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য নর্ম্মাল শ্রেণী স্থাপিত হয়। আমি বাঙ্গলা সাহিত্য ও ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির কিছু কিছু আলোচনা করিয়া নর্ম্মাল শ্রেণীতে প্রবেশের পরীক্ষা দান করি। আমি গণিত জানিতাম না, কোন সহাধ্যায়ী গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এরূপ কার্য্য অনীতি ও অন্যায় বলিয়া বড় বোধ ছিল না, অনেককে এরূপ অনীতির পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম রূপে গণ্য হইয়াছিলাম। এই সময়ে বাঙ্গলা কবিতা রচনায় আমার অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে; আমি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পদ্য রচনা করিয়া ঢাকা নগর হইতে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জিকা-নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছি, আমি "বনিতাবিনোদ" নামক

একখানা পদ্যপুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, উক্ত পুস্তক কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যও হইয়াছিল। সেই পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক্ষণ আমি একজন মহিলার সামান্য পদ্য রচনা সংশোধন করিতে যাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হই, দুই চরণ যোগ করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া উঠিতে পারি না। ময়মনসিংহের ছাত্রসভাতে আমি রচনা পাঠ করিতাম, অনেক ছাত্রের রচনার পরীক্ষক ছিলাম। অবশেষে আমি ঢাকা প্রকাশ-নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ময়মনসিংহের সংবাদদাতা হই। বিচারকদিগের চরিত্র ও বিচার কার্য্যাদির বিরুদ্ধে আমি যাহা সমালোচনা করিতাম গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহার অনুসন্ধান লইতেন। একবার আমি ময়মনসিংহের সবর্ডিনেট জজ বৃদ্ধ মৌলবি মোহম্মদ নাছেমের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করি। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার কৈফিয়ত তলব হয়, তাহাতে মৌলবি সাহেব অস্থির হইয়া পড়িলেন, আমি সংবাদদাতা ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আপনার নাজির যোগে ডাকিয়া পাঠান, আমি তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে সম্মত হই নাই। ময়মনসিংহের সবডিবিশন জামালপুরের সবডিভিশনল অফিসার একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন, আমি ঢাকা প্রকাশে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করি। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার অনুসন্ধান হয়। সেবার আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বাস্তবিক সবডিভিশনল অফিসর নির্দ্দোষী ছিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়ের দোষ ছিল। আমি শুনিতে ভুল করিয়া ভাগিনেয়ের দোষ মামার উপর চাপাইয়াছিলাম। কোন কোন বন্ধুর যত্নে লাইবেল কেস হইতে পারে নাই, আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় নাই। তখন আমি বাঙ্গলা সংবাদপত্রাদি প্রায়ই পড়িতাম। নর্ম্মাল শ্রেণী পরিত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই আমি হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর অন্যতর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। সেই সময় পারস্য গোলস্তান পুস্তক অনুবাদ করিয়া হিতোপাখ্যানমালা প্রথমভাগ নামে প্রকাশ করা যায়। উহা আসাম প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হয়, পরে বঙ্গদেশের অনেক জিলার স্কুল সমূহের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক ক্রমে ত্রয়োদশ বার মুদ্রিত করা হইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগ

বাল্যকাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ। স্বদেশে গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যেক পরিবারের বধূদিগের দুঃখ দুরবস্থা ও তাঁহাদের প্রতি শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতির অত্যাচার দর্শন করিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। এইরূপ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভিতরে থাকিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না, জ্ঞান-পিপাসা কিছুই চরিতার্থ হইতেছিল না। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণও বধূরূপে দাসীর ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হন, প্রায় কাহারও হইতে আদরযত্ন লাভ করেন না, কাজে একটু ত্রুটি হইলে গঞ্জনা ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার স্বাধীনতাটুকু নাই। এ সকল দেখিয়া মনে ক্লেশ পাইতাম, ভাবিতাম লেখাপড়া না শিখিলে, আত্মোন্নতি না হইলে, ইঁহাদের অবস্থার উন্নতি, স্বাধীন চিন্তা, মানসিক স্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। লেখাপড়া শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সমুদ্যোগী হই। পাঁচদোনা নিবাসী কৃতবিদ্য আত্মীয় যুবা কৈলাসচন্দ্র সেন ও বসন্তলাল সেন এ কার্য্যে আমার বিশেষ সহায় হন। বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ভদ্র পরিবারের অনেকগুলি বালিকা ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা আরম্ভ করে। পাঁচদোনার ভূতপূর্ব্ব সার্কেল পণ্ডিত সুচরিত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিদিন প্রাতে যত্নপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যায়। অনেকগুলি ভদ্র পরিবারের বালিকা উক্ত পাঠশালায় প্রথম শিক্ষালাভ করিয়া বিবাহান্তে স্বামীর বা অন্য আত্মীয়ের সাহায্যে শিক্ষার উন্নতি করিয়াছে, অনেক ছাত্রী প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে পাঁচদোনার বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। কখন কখন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপেক্ষা ও অযত্নে এই পাঠশালার কার্য্য কিছুকাল বন্ধ ছিল, আবার চেষ্টাযত্ন করিয়া পুনরায় কাজ চালান গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আমি ছাত্রীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সময় সময় সুন্দর সুন্দর গল্পের বই, ছবির বই, নানা প্রকার খেলার সামগ্রী পাঠাইয়া থাকি। আমি ময়মনসিংহে যখন শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত

হই, তখন তথায় বালিকাবিদ্যালয় ছিল না, কোন পরিবারে পারিবারিক শিক্ষার ও বালিকাদিগের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি মূড়াপাড়ার ভূম্যধিকারী এবং তত্রত্য কলেক্‌টরীর খাজাঞ্চী আমার পরমাত্মীয় বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার ময়মনসিংহস্থ আবাসে প্রথমে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করি। তাঁহার দুইটি কন্যা এবং অন্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকগুলি কন্যা সেই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। আমি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টাকাল বোধ হয় দুই বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছিলাম। কলেক্টর রেণাল্ড সাহেবের পত্নী দুই বার উক্ত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং একবার পারিতোষিকস্বরূপ নানা প্রকার সিলাই করার ও খেলার সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। পরে আর আমার সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবকাশ হইয়া উঠে নাই, আমার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্কুলের কার্য্য বন্ধ হয়। বহুকাল পরে ঠিক সেই স্থানে বৃহদাকার বালিকাবিদ্যালয় হয়, গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীদিগের অর্থসাহায্যে তাহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। পুরুষছাত্রদিগের অনুকরণে মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া সেই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে।

ময়মনসিংহ-জিলা স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভারতাশ্রমে স্থিতি করিলে পর ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন আমার প্রকৃতি ও রুচি বুঝিয়া আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আমি ছাত্রীদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতাম, আমার নামে কিছু বেতন নির্দ্ধারিত ছিল, উহা আমি গ্রহণ করিতাম না, প্রচারভাণ্ডারে অর্পিত হইত। কয়েক বৎসর এ কার্য্যে আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পরে দেশদেশান্তরে প্রচারের সঙ্গে আর শিক্ষকতা চলে না বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। আমি স্ত্রীলোকের জ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী বামাবোধিনী পত্রিকার বহুকাল নিয়মিত প্রবন্ধলেখক ছিলাম। পরে আমারই প্রস্তাবে ও উদ্যোগে নারীদিগের জন্য পরিচারিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ না করিলেও বহুকাল আমি একজন নিয়মিত লেখক ছিলাম। আজ ১২ বৎসর যাবৎ মহিলা পত্রিকা আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে ; মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অনেক মহিলার ধর্ম্মহীনতা, অস্বাভাবিক সভ্যতা ও বিবীয়ানার

বিরুদ্ধে দুঃখের সহিত আমাকে কখন কখন সমালোচনা করিতে হয়, তাহাতে আমি জানি জ্ঞানাভিমানিনী নব্য মহিলারা, বিশেষতঃ কোন কোন উপাধি-ধারিণী মহিলা তাহা পড়িয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন; কিন্তু মহিলা তাঁহাদের পরম হিতৈষিণী, এক্ষণ না বুঝিলে আশা করি সময়ে বুঝিতে পারিবেন।

অপিচ যখন আমি ময়মনসিংহে নর্ম্মাল শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম, বা অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক বনিতাবিনোদ-নামক পুস্তক পদ্যে রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলাম। উপরে সেই পুস্তকের উল্লেখ হইয়াছে। সেই সময়ে পাবনা নগরনিবাসী হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্রের পত্নী বামাসুন্দরী দেবী মহাবিদ্যাবতী বলিয়া বঙ্গদেশে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা পুস্তক পড়িয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম; পত্রযোগে তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়, আমি তাঁহার স্বহস্তলিখিত দুই-তিন-খানা পত্র পাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে নিজের একজন হিতৈষী বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। বামাসুন্দরী দেবী বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। আমি অনেকগুলি পুস্তক উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদিগকে দান করিবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। স্বদেশে বিদেশে যে স্থানে যে কোন মহিলা লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন শুনিয়াছি তাঁহার সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছে, আমি তাঁহার চিঠিপত্র ও রচনা যাহা পাইয়াছি, উপযুক্ত বোধ করিলেই তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। কিয়ৎকাল হইল, আমি পারিবারিক-জীবন পুস্তকরচয়িত্রী আমার ভাগিনেয়-বধূকে (কে. জি. গুপ্তের পত্নীকে) উক্ত পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তখন কে. জি. গুপ্ত উড়িষ্যা ডিভিশনের কমিশনর ছিলেন। বধূমাতা তাঁহার সঙ্গে স্থিতি করিতেছিলেন। সেই পত্র পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। জানি না আপনার মনে আছে কিনা। প্রায় ৩৭ বৎসর গত হইল আমি তখন মাত্র ১২ বৎসরের ছিলাম, তখন আমি আমার মাতুলকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আপনি সেই চিঠি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ময়মনসিংহের বিজ্ঞাপনী পত্রে তাহা ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। আপনিই সর্ব্বপ্রথমে আমার লেখা কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বইখানি আপনার মনে আনন্দ প্রদানে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য

বলিতে হইবে।" ২৭শে সেপ্টেম্বর, কটক।

আমি সেই প্রথম বয়সে লেখাপড়া করেন এমন অনেক মহিলাকে নানা ভাবে উৎসাহ দান করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে হিতৈষী বন্ধু বলিয়া আদর করিয়াছেন ও পত্রাদি লিখিয়াছেন, বা দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আত্মীয়তাবর্দ্ধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতর শিক্ষক পরলোকগত রামমাণিক্য সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোকগত ঈশানচন্দ্র চন্দের পত্নী শ্রীমতী উত্তমা সুন্দরী একজন। আমি তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার কতকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ বিজ্ঞাপনী পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলাম, ক্রমে তাঁহাকে কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছিলাম। পত্রাদি-যোগে তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। তিনি আমাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে আমি ঢাকা নগরে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামী ও পিতা তখন উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন নানাপ্রকার পানভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল। উত্তমা সুন্দরী স্বহস্তে খাদ্যসামগ্রী সকল বহনপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রণাম করেন, তৎপর একদিন নিজে রন্ধন পরিবেশন করিয়া আমাকে ভোজন করান। তখন হইতে রামমাণিক্য সিংহ ও তাঁহার সন্তানবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা হয়। পূর্ব্বে এই পরিবারের সহিত আমার কোনরূপ আলাপ-পরিচয় ছিল না। তখন উত্তমার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, পরে কন্যা সন্তান হয়। কন্যা উত্তমা কর্ত্তৃক আমাকে মামা সম্বোধনে উপদিষ্ট হইয়াছিল। ঢাকা নগরে উপস্থিত হইলে আমাকে রামমাণিক্য সিংহ ও উত্তমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে হইত, উত্তমাও সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন। এক্ষণ আর সেই প্রকার ঘনিষ্ঠতা নাই।

ধর্ম্মজীবন ও নানা পরীক্ষা

আমি মূলপাড়ানিবাসী কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চানন মহাশয় হইতে শিবমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা উল্লেখ করিয়াছি। তখন বোধ হয় আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম। শিবমন্ত্র গ্রহণের পর প্রত্যহ আমি স্নানান্তে নিষ্ঠাপূর্ব্বক পুষ্পচন্দনযোগে অনেক দিন পূজা করিয়াছি। আমার দাদা (পিতৃব্যপুত্র) দেবীপ্রসাদ রায় আমার আহ্নিক পূজায় একান্ত নিষ্ঠা ও দেবদ্বিজ-ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "ইঁহার যেরূপ হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা, বাস্তবিক এ আমাদের কুলের

গৌরব রক্ষা করিবে।" কিয়ৎকাল পরেই আমার শিবপূজার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার হ্রাস হয়, আমি প্রাত্যহিক পূজা হইতে নিবৃত্ত হই, পুষ্পচন্দন বিল্বপত্রযোগে রীতিমত শিবপূজা না করিয়া ত্রিসন্ধ্যা সংক্ষিপ্ত আহ্নিকমাত্র করিতে থাকি। এই অবস্থায় আমি ছোট দাদার সঙ্গে ময়মনসিংহ নগরে যাইয়া অবস্থান করি। সেখানে যাওয়ার পর আমি আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়া স্নানান্তে কেবল মূলমন্ত্র "নমঃ শিবায়" কয়েকবার জপ করিতে থাকি। আমাদের পরিবারে শিবমন্ত্র-গ্রহণের কিয়দ্দিন পরে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার রীতি। বড় দাদা ও ছোট দাদা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আমি প্রথম গৃহীত শিবপূজাই পরিত্যাগ করিলাম, শক্তিপূজা আর গ্রহণ করিব কি? অল্পদিন পরে আমি মূলমন্ত্র জপও ত্যাগ করিলাম। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত পূজার্চ্চনায় আস্থা আমার অন্তরে আর স্থান পায় নাই। ঈশ্বর আছেন, আমি এইমাত্র বিশ্বাস করিতাম, তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হই নাই।

ময়মনসিংহে জিলা স্কুলের অন্যতর শিক্ষক পরলোকগত ঈশানচন্দ্র বিশ্বাসের যত্নে তথায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল; প্রধান শিক্ষক পরলোকগত ভগবান চন্দ্র বসু মহাশয়ের আবাসে সপ্তাহান্তে একদিন সন্ধ্যার পর কয়েক জনে মিলিয়া আদি সমাজের প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের উপর হাড়ে চটা ছিলাম। আমার ভগিনীপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় উক্ত সমাজের একজন সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত "ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পুস্তক পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য, এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মে। আমি তাঁহার প্রণীত বোধোদয়াদি পুস্তক স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম। আমার ভগিনীপতি আমার ভাবগতিক দেখিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মরুভূমিতে ফুলের বাগান হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু ইহার কঠিন হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।" তখন আমার কোন ধর্ম্মে কোনরূপ বিশ্বাস ছিল না, আমি একজন অদ্ভুত জন্তুর স্বভাব ধারণ করিয়াছিলাম।

একদা আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতিপয় ছাত্র বন্ধুর সঙ্গে ভগবানবাবুর আবাসে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী দেখিতে যাই, দেখিয়া আমার মনে ভাল

ভাব হয় নাই। ভগবান্‌বাবু পুস্তক পড়িয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কতিপয় বন্ধু আদ্যোপান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা পরে পরস্পর ইহার আলোচনা করিয়া আমোদ করিয়াছিলাম।

এই সময়ে পরিণীত হইয়াছিলাম। তখন আমার একুশ বা বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম। বিবাহের সময় পত্নীর বয়স ১২ বৎসর ছিল। আমার বিবাহের ন্যূনাধিক দুই বৎসর পরে অগ্রজ হরচন্দ্র রায় ময়মনসিংহ নগরে ওলাউঠা রোগে অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার পূর্ব্বে আমি প্রয়োজনবশতঃ কিয়দ্দিনের জন্য বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে, মাতৃদেবী, ছোট দাদার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ময়মনসিংহে যাইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিবেন। আমি নিজালয় হইতে নৌকাযোগে কর্ম্মস্থানে যাত্রা করি, বড় দাদা বাড়ী-ঘরের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমার সঙ্গে চলিয়াছিলেন। জলপথে পাঁচদোনা হইতে ময়মনসিংহ যাইতে চারি পাঁচ রাত্রি পথে যাপন করিতে হয়। আমরা অর্দ্ধ পথের অধিক অতিক্রম করিয়াছি, মধ্যাহ্নে নৌকায় রন্ধন হইয়াছে, স্নানান্তে ভোজন করিতে বসিয়াছি, এমন সময় ছোট দাদার পরলোক যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হই। তাঁহার শয্যা পরিচ্ছদ জিনিষপত্রাদি সহ দেশে নৌকা প্রেরিত হইয়াছিল, সেই নৌকায় জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান প্রসন্নচন্দ্র সেন এবং তাহার পিতা প্রবোধচন্দ্র রায় ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ ও প্রসন্নচন্দ্র ছোট দাদার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর দেশে চলিয়াছিল। আহারান্তেই ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এই নিদারুণ শোকের সংবাদ তাঁহাদের নিকট শুনা যায়। এই সংবাদ পাইয়া আমাদের দুইজনের হৃদয় যেন বজ্রাহত হইল, আমরা শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে পীড়ার সংবাদও ঘুণাক্ষরে জানা যায় নাই। তৎক্ষণাৎ নৌকার গতি ফিরাইতে হইল, আমরা নিতান্ত শোকদগ্ধ হৃদয়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ছোট দাদার পরলোক যাত্রায় আমি যেন নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলাম। তিনি একজন সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কবি ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, সংস্কৃত পদ্যে অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত করিবার আর অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। পরে আমি "কৃষ্ণলীলা" নামক তাঁহার রচিত একখানা পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলাম। আমি ছোট দাদার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজের

সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি ছিল, তিনি সংস্কৃতে ব্রহ্মস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়ীতে পঁহুছিবার প্রাক্কালে এই শোকের সংবাদ মা এবং পরিবারস্থ সকলে প্রাপ্ত হইয়া শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। গৃহে পঁহুছিয়া আমি জ্বলন্ত শোক হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছিলাম। ছোট দাদা স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও দুই শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন। বধূঠাকুরানী অল্পকাল পরেই বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন হেমচন্দ্রও ১০ বৎসর বয়সে তাঁহাদের পরলোক যাত্রার কিয়ৎকাল পরে দেহত্যাগ করে। কনিষ্ঠ শ্রীমান ইন্দুভূষণ শৈশবকাল হইতে তাহার পিতামহী দেবী ও পিসীমাতার স্নেহযত্নে লালিত পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এক্ষণ বিষয়কর্ম্ম করিতেছে।

ছোট দাদার পারলৌকিক ক্রিয়ার পর আমি পুনর্ব্বার ময়মনসিংহে চলিয়া যাই। তিনি তথাকার অনেক বড়লোকের পরম প্রিয়পাত্র ও আত্মীয় ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার পরলোক যাত্রায় অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য আমি অনেকের বিশেষ স্নেহভাজন হই, বিশেষ বিশেষ লোকের আগ্রহ ও অনুরোধমতে স্কুল কমিটি আমাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত পদে নিযুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত রাম সুন্দর দত্ত আমার উপরের শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার উপরের শ্রেণীর শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছিল, সেই পদ তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই তদ্বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।

তখন মুড়াপাড়ার জমিদার ময়মনসিংহের কলেক্টরীর খাজাঞ্চি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছোট দাদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছোট দাদাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, সর্ব্বদা সেই পরিবারে দাদার গমন ভোজনাদি হইত। আমিও তাঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা বলিয়া সেই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে বদ্ধ হই। তখন ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় হইতেছিল। রামচন্দ্র বাবুর সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হওয়াতে আমি সেখানে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিতে লাগিলাম। আদি সমাজের উপাসনা প্রণালীর অনুকরণে ব্রহ্মোপাসনা হইত, উপাচার্য্য চেয়ারে বসিয়া উপাসনা করিতেন ও মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পড়িতেন। ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতাম। তদবধি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমার অন্তর হইতে বিদ্বেষ বিদূরিত হইল। আমি প্রত্যহ স্নানান্তে "নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়" এই ব্রহ্মস্তোত্র

পাঠ করিতাম। তখন ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য চরিত্রহীন ছিলেন। অনেক সভ্য সুরাপান করিতেন, কোন কোন উপাচার্য্য পানাসক্ত ছিলেন। একদিন উপাসনার সময় রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় একজন পানবিহ্বল বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া আম্র ফলে ঈশ্বরের মহিমাবিষয়ে বক্তৃতা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। উপাচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতাদানের জন্য তাহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। বক্তা দুই চারিটী কথা বলিয়াই চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়ে। কয়েকজন সভ্য ধরাধরি করিয়া সেই আম্রফলের ভাবে মূর্চ্ছিত বক্তাকে শবাকারে বাহিরে লইয়া যান। সেই বক্তা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মাতাল ব্রাহ্মদের সঙ্গ করিয়া আমি কখনও মদ্যস্পর্শ করি নাই।

আমি ব্যাখ্যান পড়িতাম এবং প্রত্যহ স্নানান্তে "নমস্তে সতে হে জগৎকরণায়" ইত্যাদি ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিতাম। ইহার কিছু দিন পরে ফৌজদারী আফিসের সন্নিহিত বড রাস্তার উপর সামাজিক উপাসনার জন্য একটি বৃহৎ চৌচালা ঘর ক্রীত হয়, সেই গৃহে সপ্তাহান্তে সন্ধ্যার পর উপাসনা হইতে থাকে। তত্রত্য তদানীন্তন ডিপুটী কলেক্টর বর্ত্তমান কুচবিহার মহারাজের দেওয়ান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু কালিকা দত্ত, এবং জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত বাবু উমাচরণ দাস কিয়ৎকাল পর্য্যায়ক্রমে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রধানতঃ কালিদাস বাবুর উদ্যোগে জিলা স্কুলগৃহে একটি রিডিং ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে তাহার অধিবেশন হইত, অধিকাংশ সভ্যই ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন। আমিও রিডিং ক্লাবের একজন সভ্য ছিলাম। প্রত্যেক অধিবেশনে ইংরাজীতে বা বাঙ্গলা ভাষায় এক একজন সভ্য এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তদবলম্বনে আলোচনা হইত। যেদিন আমি বঙ্গভাষা বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি, সেই দিন পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী ও পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর বিষম বিবাদ হয়, সেই দিন হইতে রিডিং ক্লাব উঠিয়া যায়।

১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহ নগরে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। সেই সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হন। তিনি উক্ত শকের ১৯শে কার্ত্তিক ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, ঢাকা হইতে নৌকাযোগে ময়মনসিংহে উপনীত হইয়াছিলেন। আসিবার সময় তাঁহাদিগকে ৬।৭ দিন পথে একখানা এক দাঁড়ের ক্ষুদ্র নৌকায় যাপন করিতে

হইয়াছিল। অপরাহ্নে ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে তাঁহাদের নৌকা সংলগ্ন হয়। কিশোরগঞ্জ সাবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন তখন মেলায় একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের আগমন সংবাদ পাইয়া ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ ও সাধু অঘোরনাথ দুই জনেই ঢাকা হইতে যাত্রা করিবার সময় জুতা হারাইয়া আসিয়াছিলেন। রামশঙ্কর বাবু তাঁহাদিগের শূন্য পদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে দুই জোড়া জুতা ক্রয় করিয়া আনিয়া দেন। জাতি যাইবার ভয়ে উক্ত নগরস্থ কোন ব্রাহ্ম নিজ আবাসে তাঁহাদিগকে স্থান দান করিতে পারেন নাই। সমাজগৃহের পার্শ্বে তাঁহাদিগের অবস্থিতির জন্য একটি বৃহৎ তাঁবু খাটান হইয়াছিল। ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৃত্য পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তখন বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল, আমি তাঁহার আবাসে তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতেছিলাম। কেশবচন্দ্রকে আমি তখন প্রথম দর্শন করি। সেই সময় তিনি দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণাঙ্গ যুবাপুরুষ ছিলেন। কলিকাতা হইতে একজন মহাবাগ্মী পুরুষ আসিয়াছেন শুনিয়া বহুলোক সেই পটমণ্ডপে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমিও প্রায় দুই বেলা যাইতাম, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রায় কেহই যাইতেন না। তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন না। আমার মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বক্তৃতা কি রূপে করা যাইতে পারে ?" কেশবচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "বক্তৃতা করা কিছু কঠিন নয়, বেহায়া হইলেই বক্তৃতা করা যায়, বক্তৃতা করিতে নির্লজ্জ হইতে হয়।" ব্রাহ্ম ভ্রাতার যেমন গভীর প্রশ্ন, আচার্য্যের তদ্রূপ গভীর উত্তর হইয়াছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র চারিদিনের অধিক ময়মনসিংহে ছিলেন না। একদিন ইংরাজি বক্তৃতা ও একদিন বাঙ্গালা বক্তৃতা হইয়াছিল। সাধু অঘোর-নাথ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। শীতকালে ক্ষুদ্র নৌকায় বড় ক্লেশে তাঁহাদিগকে ময়মনসিংহে যাইতে হইয়াছিল। বিছানা বালিস ছিল না, ব্যাগ তাঁহাদিগের বালিসের স্থান পূরণ করিয়াছিল, দুইজনে একখানা লেপ ব্যবহার করিতেন। দুই বেলা সাধু অঘোরনাথ রাঁধিতেন, কেশবচন্দ্র তাঁহার রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিতেন। শ্রুত আছি যে ময়মনসিংহের পথে নৌকায় অবস্থানকালে আচার্য্য প্রসিদ্ধ "True Faith" পুস্তক লিখিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার

সময় আমি আমার বালিস ও তোষক কেশবচন্দ্রের ব্যবহারের জন্য দান করি। রামশঙ্কর বাবু একদিন রাত্রিতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভোজন করিবার জন্য পার্ব্বতী বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী বাবু জাতি যাইবার ভয়ে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যাইয়া কি জাতি হারাইব ? লুকাইয়া যাইলেও প্রকাশ হইয়া পড়িবে"। সেই পার্ব্বতী বাবুই পরে সম্পূর্ণরূপে সাহেব সাজিয়াছিলেন, বিলাতে যাইয়া বিবী বিবাহ করিয়া তথায় শেষ জীবন যাপন ও পরলোক যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি আর কেশব বাবুর ন্যায় লোকের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন কি করিব ? জাত যাইবার ভয়ে তখন পাউরুটী পর্য্যন্ত ভোজন করিতে পারিতাম না। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী যুবা ছিলেন, তখন তিনি বিলাতে গমন করেন নাই, তাঁহার কোনরূপ অহিন্দু আচার ছিল না। তিনি কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আদি সমাজ হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচারার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষা

কেশবচন্দ্রের ময়মনসিংহে প্রচার করিয়া যাওয়ায় বোধকরি দুই বৎসর পরে প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তথায় প্রচারার্থ উপনীত হন। তিনি সমাজগৃহে ক্রমে চারি পাঁচটি বক্তৃতা দান করেন। গোস্বামী মহাশয় পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের এবং উপবীত ধারণের বিরুদ্ধে অনেক বলিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মনও আন্দোলিত হইয়া উঠে, এবং অনেক ব্রাহ্ম উপবীত ত্যাগী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন করেন, আমিও ভোজন করিয়াছিলাম। কয়েকটি বক্তৃতা দান করিরা গোস্বামী মহাশয় শেরপুরের ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিমন্ত্রণানুসারে তথায় চলিয়া যান। নিজের বস্ত্রাদির গাঁঠরী কোমরে বাঁধিয়া একাকী নূন্যাধিক ত্রিশ মাইল পথ হাঁটিয়া শেরপুর গমন করেন, অনেক অনুরোধ ও অনুনয়ে একজন লোক সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই দীনতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি লোকের অন্তরে বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। তিনি শেরপুর হইতে বোধহয় পদব্রজেই বগুড়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের চলিয়া যাওয়ার পর বিজ্ঞাপনী পত্রিকার সম্পাদক

জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এবং ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপবীত পরিত্যাগ করেন। তখন ময়মনসিংহস্থ প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দুগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মদের কেহ কেহ তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন, অনেকে দেশে যাইয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপবীত ত্যাগের একদিন বা দুইদিন পরেই পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখি তিনি শুভ্র স্থূল নূতন উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিয়া অনাবৃত দেহে রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমি এরূপ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি শুনিয়াছিলাম আপনি যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছেন, একি দেখিতেছি? তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ ত্যাগ করিয়াছিলাম বটে, তাহা আর কি।" গোপালচন্দ্র পনের বিশ দিন উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন পরে স্ত্রীর তাড়নায় উপবীত গ্রহণ করেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ঢাকা নগর নিবাসী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা অঞ্চলের লোক।

উপরিউক্ত দুইজনের উপবীতত্যাগের সংবাদ গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তখন তিনি বগুড়াতে ছিলেন, সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হন, বগুড়া হইতে পাল্কীযোগে ময়মনসিংহে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমবারে তিনি পশ্চিমবঙ্গনিবাসী মোনসেফ্ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয়ের আবাসে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া স্থিতি করিয়াছিলেন। এবার আর ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহাকে স্থান দান করিতে সাহসী হইলেন না, পুলিসের তদানীন্তন হেড্ক্লার্ক বাবু ঈশানচন্দ্র দের গৃহে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যাঁহারা পঙ্ক্তিভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ঢাকা-প্রকাশ পত্রিকায় হইয়াছিল। তাহা পড়িয়া হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এক সভা স্থাপন করিয়া সকলকে সমাজচ্যুত করেন। গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে বাবু ঈশানচন্দ্র দে ব্রাহ্মদিগকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই সাহসী হন নাই। কেবল, বাবু দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত ও আমার দ্বারা নিমন্ত্রণ রক্ষিত হইয়াছিল। দে মহাশয়ের প্রচুর অন্নব্যঞ্জন অপচিত হয়। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় দুঃখিত

ও উত্তেজিত হইয়া উত্তেজনাপূর্ণ এক বক্তৃতা দানপূর্ব্বক ঢাকা নগরে চলিয়া যান।

অতঃপর হিন্দুসভা ব্রাহ্মদিগের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন; প্রায় সকল ব্রাহ্মই হিন্দু আত্মীয়দিগের ভয়ে ও অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, দুই একজন ব্যতীত সকলেই অবৈধ উপায় অবলম্বনে হিন্দু আত্মীয়দিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন। সেই দুই একজনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমি তখন জিলা স্কুলের পণ্ডিত, উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে একত্র বাস একত্র ভোজন করিতেছিলাম, পার্ব্বতী বাবুর পত্নী অন্তঃপুরে আমার ভোজন বন্ধ করিয়া দিলেন, বহির্ভবনে আমার জন্য অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ থালা পাঠাইয়া দিতেন, সেই থালা-বাটী আমি ধৌত প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইতাম। তৎপর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রেরণ বন্ধ হয়। আমি বহির্ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করিতাম, ভৃত্যাভাবে নিজে খাদ্যসামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতাম, স্কুলের সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল বহন করিয়া আনিতাম, উচ্ছিষ্ট পাত্র স্বয়ং মার্জ্জনা করিতাম। পরে একটী ভৃত্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারে সে দুই তিনদিন পরেই প্রস্থান করে। ভৃত্য আমার উচ্ছিষ্ট পাত্র স্পর্শ করিলে গৃহিণী তাহাকে স্নান করাইতেন, সে দুই একদিন রাত্রিতে স্নান করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে। ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কেহ প্রকাশ্যে আমার সঙ্গে জলযোগ করিতে সাহসী হন নাই। এদিকে অনেকেই রাত্রিকালে জমীদার বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্যের বোটে যাইয়া মোসলমান বাবুর্চির রাঁধা পোলাও মুরগির কারি উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়া আসিতেন। পার্ব্বতী বাবু দেশে যাইয়া স্ত্রীর অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করেন, কিন্তু অল্পদিন পরে স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতেই বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, হ্যাট কোট পরিয়া English dinner খাইতে থাকেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিলাতে যাইয়া এক বিবীকে বিবাহ করেন।

দেশস্থ কোন আত্মীয় আমার সহায় ছিলেন না। মাতা ঠাকুরাণী ও বড়দাদা অবৈধ উপায়ে আমাকে সমাজে গ্রহণ করিতে যত্ন চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবী আমার প্রতি অতিশয় অনুকূল হইয়াছিলেন, তিনি আমার ধর্ম্মপথে সহায় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় আমি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং স্থিরতর থাকিতে পারিয়াছি। তিনি কোন বিপৎ পরীক্ষায় ভীত ও বিচলিত হইতেন না, বরং আমি চিন্তিত হইলে সাহস

ও উৎসাহ দান করিতেন। সেই ঘোরতর পরীক্ষার সময় আমি তাঁহার এক এক খানা উৎসাহজনক পত্র পাইয়া অতিশয় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি আমার সঙ্গে বাস করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে আনয়ন করিতে বাধ্য হই। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত স্বয়াপুর নিবাসী বাবু দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত মহাশয় তখন সপরিবারে ময়মনসিংহে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আবাসে আমি পরিবারস্থ স্থিতি করি। এক মাস বা দেড়মাস কাল অতীত না হইতেই দুর্গাশঙ্কর বাবু স্কুলের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের নিকটে নিজের বাসাবাটী বিক্রয় করিয়া সপরিবারে ময়মনসিংহ হইতে চলিয়া যান। বাসা ক্রয় তারকবাবু করিবার অল্প দিন পরেই আমাকে তাঁহার বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলেন। তখন আমি মহাসঙ্কটাপন্ন ও অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়ি। আমি পরিবারসহ এই অবস্থায় কোথায় যাই? কেহ নিজের বাড়ীতে স্থান দান করিবে দূরে থাকুক বাড়ীর পার্শ্বেও আমাকে স্থান দান করিতে প্রস্তুত ছিল না। পরে জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক স্বর্গগত বাবু কালীকুমার গুহ মহাশয় নিজের আবাসের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র এক পতিত ভূমি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার জন্য আমাকে প্রদান করেন। আমি অবিলম্বে তথায় গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করি। আমি ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে ছিলাম। তখন ময়মনসিংহে পাকা মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল। আমি সহধর্ম্মিণী সহ ময়মনসিংহ নগরে ন্যূনাধিক এক বৎসর বাস করিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ময়মনসিংহ নগরে ও স্বদেশে তাঁহার প্রসবের সময়ে স্ত্রীলোকের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হওয়াতে আমি শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের অনুরোধ ক্রমে কিছুদিনের ছুটী লইয়া তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া যাই। স্বর্গগত শ্বশ্রুসুন্দর মহাশয়ের ঢাকা নগরে আরমানীটোলার ভবনে উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় কতিপয় ব্রাহ্মযুবকসহ বাস করিতে-ছিলেন, আমি সেখানে যাইয়া পত্নীসহ স্থিতি করি। কিছুদিন পরে একটী কন্যা সন্তান প্রসূত হয়। একপক্ষ অতীত না হইতেই সেই কন্যারত্ন হইতে বঞ্চিত হওয়া যায়। তখন সহধর্ম্মিণী সাজ্যাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তিনি বহুকাল শয্যাগত থাকেন, তাঁহার দেহ কঙ্কালমাত্র বিশিষ্ট হয়। সেই অবস্থায় আমার শ্বশ্রুমাতা স্বাভাবিক মাতৃস্নেহের আবেগে স্বীয় কন্যাকে আর

দূরে রাখিতে দিলেন না। তিনি কিছুকাল সেবাশুশ্রূষা করেন, তাহাতে তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল হয়। আমি গ্রীষ্মের ছুটীতে নিজালয়ে যাইয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্ম্মস্থানে লইয়া যাই। তখন যেরূপ বিপৎপরীক্ষায় পতিত হওয়া গিয়াছিল ; ব্রহ্মময়ীর জীবনচরিত পুস্তকে তাঁহার অন্তিমাবস্থা বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে উক্ত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

ডাক্তার উইলসন সাহেব ছিলেন। তিনি যত্নপূর্ব্বক রোগীকে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "রোগ কঠিন হইয়াছে, সাবধানে থাকিবে।" এপর্যন্ত কোন চিকিৎসকই উহা যে বসন্তের জর বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, বুঝিলেও প্রকাশ করেন নাই। তখন নগরে এই নিদারুণ সংক্রামক রোগে একজনও আক্রান্ত হন নাই। ব্রহ্মময়ীর বসন্ত হইবে আমার মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মে নাই। ডাক্তারেরা জরের উপসমের জন্য রোগীকে নানাবিধ উগ্র ঔষধ সেবন করাইতেছিলেন, এবং জুলাপ দিয়াছিলেন। এই বিপরীত চিকিৎসায় বিপরীত ফল হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব যে দিন প্রাতে দেখিয়া গেলেন, সেই দিন রাত্রিতে প্রণয়িনী বলিলেন, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন সূচ ফুটিতেছে।" আমি তাঁহার দেহ হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি, তাঁহার সমুদয় শরীর ব্যাপিয়া রক্তচন্দনের ফোঁটার ন্যায় আরক্তিম বিন্দু বিন্দু ব্রণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বাবস্থায় বসন্তের ব্রণ এই রূপই হয়। আমি উক্ত রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর প্রথমাবস্থায় এই প্রকার দেখিয়াছিলাম, এক্ষণ দেখিবামাত্রই বুঝিলাম যে, প্রণয়িনী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ বসন্ত ব্রণ সমুদগত ; তখন আমার মনে মহা চিন্তা ও ত্রাস উপস্থিত হইল। ময়মনসিংহ নগরে এইরূপ রোগীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আমি নিঃসহায় একাকী, তাহাতে আবার আমার অসুস্থ শরীর, আমি পার্শ্ববেদনায় কাতর। একজন গাঁজাখোর হিন্দুস্থানী ভৃত্যমাত্র আমার অবলম্বন। সেবাশুশ্রূষা করিতে পারে এখানে আমার এমন কোন আত্মীয় বন্ধু নাই, বরং অতিশয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকও বসন্ত রোগীর নিকটে উপস্থিত হইতেও ভীত হয়। ইহা ভাবিয়া রোগীকে দেশে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে হইবে, আমি এরূপ স্থির করিলাম। তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি আমি নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিকে উষাগমের শুভ্ররেখা দর্শনমাত্র আমি প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ দূরে ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের আবাসে দৌড়িয়া গেলাম, তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া জাগরিত করিলাম। গোপীবাবু ও

তাঁহার আত্মীয়গণ অসময়ে হঠাৎ আমাকে উপস্থিত দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, তাঁহারা ভাবিলেন, রোগীর অন্তিমাবস্থা ঘটিয়াছে। আমি গোপীবাবুকে বলিলাম, পত্নী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীরে লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে এই রোগীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। আমি তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইব। আপনি এখনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিন, আমি আর তিল মাত্র বিলম্ব করিতে পারি না। অতঃপর আমি সে স্থান হইতে কিয়দ্দূরে আত্মীয়বর এবং আমার শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ মহাশয়ের আবাসে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা জ্ঞাপন করি। তিনি ব্যস্ত হইয়া বসন্ত রোগের দুইজন চিকিৎসক সহ আমার আবাসে উপস্থিত হন। চিকিৎসকদ্বয় রোগীকে দেখিয়াই তাঁহার বসন্ত রোগ যে হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন, এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধাদি সংগৃহীত হইল। গোবিন্দ বাবু ব্রহ্মপুত্র নদের ঘাটে একখানা দুই দাঁড়ের নৌকা স্থির করিলেন এবং কিছু টাকা ধারে সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে দিলেন। একজন বন্ধু পাল্কী বেহারা পাঠাইলেন। আমি এক-মাসের ছুটীর প্রার্থনা করিলাম। রোগীকে কিছু পথ্য করাইয়া বেলা ১০টার সময় পাল্কী যোগে নৌকায় উঠান গেল। সেই হিন্দুস্থানী ভৃত্যটী মাত্র সঙ্গী হইল। ময়মনসিংহ হইতে জলপথে সচরাচর চারিদিনে আমাদের দেশে যাইতে হয়। তবে বর্ষাকালে একটানা স্রোত হইলে শীঘ্র যাওয়া যায়। তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগ, ব্রহ্মপুত্র নদে স্রোত প্রখর হয় নাই। আমি মাঝি ও দাঁড়ী-দিগকে বলিলাম, দিবারাত্রি নৌকা অবিশ্রান্ত সবেগে চালাইয়া কাল মধ্যাহ্নে ঘোড়াশালের ঘাটে পৌছাইতে পারিলে আমি ভাড়া ছাড়া তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি টাকা পুরস্কার দিব। তাহারা যথাশক্তি নৌকা চালাইতে লাগিল। সেই দিন রাত্রি প্রায় নয়টায় ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া বানার নদের সঙ্গমস্থলে ঘোড়াশাল গ্রামের অর্দ্ধপথে টোকনামক স্থানে নৌকা পঁহুছিল। সেস্থানে পঁহুছিলে আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইল, প্রবল প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বজ্রধ্বনি এবং বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। নৌকা চালাইয়া অগ্রসর হইবার নাবিকদিগের আর সাধ্য হইল না। তাহারা ঘাটে নৌকা সংলগ্ন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই, মনে মহাভাবনা ও উদ্বেগ ছিল। প্রণয়নীর ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ও প্রলাপোক্তি হইতেছিল। প্রবল বায়ুর জন্য নৌকায় দীপ রাখিবার সাধ্য ছিল

না। আমি অন্ধকারে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম। রজনীর শেষভাগে গগনমণ্ডল পরিষ্কৃত ও বৃষ্টির বিরাম হইল। নৌকা চালাইবার জন্য আমি নাবিকদিগকে ডাকিয়া তুলিলাম। তাহারা পুনর্ব্বার সবেগে নৌকা চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরদিন পূর্ব্বাহ্নে লক্ষা নদীতে প্রতিকূল বায়ুবশতঃ প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তরণীর প্রতিরোধ করিতে লাগিল। নাবিকগণ অনেক কষ্টে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা ঘোড়াশালে পঁহুছিয়া দিল। লক্ষা নদীর পূর্ব্বকূলে ঘোড়াশাল গ্রামের পার্শ্বে খাঘড়ার খাল নামক একটি ক্ষুদ্র খাল আছে। সেই খালের মুখে নৌকা সংলগ্ন করা হইল। সেখান হইতে ভাটপাড়া গ্রাম প্রায় তিন মাইল দূরে, তখন খাঘড়ার খাল জলশূন্য, জলপথে ভাটপাড়া গমনের সুবিধা ছিল না। নৌকা পঁহুছিবামাত্র পাল্কী বেহারা ও চিকিৎসক মানিক আচার্য্যকে পাঠাইবার জন্য আমার সম্বন্ধী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায়ের নামে রোগীর বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া আমি ভৃত্যটিকে ভাটপাড়ায় শ্বশুরালয়ের অভিমুখে প্রেরণ করি। নির্ব্বোধ ভৃত্য আমার পত্র হারাইয়া রাত্রিকালে সেখানে উপস্থিত হয়, এবং বলে 'মাইজী ঘাটপর পঁহুছি, ওনকো চিচককী বিমারী হুয়ী।' তাহার কথার ভাবে জগচ্চন্দ্র রায় স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে পঁহুছিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাত্রিতে ভগিনীকে নৌকা হইতে গৃহে আনয়ন করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, চিকিৎসক প্রেরণেও অসমর্থ হইলেন। সেই সময় বেহারা পাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। বেহারা আসার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে নিরাশ হইলাম। ব্রহ্মময়ী সূর্য্যাস্তগমনের প্রাক্কালে নৌকার সম্মুখভাগে বসিয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্তিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, "শোক দুঃখ বিপদে তুমি অন্য লোককে সান্ত্বনা দান করিয়া থাক, কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে তুমি নিজে স্থির থাকিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, তোমাকে সান্ত্বনা দান করার জন্য অন্য কাহারও যেন প্রয়োজন না হয়।"

পুনর্ব্বার ঘনতর জলদজালে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বিদ্যুতের তীব্র আলোকের সঙ্গে ঘোরতর মেঘ নির্ঘোষ হইতে লাগিল, বায়ুপ্রবাহের সহিত সবেগে বারিধারা বর্ষণ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক তিমিরাবরণে আবৃত, ইতস্ততঃ কিছুই নয়নগোচর হয় না। নৌকায় দীপালোক নাই, দীপ জ্বালিলেও বায়ুবেগে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়। আমি অন্ধকারে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া

তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছি। আমার অন্তঃকরণ ক্লেশ যাতনায় অস্থির, মনের কথা বলিব এমন কেহ নাই। ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, সেও নাই। আমার এক পার্শ্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত নাবিকগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া আছে। রোগীর সেবায় আমি নিতান্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন, নিজের আহার-নিদ্রা বিলুপ্ত প্রায়। ডাঙ্গায় উঠিয়া দুগ্ধ অন্বেষণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, সেই দুধ জাল দেওয়া, অন্ন পথ্য প্রস্তুত করা এবং হরিদ্রাযুক্ত জলে রোগীকে স্নান করান, তাঁহাকে বীজন করা, রোগের ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ উপস্থিত মতে তাহা নিবারণে যত্ন করা ইত্যাদি সমুদায় কার্য্য একাকী আমাকে করিতে হইয়াছিল। আবার তাহাতে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী, মুষলধারায় বারি বর্ষণ। আমার বাহিরে আঁধার অন্তরেও আঁধার। আমি অন্তরে কোন আলোক পাইতেছিলাম না; বাহিরে বারিদমণ্ডল হইতে অবিরত বারিধারা বর্ষিত হইতেছিল। আমার নেত্রযুগল হইতেও অনর্গল অশ্রুধারা পড়িতেছিল। আমি ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। সেই রাত্রি এত দীর্ঘ বোধ হইতেছিল যেন সম্বৎসরের সমুদায় রাত্রি একত্র মিলিত হইয়া আমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত; কিছুতেই শেষ হয় না। এমন অন্ধকার আমি জীবনে দর্শন করি নাই। ভাবিতেছিলাম যে, আমার ন্যায় বন্ধুবিহীন নিরাশ্রয় বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পরে হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র পক্ষীর ক্ষীণস্বর শুনিয়া আমি মনে করিলাম রজনী অবসান; তখনও পূর্ব্বদিকে আলোকরেখা প্রকাশ পায় নাই। তৎক্ষণাৎ আমি ডাঙ্গায় অবতরণ করিলাম। সেখানে নদীর কূলে একখানা মুদির দোকান ছিল। আমি জানিতাম সেই দোকানের পার্শ্বে একটি কুড়ে ঘরে বেহারাগণ থাকে। আমি অন্ধকারের মধ্যে বেহারা খুঁজিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ একজন লোককে নিকটে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে বেহারা কোথায় আছে? সে বলিল, "দুইজন মাত্র বেহারা আছে, তাহারা এক্ষণই দেশে চলিয়া যাইবে। তাহাদের একজন মুদি দোকানে শুয়ে আছে।" তখন আমি মুদিখানায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিলাম, একটি রোগীকে ভাটপাড়ায় পঁহুছিয়া আসিতে হইবে, রোগী ডুলিতে বসিতে পারিবেন না, ভাটপাড়া হইতে পাল্কী আনয়ন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে। এ কার্য্যটি করিয়া তোমরা দেশে যাইতে পারিবে। এ কার্য্যে বেহারা পাঁচসিকি পারিশ্রমিক চাহিল, আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম পাঁচ সিকিই দিব, অগ্রিমস্বরূপ এক টাকা প্রদান করিতেছি, চারি আনা ভাটপাড়ায়

পঁহুছিয়া দিব। বেহারা বলিল, "মহাফা এক্ষণই এই গ্রামে পাওয়া যাইবে, মহাশয় রোগী বসিতে পারিবেন কি?" ব্রহ্মময়ীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন "আমি মহাফায় বসিয়া কোনরূপে যাইতে পারিব।" তথনই বেহারা মহাফা উপস্থিত করিল। রোগী মহাফায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। আমি সমুদায় নৌকাভাড়া পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেক নাবিককে এক একটা টাকা প্রদান করিয়া পদব্রজে চলিলাম। সেই দিন বিধাতার বিশেষ কৃপায় বেহারা পাওয়া গিয়াছিল। তথন দেশে অন্য একজনও বেহারা ছিল না। বেহারা না পাইলে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রোগীকে তাঁহাব পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়া মহাসঙ্কট হইত।

রোগী স্বীয় পিত্রালয়ে পঁহুছিলে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আরোগ্যলাভ বিষয়ে নিরাশ হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে বসন্তব্রণ হইয়াছিল, এবং তাহা শরীরে বসিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারী নানাপ্রকার তীব্র ঔষধ সেবনে তাঁহার দেহ রক্তহীন হইয়াছিল। চিকিৎসক বলিলেন, "এবার আমি প্রায় একশত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি, সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু এ রোগীর সম্বন্ধে সঙ্কট দেখিতেছি।" আট নয় দিন সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইয়াছিল। আশ্চর্য্য মাতৃস্নেহ! আমার শ্বশ্রূমাতা তাঁহার বসন্ত রোগাক্রান্তা প্রিয়তমা কন্যাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকিতেন। তিনি কত যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা করিলেন, সকলই বিফল হইল। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে ব্রহ্মময়ী অমরধামে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বদিন আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইয়া উক্তগ্রামের অপর পাড়ায় আমার ভগিনীপতি স্বর্গগত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের আবাসে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে ভৃত্য আসিয়া জ্ঞাপন করিল, "মাইজীকো রাম হওয়া।" আমি প্রস্তুত ছিলাম, শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করি নাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সেই সময় জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং মধ্যম ভাগিনেয় স্বর্গগত প্যারীমোহন গুপ্ত পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন। তাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশোপলক্ষে বাড়ীতে স্থিতি করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়ের বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার রায় (ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল) ভাটপাড়ায় গুপ্ত মহাশয়ের আলয়ে ছিলেন। গুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রসন্নকুমার রায়ের ও অপর কোন কোন যুবকের এবং প্রজা ও ভৃত্য গুরুদাস সিংহের বিশেষ সহকারিতায় প্রিয়তমার শব বহন করিয়া প্রায় এক মাইল অন্তর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শ্মশান ক্ষেত্রে লইয়া যান।

সে স্থানে শব নীত হইলে আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া একটী প্রার্থনা করি। তৎপর চিতাশয্যায় শব স্থাপন করা হয়। তখনই আমি প্রিয়তমা পত্নীর দেহের সঙ্গে সাংসারিক সকল সুখ ও আশা-ভরসা শ্মশানে বিসর্জ্জন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ভাটপাড়াতে গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া যাই। তথায় কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে চলিয়া যাইব, আমার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। উক্ত গৃহে পদস্থাপন মাত্র এক মহাদুঃখজনক ব্যাপার ঘটিল। তখন দিদি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি আর এক মুহূর্ত্ত কালও সে স্থানে থাকিতে সমর্থ হইলাম না। সম্বন্ধী জগচ্চন্দ্র রায় সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন, তিনি আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য পত্র লিখেন ও লোক পাঠাইয়া দেন। অপরাহ্নে বড় দাদা বাড়িতে যাইবার জন্য পত্র লিখেন ও লোক পাঠাইয়া দেন। আমি বাড়িতে চলিয়া যাই। এইরূপে আমার জীবন-পুস্তকের পরীক্ষাপূর্ণ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়। এই দুঃখ-বিপৎ পরীক্ষার সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়া বিধাতা আমার জন্য অশেষ কল্যাণসাধন এবং আমার জন্য সুখ-সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত করিরাছেন। ধন্য তাঁহার স্নেহ-প্রেম ও পরিত্রাণপ্রদ বিধান। এইরূপে তিনি পাপীকে শাসন করিয়া পাপীকে সংশোধিত ও সমুন্নত করিয়া থাকেন। আমি নারীজীবন দ্বারা নিজ-জীবনে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য নারীজাতির সেবা করা আমার চিরজীবনের ব্রত হইয়াছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার সহায় হউন।"

সহধর্ম্মিণীর স্বর্গগমনের অব্যবহিত পরে আমি নিজালয় হইতে কলিকাতায় যাত্রা করি ; ঢাকা নগর হইতে বাষ্পীয় পোতারোহণে কুষ্টিয়ায়, কুষ্টিয়া হইতে ট্রেনে রানাঘাটে পঁহুছিয়া পদব্রজে দশ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শান্তিপুরে চলিয়া যাই। আমি শান্তিপুরে যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের আলয়ে দুই দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। তখন তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বনে তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আচার্য্যের সম্বন্ধে নরপূজার অপবাদ দানের পর তিনি কিরৎকাল প্রচারব্রত হইতে বিরত ছিলেন, পরে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়বলম্বনে প্রচারের কার্য্য করেন। আমি সেই সময়ে যাইয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে আমি তথা হইতে কলিকাতায় যাইয়া প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে কয়েকদিন অবস্থান-পূর্ব্বক ঢাকা নগরে প্রত্যাগত হই, এবং সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করি। শ্রাদ্ধসভায় পত্নীর জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছিল। বন্ধুগণের আগ্রহ-

অনুরোধক্রমে অল্পদিন পরে তাহা জমীদার হরচন্দ্র চৌধুরীমহাশয়ের অর্থসাহায্যে পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করা যায়; এবং তাহা প্রচারভাণ্ডারের স্বত্বরূপে পরিণত করা হয়। এই পুস্তকের এ পর্য্যন্ত তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

সেই বৎসর আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীর সময় পুনর্ব্বার কলিকাতায় আগমন করি, তাহা আমার দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমন। তখন স্বর্গগত আনন্দ-মোহন বসুর আতিথ্যগ্রহণে তাঁহার আবাসে পঞ্চাননতলায় কয়েকদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসুর সেই সময়ে পাঠ্যাবস্থা ছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, বা এম, এ, ক্লাসে পড়িতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কলেজের কতিপয় ছাত্র বাস করিতেছিল। সেই বৎসর ৪ঠা কার্ত্তিক ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা কলেজ গৃহে সভা হইয়াছিল, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন প্রচার বর্গের অতীব দৈন্য ও দুঃখ কষ্ট ছিল। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন জুটিত না। সেই মহাদৈন্য বৈরাগ্যের অবস্থায় তাঁহারা অম্লানবদনে সুখে শান্তিতে ছিলেন।

বৈষয়িক জীবনের চরমাবস্থা

আমি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্যও করিতেছিলাম। তত্রত্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮৭৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র ও স্বর্গগত কালীনারায়ণ গুপ্ত এবং কতিপয় ব্রাহ্মযুবক তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই অমৃতলাল বসু সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে ঢাকা নগরে পদার্পণ করিয়া-ছিলেন। মিত্র মহাশয় ঢাকা হইতে রায় মহাশয়ের সহযাত্রী হইয়া ময়মনসিংহ আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের উৎসবান্তে সকলে মিলিয়া নৌকা-রোহণে শেরপুরে গমন করেন। আমি সহযাত্রী হইয়াছিলাম। তত্রত্য জমীদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ হইয়াছিল। ঢাকার যাত্রিগণ ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিয়া ঢাকায় চলিয়া যান। এই বৎসর ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভক্ত কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। আমার ভগিনীপতি কালী-নারায়ণ গুপ্ত মহাশয় নিজের ব্যবহারের মূল্যবান শাল বিক্রয় করিয়া তাঁহার ইংলণ্ড গমনের পাথেয় সাহায্যার্থ ময়মনসিংহেই শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি ঢাকা নগরে আচার্য্যের নিকটে দীক্ষিত

হইয়াছিলেন, তখন আচার্য্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ইহার পর বৎসর সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় আসাম প্রদেশে প্রচার করিয়া আমাদের আহ্বানানুসারে ময়মনসিংহে উপস্থিত হন। তিনি প্রায় মাসাবধি কাল স্থিতি করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা, সায়ংকালে ধর্ম্মা-লোচনা করিয়াছিলেন, এবং তিন-চারিটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অপিচ একদিন ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবে ৮।৯ জন যুবা সাধু অঘোরনাথের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেবার তাঁহার প্রচারে বিশেষ ফল ফলিয়াছিল। অনেকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উপাসনার প্রতি অনুরাগ হইয়াছিল। অঘোরনাথ আমার গৃহেই বাস করেন, প্রতিদিন সায়ংকালে সকলে তাঁহার নিকটে সম্মিলিত হইয়া দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিতেন। তিনি ঈশ্বরদর্শন, প্রত্যাদেশশ্রবণ, বিশেষ করুণা ইত্যাদি এক একটি বিষয়ে এক একদিন উপদেশদান ও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ সকল লিখিত হইয়া পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই উপদেশে সকলের সংশয় দূর, বিশ্বাস বৃদ্ধি ও ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। তাহাতে অনেকগুলি যুবা হিন্দুসমাজ ও পৌত্তলিকতার বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হন, আত্মীয় পরিবার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও তাড়িত হইয়া আমার আবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমার সঙ্গে একান্নভুক্ত হন। অনেকের অন্নবস্ত্রের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীমান শরৎচন্দ্র দাস ও জিলা স্কুলের ছাত্র শ্রীমান বৈকুণ্ঠ-নাথ ঘোষ এবং শ্রীমান রমাপ্রসাদ প্রভৃতি উৎপীড়িত ও তাড়িত লোকদিগের অন্তর্গত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি হিন্দু সমাজাশ্রিত ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একঘরে হইয়াছিলাম। প্রায় কেহ আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে জল গ্রহণ করিতেন না, এক্ষণ আমার আবাসে সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধুদিগের স্থান হইয়া উঠে না। শরচ্চন্দ্র রীতিমত বাঙ্গলা লেখাপড়াও শিক্ষা করেন নাই। কালেক্টরীর তদানীন্তন হেডক্লার্ক সমবিশ্বাসী উৎসাহী বন্ধু বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় তাঁহাকে ইষ্টাম্পের বাট্টাধারী কাজে নিযুক্ত করেন, তাহাতে তাঁহার মাসিক কিছু কিছু উপার্জ্জন হইত, তাঁহার আবশ্যকীয় ব্যয় কোনরূপে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। পরে বৈকুণ্ঠনাথ ঢাকায় যাইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। রমাপ্রসাদের ভাবপ্রধান জীবন ছিল, কিয়দ্দিন পরে কুসঙ্গদোষে তাহার চরিত্র নষ্ট হয়। আমাদের সঙ্গে তাহার যোগ ছিন্ন হইয়া যায়। গোপীবাবু নিয়মিত অর্থদানে অন্নবস্ত্রের সাহায্য করিয়া বা আফিসে কাজকর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিয়া অনেক

ব্রাহ্ম যুবার ক্লেশ দূর করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মযুবা শ্রীমান্ শ্রীনাথ চন্দ যিনি পরে জিলা স্কুলের পণ্ডিতের পদে আমার স্থলবর্ত্তিরূপে নিযুক্ত হইয়া নানা উপায়ে সম্পত্তিশালী হইয়াছেন, তখন তাঁহার ছাত্রাবস্থা ছিল। বিধবা মাতা ও ভগিনীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর ছিল। তাঁহার অর্থাগমের কোন উপায় ছিল না। মুড়াপাড়া নিবাসী পরলোকগত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বালেশ্বরীর খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি আমার অনুরোধক্রমে শ্রীনাথকে নিজের আবাসে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার অন্নচিন্তা দূর করিয়াছিলেন। গোপীবাবু কর্তৃক বিশেষরূপে উপকৃত ব্রাহ্মযুবা শ্রীমান্ মধুসূদন সেন আমার আবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মযুবাদের জ্বলন্ত উৎসাহ-উদ্যম ছিল, তাঁহারা কোন পরীক্ষা-বিপদকে গ্রাহ্য করিতেন না, কোনরূপ সুখভোগ প্রত্যাশী ছিলেন না। এক কুচবিহার বিবাহের ঝড়ে সেই প্রিয়দর্শন উৎসাহানলে উদ্দীপ্ত যুবকদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন হইতে তাঁহারা প্রায় সকলেই আমাদের প্রতি অবিশ্বাসী এবং আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেই সময় বিশ টাকা মাত্র আমার আয় ছিল, যাহা হইতে নিজের ও অন্য অনেকের অন্নের সংস্থান করিতে হইত এবং নিয়মিতরূপে মাসিক একটী টাকা কলিকাতার প্রচার ভাণ্ডারে প্রেরণ করা যাইত, অপিচ ব্রাহ্মসমাজের অন্যরূপ চাঁদাও দিতে হইত। তৎকালে এক টাকায় একমণ চাল পাওয়া যাইত, এক্ষণকার ন্যায় তখন একমণ চাউল আট টাকায় বিক্রয় হইত না। সমুদায় খাদ্যদ্রব্যই সুলভ ছিল। সেই সময়ে প্রচারকদিগের অনেককে আমি দর্শন করি নাই, কিন্তু তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহাদের পরিবারের দুঃখকষ্টে আমার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আমি ব্রাহ্মদিগকে ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিকারীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ অর্থ ভিক্ষা করিয়াছি, এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার প্রচার-ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিয়াছি। একবার আমার আবেদনে জমিদার হরচন্দ্র বাবু দুইশত টাকা প্রচারভাণ্ডারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচারকার্য্যের পুঞ্জ পুঞ্জ পুস্তক তখন ময়মনসিংহে বিক্রয় হইয়াছে, বন্ধুদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেই পুস্তক সকল বিক্রয় করা হইয়াছে। সেই সময় এক বৎসরে যত পুস্তক ময়মনসিংহে বিক্রয় হইত, এক্ষণ দশ বৎসর তাহার অর্দ্ধাংশও বিক্রিত হয় না।

সে রূপ চেষ্টা নাই, ইহাই প্রধান কারণ।

সামান্য ভাবে জীবন যাপন করা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি সামান্য অন্নবস্ত্রাদিতে সন্তুষ্ট। ব্রস ও চিরুনী দ্বারা কেশ-বিন্যাস এবং আরসিতে মুখাবলোকন, ইহা আমাদ্বারা জীবনে বড় ঘটে নাই। আমি বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার সময়েও সুযোগ মতে স্থানে স্থানে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছি, প্রার্থনামতে বিশেষ বল প্রাপ্ত হইয়াছি, নিত্য উপাসনায় আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি কখনও নিরাশ ও নিরুৎসাহ হই নাই। মহাপাপীর প্রতিও যে ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রকাশ পায় আমার জীবন তাহার সাক্ষী বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলে কখনও বঞ্চিত হওয়া যায় না, ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিব।

ময়মনসিংহে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার বোধ হয় পর বৎসর পৌষ মাসে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায় সদলে তথায় উৎসব করিতে উপস্থিত হন। ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজকে অনেকগুলি সভ্য প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তদ্রূপ মণ্ডলীভূত হই নাই, অথচ ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলাম। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযাত্রী পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র নন্দী আমাকে বলিয়াছিলেন, দীক্ষিত না হইয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করা সঙ্গত নয়। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কলিকাতার ব্রহ্মমন্দিরে আমার জীবনের এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয়, আমি তজ্জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। কৈলাসচন্দ্রের কথা আমার সঙ্গত বোধ হওয়াতে আমি মন্দিরে রায় মহাশয়ের নিকটে নিজের বিশ্বাস স্বীকার করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হই। সেই সময়ে নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হওয়া যাইত।

"অদ্য অমুক সনের অমুক মাসের অমুক দিনে অমুক তিথিতে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইলাম। করুণাময় পরমেশ্বর আমার সহায় হউন"।

আমি এইরূপ বচন পাঠ করিয়া ময়মনসিংহে ব্রাহ্মমন্দিরে মণ্ডলীভুক্ত হই। বাস্তবিক ইহা মণ্ডলীতে প্রবেশ, ধর্ম্মদীক্ষা, নয়। ইহার সঙ্গে তুলনায় নববিধানের দীক্ষা স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ন্যায় প্রভেদ।

তৎপর একবার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া

তাঁহার জন্মস্থান সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মোড়াচর গ্রাম হইতে ময়মনসিংহে সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমাদের কাহার কাহার সঙ্গে পরস্পর কলহ বিবাদ চলিয়াছিল, তিনি তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ

সাধু অঘোরনাথ ঢাকায় গমন করিলেন, ইহার কিছুদিন পরে দুর্গাপূজার ছুটী হয়। আমি পশ্চিমাঞ্চল দর্শন ও ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে উক্ত ছুটীর সঙ্গে তিন মাসের ছুটী লইয়া ময়মনসিংহ হইতে যাত্রা করি, প্রথমতঃ ঢাকা নগরে উপস্থিত হই। তথা হইতে কলিকাতা লক্ষ্য করিয়া সাধু অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে কুষ্টিয়াতে যাত্রা করা যায়। তখন কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ট্রেন ছিল। টাকানগর হইতে সপ্তাহান্তে একবার মাত্র মাল বোঝাই করা জাহাজ আরোহিবর্গ সহ দুই-তিন দিনে কুষ্টিয়ায় যাইত। আমরা কুষ্টিয়া হইতে বাষ্পীয় শকটারোহণে সায়ংকালে কলিকাতায় উপনীত হই। সেই দিনই ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসের বিশেষ দিন ছিল, আচার্য্যমহাশয় ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। প্রাতে বিশেষ ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল। আমি কলিকাতা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করি। সেইবার পশ্চিম প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মভ্রাতার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুতা হইয়াছিল। আমি নিম্নলিখিত স্থান সকলে গিয়াছিলাম।—বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সীতাকুণ্ড*, বাঁকিপুর, কাশী, মির্জ্জাপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বিঠোর†, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন**,

* সীতাকুণ্ড মুঙ্গের হইতে ন্যূনাধিক ১২।১৩ মাইল দূরে। ইহা একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, হিন্দুদিগের তীর্থ। এই প্রস্রবণের জল অতিশয় উষ্ণ, অধিকক্ষণ হস্তে ধারণ করা যায় না।

† বিঠোর কানপুর হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে। ইহা বাল্মিকী তপোবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রসিদ্ধ বাজিরাও এবং তাঁহার পুত্র বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতা নানাসাহেব বাস করিতেন। কানপুরের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর নানাসাহেবের প্রাসাদ ভূমিসাৎ করা হইয়াছে।

** গোবর্দ্ধন হইতে তৎসন্নিহিত কুসুম সরোবর, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডে যাওয়া হইয়াছিল।

দিল্লী, কুতুর, মিরাট, শাহারাণপুর, দেরাহুন, হিমালয়শৃঙ্গ-মস্থরি, হরিদ্বার, রুথি, অম্বালা, জলন্ধর, অমৃতসর, লাহোর, মোলতান, রাজঘাট

ট্রেন, একাগাড়ী, গোযান ও অশ্বারোহণে এবং পদব্রজে সুবিধানুসারে উপরিউক্ত স্থান সকলে যাওয়া হইয়াছিল। আমি শাহারাণপুর হইতে ৪২ মাইল পার্ব্বত্য দুর্গম পথ একারোহণে অতিক্রম করিয়া একদিনে দেরাদুন নগরে গিয়াছিলাম। তখন আমার প্রথম একায় আরোহণ। এক এক স্থানে বন্ধুরভূমি এবং মোহন পাশ পর্যন্ত পার হইতে আমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ এবং অস্ত্র সকল যেন ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। আমি গিরিমূল রাজপুর হইতে ৭ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া হিমালয়শৃঙ্গে মস্থরির উপর আরোহণ করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার রাজপুব হইতে অশ্বারোহণে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দেরাদুনে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লেণ্ডোর হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত পদব্রজে অবতরণ করা গিয়াছিল। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এবং পরলোকগত ভ্রাতা বাবু গোপীমোহন ঘোষ আমার সহযাত্রী ছিলেন। আমি দেরাদুনে ২০।২১ দিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষের পরিবার মধ্যে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম। পরে দেরাদুন হইতে ৩৫ মাইল নিবিড় অরণ্যময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারে আমার যাওয়া হইয়াছিল, একজন পাহাড়ী ভৃত্য মাত্র সঙ্গে ছিল। হরিদ্বার হইতে ১৫ মাইল দূরে রুথি নগরে পদব্রজে যাওয়া হইয়াছিল, আমি তথা হইতে শাহারণপুরে গোযানে গমন করিয়াছিলাম। শাহারণপুর হইতে ট্রেনে আরোহণ করা যায়। আগ্রা হইতে ৩৫ মাইল পথ একারোহণে অতিক্রম করিয়া মথুরা নগরে যাওয়া হইয়াছিল। মথুরা হইতে ৬ মাইল বৃন্দাবন, বৃন্দাবন হইতে ১৫ মাইল গোবর্দ্ধন, তথা হইতে কুসুম সরোবর এবং শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড, এ সকল স্থানে একারোহণেই ভ্রমণ করা গিয়াছিল। আমি সীতাকুণ্ডে ও বিঠোর এবং কুতুবে গোযানে গিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বঙ্গবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জীবনের অন্যতর পরীক্ষা ও ময়মনসিংহ ত্যাগ

পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া ময়মনসিংহ নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর বন্ধুবর গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় আমার ঘোরতর বিরোধী হন। তিনি প্রায় প্রত্যেক সামাজিক উপাসনার সময় আমার প্রার্থনা ও উপদেশগুলি প্রতিবাদসূচক

উপদেশ দান ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি গোপীকৃষ্ণ বাবুকে পরম হিতৈষী উপকারী বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাঁহার এরূপ আচরণে অতিশয় ব্যথিত হই। অবশ্য আমার উপাসনাদি তাঁহার ভাল লাগিত না। তাহাতেই তিনি উত্যক্ত হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মমন্দিরে উপাচার্য্যের উপাসনা ও প্রার্থনাদির প্রতিবাদ করিয়া একজন উপাসকের উপদেশ দান বা প্রার্থনা করা যে অতিশয় নীতি বহির্ভূত ও অনিষ্টকর কার্য্য ইহা তিনি বুঝিতেন না। আমার উপাসনাদিতে কোন্ কোন্ স্থানে ত্রুটি হয় উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিলে আমি তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা যত্ন করিতাম। অন্য উপাসকদিগের পক্ষেও তাঁহার এই আচরণ অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একজন আত্মমত প্রতিপোষক দুর্নিবার তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; উপাসকদিগের কাহারও কথায় নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। গোপীবাবু আমাকে বেদীচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপাসক মণ্ডলীর অনুকূলমত না পাওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকটে বিশেষরূপে ঋণী। তাঁহার বিশেষ যত্ন চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে তথাকার ব্রহ্মমন্দির হইয়াছিল। আমি ঘোরতর অশান্তি দেখিয়া চিরজীবনের জন্য ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করাই স্থির করিলাম। তখন আমার প্রতি ভগবানের এরূপ ইঙ্গিত হইয়াছিল। আমি শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে নিজের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করি। আমি প্রচারব্রত গ্রহণ করিতেছি ভাবিয়া তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহসূচক পত্র লিখেন। কিন্তু তখন আমি প্রচারক হইব এরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি নাই। প্রচার ব্রত অতিশয় উচ্চ ব্রত। সেই ব্রত গ্রহণের উপযুক্ত আমি আপনাকে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না। তবে বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকমণ্ডলীর নিকটে থাকিব এবং তাঁহাদের কোন কোন কার্য্যে সহায়তা করিব, আমার মনে এরূপ সঙ্কল্প হইয়াছিল। ধর্ম্ম-জীবনের সহচরী সহধর্ম্মিণীর তিরোধানের পর হইতে বিষয় বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে আমার অনিচ্ছা হইয়াছিল। বিশেষতঃ শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল, আমি শিক্ষকতা কার্য্যের গুরুভার বহনে অনেক সময় আপনাকে অক্ষম ও অযোগ্য মনে করিতেছিলাম। আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ ত্যাগের অভিপ্রায় বন্ধুদিগকে জ্ঞাপন করি। তখন সকলের এইরূপ পরামর্শ হয় যে, একেবারে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া আপাততঃ কিছুকালের ছুটী লইয়া পরে

কর্ম্ম ত্যাগ করা, শরীর যেরূপ রুগ্ন ও তুর্ব্বল, ছুটীর জন্য সিবিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে। ইহা স্থির হইলে গোপীকৃষ্ণ বাবুই আমাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহা হইতে তিন মাসের জন্য ছুটীর সার্টিফিকেট লইয়া দেন। আমি কর্ম্মত্যাগের আবেদন করিলে ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গৌরচন্দ্র রায় সেই কার্য্যের প্রার্থনা করিতে উদ্যত হন। তিনিই আমার কার্য্য পাইবার উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু আমি আপাততঃ ছুটী লইতেছি জানিয়া গৌরবাবু প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবার প্রার্থনা না করিয়া আমাকে এরূপ অনুরোধ করেন যে, "আপনি যখন ত্যাগপত্র লিখিবেন, তাহার পূর্ব্বে অবগৎ আমাকে জ্ঞাপন করিবেন।" আমি তাঁহার সেই অনুবোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হই। শ্রীমান শ্রীনাথচন্দ্র আমার কার্য্যে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইবার জন্য লালায়িত হন। তিনি নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া জিলা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার ছাত্রাবস্থা। সেই জিলা স্কুলের পণ্ডিতের পদ তাঁহার পাওয়া অসম্ভব ছিল। তবে শ্রীনাথ নিতান্ত নিঃস্ব নিরীহ ব্রাহ্মযুবা বলিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মদিগের আন্তরিক আকর্ষণ ও দয়া ছিল। শ্রীনাথ আমারও প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমি ছুটীর আবেদনপত্রে তাঁহার নাম লিখিয়া দি। স্কুল কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী সভ্য বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যত্নে শ্রীনাথই তিন মাসের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

ময়মনসিংহ পরিত্যাগের প্রাক্‌কালে বন্ধুবর গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় কতিপয় বন্ধুসহ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। তিনি সেই সময়ে সজল নয়নে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার ময়মনসিংহ ত্যাগের কারণ হইয়াছি বলিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়াছে।" আমি ১৮৭৫ সালে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাইয়া ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে আচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে স্থিতি করি। সুলভ সমাচার পত্রিকার ল্যাবল মোড়ার কাজ আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। এখন হইতে আমি আচার্য্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দান করিতে থাকি। ছুটীর তিন মাস অতীত হওয়ার প্রাক্‌কালে শ্রীনাথ আমাকে এরূপ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠান যে "আপনি ক্রমশ বৎসরাধিক কাল ছুটী লইবেন, তাহা হইলে আমি আপনার কার্য্যে স্থায়ী হইতে পারিব, এরূপ আশা করিতে পারি"। আমি স্নেহবশতঃ তাঁহার অনুরোধ পালন করি।

কার্য্যত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতির জন্য বাবু গৌরচন্দ্র রায়কে লিখিয়া জ্ঞাপন করি যে, "আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি। আপনি এই কার্য্যে প্রার্থী না হইলে দুঃখী শ্রীনাথ ইহা পাইতে পারে না। যখন উভয় পদের বেতন তুল্য, তখন আপনি শ্রীনাথের প্রতি দয়া করিয়া যদি ইহার প্রার্থী না হন তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।" গৌরচন্দ্রবাবু আমার অনুরোধ পালন করেন। তখন শ্রীনাথ স্থায়িরূপে ময়মনসিংহের জিলা স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

আমিষভক্ষণ ত্যাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা

আটচল্লিশ বৎসর যাবৎ মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছি, মাংসত্যাগের কিয়দ্দিন পর মৎস্য ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরামিষভোজী হইয়াছিলাম। তখন আমার পত্নী বিদ্যমান ছিলেন। আমার দেহ অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল। একজন মাংসভক্ত ডাক্তার বন্ধু মাংস না খাইলেও শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ততঃ মৎস্যাহার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই। পরে তিনি আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট যাইয়া আমিষ ভক্ষণ না করিলে আমার জীবনরক্ষা পাওয়া দুষ্কর ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি সেই ডাক্তারবাবুর কথায় ভীত ও চিন্তিত হইয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে অন্ততঃ মৎস্যাহারের জন্য আমাকে দৃঢ়তর অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি অগত্যা পুনর্ব্বার মৎস্যভোজনে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণ যেমন সভ্য জগতের নরনারীগণ প্রতিদিন মাংস ভোজন করিয়া থাকেন, মাংসাহার ব্যতীত তাঁহাদের দেহ রক্ষা হয় না, তাঁহাদের এরূপ সংস্কার। আমার সেরূপ সংস্কার নয়। আমি যখন মাংসাহারী ছিলাম তখন সম্বৎসর মধ্যে দুই চারি দিন স্বল্প পরিমাণে মাংস ভোজন করিতাম, প্রায় কোন জীবের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করা হইত না। সচরাচর পূজাপার্ব্বণাদি উপলক্ষে পাঁঠার মাংস উপহার পাওয়া যাইত। আমি অন্য জীবের মাংস কদাচিৎ খাইতাম। গুরুতর রোগের শক্তি ডাক্তার বাবুরা ব্যবস্থা করিয়া এ পর্য্যন্ত আমাকে মাংসের জুস খাওয়াইতে পারেন নাই। তবে যখন আমি চরমাবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িব, তখন যে তাঁহারা গঙ্গোদকের ন্যায় কুক্কুটরস বলে কৌশলে আমাকে পান করাইবেন না, ইহা বলা যায় না। আমি সহধর্ম্মিণীর পরলোকগমনের পর পুনর্ব্বার মৎস্য ত্যাগ করি, আজ ৩৭ বৎসর হইল সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী। মৎস্য মাংস ভোজনে নিবৃত্ত হইয়াছি, আমার শরীরের মাংসের হ্রাস হয় নাই ও

বলক্ষয় নাই, বরং মাংসবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইয়াছে। আমি শুধু ডাইল চচ্চরি ভাত খাইয়া এই ৭১।৭২ বৎসর বয়সে যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারি, নিত্য মৎস্য মাংসভোজী অনেক মধ্য যুবা সেরূপ পরিশ্রম করিতে সুক্ষম নহে।

আমি একজন সভ্যজগতের বহির্ভূত লোক। আমি কখনও ইংরাজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী; স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই। আমি আমার অন্তরাত্মার উপদেশে চিরকাল চলিয়াছি। পরে আমি বিশেষভাবে মোসলমান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি, মোসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু মোসলমানদিগের ন্যায় জীবনে কখনও শ্মশ্রু ধারণ করি নাই। ইজার চাপবান পরি নাই, এবং মস্তকে টুপি ধারণ করি নাই, লস্থন পলাণ্ডুর ভক্ত হই নাই। নববৃন্দাবন নাটকের ট্যাব্‌লোতে একদিন মাত্র আমি মৌলবী সাজিয়াছিলাম, তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ এবং মৌলবী পোষাক, টুপী ও ইজার চাপকান পরিয়াছিলাম। নিজাম হায়দরাবাদে যখন উর্দ্দু বক্তৃতা দান করিবার জন্য মোসলমানদের সভায় যাইতেছিলাম, তখন তত্রত্য কলেজের ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী আমাকে টুপি ও ইজার চাপকান পরিয়া সভায় যাইতে অনুরোধ করেন। আমি মস্তকে টুপি ধারণ করিয়া ধুতির উপর চাপকানের আকার লম্বা কোট ঝুলাইয়া বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত জীবনে আর কখনও মোসলমানী পরিচ্ছদ পরিধান করি নাই। লস্থন পলাণ্ডুর প্রতি আমার চিরকাল বিরাগ। এই দুই দুর্গন্ধ বস্তু মোসলমানদের ভক্ষণ করা উচিত নয়। কেন না, হদিস শাস্ত্রে হজরত মোহম্মদের এই দুই বস্তুর বিরুদ্ধে এই ভাবের উক্তি পাওয়া গিয়াছে,—"এই দুই দুর্গন্ধ বস্তু ভক্ষণ করিয়া কেহ যেন মস্‌জেদে প্রবেশ না করে, উহার দুর্গন্ধে দেবতাদের কষ্ট হয়"। হদিস মেস্কাত শরিফ নমাজ প্রকরণে "নমাজের স্থান ও মস্‌জেদ নামক" পরিচ্ছেদ পাঠ কর। মোসলমানদের প্রতিভাশালিনী বিদুষী কন্যা মতিচুর পুস্তকের রচয়িত্রী শ্রীমতী আর, এস, হোসেন মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ধর্ম্মসাধন নীতিপুস্তকের সমালোচনায় আমাকে "মোসলমান ব্রাহ্ম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতি প্রকৃতি ভোজ্য পরিচ্ছেদ আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমাকে মোসলমান ব্রাহ্ম বলেন নাই, আমি মোসলমান জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া থাকি তজ্জন্য সেরূপ বলিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার সঙ্গে আমার মাতৃপুত্র সম্বন্ধ স্থাপিত। সেই

মনস্বিনী মহিলা উক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় নিজেই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে পত্রাদি লিখিতে পত্রে নিজের নাম না লিখিয়া নামের পরিবর্ত্তে "মা" "আপনার স্নেহের মা" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতা অপেক্ষা পুত্রের বয়ঃক্রম দ্বিগুণেরও অধিক, মাতার ২৬।২৭ বৎসর বয়ঃক্রম, পুত্রের ৭১।৭২ বৎসর বয়স।

বঙ্গবন্ধু পত্রিকা সম্পাদন

ভারতাশ্রমে কিছুদিন স্থিতি করিলে পর আচার্য্যদেব উক্ত আশ্রমের অন্তর্গত স্ত্রীবিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষকের পদে আমাকে মনোনীত করেন। আমি অবৈতনিকরূপে কিছুকাল সেই কার্য্য সম্পাদন করি। তৎপর ঢাকা নগরে যাইয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমার জীবনে পরীক্ষা ও সংগ্রাম চলিয়াছিল। পাপের জন্য অনুতাপ ও উত্থানপতন হইয়াছিল। ঢাকা নগরে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু পত্রিকা সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। তখন উক্ত পত্রিকা সাপ্তাহিক ছিল। রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধাদি তাহাতে লিখিত হইত। সেই সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল। স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র নন্দী সেই পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ও অপর কোন কোন বন্ধু তাহার পুষ্টিপোষক ছিলেন। রায় মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগে এবং তাঁহার পরামর্শতে কৈলাসচন্দ্র বঙ্গবন্ধু সম্পাদনের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে কৈলাসচন্দ্র আমাকে না বলিয়া আমার অজ্ঞাতসারে বঙ্গবন্ধুর জন্য Manuscript লিখিয়া কম্পোজের জন্য কম্পোজিটারদের হস্তে সমর্পণ করেন। আমি যথাসময়ে Manuscript প্রস্তুত করিয়া এসেই ছাপাখানায় যাইয়া দেখি যে, কৈলাসচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধাদি কম্পোজ হইতেছে। ইহাতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া যাই এবং অবিলম্বে কলিকাতায় যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগী হই। তখন আমি রিক্তহস্ত, কলিকাতায় গমনের পাথেয়সম্বল আমার হস্তে কিছুই ছিল না। আমি বঙ্গবন্ধু সম্পাদন করিব, আমার আহারাদির ব্যয় যন্ত্রাধক্ষ্য কৈলাসচন্দ্র নির্ব্বাহ করিবেন এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল; তিনি তাহা দিলেন না। একজন ব্রাহ্মযুবকের বাসায় দুইবেলা ভোজন করিতেছিলাম মাসান্তে খোরাকি খরচ তাঁহাকে দিতে হইবে, এরূপ কথা ছিল। কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে

তিনি খোরাকী বাবতে প্রাপ্য টাকা চাহিলেন এবং তাহা পরিশোধ করিয়া যাইবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ করিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া কোন কোন আত্মীয়ের নিকটে যাইয়া ধার চাহিয়াছিলাম, ধার পাইলাম না। কোন প্রকারে কলিকাতার গমনের পাথেয়ের সংস্থান করা গেল। খোরাকির টাকা কিছুদিনের জন্য ধার রাখিয়া কলিকাতায় আসা গেল। সেখানেও টাকা না দিলে আশ্রমে অন্নের ব্যবস্থা হইবে না, ম্যানেজার বাবু এরূপ জ্ঞাপন করিলেন।

বিষয়সম্পত্তি ও উপজীবিকার ব্যবস্থা

অপর সাধারণ প্রচারকদিগের ন্যায় আমার জীবনোপায়ের ব্যবস্থা নয়, সাধারণ প্রচারকদিগের জীবিকা প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে। অনেকে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর না করিয়া বিধিবহির্ভূত ভাবে নিজে অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সাধারণের দান ও প্রচারকদিগের শ্রমার্জ্জিত অর্থে প্রচারভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডারে অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তিনি প্রচারক পরিবারের ঈশ্বর নিয়োজিত। অভিভাবক ও প্রতিপালক। যাঁহারা বিষয়-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রণীত পুস্তকাদিতে ও তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যে অর্থাগম হইলে সেই অর্থে তাঁহাদের নিজের কোন অধিকার নাই, উহা প্রচার ভাণ্ডারের সম্পত্তি, তাঁহারা সপরিবারে বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিবেন, প্রচার-ভাণ্ডারের সাহায্যে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। প্রেরিতদিগের প্রতিবিধিনামক পুস্তকে ইহা সবিশেষ বিবৃত।

আমি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, রীতিপূর্ব্বক প্রচারব্রত অবলম্বন করি নাই, এমন অবস্থায় আমার অত্যন্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। এদিকে আমার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তিতে ভূসম্পত্তিতে অধিকার রহিয়াছে—আমি তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইতেছি না। পরে আমি ভাবিলাম পৈতৃক ভূসম্পত্তির অংশ আমার আছে, সামান্য ভাবে জীবনযাপনের জন্য তাহা হইতে উপজীবিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তখন বাড়ীতে জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের হস্তে বিত্তসম্পত্তি রক্ষিত ছিল। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী কিছু কিছু অর্থ প্রতিমাসে পাঠাইবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া এরূপ ব্যক্ত করেন যে, "তুমি বাড়ীতে আসিয়া বাস কর, বিদেশে তোমার জন্য অর্থ-প্রেরিত হইবে না।" পরে আমি

দৃঢ়তাসহকারে বলি যে সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব আছে, তাহার আয় হইতে আমার অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রতি মাসে কিছু টাকা আমাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে, নিজের অভিমতানুসারে। তাহা হইলে প্রেরিত জীবনে অর্থসম্বন্ধীয় নীতি প্রতি-পালিত হইবে। পরে আমি ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জ্ঞাপন করি যে সম্পত্তি হইতে মাসিক ৭ টাকা পাওয়া যাইবে, তদ্বারা আমার জীবন যাত্রার সমুদয় আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া প্রয়োজন। তিনি ছয় টাকা তাঁহার হস্তে দান করিয়া এক টাকা ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য আমার হস্তে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ছয় টাকায় খোরাকি ও আংশিকভাবে চাকরের মাহিয়ানা ও বাড়ীভাড়া ইত্যাদি চালাইবার কথা। তখন খাদ্যসামগ্রী মূলত মূল্য ছিল, ৩।৪ টাকায় একজনের সামান্যভাবে একমাসের খোরাকী চলিত। বিনামা, কাপড় খরিদ ও কাপড় ধোলাই ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়া এক টাকার কিছুই বাঁচিত না, যে জল খাওয়া ও দুগ্ধ পানাদি হইতে পারে। তবে প্রচার কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে স্থানান্তরে বিশেষ বিশেষ বন্ধুর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে হইত। তাহাতে খোরাকি খরচ কিছু বাঁচিয়া যাইত। তাহাতে অর্থাভাব কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইত। কখন কখন তদ্বারা পাথেয়ের অভাবও পূরণ করা যাইতে পারিত। কয়েক বৎসর পর আমার কষ্ট ভাবিয়া মাতৃদেবীর অনুরোধ মতে দাদা ৮ টাকা বরাদ্দ করেন। তাহাতে এক পোয়া দুগ্ধ এবং বিকালে জল খাওয়ার অর্দ্ধ পয়সার মুড়ীর ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পরিতেছিল। দাদার পরলোক গমনের পর শ্রীমান ইন্দুভূষণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরান্তে মাসিক ১০ টাকা করিয়া পাঠাইতে থাকেন। তাহাতেও আমার কষ্টের নিবৃত্ত হইতেছে না ভাবিয়া কয়েক মাস হইতে শ্রীমান ১২ টাকা করিয়া পাঠাইতেছেন। প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকেও ৬ টাকা স্থানে ৭ টাকা করিয়া দান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইভাবে আচার্য্যদেবের অনুমোদনে প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষের ব্যবস্থামতে তাঁহার হস্তে অর্থদানে জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতেছে।

মাতামহী ঠাকুর স্বর্গগত শিবচন্দ্র রায় হইতে দানসূত্রে কিছু ভূসম্পত্তি মাতৃ-দেবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া বড় দাদার ও অন্য কাহার কাহার পরামর্শমতে তিনি আমাকে বঞ্চিত করিয়া বড় দাদা ঈশ্বরচন্দ্র রায়কে এবং ছোটদাদার পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণকে উইল দ্বারা আপন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে এ বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, পরে জানিয়া বাড়ীতে যাইয়া মাকে বলিয়াছিলাম, আপনি যেরূপ উইল লিখিয়া

নিজের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে; আপনি জানেন আমার অর্থের প্রয়োজন নাই, সামান্যভাবে আমার অন্নবস্ত্রের মাত্র প্রয়োজন। আমার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। আমার সম্পত্তি বড় দাদা প্রভৃতি ভোগ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। যাহা করিয়াছেন ঠিক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া মা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বীয় পৈতৃক জমীদারী গোবিন্দপুর পরগণার নিলাম ফাজিলী টাকার অংশ স্বরূপ ছয় হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। তাহার কিছু নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিবার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় বড় দাদার হস্তে ন্যস্ত করেন। তাহার পর একবার তিনি ঢাকা নগরে স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা আমার ছোট্ট দিদীর (শ্রীমান্ কৃষ্ণ-গোবিন্দের মাতার) নিকটে যাইয়া কয়েক দিন স্থিতি করেন, এখন আমিও সেখানে যাইয়া বাস করিয়াছিলাম। একদিন দিদী একশত টাকা আমার নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মা তোমাকে এই টাকা নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিবার জন্য দিয়াছেন।" আমি তাহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করি। দিদী বলিলেন, "মা আদর করিয়া দিয়াছেন। ইহা তোমার গ্রহণ করিতে হয়"। পরে সেই টাকা গ্রহণ করিয়া পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ফণ্ডে জমা করিয়া রাখি, মাতৃদেবী স্বর্গগত হইলে পর উক্ত একশত টাকা তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় ব্যয় করিয়াছি। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তিনি আরও একশত টাকা শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আমাকে প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন।

বড় দাদার চারিপুত্র চারিকন্যা। কন্যা সকল বিবাহিত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান বিপিনচন্দ্র, ছোট দাদার একমাত্র পুত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ। ইন্দুভূষণ শৈশবকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তাহার বড় পিসীমা স্বর্গাগতা বরদেশ্বরী গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ইন্দুভূষণ। বিপিনচন্দ্র নিতান্ত অমিতাচারী ও অবিবেচক। তাহার কোনরূপ চরিত্রদোষ ও পানদোষ নাই। কিন্তু ঢাকা নগরে পাঠ্যাবস্থাতে শ্রীমান্ ভোজ্য পরিচ্ছদাদিতে অবস্থার অতিরিক্ত বাহুল্য ব্যয় করিয়া তাহার পিতৃদেবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় কাপড়ের দোকানে ও ময়রার দোকানে তাহার অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল, বহুদিনে সেই টাকা পরিশোধ হইয়াছে, এক্ষণও সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে কিনা জানি না। ঋণ করিতে সে কিছুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত নহে। দাদার পরলোক গমনের পর, আমি তাহার কল্যাণ এবং পারিবারিক শান্তি ও সুব্যবস্থার জন্য তাহাকে বলিয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত দাদা

বিদ্যমান ছিলেন, তিনি পরিবারের কর্ত্তা ও অভিভাবক ছিলেন, তোমরা সকলে তাঁহার আশ্রয়ে ছিলে। এক্ষণ অন্যরূপ অবস্থা। তোমরা চারি সহোদর, ইন্দুভূষণ খুড়তুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সকলে একান্নভুক্ত। অর্থের আদান প্রদানাদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দুভূষণের অমতে করিবে না, তাহার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অমতে ও অজ্ঞাতসারে ঋণ করিবে না। তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির ও পিতামহীর সম্পত্তির উপর আঘাত পড়িবে, সম্পত্তি রক্ষা পাইবে না, ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিবারে অশান্তি ঘটিবে। তোমরা চারি সহোদর, সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী তোমার খুড়তুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একা ইন্দুভূষণ ; এরূপ একান্নভুক্ত যুক্ত পরিবারে বিশেষ সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। অতি সামান্য সম্পত্তি। ইহা তোমাদের নিজকৃত নয়, পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত। অমিতাচার ও অবিবেচনায় যেন সম্পত্তির উপর কোন আঘাত না পড়ে। আমার এই কথায় হিতে বিপরীত হইল, শ্রীমান্ অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল, অনেকের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ পত্রাদি লিখিল। তখন ইন্দুভূষণ স্থানান্তরে বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল ; বিপিনচন্দ্র বাড়ীতে স্থিতি করিতেছিল। ইন্দুভূষণ বাড়ী ঘর তালুক জমি ইত্যাদির সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিপিনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বে ভরাডুবি হইতেছিল, এত অধিক ঋণ হইল যে, সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর ছিল না। কাহার হইতে কত টাকা ধার করা হইয়াছে, কেন ধার করা হইল পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। শ্রীমান্ পরেও জানিতে দেয় নাই। সুদ বৃদ্ধি পাইয়া মূলকে অনেক অতিক্রম করিয়াছিল। উত্তমর্ণগণ টাকা না পাইয়া নালিস করিতে লাগিল, তখন বিপিনচন্দ্র নিরুপায় হইয়া পড়িল, সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কতক ঋণ পরিশোধ করিল, ভ্রাতৃগণ দয়া করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির কিছু কিছু অংশ তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য ছাড়িয়া দিল। ৩।৪ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ হইলে সকলে ভাবিয়াছিল যে, ঋণদায় হইতে পরিবার মুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতে ঋণ শেষ হয় নাই, পরে জানা গেল অনেক ঋণ আছে। তাহা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই, গোপন করা হইয়াছে। যখন ধার করা হয় ভ্রাতাদিগকে জানিতে দেওয়া হয় না, কাহার নিকটে কত টাকা ধার তাহাও জ্ঞাপন করা হয় না। যখন ঋণপরিশোধ না করিলে উপায়ন্তর নাই, তখন বিপিন ভ্রাতাদের শরণাপন্ন হইয়া ভূমি বিক্রয় করিয়া টাকা দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করে। প্রথমবারে ঋণ পরিশোধের

জন্য ভূমি বিক্রয় করা হইলে পর তাহাকে বলা গিয়াছিল, তোমার কত টাকা ধার আছে, কত বা ক্ষুদ্র ধার, কত বন্ধকী, কত তমস্সুকী, তুমি একটা লিষ্ট করিয়া দাও, কিছুই গোপন রাখিবে না, আমরা ধার পরিশোধের ব্যবস্থা করিব, এবং তোমাকে আমাদের ব্যবস্থামতে সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইন্দুভূষণ বিশেষভাবে এরূপ অনুরোধ করে, বিপিন তাহাতে সম্মত হয় না। কিয়ৎ কালের মধ্যে আবার পূর্ব্ববৎ ঋণবৃদ্ধি হয়। বিপিন পাওয়ানাদারদের আক্রমণে নিরুপায় হইয়া পড়ে। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আমার পৈতৃক সম্পত্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিখণ্ড বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহার ঋণ পরিশোধের সহায়তা করিবার জন্য অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক আমাকে বিশেষ অনুরোধ করে, এবং দূরবর্ত্তী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত পিতামহী হইতে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির কিয়দংশ, যাহার খাজানা প্রায় আদায় হয় না, এবং যাহা অংশিগণ হইতে পথকর অনাদায়ের জন্য পুনঃ পুনঃ নীলামে উঠে, আমার সম্পত্তির পরিবর্ত্তে তাহা প্রদান করিতে চাহে। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। দ্বিতীয় বারও ভ্রাতারা তাহার ঋণ পরিশোধে সহায়তা করে; কেহ কেহ নিজেদের সম্পত্তির অংশ ছাড়িয়া দেয়। এই গোলযোগে মাতৃদেবীর স্থাবর সম্পত্তি সমুদায় বিক্রয় হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র সবরেজিষ্টার, তাহার মাসিক ১০০ টাকা আয়। এই অবস্থাতেও নিজের ব্যয়ের জন্য সময়ে সময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ হইতে ২০।২৫ বা ৫০ টাকা চাহিয়া লওয়া হয়। শ্রুত হইল সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন গত বৎসর এইরূপে তাহাকে ৬০০ (ছয় শত) টাকা দিয়াছে। কাহারও পরামর্শানুসারে না চলিয়া নিজের মতে যথেচ্ছরূপে অর্থ ব্যবহার করাতে এই কুফল ফলিয়াছে। যে স্থলে এক পয়সার পোষ্টকার্ড লিখিলে চলে অনেক সময় বিপিনচন্দ্র সে স্থানে টেলিগ্রাফ করে, বা রেজেষ্টরী করিয়া পত্র পাঠাইয়া থাকে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমরা যেস্থলে ২০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করি, বিপিনচন্দ্র কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইয়া ঋণ করিয়া দ্বিগুণেরও অধিক ব্যয় করিয়া থাকে, এক্ষণও তাহার অনেক টাকার ঋণ। ঋণদায়ে পড়িয়া তাহার মনে একটুকু শান্তি নাই; স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, Colic pain-এ সর্ব্বদা ক্লেশ পাইতেছে, আহারে অরুচি। তাহার অবস্থা ভাবিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এক্ষণও শ্রীমান্ সাবধান হইয়া চলিল না, ইহার পরিণাম যে কি হইবে, কে জানে? ইন্দুভূষণ তাহার ব্যবহারে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর তাহার সঙ্গে একান্নভুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক নহে। ইন্দুভূষণ এবং বিপিনের কনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র অতিশয় মিতাচারী ও মিতব্যয়ী। তাহারা

আয়ানুসারে ব্যয় করে, ঋণ করিতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত। ময়মনসিংহ জিলাতে আমাদের কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, বিপিনচন্দ্রের প্রথম ঋণের ধাক্কায় তাহা হস্তান্তরিত হয়, আমি আমার অংশ তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য বিক্রয় করিতে দি নাই। আমাকে শ্রীমান্ এরূপ জ্ঞাপন করে যে, সেই তালুক বহু দূরে, তথাকার প্রজাসকল অতিশয় দুরন্ত ও অবাধ্য, তাহাদের হইতে খাজনা আদায় করা দুষ্কর, তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়ীর নিকটে ভূমি ক্রয় করা যাইবে, তাহাতে উপস্বত্ব অধিক হইবে, প্রজাগণ হইতে খাজনা আদায়ে কোন কষ্ট হইবে না। আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করি, এবং ভূমি বিক্রয়ের জন্য আমমোক্তারনামা লিখিয়া দি। আমার অংশ কত টাকা মূল্যে বিক্রয় হইল, এবং জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী ভূমি কত টাকা মূল্যে ক্রীত হইল, ক্রীত ভূমির মূল্যদানের পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল কিনা, কি পরিমাণ ও কিরূপ ভূমি, তাহাতে কত প্রজার বাস, ইহা কিছুই আমাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। আমি এইমাত্র জানি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সুখিয়া আশুতিয়া প্রভৃতি তাল্লুকের আমার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। বাড়ীর নিকটস্থ পরস্পর সন্নিহিত কয়েকখণ্ড ভূমি ক্রীত হইয়াছে।

আমার সম্পত্তিশাসন সংরক্ষণ করিয়া জীবিকার টাকা প্রতি মাসে পাঠাইবার ভার শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র কয়েক বৎসর সেই ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইতে ছয় মাসান্তে বা বৎসরান্তে টাকা পাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। আমাকে ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। ইন্দুভূষণ তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া নিজহস্তে সেই ভার গ্রহণ করে, প্রতিমাসে যথাসময় নিয়মিতরূপে উপজীবিকার টাকা তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। শ্রীমান্ ক্রমে ৮৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা এবং পরে ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া আমার অর্থকষ্ট নিবারণে যত্নবান্ হইয়াছে। বিপিনচন্দ্রের দুঃখ ক্লেশ ও পারিবারিক অশান্তি তাহার অবিবেচনা ও স্বেচ্ছাচারিতার অনিবার্য্য ফল। তাহার ও অপরের সাবধানতা ও শিক্ষার জন্য আমাকে দুঃখের সহিত এ সকল লিপিবদ্ধ করিতে হইল।

আমা কর্ত্তৃক রচিত ও সঙ্কলিত এবং অনুবাদিত কতকগুলি পুস্তক আছে। কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার যে, আমি পুস্তক লিখিয়া নিজের সম্পত্তি করিয়াছি, তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছি; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমার নিজের অন্নবস্ত্রাদির জন্য পুস্তকের উপস্বত্ব আমি গ্রহণ করি না, আমার কোন

উত্তরাধিকারী সেই উপস্বত্বের ভাগী হইবে না। আমি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া মিশনে দান করিয়াছি। তন্মধ্যে তাপসমালা প্রথম ভাগ ও স্বীয় পত্নীর জীবনচরিত নিজে অর্থসংগ্রহপুর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ দান করা গিয়াছে। অধিকাংশ পুস্তক মিশনে দান না করিয়া আমি নিজের দায়িত্বে মুদ্রিত করিয়াছি। প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইলে দরিদ্র প্রচার ভাণ্ডারের অর্থের অপ্রতুলতাবশতঃ এক একখানা বৃহৎ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে অসম্ভব বিলম্ব হয়, এবং আমার ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় না। সর্ব্বজন সমাদৃত তাপসমালা ছয় ভাগ একত্র একখণ্ডে উত্তমরূপে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া অনেকে বিশেষ দুঃখিত। দশ বৎসরেরও অধিক কাল হইবে, মিশনে প্রদত্ত দেওয়ান হাফেজের অনুবাদ প্রথমার্দ্ধ মিশনের সাহায্যে ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। চরমার্দ্ধের অধিকাংশ অনুবাদ manuscript আকারে প্রস্তুত আছে। উপেক্ষাবশতঃ হউক, বা মিশনের অর্থের অসচ্ছলতাপ্রযুক্ত হউক এ পর্য্যন্ত তাহার একখণ্ডও মুদ্রিত হইতে পারে নাই। বলিতে কি আমার জীবনে তাহা মুদ্রিত দেখিতে পাইব না, বা পরে কখনও মুদ্রিত হইবে না আমার এরূপ সংস্কার। আমি এমন দীর্ঘসূত্রী হইয়া কাজ করিতে পারি না। পরন্তু আমা কর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক যে আমি প্রচার ভাণ্ডারভুক্ত করিয়া দিব আমার এরূপ উদ্দেশ্য নয়। পুস্তকবিক্রয়ে এক্ষণও লাভ হইতেছে না, যে টাকা পাওয়া যায়, নূতন পুস্তকমুদ্রাঙ্কনে এবং নিঃশেষিত পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনে তাহা ব্যয়িত হয়। দিদীর প্রদত্ত দুই শত টাকা, gratuity স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত এক শত টাকা পুস্তকের ফণ্ডে জমা আছে। তাহা না থাকিলে অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কনে বিঘ্ন হইত। সেই টাকারও কতক প্রচার কার্য্যে পাথেয় হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে। সময়ে পুস্তকে লাভ হইতে পারে। লাভ হইলে তাহার একচতুর্থাংশ প্রচারভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে, অবশিষ্ট আমার দুঃখী জন্মভূমির অভাবমোচনে ব্যয়িত হইতে থাকিবে, মৎকৃত নিম্নোক্ত উইলপত্রে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই উইলের পাণ্ডুলিপি প্রেরিত দরবারের সম্পাদক ও প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে এবং সমুদায় আত্মীয় স্বজনকে প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সকলের অনুমোদনে লিখিত হইয়াছে, পরে রেজেষ্টরী করা গিয়াছে।

উইলপত্র

"লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন ওলদে স্বর্গগত মাধবরাম সেন, সাকিন পাঁচদোনা পরগণা মহেশ্বরদি থানা রূপগঞ্জ মহকুমা নারায়ণগঞ্জ জিলা ঢাকা, কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চানে।

"যেহেতু আমি বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, জীবনের স্থিরতা নাই। অতএব আমার পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ী ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যে যৎকিঞ্চিৎ আমার স্বত্বাধিকারে আছে, এবং জীবদ্দশা পর্য্যন্ত থাকিবে, তৎসমুদায়ের সম্বন্ধে ও মৎপ্রণীত পুস্তক সকলের বিষয়ে একটী উইল করা আবশ্যক হইয়াছে।

"ইতিপূর্ব্বে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে এক উইল করিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী করাইয়াছিলাম, তাহার অনেক অংশ এক্ষণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে সেই উইলপত্র সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া এই উইল করিতেছি।

"আমার স্ত্রীপুত্র কন্যা নাই, একান্নভুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উত্তরাধিকারিরূপে বিদ্যমান। আমার প্রাণবিয়োগের পর আমার পরিত্যক্ত পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত সর্ব্বাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রগণ শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন তুল্যাংশে পাইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে। উক্ত সম্পত্তির অপর এক-তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত অগ্রজ হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন প্রাপ্ত হইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উপরি উক্তরূপে ভোগ দখল করিবে।

"আমার স্বকৃত কতকগুলি পুস্তক নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের অন্তর্গত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত আছে। যথা ;—(১) কোরাণের বঙ্গানুবাদ, (২) মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত, (৩) মহাপুরুষ মূসার জীবনচরিত, (৪) মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত, (৫) মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত তিন ভাগ, (৬) হদিস মেস্কাতোল মসাবিহের বঙ্গানুবাদ চারিখণ্ড, (৭) হিতোপাখ্যানমালা প্রথমভাগ, (৮) হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ, (৯) নীতিমালা প্রথম ভাগ, (১০) তত্ত্বরত্নমালা, (১১) তত্ত্বসন্দর্ভমালা প্রথমভাগ,

(১২) চারিজন ধর্ম্মনেতা। এই সকল পুস্তকের চারি ভাগের তিন ভাগ উপস্বত্ব আমার জন্মভূমি পাঁচদোনাগ্রামের নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। উক্ত পুস্তক সকল কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া বিক্রয় হইতে থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের উক্ত অধ্যক্ষ এবিষয়ে য়েক্‌জিকিউটার (কার্য্য সম্পাদক) হইবেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদিবাবতে ঋণ থাকিলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রেরিত দরবারের অর্থাৎ উক্ত নামধেয় প্রচারক সভার অভিমত এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ ও শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধাদি বিষয়ে অর্থব্যয়াদি করিবেন। ঋণপরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫৲ টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর ও গৃহহীন দরিদ্রদিগের গৃহাভাব মোচন করার সাহায্য সেই অর্থ দ্বারা হইতে পারিবে। কোন কোন নববিধান প্রচারক মহেশ্বরদি পরগণার কোন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে তাঁহাদের পাথেয়াদির সাহায্য সেই পুস্তকের ফণ্ড হইতে দান করা যাইতে পারিবে। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন ও শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন উক্ত অর্থবিতরণ সম্বন্ধে য়েক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অনুজগণের এবং পাঁচদোনাগ্রামস্থ আমার খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেনের যোগে একটি কমিটী স্থাপন করিয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণ-পূর্ব্বক অধিকাংশের মতে সেই সকল কার্য্যে অর্থব্যয় করিবেন। কোন কারণে কমিটীর মেম্বারগণ সকলে একত্রিত হইতে না পারিলে সম্পাদক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের মত আনয়ন করিয়া অধিকাংশের মত কার্য্য করিবেন। প্রথমোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজন উক্ত কমিটীর সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক হইবেন। কমিটী আবশ্যক বোধ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পাঁচদোনা গ্রামের সন্নিহিত অপর গ্রাম সকলের দুঃখী দরিদ্রদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন করিতে পারিবেন। উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদিগের প্রধান উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি যথাক্রমে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। মদ্রচিত

উক্ত পুস্তকসকলের উপস্বত্ব আমি যেমন নিজের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতেছি না, তদ্রূপ আমার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির ভোগাদির জন্য তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে। সময়ে আমার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ একান্ত দারিদ্র্য অবস্থায় পড়িয়া উক্ত দান পাইবার উপযুক্ত হইলে দরবারের অভিমতে তাহারও পাইবার অধিকার থাকিবে। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আয়ব্যয়ের হিসাবপত্রাদি রাখা ও বাহুল্যরূপে পুস্তকবিক্রয় ও প্রচার জন্য আবশ্যকমতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিবেন। উপযুক্ত কমিশনদানে কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তিনি পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিবেন, তিনি উহার হিসাবপত্র প্রেরিত দরবারে অর্পণ করিবেন। উপরিউক্ত পুস্তকাবলীর মধ্যে কোন পুস্তকের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন বা সংশোধন করা আবশ্যক হইলে উক্ত প্রচারক সভার মতে তাহা হইতে পারিবে। পুস্তক বিক্রয়ান্তে খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে তাহার শতকরা ৫৲ টাকা প্রেরিত দরবার পাঁচদোনার উপরিউক্ত হিতকর কার্য্যসম্পাদনার্থ উক্ত অর্থবিতরণ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন। কমিটীর সম্পাদক ছয় মাস অন্তে বা বৎসরান্তে টাকা পাইবার জন্য দরবারের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিবেন ; ফণ্ডে পুস্তকের উপস্বত্ব থাকিলে দরবার তাহা প্রদান করিবেন। পরে কোন্ কোন্ বাবতে কত অর্থ ব্যয় হইল কমিটীর সম্পাদক দরবারকে জানাইবেন। কোন পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনে অর্থের অভাব হইলে দরবার উপযুক্ত অংশদানে কোন ব্যক্তিকে বা কতিপয় ব্যক্তিকে তাহা প্রকাশের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। অর্থব্যয় ও বিতরণ করিবার ভারপ্রাপ্ত য়েক্‌জিকিউটারগণ নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রথমতঃ দরবার তাঁহাদের ত্রুটির বিষয় তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে দরবারের অভিমতে প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার দেশস্থ দুই তিনজন উপযুক্ত বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্ত অধ্যক্ষের নিজ কার্য্যে ত্রুটি হইলে অর্থবিতরণ সম্বন্ধীয় য়েক্‌জিকিউটারগণ প্রেরিত দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন। পুস্তকাদি সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহারা প্রেরিত দরবারের মত গ্রহণ করিয়া করিতে পারিবেন। প্রচার কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের অবর্ত্তমানে তাঁহার স্থলবর্ত্তী যিনি হইবেন তিনিও উইলসম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত য়েক্‌জিকিউটার হইবেন।

কালক্রমে যদি দরবারের এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, তাহাতে উল্লিখিত কার্য্যে সকলের ব্যাঘাত হয়, বা দরবার না থাকে, কিংবা তাহার স্থলবর্ত্তী নামান্তর-প্রাপ্ত কোন প্রচারক সভার অভাব হয়। তাহা হইলে দাতব্যের জন্ম নিযুক্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রতি বা অফিসিয়েল ট্রষ্টির প্রতি উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইতে পারিবে। পৈতৃক সম্পত্তি ও মৎপ্রণীত পুস্তকাদি ব্যতীত অপর কোন সম্পত্তি বা অপরের রচিত পুস্তক আমার স্বত্বাধিকারে থাকিলে তাহার উপস্বত্ব পূর্ব্বোক্তরূপে দাতব্য বিভাগে ব্যয়িত হইবে।

"আমার যে সকল উর্দ্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে সেই সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বলারাম ভীমবাটদ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রচার হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই। পরে আমার কোন উত্তরাধিকারীরও স্বত্ব থাকিবে না।

"প্রায় চারি বৎসর যাবৎ মহিলানাম্নী মাসিক পত্রিকা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দরবার, তাহার উপস্বত্বাদিতে আমার কোন স্বত্ব নাই, সুতরাং আমার উত্তরাধিকারীদিগেরও তাহাতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।

"মদ্রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকসকল প্রচার ভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে। তাহার উপস্বত্ব দ্বারা দরিদ্র প্রচারকপরিবারের ভরণ পোষণাদির সহায়ক হইবে। প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের হস্তে সেই সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও অর্থ আদান-প্রদানাদির ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত আছে। সেই সমুদায় পুস্তক প্রচার ভাণ্ডারের অর্থেও কিয়দংশ অন্যদীয় সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীদিগের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই ও কখনও স্বত্ব থাকিবে না। সেই সমস্ত পুস্তক আমি প্রচারভাণ্ডারের সাহায্যার্থে অর্পণ ও দান করিয়াছি। অতঃপর আমা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া যে কোন পুস্তক ভবিষ্যতে প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচারভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অপিচ আমার রচিত যে সকল পুস্তক ভবিষ্যতে প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে না, অথবা আমি নিজের বা অন্যের অর্থসাহায্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচারভাণ্ডারে দান করিব না, পূর্ব্বোক্তরূপ তাহার উপস্বত্ব পাঁচদোনার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

"আমার রচিত যে সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা ;—(১) তাপসমালা, ৬ ভাগ, (২) দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমার্দ্ধ, (৩) তত্ত্বকুসুম, (৪) কোরাণের রচনাবলী, (৫) দরবেশদিগের সাধন-প্রণালী, (৬) দরবেশদিগের ক্রিয়া, (৭) দরবেশদিগের উক্তি, (৮) দরবেশী,

(৯) ব্রহ্মময়ী চরিত, (১০) সতী চরিত, (১১) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সঙ্ক্ষিপ্ত জীবন, (১২) ঈশ কি ঈশ্বর ?

"এই উইল আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিলাম, আমার মৃত্যুর পর ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ইতি সন ১৩০৬ সাল, তারিখ ৮ই বৈশাখ।" "লিখক খোদ।

সাক্ষী

"শ্রীশশিভূষণ দত্ত, হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।

"শ্রীনলিনীভূষণ দত্ত, হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।

"গণেশচন্দ্র পাল, সাং কাওরাইদ, জিলা ঢাকা।"

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের ২০শে তারিখ নারায়ণগঞ্জের সবরেজেষ্টরী আফিসে এই দলিল রেজেষ্টরী হইয়াছে।

এই উইল কৃত হইলে, উইলে উল্লিখিত পুস্তকাবলী ব্যতীত এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল আমা কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে;—হদিস পূর্ব্ববিভাগ ৫ম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড পর্য্যন্ত এবং হদিস উত্তরবিভাগ প্রথম হইতে দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত; এমান হসন ও হোসয়ন; মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলাম ধর্ম্ম; ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য; ধর্ম্মসাধননীতি। এ সকল পুস্তক প্রচারভাণ্ডারের অর্থসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে।

প্রচার

১৭৯৫ শকের শেষভাগে আমি বিদেশে প্রচার আরম্ভ করি। প্রথমতঃ প্রচারার্থ আসাম প্রদেশে গমন করা হইয়াছিল। তখন আমি রীতিপূর্ব্বক প্রচারকরূপে মণ্ডলীতে গৃহীত হই নাই। সেই সময় প্রচারব্রতগ্রহণের জন্য কোন সুদৃঢ় নিয়ম ছিল না। এক্ষণ নববিধান প্রচারব্রতগ্রহণে সুকঠিন নিয়ম; প্রচারব্রতের প্রার্থীকে এক বৎসর কাল পরীক্ষাধীনে থাকিতে হয়। পরে প্রেরিত দরবারের অনুমোদন হইলে প্রার্থীকে বিশেষ দিনে প্রকাশ্যে আচার্য্যের নিকটে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে হয়;—

"অদ্য অমুক শকে অমুক মাসে অমুক দিবসে আমি অতি বিনীতভাবে গাম্ভীর্য্যসহকারে প্রচারকশ্রেণীর ব্রতবিধি গ্রহণ করিতেছি। যাবতীয় বিষয়-কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক নববিধান প্রচার, মানবজাতির সেবা, পৃথিবীতে ঈশ্বরের

স্বর্গরাজ্যস্থাপন জন্য আমি আমাকে এবং আমার সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করিতেছি। মনুষ্যের অনুরোধে কদাপি খণ্ডিত না করিয়া আমি পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিব, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, উপাসনা ও ঈশ্বরেতে সকলের মিলন প্রচার করিব, এবং আমার সমস্ত প্রচার মধ্যে আমি নববিধানকে গৌরবান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্যাত্মাসকলকে ঈশ্বরের নিকটে আনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয়কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য ও পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থসম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দারিদ্র্য, বিনয় ও আত্মসমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব ঈশ্বর আমাকে এবিষয়ে সাহায্য করুন।"

সেই সময়ে প্রচার ব্রত গ্রহণে এরূপ নিয়ম ও প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইত না। আমি নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বর্ষার সমাগমে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে আচার্য্য রবিবাসরীয় মিরার পত্রিকায় আমার প্রচারবৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রচারক বলিয়া জ্ঞাপন করেন। ১৭৯৬ শকের ২২শে ভাদ্র আমি প্রচারক সভায় প্রথম যোগদান করি, এবং উক্ত সভায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর অন্তর্গত আমার নাম লিখিত হয়। ৩২ বৎসর যাবৎ আমি প্রচারকরূপে গণ্য।

আসামে প্রচার

আসাম প্রদেশেই আমার প্রথম প্রচার হয়। পরে আমি আরও দুইবার সেই প্রদেশে প্রচার করিতে গিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তৃতীয়বারে প্রীতিভাজন শ্রীমান্ আশুতোষ রায় সঙ্গে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে নিম্ন আসাম ধুবড়ী হইতে সীমান্ত প্রদেশ উপর আসাম ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল। তৃতীয়-বারে আশুতোষকে সঙ্গে করিয়া বদরপুর জংশন হইতে পার্ব্বত্য রেলওয়ের পথে গৌহাটী নগর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ধুবড়ী হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসা গিয়াছিল। এই তিন বারে আসাম প্রদেশের যে যে স্থানে উপাসনা উপদেশ বক্তৃতা সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা প্রচার করা গিয়াছিল, সেই সকল স্থানের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে,—নিম্ন আসাম—ধুবড়ী ; সবডিভিশন গোওয়াল-

পাড়া। গৌহাটী। আসামের বর্ত্তমান রাজধানী শিলং। মধ্য আসাম—তেজপুর; গ্রাম, বিশ্বনাথ। নওগাঁ। উত্তর—আসাম—শিবসাগর; সবডিভিশন গোলাঘাট। ডিব্রগড়।

আসামের নিম্নলিখিত স্থানসকলে যাওয়া হইয়াছিল, তুই একদিন স্থিতি হইয়াছিল, প্রচারের স্থযোগ হয় নাই;—নওগাঁ জেলার অন্তর্গত বড়দওয়া শিবসাগর জিলার অন্তর্গত নিগ্রিটিং, সবডিভিশন এবং কোন স্বাধীন আসামরাজ পুরন্দর সিংহের রাজধানী জোড়হাট; টিয়কা শিলঙ্গের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জী পাহাড়।

রেলওয়ে, জাহাজ, গোযান, ডোঙ্গা নৌকা, অশ্ব, গজ, থাবা ও পদচারণা গমনাগমনের উপায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় যাত্রায় শিবসাগর ও ডিব্রগড়ের জিলায় ক্রমে ৮২ মাইল গোযানে ভ্রমণ করা গিয়াছিল। প্রথম যাত্রায় ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে ডোঙ্গায় আরোহণে ২৮ মাইল অন্তর বিশ্বনাথ নামক স্থানে যাওয়া হয়। আমি ডোঙ্গা নৌকায় ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া গজারোহণে লাউর্থার ১৫ মাইল নিবিড় অরণ্য নিশাকালে অতিক্রমপূর্ব্বক নওগাঁ নগরে উপনীত হইয়াছিলাম। নওগাঁ হইতে ১৮ মাইল দূরে বড়দওয়াতে পদব্রজে যাওয়া হয়, এবং তথা হইতে পদব্রজে নওগাঁয় ফিরিয়া আসা যায়। * নওগাঁ হইতে অশ্বারোহণে উপরিউক্ত অরণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপস্থিত হইয়া ডোঙ্গা নৌকারোহণে তেজপুরে ফিরিয়া আসা হয়। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব কূল হইতে গজারোহণে ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া

* আসামবাসী সাধারণ লোক মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বী। চারি শত বৎসর হইল, শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের সময়ে মহাপুরুষ শঙ্করদেব আসাম দেশে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকরূপে অভ্যুদিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু মূর্ত্তিপূজা করিতেন না, আপন শিষ্যদিগকে প্রতিমার প্রসাদ গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। কেবল নামগান ও ভাগবত গ্রন্থ পাঠে জীবের পরিত্রাণ, তিনি এই মত প্রচার করেন। আসামের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হরিনামগানের জন্য বড় বড় নাম ঘর স্থাপিত আছে। শঙ্করদেব জাতি-বিচার করিতেন না। তিনি অসভ্য নাগাকে পর্য্যন্ত আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আসামবাসীদিগের প্রগাঢ় ভক্তি। নওগাঁ জিলার অন্তর্গত বড়দওয়া তাঁহার জন্মস্থান, সেই স্থান আসামীদিগের তীর্থবিশেষ। উহা দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল।

নিগ্রিটিঙ্গে পৌছছান গিয়াছিল। গৌহাটী হইতে নূনাধিক ৬৩ মাইল দূরে পূর্ব্বাংশে দূরারোহ খসিয়া হিল (শিলঙ্গ পর্ব্বত)। তখন কার্ট রোড হয় নাই, রাস্তা প্রস্তুত হইতেছিল। অশ্বারোহণে দুই দিনে পার্ব্বত্য ক্রমোন্নত অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করা গিয়াছিল। তৎপর আমি খসিয়া কুলীর পৃষ্ঠে ঘোড়ার আকার থাবানামক আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই দিনে খসিয়া হিলে পঁহুছিয়াছিলাম। তথা হইতে তদ্রূপ খসিয়া কুলীর পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রায় দুই দিনে চেড়াপুঞ্জিতে যাওয়া হইয়াছিল। চেরাপুঞ্জি হইতে গিরিপাদমূল থারিয়াঘাটে অবতরণ করা যায়।

তথা হইতে খরস্রোত প্রস্রবণে বারকীনামক ক্ষুদ্র নৌকায় অরোহণ করিয়া নিম্নাভিমুখে তড়িদ্‌বেগে ভোলাগঞ্জে পঁহুছান যায়। ভোলাগঞ্জ হইতে স্বদেশী নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক ছাতকে, পরে আমি ষ্টীমার আরোহণে ঢাকায় গিয়াছিলাম। তথা হইতে কলিকাতায় যাওয়া হইয়াছিল। আমি জীবনের প্রথম প্রচারে এইরূপ নানা উপায়ে সঙ্কটাকীর্ণ দুর্গম পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। জাহাজে অবস্থিতিকালে কবিবর শেখ সাদী প্রণীত প্রসিদ্ধ বুস্তাননামক নীতিপূর্ণ পারস্য পদ্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরে তাহা হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশ করা গিয়াছিল। আমি আচার্য্য দেবকে বুস্তানের প্রেমমত্ততা পরিচ্ছেদের কিয়দংশের অনুবাদ প্রচারক্ষেত্র হইতে উপহার দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমাকে এইরূপ উপহারই দিবে," সেইবার আমি গোওয়ালন্দ হইতে চূনারনামক বেগগামী ষ্টীমারে সাত দিনে গোওয়ালপাড়ায় পঁহুছিয়াছিলাম, গোওয়ালপাড়া হইতে অন্যতর জাহাজে তিন দিনে গৌহাটীতে, গৌহাটী হইতে প্রায় তিন দিনে তেজপুরে গিয়াছিলাম। তখন গোওয়ালন্দ হইতে ডিব্রগড়ে বিশ দিনে জাহাজ পঁহুছিত, এক্ষণ মেল ষ্টীমার পাঁচ দিনে পঁহুছে।

বঙ্গদেশের যে যে স্থানে প্রচার হইয়াছে

পূর্ব্ববঙ্গ

ঢাকা ; সবডিভিশন—নারায়ণগঞ্জ, মোন্‌শীগঞ্জ ; মোন্‌সফী চৌকী—কালীগঞ্জ, গ্রাম—কাওরাইদ। ময়মনসিংহ ; সব—কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল ; মোন্—পিঙ্গলা, ঈশ্বরগঞ্জ, বাজিতপুর ; গ্রাম, মুক্তাগাছা, শেরপুর,

আঠার বাড়ী, বাঘিল, জঙ্গলবাড়ী, ..., করিমগঞ্জ। চট্টগ্রাম; পার্ব্বত্য ডিষ্ট্রীক্ট রাঙ্গামাটিয়া; সব—কাক্স বাজার; দ্বীপ—কুতুবদিয়া; গ্রা—পটিয়া। নওয়াখালী; সব—ফেণী; দ্বীপ—সন্দীপ। কুমিল্লা; সব—ব্রাহ্মণবাড়িয়া। স্বাধীন ত্রিপুরা—রাজধানী আগরতলা; নূতন রাজধানী নয়াহাবিলী; মোন্—মোরাদনগর; গ্রা—লাক্সাম—পশ্চিম গাঁ; হরিপুর। শ্রীহট্ট; গ্রা—ছাতক; আদাইর। শিল্চর; সব—হালিয়াকাঁধি; গ্রা—বার্ণারপুর। পাবনা; সব—সেরাজগঞ্জ। বরিশাল। ফরিদপুর; সব—রাজবাড়ী। যশোহর; গ্রা—মঙ্গলগঞ্জ।

উত্তরবঙ্গ

রঙ্গপুর; সব—কুড়ীগ্রাম। দিনাজপুর; মোন্—ফুলবাড়ী। রাজসাহী বোওয়ালিয়া; সব—নওগাঁও; গ্রা—দীঘাপাতিয়া। বগুড়া। রাজধানী কুচবিহার, গ্রা—বড়মরিচা, হল্‌দিবাড়ী। জলপাইগুড়ি। হিমাচলশৃঙ্গ—দার্জিলিং। মালদহ।

পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতা; ভবানীপুর। চুঁচুড়া; হুগলি; সব—শ্রীরামপুর; গ্রা—অমরপুর। খুঁওড়া; গ্রা—আমরাগড়ি, ব্যাঁটরা। চন্দননগর। নদিয়া জিলার অন্তর্গত সব—কুষ্টিয়া। গ্রা—শান্তিপুর; কুমারখালি। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গ্রা—খাঁটুরা। বহরমপুর; সব—জঙ্গীপুর; গ্রা—জিয়াগঞ্জ। মেদিনীপুর; সব—তম্‌লুক। বীরভূমের রামপুরহাট। বর্দ্ধমানের জিলা রাণীগঞ্জ। উপরে উল্লিখিত স্থানসকলের মধ্যে অনেকগুলি স্থানে একবার নয়, পুনঃ পুনঃ প্রচার করা গিয়াছে। বাঁকুড়াতে বিবাহোৎসবোপলক্ষে, বীরভূমের জিলা ভোলপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবোপলক্ষে, এবং কুমিল্লার জিলা কালীকচ্ছ গ্রামে দলবদ্ধভাবে বহুকাল পূর্ব্বে যাওয়া হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে দলবদ্ধভাবে প্রচারযাত্রা

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর প্রথমবার প্রচারযাত্রায় ভাই উমানাথ গুপ্ত, রামচন্দ্র সিংহ, ভ্রাতা বলদেব নারায়ণ প্রভৃতি ছিলেন। সেবারে রঙ্গপুর, ফুলবাড়ী, নাটোর, সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া গিয়াছিল। একবার দলবদ্ধভাবে কাকিনায় গমন হইয়াছিল। আচার্য্যের সঙ্গে প্রথমতঃ দলবদ্ধভাবে প্রচারযাত্রায় বর্দ্ধমান নগরে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয় বার ভাই উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, কেদারনাথ দে, রামচন্দ্র সিংহ, কালীশঙ্কর দাস, ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিক, আশুতোষ রায় প্রভৃতি

শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণানুসারে প্রচার যাত্রায় বহির্গত হন। তাঁহাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। নিম্নলিখিত স্থানসকলে যাওয়া যায় ;—খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, মঙ্গলগঞ্জ, নকফুলী, বনগ্রাম, যশোহর, খুল্না, বাঘেরহাট, বরিশাল।

একবার মাঘোৎসবান্তে কলিকাতা হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সদলে প্রচার যাত্রায় বহির্গত হন, তৎসঙ্গে আমিও ছিলাম। নিম্নলিখিত স্থান সকলে প্রচার হইয়াছিল ; ময়মনসিংহের সবডিভিশন টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইলের অন্তর্গভ গ্রাম বেড়াবোচিনা ; কেদারপুর। ঢাকা জিলার অন্তর্গত তিল্লি।

আমি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুরে, চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বসিরহাটে গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে প্রচারের সুযোগ হয় নাই, কৃষ্ণনগরে, নবদ্বীপেও গিয়াছিলাম ; হিন্দুতীর্থ ও প্রাকৃতিক শোভাদর্শনার্থ আসাম প্রদেশস্থ কামাখ্যা পর্ব্বতে, বশিষ্ঠাশ্রমে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত মহিষখালী দ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বতেও গিয়াছিলাম। এই সকল স্থানে কিছুই প্রচার হয় নাই। চট্টগ্রাম হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া চন্দ্রনাথ অঞ্চলে যাওয়া হইয়াছিল।

ধূমযান, বাষ্পীয়পোত, অর্ণবযান, গোযান, মহিষযান ইত্যাদি যোগে গমনাগমন হইয়াছিল। বর্ষাপগমে ক্ষুদ্র নৌকারোহণে কুমিল্লা ও নওয়াখালি অঞ্চলে একাকী প্রায় একমাস প্রচারার্থ ভ্রমণ করা গিয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারকে সঙ্গে করিয়া নৌকারোহণে প্রায় মাসাধিকাল ময়মনসিংহ জিলার নানা বিভাগে, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলা পর্য্যন্ত প্রচার করা গিয়াছিল। সেইবার ইটনা গ্রাম হইতে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বিথলঙ্গে প্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম দর্শনার্থ গমন করা হইয়াছিল।* এক একবার পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রচারে প্রচারকার্য্যালয়ের দেড়শত দুইশত টাকার পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।

---

*শতাধিক বৎসর হইতে পারে রামকৃষ্ণ গোস্বামী নামক একজন নিরাকারবাদী সাধুভক্ত ছিলেন। বিথলঙ্গে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান। সেই সমাধিস্থলে একজন মহান্ত এবং তাঁহার অনুগামী কৌমার্য্যব্রতধারী অনেকগুলি লোক স্থিতি করেন। অতিথি অভ্যাগতজনের সেবা ও নামগানই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। প্রতিদিন উক্ত আশ্রমে বহু যাত্রিকের সমাগম হয়। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার হইয়া থাকে। সেই আশ্রমকে রামকৃষ্ণ গোসাঞের আখ্ড়া বলে। এই আখ্ড়ার অন্তর্গত অনেক স্থানে অনেক আখ্ড়া আছে, এবং এই আখ্ড়ার মহান্তেরে নানা স্থানে বহু শিষ্য বিদ্যমান। মহান্ত পূর্ণব্রহ্মনামে সকলকে দীক্ষিত করেন।

প্রচার

মহাপ্রচার যাত্রা

১৮৩১ শকের কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মানন্দ প্রচারকদলসহ বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই দীননাথ মজুমদার, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই দুর্গানাথ রায় এবং ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ নন্দন প্রচারযাত্রিদলের অন্তর্গত ছিলেন। আমিও একজন যাত্রিক ছিলাম। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে সঙ্গীতপ্রচারক মহাশয় অধিক দূরে যাইতে পারেন নাই, পথে রামপুরহাটে স্থিতি করেন। সাধু অঘোরনাথ যাত্রিকদলের সম্পাদক, ভাই দীননাথ মজুমদার মৃদঙ্গবাদক, ভাই উমানাথ গুপ্ত পতাকাধারী ছিলেন; আমি ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য প্রচারবৃত্তান্ত লেখক ছিলাম। হাবড়ায়, নৈহাটীতে ও আচার্য্যদেবের পৈতৃক জন্মভূমি গৈরিভা গ্রামে প্রচার করিয়া চন্দননগরে এবং জগদ্দল পল্লীতে প্রচার করা হয়। তৎপর মোকামা, ক্রমে বাঢ়ঘাট, মজফ্ফরপুর, বাঁকিপুর, গয়া, ডোম্‌রাঁও, গাজিপুর, আরা ও শোনপুরে প্রচার হয়। সকল স্থানেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বাঙ্গলা বা হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাদি করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। উপাসনা সৎপ্রসঙ্গাদি প্রধানতঃ সমুদায় কাজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। নগর সঙ্কীর্ত্তনে ভাই দীননাথ মজুমদার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই প্রচারযাত্রা প্রায় এক মাস ব্যাপিয়া হইয়াছিল। আমরা সকলে সর্ব্বত্র তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়াছিলাম। পরে ভিক্ষার ঝুলিতে টাকার সচ্ছলতা দেখিয়া বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় আচার্য্য মহাশয় সকলের জন্য ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার নিম্নলিখিত স্থান সকলে প্রচার হয়

কটক; সব—কেন্দ্রপাড়া। পুরী। সব—খুরদা। বালেশ্বর। গড় জাতের অন্তর্গত ময়ুরভঞ্জ ও বোধনগর। হিন্দুতীর্থ ভুবনেশ্বর এবং বৌদ্ধতীর্থ উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিদর্শনের জন্য যাওয়া হইয়াছিল। অর্ণবপোত সরিৎপোত ধূমযান গোযান ও উৎকলী নৌকাযোগে গমনাগমন করা গিয়াছিল। সম্বলপুর হইতে কটক নগরে ক্ষুদ্র নৌকাযোগে প্রায় ১২ দিনে যাওয়া গিয়াছিল।

মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্বলপুর।

বিহার প্রদেশ—ভাগলপুর। মুঙ্গের। বাঁকিপুর; গ্রা—খগোল। গয়া। আরা। লাহিরিয়া সরাই; (দ্বারভাঙ্গা)। সমস্তিপুর।

সাঁওতাল পরগণা;—সব—দেওঘর; মধুপুর।

ছোটনাগপুর—ডেল্টনগঞ্জ। হাজারীবাগ; সব—চাত্রা। পুরুলিয়া; সব—গোবিন্দপুর। এই সকল স্থানে অল্পাধিক প্রচার হইয়াছে।

নওয়াদা সবডিভিশন হইয়া বুদ্ধদেবের প্রচারক্ষেত্র রাজগিরি দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল—গাজীপুর। এলাহাবাদ। কাণপুর। আগ্রা। এই কয়েক স্থানে কিছু কিছু প্রচার হইয়াছে।

অযোধ্যা প্রদেশ—লক্ষ্ণৌ নগরে প্রচার হয়। পাঠ্যাবস্থায় এবং তৎপরে লক্ষ্ণৌ নগরে গমনাগমন কালে জৈনপুর, অযোধ্যা, ফয়জাবাদ, ছাপরা ও গোরখপুরে যাওয়া হইয়াছিল, বিশেষ প্রচার হয় নাই। শেষোক্ত দুই স্থানে পারিবারিক উপাসনামাত্র হইয়াছিল। আরা নগর হইতে সেই জিলার অন্তর্গত রোটাস্‌গড়ে, সবডিভিশন সসারামে ও বক্‌সারে যাওয়া হইয়াছিল। আমি অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর নগরে কিয়দ্দিন স্থিতি করিয়া প্রসিদ্ধ নৈমিষারণ্য তীর্থে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদের পথে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় উনাও নগরে যাওয়া হয়। আমি জব্বলপুরে নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও শ্বেত প্রস্তরের পর্ব্বত (Marble Rock) দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

পঞ্জাব প্রদেশ;—দেরাদুন। সিমলা পর্ব্বত। লাহোর। রাউলপিণ্ডি। মরি পর্ব্বত। পেশওয়ার। এই কয়েক স্থানে কিছু কিছু প্রচার হইয়াছিল

রোহিলখণ্ড—বেরিলী নগরে সামান্য প্রচার হইয়াছিল। শাহজাহনপুরে যাওয়া হইয়াছিল, প্রচারের সুযোগ হয় নাই। কমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত নয়নীতাল পর্ব্বতে যাইয়া স্থিতি করা গিয়াছিল, প্রচার হয় নাই।

সিন্ধুদেশে করাচি বন্দরে ও হায়দরাবাদে প্রচার হইয়াছিল। রাজপুতানার অন্তর্গত আজমিরে কিছু প্রচার হয়, তথা হইতে প্রসিদ্ধ পুষ্করতীর্থদর্শনার্থ যাওয়া হইয়াছিল। আমি জয়পুর ও সাম্বারে যাইয়া প্রচার করিবার সুযোগ পাই নাই। সাম্বারের লবণ হ্রদসম্পর্কিত ডাক্তার ব্রাহ্মযুবা পি. এন্. দের আবাসে পারিবারিক উপাসনামাত্র হইয়াছিল। রাজপুতনা প্রদেশে একটীও ব্রাহ্ম সমাজ নাই।

বুঁদেল খণ্ডের অন্তর্গত ঝান্‌সী নগরে প্রচার হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ নগরে এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইলোরে যাওয়া হইয়াছিল। এই দুই স্থানে কোন কাজ হয় নাই। ওয়াল্টিয়ারে এবং গঞ্জামে কিছু কাজ হইয়াছিল। মান্দ্রাজযাত্রায় স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহযাত্রী ছিলেন। বিজোরা জংসন হইতে হায়দরাবাদে যাইবার সময় নেজাম রাজ্যে খেমামেট নামক ষ্টেশনে আমি আমার সহযাত্রীসহ প্লেগক্যাম্পে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন কটকে কে জি. গুপ্ত কমিশনার ছিলেন, তাঁহার টেলিগ্রাফ পাইয়া ডাক্তার আমাদিগকে মুক্তিদান করেন।

নিম্নলিখিত স্থানসকলে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল ;—

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, লাহেরিয়া সরাই, চাত্‌রা, ঝান্‌সী, শিমলা শৈল, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, হায়দরাবাদ সিন্ধ, হায়দরাবাদ নেজাম, পূর্ণিয়া, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ।

প্রকৃত ধর্ম্ম, নববিধান কি, বিশ্বাস কিরূপ বস্তু, জীবনের উন্নতি, প্রত্যাদেশ তত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন উপস্থিত, স্বর্গ-নরক-তত্ত্ব, একতাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে লিখিয়া সভায় পাঠ করা গিয়াছিল, দুই তিন স্থানে মুখে বলা গিয়াছিল। কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে, কতকগুলি Manuscript-এর আকারে আমার হস্তে রক্ষিত আছে। ক্রমে মুদ্রাঙ্কনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

চট্টগ্রামে একটী উর্দ্দু বক্তৃতায় তথাকার মাদ্রাসা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মৌলবী জোল্‌ফকার আলি এবং অন্যতর বক্তৃতায় অন্যতর প্রিন্সিপাল মৌলবী ইয়াকুব আলি সাহেব, বাঁকিপুরে একটী উর্দ্দু বক্তৃতাতে লক্ষ্ণৌনিবাসী মোজ্‌তহদোল্‌ আমর মৌলবী মোহম্মদ হোসেন সাহেব, অন্যতর বক্তৃতায় বারষ্টার শর্‌ফোদ্দীন সাহেব, এলাহাবাদের বক্তৃতায় একজন প্রসিদ্ধ মোসলমান বারিষ্টার, এবং লক্ষ্ণৌ নগরের বক্তৃতায় একজন মোসলমান উকিল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেজাম হায়দরাবাদের উর্দ্দু বক্তৃতায় তত্রত্য মহবুব কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। লাহোরের উর্দ্দু বক্তৃতায় পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কাউন্‌সেলের মেম্বর এবং তত্রত্য চীফ কোর্টের বারিষ্টার মাননীয় মোহম্মদ শাহদীন সাহেব সভাপতিরূপে বরিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে প্রদত্ত উর্দ্দু বক্তৃতাটী তত্রত্য একটী ত্রৈমাসিক উর্দ্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লাহোর, করাচি এবং হায়দরাবাদ

সিন্ধের ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দীভাষায় উপাসনাও উপদেশ এবং ভাল্টানগঞ্জ ও পূর্ণিয়া নগরে ছাত্রসভায় হিন্দীতে ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" ও "ধর্ম্মশিক্ষা" এবং "সামাজিক উপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা" অপিচ "কতকগুলি ধর্ম্মকথা" ও "ধর্ম্মোপদেশ" নামক পুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা গিয়াছে। সামাজিক উপাসনাপ্রণালী ও প্রার্থনামালা এবং কতকগুলি ধর্ম্মকথাও ধর্ম্মোপদেশ এই তিনখানা ক্ষুদ্র পুস্তক, ইহা আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত। আমি লক্ষ্ণৌ নগরে পাঠ্যাবস্থায় এই পুস্তিকাত্রয় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলাম। প্রথমোক্ত পুস্তকদ্বয় অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষা উর্দ্দুভাষায় অনুবাদ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মকা দস্তুরোল্ আমল" এবং "তালিমোল্ ইমান" নামে প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহা এবং তিনটী উর্দ্দু বক্তৃতা "মজহবে হক্কানী", "ইমান ক্যা চীজ হ্যায়" ও "নয়ী সরিয়ত ক্যা হ্যায়" লাহোর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য লালা রলারাম ভিমবার্ট আমা হইতে manuscript পাইয়া লাহোরে মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত বক্তৃতার সমস্ত মুদ্রাঙ্কনব্যয় বন্ধুবর স্বর্গগত ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ও পার্ব্বতীচরণ রায় অযাচিতভাবে প্রদান করিয়াছিলেন; অপর পুস্তক ও বক্তৃতা সকলের মুদ্রাঙ্কনব্যয় নিজ ইচ্ছায় উক্ত লালাজী যোগাইয়াছেন। বাঁকিপুরে "আস্রারে এবাদত" (উপাসনাতত্ত্ব) বিষয়ে প্রথম উর্দ্দু বক্তৃতা হয়। ১৮৯৯ সনে তাহা পাটনা নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। গত বৎসর জুন মাসে "হক্‌তালা গায়েব নহী বল্‌কে হাজের হ্যায়" (ঈশ্বর অনুপস্থিত নহেন বরং উপস্থিত) এবিষয়ে উর্দ্দু বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহা স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যে সম্প্রতি লাহোরে মুদ্রিত হইয়াছে।

আমার প্রথম দলবদ্ধভাবে প্রচারযাত্রা আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণের পর ১৮০৬ সালের বৈশাখ মাসে রঙ্গপুর অঞ্চলে হয়। দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা ১৮০৭ সালের চৈত্রমাসে পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াছিল। তদ্বিবরণ কিছু কৌতুকাবহ। তাহা বিবৃত করিয়া প্রচার বৃত্তান্তের উপসংহার করা যাইতেছে। আমরা প্রথমতঃ খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সমাপ্ত করিয়া গোবরডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করার পর স্বর্গগত ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আসের আহ্বানানুসারে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র মঙ্গলগঞ্জে গমন করি। যাত্রিকদলের মধ্যে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কেদারনাথ দে, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই কালীশঙ্কর দাস,

শ্রীমান্ আশুতোষ রায় এবং ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিক প্রভৃতি ছিলেন, এবং আমিও একজন ছিলাম। মঙ্গলগঞ্জ হইতে বনগ্রাম হইয়া যশোহর, খুলনা, বাঘেরহাট, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে প্রচার যাত্রা হইবে, এরূপ ধার্য্য হইয়াছিল। বরিশাল হইতে ঢাকা জিলার সব্ ডিভিশন মোন্‌শীগঞ্জ হইয়া ঢাকা নগর পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল। মোন্‌শীগঞ্জ হইতে পাথেয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঢাকা নববিধানসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় হইতে আমাদের তথায় যাওয়া সম্বন্ধে অনুকূল মত না পাওয়াতে পরে ঢাকা অঞ্চলে গমনে নিবৃত্ত হওয়া যায়। বরিশাল নগর পর্য্যন্তই প্রচার যাত্রার সীমা নির্দ্ধারিত হয়। আমরা মঙ্গলগঞ্জ হইতে সকালবেলা ভোজনান্তে জলপথে বনগ্রামে যাত্রা করি। তিন খানা নৌকায় মৃদঙ্গ করতালে ভিগল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রসহ যাত্রিকদলে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সায়ংকালীন ভোজনের প্রচুর লুচী তরকারী মিষ্টান্নাদি ছিল। গম্যপথে ইচ্ছামতী নদীর তীরস্থ নকফুলী গ্রামে অপরাহ্ণে পঁহুছান গেল, সেই গ্রামে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করার প্রস্তাব ছিল। যাত্রিকদল নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যসহ কীর্ত্তন করত গ্রামে প্রবেশ করেন। গ্রামের অপর পার্শ্বস্থ ঘাটে নৌকা সংলগ্ন করিয়া রাখিবার জন্য নাবিকদিগকে নির্দ্দেশ করা হয়। উক্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অনেক ভদ্র-লোকের বাস; তথায় কীর্ত্তন উপাধ্যায়ের বক্তৃতা হয়। রাত্রি ৯টা বা ১০টার সময় সকলে নৌকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সমস্ত যাত্রিকই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, নৌকায় গেলেই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় হইবে, এই আশায় সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। রজনী অন্ধকারময় ছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া গেল, চলিতে চলিতে রাস্তা আর শেষ হয় না। আমরা একটি প্রকাণ্ড ঝিলের পার্শ্ব দিয়া অনেক দূর যাইয়া সম্মুখে একটা জলপ্রণালী পাইয়াছিলাম, তাহার নাম জয়সিংহের খাল। জয়সিংহের খালের কথা গ্রামস্থ লোকেরা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। আমরা সেই খাল পার হইয়া একটী পল্লীতে উপনীত হই। পল্লী নিস্তব্ধ জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, গ্রামে কোন ময়রার দোকান পাইলে কিছু খাবার ক্রয় করিয়া খাইব। সেই গ্রামে একখানা মুদিদোকানও নাই, এরূপ বোধ হইল। যাইতে যাইতে একটী রাস্তার পার্শ্বে বাহিরের ঘরে দেখা গেল, একজন লোক বসিয়া আছে। তাহার নিকটে ইচ্ছামতীর ঘাটের অনুসন্ধান করা গেল। সে অর্দ্ধ মাইল দূরে একটা ঘাট আছে, নির্দ্দেশ করিল, এবং কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহাও বলিয়া দিল।

আমরা তদনুসারে নদীতীরে যাইয়া নৌকা অন্বেষণ করিলাম, নৌকার কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। তারস্বরে পুনঃ পুনঃ মাঝিদিগকে ডাকা গেল, নদীর অপর পার হইতে কেবল আমাদের শব্দের অনুরূপ প্রতিধ্বনিই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমরা নৌকাপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া পুনর্ব্বার সেই লোকটীর নিকটে চলিয়া গেলাম, এবং অবস্থা জানাইয়া তাহার বহির্ভবনে নিশাযাপনের জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, সে কিছুতেই অনুমতি দান করিল না। তাহার একটা নূতন ঘর ছিল, সেই ঘরে বেড়া দেওয়া হয় নাই, আমরা তথায় বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে চাহিলাম, তাহার বৃদ্ধা মা, দয়া করিয়া সেই ঘরে আমাদিগকে বসিতে দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই অনুরোধ সে গ্রাহ্য করিল না। সে বলিল, "আমাদের জমীদার বাড়ী নিকটে, তোমরা সেখানে যাও, তথায় থাকিতে পাইবে। সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাহার জমীদার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেই বাড়ীতে বড় বড় ঘর এবং জমীদার বাবুর প্রচুর শস্যসম্পত্তি দৃষ্ট হইল। গৃহস্বামী নিদ্রিত ছিলেন, ডাকাডাকির পর জাগরিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনিও আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না, তাঁহার কোন গৃহে স্থান দান করিতে সম্মত হইলেন না। ভাবে বুঝা গেল, তিনি আমাদিগকে ডাকাত ভাবিয়াছিলেন, সুযোগক্রমে লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইব, এরূপ মনে করিয়াছিলেন। পরে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু বলিল, "অমুক স্থানে নদীর ঘাটে একখানা বড় নৌকা আছে, তোমরা সেই নৌকায় যাইয়া থাক। অমুক সরু রাস্তা ধরিয়া শিমূলতলার পথে দক্ষিণ মুখে চলিয়া যাও, সেই ঘাটে পঁহুছিতে পারিবে।" আমরা বলিলাম, ভাই, তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া নৌকায় পঁহুছাইয়া দাও, তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব। বন্ধু বলিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না, আমি অন্ধকারে একাকী কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিব? বিশেষতঃ তোমাদিগকে কুয়ে (ভূতে) পাইয়াছে, আমার ভয় হয়।" আমরা তাহার কথা শুনিয়া নিরাশ হইয়া তাহার নির্দ্দেশানুসারে নৌকা খুঁজিতে গেলাম। কোথায় বড় নৌকা? সর্ব্বৈব মিথ্যা। লোকটা আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। আমরা নদীতীরে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম, নাবিকদের চেতনার জন্য মৃদঙ্গ, করতাল ও ভিগল বাজাইতেছিলাম, এবং তারস্বরে ডাকিতেছিলাম। নদীর অপর কূল হইতে কেবল আমাদেরই কথার অবিকল প্রতিধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কেহ যেন প্রতিধ্বনিরূপে আমাদিগকে বিদ্রূপ

করিতেছে, এরূপ বোধ হইল। এদিকে আমরা পথশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন, আবার শীতে অভিভূত ; কাহারও দেহে স্থূলবস্ত্র ছিল না, এক একখানা গেরুয়া বা সরু চাদরমাত্র ছিল। আমরা সকলে নদীতীরে অন্ধকারে খোলামাঠে পড়িয়া রহিলাম। ইতস্ততঃ শুষ্ক কাশবন ছিল, শ্রীমান্ আশুতোষ পকেটে হস্তার্পণ করিয়া ম্যাচ বাক্স পাইলেন। তিনি দীপশলাকাসংযোগে কুশবনে অগ্নি উদ্দীপন করিলেন। বন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন অন্ধকার দূর হইল, এবং শীতনিবারণের উপায় হইল, সকলে মহা উৎসাহে চারিদিকের বন পোড়াইতে লাগিলেন, কুশবন ভস্মীভূত হইল। রজনীর শেষভাগে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া একটি বৃহৎ মাটীর ঢেলাকে উপাধানস্বরূপ করিয়া মাঠে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অন্য কোন কোন বন্ধুও আমার অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি রাত্রির অবসান হইয়াছে, জানিলাম সেই স্থান হইতে বনগ্রাম সবডিভিশন ৬ মাইল দূরে। আমরা কয়েকজন তৎক্ষণাৎ পদব্রজে তথায় যাত্রা করিলাম। ভাই উমানাথ গুপ্ত নৌকার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, নৌকা পাইলেন। নাবিকগণ এক স্থানে নৌকা সংলগ্ন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। তাহারা লুচী মিষ্টান্নাদি সমুদায় নিঃশেষ করিয়াছিল, না আমাদের জন্য কিছু রাখিয়াছিল তাহা মনে নাই। ভাই উমানাথ গুপ্ত ও অন্য কোন কোন বন্ধু নৌকারোহণে বনগ্রামে চলিয়া গেলেন, আমরা কয়েকজন পদব্রজে তথায় গেলাম। সেই রাত্রির কষ্টে কাহারও কাহারও অসুখ হইয়াছিল। উপাধ্যায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

বনগ্রাম হইতে যশোহর নগরে আমাদের প্রচারযাত্রা হয়। তখন সেখানে কোন আত্মীয় পরিচিত ব্রাহ্ম ছিলেন না। জাতি যাইবার ভয়ে তথাকার কোন ভদ্রলোক আমাদিগকে বাসায় স্থান দান করেন নাই, এমন কি হুকো বন্ধ হইবে ভাবিয়া বাসায় ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিতে দেন নাই। আমরা ষ্টেশনের নিকটে একটি ক্ষুদ্র মুদিদোকান আশ্রয় করিয়া দুই তিন দিন ছিলাম। মাঠে ও পথে সঙ্গীত বক্তৃতাদি হইয়াছিল। স্কুল গৃহে বক্তৃতা করার চেষ্টা করা গিয়াছিল, অনুমতি পাওয়া যায় নাই। মুদি দোকানে একখানা ক্ষুদ্র চালা গৃহে আমাদের অবস্থান হইয়াছিল, রীতিমত উহার বেড়া ছিল না। বাঁশের মাচার উপর চটের শয্যাতে শয়ন হইত, কেহ কেহ কেরাসিনবাক্সকে তক্তপোষরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজেরা বাজারে যাইয়া খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতাম, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ভোলা দীঘি হইতে কলস পূর্ণ

করিয়া জল আনয়ন করিতেন, কেহ মসলা পিষিতেন, কেহ রাঁধিতেন। বেলা একটা দুইটার সময় আমাদের ভোজন হইত। একদিন অপরাহ্নে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়। রাত্রিতেও মেঘের ঘটা ছিল। সেই রাত্রিতে চিড়ে বাতাসা-ভক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভাই উমানাথ গুপ্ত বাজারে চিড়ে বাতাসা খরিদ করিবার জন্য গমন করেন, পথ পিচ্ছল ছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় অন্ধকারে রাস্তায় পড়িয়া রক্তারক্তি হন। তিনি চিড়ে বাতাসা কোচড় হইতে ছাড়েন নাই। সবসহ শোণিতাক্তচরণে উপস্থিত হন, এবং উৎসাহ সহকারে সকল বন্ধুকে চিড়ে বাতাসা খাওয়াইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। যশোহরে তাঁহার পাগলামীর দুই একটী কথা এস্থানে উল্লিখিত হইতেছে। বিকালে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিবার জন্য মাঠে যাওয়া স্থির হইয়াছিল। তথায় যাত্রার সময় তিনি বলেন, "প্রত্যেককে লাঠি হাতে করিয়া যাইতে হইবে।" আমাদের তাহাতে অমত হয়। কিন্তু তিনি লাঠি লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত জিদ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "তোমরা সকলে লাঠি হাতে করিয়া না গেলে আমি বক্তৃতা স্থানে যাইব না, তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। আমরা অগত্যা তাঁহার সঙ্গে সম্মিলনরক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার আব্দারক্রমে দণ্ডধারী হইয়া চলিলাম। তিনি দণ্ডধারী যাত্রিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে আমরা তথাকার থিয়েটার ঘরে বক্তৃতা করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম। একদিন যশোহরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিয়া ভাই উমানাথ গুপ্তের রাজভক্তির আবেগ হইয়াছিল। তিনি সমবেতভাবে তাঁহার কুঠীতে যাইয়া তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য সকলকে বাধ্য করিতে লাগিলেন। অনেকে গেলেন, আমি যাই নাই। যশোহর হইতে নিশান্তভাগে খুলনা নগরে যাত্রা করা যায়। সে দিন সন্ধ্যার পর কালেক্টরীর সেরেস্তাদার আমাদিগকে তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মোপাসনাদি করিতে দেন, এবং মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিদায় দান করেন।

খুলনাতে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আমাদের স্বর্গগত ব্রাহ্মভ্রাতা শ্যামাচরণ ধর মজুমদার ছিলেন। সেখানে আমাদের অবস্থিতি ও কাজকর্ম্মের কোন অসুবিধা হয় নাই। আমাদের বাসগৃহে উপাসনা ও আলোচনাদি হয়। স্কুলঘরে বক্তৃতা এবং ভৈরব নদীর অপর পারে একটি গ্রামে একজন ভদ্রলোকের আবাসে তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে উপাসনা বক্তৃতাদি হইয়াছিল। খুলনা হইতে জাহাজে সব-ডিভিশন বাঘেরহাটে যাওয়া হয়। তখন ব্রাহ্মবন্ধু স্বর্গগত জাগদীশ্বর গুপ্ত

মহাশয় তথায় মোন্‌সেফ ছিলেন। তিনি সবান্ধবে আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে মাঠে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন এবং জগদীশবাবুর আবাসে উপাসনাদি হইয়াছিল। তথায় সব্‌ডিভিশনল আফিসার একজন বাঙালী বাবু ছিলেন, ভাই উমানাথ গুপ্ত সম্মিলিতভাবে তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া একাকী তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন। হাকিমবাবু তাঁহাকে বড খাতির করেন নাই।

তথা হইতে ষ্টীমারে বরিশালে যাওয়া হয়। তখন আমার দেশস্থ আত্মীয় শ্রীমান্ কামিনীকান্ত গুপ্ত তথাকার জজ আদালতের নাজির ছিলেন। তিনি জাহাজ হইতে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া নিজের আবাসে লইয়া যান। সেখানে বক্তৃতা এবং অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুর আবাসে উপাসনাদি হইয়াছিল। সেই সময়ে যশোহর-খেজুরিয়ানিবাসী বাবু বেণীমাধব মিত্র বরিশালে সব জজ ছিলেন। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে আমরা তাঁহার গৃহে উপাসনা ও ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি উপাসনায় যোগদান করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন। বেণীবাবু বড় পিতৃভক্ত সরল ও কোমল হৃদয়, উপাসনার পর ভাবে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "আমার বাবা বড ভক্তিমান ছিলেন, এরূপ মধুর উপাসনা সম্ভোগ করিতে পারিলে তিনি কত না আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার আতিথ্য-সৎকারে অতিশয় ভক্তিনিষ্ঠা ছিল। তিনি অতিথি সেবাতে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। একদিন আমি সে কার্য্যে অর্থব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, এই কথায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন।" এই কথার পরই বেণীবাবু 'আমি বাবার মনে ক্লেশ দিয়াছি' বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত সরল লোক আর কখনও দেখি নাই। বরিশালে ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয় জ্বরে আক্রান্ত হন। বেণীবাবু তাঁহাকে নিজগৃহে স্থান দান করিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন, নিজের একটী পুত্রকে তাঁহার সেবার জন্য অবিশ্রান্ত নিযুক্ত রাখেন। ইতিপূর্ব্বে আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম, বাড়ীতে বড দাদার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার বহুমূত্র রোগ ছিল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বরিশাল হইতে নৌকাযোগে পাঁচদোনায় যাত্রা করি। আমি আর তাঁহার দর্শন পাই নাই, আমার বাড়ীতে পহুছিবার অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি পরলোকে যাত্রা করিয়াছিলেন। বন্দনীয়া বৃদ্ধা জননী এবং পরিবারস্থ সকল লোক শোকাভিভূত ছিলেন। আমি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কয়েক দিন গৃহে বাস করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাই। পরে ভাই উমানাথ গুপ্ত আরোগ্য লাভ

করিয়া যাত্রিকদলসহ বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

যে যে স্থানে প্রচার করা হইয়াছিল, এবং যাওয়া হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ মাত্র করা গেল। বাহুল্যভয়ে সকল স্থানের প্রচারের বিবরণ লিখা গেল না। সম্প্রতি পূর্ব্বোপদ্বীপ বর্ম্মাতে যাওয়ার প্রস্তাব আছে। এ স্থলে একটী কথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রচারকরূপে গণ্য হওয়ার পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের প্রধান নগর গৌহাটীতে যাওয়া হইয়াছিল, সেখানে একটী বক্তৃতা হয়। আসামের রাজ্যচ্যুত স্বাধীন রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ উক্ত বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং গৌহাটী হইতে খসিয়া হিলে যাওয়ার সময় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পাথেয় দিয়াছিলেন।

জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামে কার্য্য

আজ প্রায় পনের বৎসর হইল পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে উপাসনা-কুটীর প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে। উক্ত কুটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং তাঁহার সহকারী কোন কোন প্রচারক বন্ধু আগমন করিয়াছিলেন। তদবধি আমি বাড়ীতে গেলে সেই কুটীরেই নিত্য উপাসনা করিয়া থাকি। একবার নিজালয়ে উৎসব করা গিয়াছিল। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় সদলে আসিয়াছিলেন, স্বর্গগত ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ও তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পল্লীর পথে ও বাজারে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আমার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের বহির্ভবনে ভক্তিবিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। সেবার পাঁচদোনা গ্রামে ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ের বিশেষ খ্যাতি হয়। তাঁহার মধ্যম পুত্র বালক শ্রীমান্ পরেশরঞ্জন তাঁহার সঙ্গে পাঁচ-দোনায় আমাদের বাটীতে গিয়াছিলেন। পরেশের জ্বর হইয়াছিল, ডাক্তার বাবু জ্বর ত্যাগ না হইতেই তাঁহাকে মাছ ভাত খাওয়াইয়াছিলেন। উক্তরূপ পথ্যের পর শ্রীমান্ সুস্থ হন। ইহা দেখিয়া ডাক্তার বাবুর প্রশংসা হইতে লাগিল, "চমৎকার ডাক্তার, মাছ ভাত খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ায়। এজন্যই সরকার বাহাদুর তিন শত টাকা তাঁহাকে মাহিনা দিয়া থাকেন।" সর্দ্দি জ্বর ছিল, তাহাতেই অন্নপথ্য করাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে স্থিতিকালে একবার আমি ছুটী উপলক্ষে নিজালয়ে যাইয়া কতিপয় আত্মীয় যুবাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া "প্রকৃত ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। পরে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম লিখিয়া

পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা গিয়াছিল। উহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা ছিল। কোন্ সনে কোন্ মাসের কোন্ দিবসে সেই বক্তৃতা হইয়াছিল, স্মরণ নাই।

আমি সম্বৎসরের মধ্যে মাতৃদর্শনোপলক্ষে দুই তিন বার বাড়ীতে যাইয়া কিয়দ্দিন স্থিতি করিতাম। তখন পূর্ব্বাহ্নে কুটীরে নির্জ্জন উপাসনা, সায়াহ্নে সেখানে ধ্যান চিন্তা এবং অনেকদিন অপরাহ্নে গৃহে আত্মীয়া মহিলাগণ উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা হইত।

আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া নারীবিদ্যালয় হইতে একদা এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে, সেই বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিদেশস্থ মহিলাগণও পরীক্ষা দান করিতে পারিবেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার লাভ করিবেন। আমার উদ্যোগে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের সাহায্যে পাঁচদোনা পল্লীস্থ বধূমাতা শ্রীমতী হেমলতা এবং শ্রীমতী সুশীলা হস্তাক্ষর ও বাঙ্গলা রচনা প্রভৃতির পরীক্ষা দান করেন, হেমলতা উত্তম হস্তাক্ষরের জন্য প্রথম পুরস্কার ১৫৲ এবং উত্তম রচনার জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫৲ এবং সুশীলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুস্তকাদি পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৫০৲ পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিশোরগঞ্জ হইতে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনের পত্নী স্বর্গগতা কিশোরী মোহিনী পরীক্ষা দান করিয়াছিলেন, তিনি রচনার পরীক্ষায় হেমলতার তুল্য নম্বর পাইয়া ২৫৲ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী কাগজে কাটা ছবির জন্য আচার্য্য হইতে ১০৲ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারী ও তাঁহার ছাত্রী গঙ্গা কাগজে কাটা ছবির জন্য ইয়ুরোপ আমেরিকাতে পর্য্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি এবং নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর ছবি অপিচ বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আকৃতি কাঁচি দ্বারা এরূপ আশ্চর্য নৈপুণ্য সহকারে কাগজে কাটিয়া প্রস্তুত করেন যে, যিনি দেখেন তিনিই বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি ছবি কুচবিহারের মহারাজ, ত্রিপুরার মহারাজ এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজ ও কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি বড়লোকদিগের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পাইয়া তাঁহাদেব কেহ ৫০৲ কেহ ৪০৲ কেহ ২০৲ অক্ষয়কুমারী ও গঙ্গার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পুরস্কার দিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ৪০৲ পুরস্কার আসিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যোগে ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইলিয়ট-

সাহেবের পত্নী লেডী ইলিয়েটের নিকটে কতকগুলি কাগজ কাটা ছবি প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাহা পাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া রচয়িত্রীদ্বয়কে উৎসাহ দান করিয়াছেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক অক্ষয়কুমারীকৃত যীশুখ্রীষ্টের একখানা ছবি উপহার পাইয়া ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রকরের চিত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বৃহৎ সমালোচনা করিয়াছেন। লর্ড বিশপ কয়েকখান যীশুখ্রীষ্টের ছবি পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু যোগে উহা তাঁহার নিকটে পাঠান গিয়াছিল। কলিকাতা আর্ট স্কুলের ইটালীনিবাসী প্রিন্সিপাল অক্ষয়কুমারীকৃত কাগজেকাটা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "ইটালীতে কাগজেকাটা ছবি হয়, কিন্তু এরূপ সুন্দর ও পরিষ্কৃত হয় না," অক্ষয়কুমারীকৃত আমার মাতৃদেবীর অতি সুন্দর পরিষ্কৃত ছবি আমার নিকটে রক্ষিত। উহা ব্রোমাইট আলেখ্যকে আদর্শ করিয়া কাটা হইয়াছে। ছবিসকলের হাসিয়াতে কারুকার্য্য কত সুন্দর ও কত চিত্তাকর্ষক।

১৩০৪ সালের ৩০শে বৈশাখ পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে মাতৃদেবী ৯৪ বৎসর বয়সে স্বর্গগতা হইয়াছিলেন। আমি ১৫ দিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনপূর্ব্বক বাড়ীতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং শ্রীমান্ আশুতোষ রায়, ঢাকা হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, মহিমচন্দ্র সেন, ভগিনীপতি গুপ্ত মহাশয় শ্রাদ্ধক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবস পাঁচদোনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পবিত্র গম্ভীর ভাবে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রাদ্ধেয় মন্ত্রাদি শ্রবণ ও দানাদির ব্যবস্থা দর্শন করিয়া পল্লীবাসীদিগের মনে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়াছে। উক্ত ক্রিয়ার দিন সায়ংকালে উপাধ্যায় "পরলোক" বিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। পর বৎসর সোওয়ারিস কোম্পানি কর্ত্তৃক শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত সমাধিবেদিকা বহির্ভবনে মাতৃদেবীর দেহভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাধিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ময়মনসিংহ হইতে ভাই দীননাথ কর্ম্মকার এবং চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, কলিকাতা হইতে কনিষ্ঠা ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সুবালা দেবী, ঢাকা নগর হইতে তৃতীয়া ভাগিনেয়ী শ্রীমতী চপলা দেবী পাঁচদোনায় গিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধক্রিয়ার দিন "মাতৃবিয়োগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক ক্রিয়াক্ষেত্রে পঠিত হইয়াছিল। সেই পুস্তিকায় মাতৃচরিত ইত্যাদি কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। পুস্তিকার চরমাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—"কুচবিহারে ব্রহ্মোৎসবে ব্যাপৃত আছি, ৯ই বৈশাখ পৌর্ব্বাহ্নিক

উপাসনার পর ভোজন করিতে যাইব, এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়ের এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ পৌছিল, 'মাতামহী কার্ব্বাঙ্কোল ও জ্বররোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত'। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া অস্থির হইলাম। জ্বর হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিনমাত্র পথ্য করিয়াছি। খিচড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল, দুই গ্রাসের অধিক বোধ হয় মুখে অর্পণ করিতে পারি নাই। বন্ধুরা যাত্রার আয়োজন করিয়া পাথেয়াদি প্রদান করিলেন। তোর্ষা ষ্টেশনে নারায়ণগঞ্জের জন্য টিকিট ক্রয় করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজালয়াভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভয়ঙ্কর রোগে মার বার্দ্ধক্যজীর্ণ শরীর আক্রান্ত, তিনি এত দিন বাঁচিয়া নাই। তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না, পথে পথে কেবল ইহাই ভাবিতেছিলাম; তখন মনে চিন্তা ক্লেশ যে কত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। ১২ই বৈশাখ প্রাতে ঘায়ে ড্রেস করিবার সময় বাড়ীতে পৌছিলাম। ঘা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। এরূপ জরাজীর্ণ বৃদ্ধার এ প্রকার কার্ব্বাঙ্কোল হইতে পারে মনেও কল্পনা করিতে পারি নাই। তখন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুই বার করিয়া ড্রেস হইতেছিল। ড্রেস ইত্যাদির সময় মা আশ্চর্য্য ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করিয়াছেন, কখন কখন এইমাত্র বলিয়াছেন, 'টিপো না, আমাকে দুঃখ দিও না।' ইতিপূর্ব্বে সচেতন অবস্থায় দুইবার অস্ত্র হইয়াছে, তাহার পরও আর এক বার অস্ত্র হয়। পাঁচদোনানিবাসী ডাক্তার শ্রীমান্ শশিভূষণ অতি যত্ন ও নিপুণতার সহিত চিকিৎসা করিতেছিলেন। তখন পর্য্যন্ত অন্য কোন উপসর্গ হয় নাই, কোন মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, ঘায়ের অবস্থা দিন দিন ভাল দেখা যাইতেছিল। আমি উপস্থিত হইলে পর মা বলিলেন, 'তুমি আসিয়াছ, আচ্ছা ভাল; তুমি আমার ধর্ম্মপুত্র।' পরে বলিলেন, 'তুমি কোন্ খানে থাকবে?' আমি বলিলাম, 'আমাদের ঘরে স্থান নাই, দীনবন্ধুদিগের ঘরে থাকিতে মনস্থ করিয়াছি'। মা বলিলেন, 'না, সেখানে নয়, তুমি আমার কাছে থাক, পুরাতন দালানের পূর্ব্বদিকের কুঠরীতে শয়নের স্থান করিও।' সেই সময়ে মার অন্যতর পৌত্র শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র ঢাকায় ছিলেন, ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধীয় যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, শ্রীমান্ তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হউক বা ডাকযোগে হউক প্রেরণ করিতেন। এক দিন মা কমলালেবু খাইতে ইচ্ছা করিয়া 'আমাকে একটী কমলা খাইতে দাও, আমি একটী মাত্র কমলা চাই' এরূপ বলেন। তৎপর ঢাকায় ও কলিকাতায় কমলালেবুর জন্য পত্র লেখা গেল। ঢাকা হইতে বিপিনচন্দ্র ২।৩ বারে অনেকগুলি কমলালেবু,

কলিকাতা হইতে শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ ৫০টী, ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী ১০০টী পাঠাইলেন, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০০ কমলালেবু আসিয়া পঁহুছিল। আমি বলিলাম, মা শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ ও বিমলা আপনার জন্য কমলা পাঠাইয়াছেন। সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আমি খাব।' কয়েক দিনে ৫।৬টী কমলালেবু খাইয়াছিলেন। পটল তরকারি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল ; ভাল কচি পটল হইলে কিছু পথ্য করিতে পারিবেন ভাবিয়া উৎকৃষ্ট পটলের জন্য মুন্সিগঞ্জে ও কলিকাতায় পত্র লেখা গেল। মুন্সিগঞ্জ হইতে শ্রীমান্ জগচ্চন্দ্র উত্তম পটল ও অমৃতসাগর কলা, কলিকাতা হইতে কনিষ্ঠা ভাগিনেয়ী সুবালা দেবী পাঁচ সের উৎকৃষ্ট কচি পটল পাঠাইয়া দিলেন। তখন মার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উদরাময় জন্মিয়াছে, কার্ব্বোঙ্কোলের বিষ মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইয়াছে। তিনি মস্তকে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার পথ্য করিবার শক্তি ছিল না, জগচ্চন্দ্রের প্রেরিত একটী পটল মুখে অর্পণ করিয়া কোনরূপে চিবাইয়াছিলেন। মুন্সিগঞ্জ হইতে জগচ্চন্দ্র উত্তম পটল পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। 'মুন্সিগঞ্জ হইতে পাঠাইয়াছে ?' দুই তিনবার এই কথা বলিয়াছিলেন। সুবালার প্রেরিত পটল যখন পঁহুছিল, তখন মার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল। কাগজি লেবুর রসসংযোগে পথ্য রুচিকর হইবে ভাবিয়া ফরিদপুর হইতে মধ্যম ভাগিনেয় শ্রীমান্ প্যারীমোহন একশত কাগজি লেবু পাঠাইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'মা, আপনার জন্য প্যারী একশত কাগজি লেবু পাঠাইয়াছেন।' তাহা শুনিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'প্যারী লেবু পাঠাইয়াছে ? ষাট্ ষাট্ ষাট্।' সেই লেবুও তাঁহার ব্যবহারে আইসে নাই।

"ঢাকা হইতে মধ্যম ভাগিনেয়ী শ্রীমতী চপলাসুন্দরী মার বসিবার জন্য সুকোমল গদিযুক্ত একটী উত্তম চেয়ার পাঠাইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, আপনি আরামে বসিতে পারিবেন এজন্য সুন্দর চেয়ারটী ঢাকা হইতে চপলা পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া 'চপলা, চপলা' কয়েকবার বলিলেন, এবং চেয়ার-খানায় হাত বুলাইলেন। তিন চারিদিন কোনরূপে তাঁহাকে সেই চেয়ারে ধরিয়া বসান গিয়াছিল। তৎপর বসিবার শক্তি সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। স্বর্গ-গমনের চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু দুই তিন দিন পূর্ব্বেও শয়নাবস্থায় নিয়মিতরূপে আহ্নিক করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্নিকনিষ্ঠা অতিশয় আশ্চর্য্য ছিল। ভয়ানক রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি

আহ্নিক না করিয়া জলবিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। শরীর সম্পূর্ণ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল এবং বাক্যরোধ হইয়া গিয়াছে, সেই অবস্থায়ও তিনি আহ্নিক করিয়াছেন। যখন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে ছিলেন, তখন দিবসের অনেক সময়ই পূজা আহ্নিক ও নামজপে ব্যয় করিতেন। পা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে ইতস্তত: হাঁটিয়া বেড়াইতেন, পূজার জন্য নিজে দূর্ব্বাদি তুলিয়া বাছিয়া লইতেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক তীক্ষ্ণ ছিল। ইদানীং তাঁহার দুই চারিটী মাত্র দন্তের স্খলন হইয়াছিল। অবশেষে এবার হঠাৎ যখন রোগের বৃদ্ধি হইল. তিনি জীবনে নিরাশ হইলেন, তখন পুনঃপুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে আমি নিকটে বসিয়া স্তোত্র পাঠ ও শ্লোক পাঠাদি করিয়াছি, ভগবানের নাম শুনাইয়াছি। দিদীও তাঁহার কর্ণে ঈশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াছেন। একদিন মা 'হরি নাম করে আমি যমকে দিলাম ফাঁকি' এইরূপ একটি গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে মা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন। তাহাকে স্বামীর আলয় হইতে আনয়ন করা হয়, তাহাকে দেখিয়া মা অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

"ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠচন্দ্র ঢাকা হইতে বাড়ীতে পঁহুছিয়া মার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঠান্ দিদি, আমাকে চিনিতে পারেন কি?' তিনি মুখের দিকে ঈষদ্ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'পূর্ণ'। ইহা ভুল হইয়াছিল। পরে বৈকুণ্ঠ বলিয়া চিনিয়া তাহার মস্তকে স্নেহের সহিত পুনঃপুনঃ হাত বুলাইয়া, 'তুমি আসিয়াছ, ষাট্ ষাট্, আমার মাথায় যত চুল তত তোমার পরমায়ু হউক।' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

"শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সাত মাইল অন্তর কালীগঞ্জে অবস্থিতি করিয়াও বিষয়-কর্ম্মে আবদ্ধ থাকা বশতঃ যথাসময়ে আসিতে পারেন নাই। মা তাহাকে স্মরণ করিয়া 'ডাকাত এল না, আমার জ্ঞান থাকৃতে এল না' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ইন্দুভূষণ মার আসন্ন কালে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মাতৃ দেবীর কথা কহিবার শক্তি ছিল না। ইন্দু ডাকিলে পর মা চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন, এবং তাহার দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন। আসন্নকালেও কেহ ডাকিলেই তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়াছেন, এবং হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, কথা কহিতে পারেন নাই। নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে পর আমি ডাকিলে 'বাবা' বলিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন। দিদী বা বধূ ঠাকুরানী ডাকিলে, 'মা' মাত্র বলিয়াছেন। পরলোকে যাত্রার তিন দিন পূর্ব্বে

তিনি বধূঠাকুরাণীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া 'তুমি আমার মা, তুমি আমার মা,' দুইবার এইরূপ বলিয়াছিলেন। তাহার পর আর কথা কহেন নাই। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্তও কেহ ডাকিলে চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এক দিন রাত্রিতে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রকাশ করেন, শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময় দিদী ডাকিয়া আমাকে বলিলেন, 'দেখ আসিয়া মা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।' যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, শরীরের কিরূপ অবস্থা ?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, কয়ে উঠিতে পারিতেছিনা।' যখন যে প্রকার যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করা গিয়াছে। যখন কথা বন্ধ হইল, আভ্যন্তরিক যন্ত্রণা তিনি কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তখন একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়া গিয়াছিল। নিতান্ত দুরদৃষ্ট ছিল যে, জননীর এই বিষম ক্লেশযন্ত্রণা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার। প্রথমতঃ স্ফোটকের তীব্র বেদনা হইয়াছিল, তখন তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। তিনি শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া এবং একজন আত্মীয়ের নাম ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়াছেন। যে শরীরে একটা সূচ ফুটান দুঃসাধ্য ছিল, তাহাতে ভয়ানক ক্ষত ও তিন বার অস্ত্রাঘাত কি নিদারুণ ব্যাপার! বিধাতা মার সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্যই বুঝি ইহা ঘটাইয়াছিলেন। আমার দিদী ও বধূঠাকুরাণী এবং বধূমাতৃগণ প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। বিশেষতঃ মাতৃদেবীর শুশ্রূষায় কোন কোন বধূমাতার বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখিয়া এই দুঃখের সময়েও আমার মনে অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রমেশ জননীর অতিশয় প্রিয়পাত্র। শ্রীমান্ প্রাণপণ যত্নে দিবারাত্রি পিতামহীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহার প্রতি মার অতিশয় স্নেহ ছিল। পথ্যাদি করাইতে বধূমাতারা অক্ষম হইলে রমেশ আসিয়া যাই বলিয়াছে, 'ঠান্ দিদী, ইহা খাইতে হইবে' তখন আর তিনি আপত্তি করেন নাই। শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ মাতামহীর সেবার জন্য মাসিক ৫৲ টাকা দান সঙ্কল্প করিয়া প্রথম মাসের দান পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তিনি চক্ষে দর্শন ও হস্তে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। উহা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অর্পণ করা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই তিন দিন জ্বর হইয়াছিল। ৩০শে বৈশাখ প্রত্যুষে ঘন শ্বাস হয়, দেহ শীতল হইতে থাকে, বৈদ্য মহিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে থাকেন। এক মাস রোগযন্ত্রণা

ভোগের পর সেই দিন ১২টা পাঁচ মিনিটের সময় মা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে যাত্রা করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ নূতন শুভ্র বস্ত্র ও পুষ্পমালাদিতে অলঙ্কৃত ও সুগন্ধি দ্রব্যে সুগন্ধীকৃত করা হয়। আমি একটী প্রার্থনা করিলে পর হিন্দু জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তক্তপোষে শব বহন করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তটে লইয়া যান। সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের দল সঙ্কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছিল। শ্মশানঘাটে দেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়। বালক বৃদ্ধ যুবা প্রায় একশত লোক উৎসাহের সহিত সর্ব্বজনবন্দনীয়া বৃদ্ধা জননীর সম্মানজন্য শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাহা নশ্বর তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভস্মীভূত হইল। মার বড় সাধ ছিল, ব্রহ্মপুত্র নদে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি পবিত্র দেহভস্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া শোকদগ্ধহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। শ্মশানবন্ধুগণ সকলেই স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন।

"আমি এমন মাকে যথোচিত ভক্তি করি নাই, বলিতে কি মাতৃসেবা কিছুই করি নাই। আমার মা বড় ভাল মা ছিলেন। তিনি ছিলেন কি, এক্ষণও আছেন, সম্পূর্ণ আছেন। তিনি রোগাক্রান্ত জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে অশরীরী পুত্রকন্যাও পৌত্রাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া আজ না জানি কি আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। সেখানে তাঁহার আনন্দের বাজার। আমি হতভাগ্য পাপী সেই দেবীর শান্ত গম্ভীর পবিত্র মূর্ত্তিদর্শনে তাঁহার স্নেহপূর্ণ সুমধুর বাক্যশ্রবণে বঞ্চিত হইলাম। মা আমাদের পরিবারের ভূষণ ও গৃহের শোভা ছিলেন। মা আমার মস্তকের মণি, কণ্ঠের হার, তাঁহার চরণ হস্তের অলঙ্কার, মার আশীর্ব্বাদ আমার জীবনের সম্বল ছিল। লোকে বলে এমন বৃদ্ধা পরলোকে গিয়াছেন ভালই হইয়াছে, উহা শুনিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। আরও দশ বৎসর মা আমার নিকটে থাকিলে আমি অতি সুখী হইতাম। আমি দিব্য চক্ষে যেন পরম জননীর ক্রোড়ে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি হৃদয়ে দর্শন করিতে পারি, পরমেশ্বর এরূপ সুভাশীর্ব্বাদ করুন।"

বিগত ৭ই ভাদ্র পাঁচদোনা গ্রামে নিজভবনে মাতৃস্থানীয়া বন্দনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী বরদেশ্বরী গুপ্ত ন্যূনাধিক ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ১১ই ভাদ্র রোগশয্যায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বাড়ীতে যাত্রা করিব, এরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলাম, ১০ই তারিখে তাঁহার এই ধরাধাম পরিত্যাগসংবাদ পাইয়া শোকাতুর হই। তিনি বালবিধবা ছিলেন, দীর্ঘ জীবন

পবিত্রভাবে পরসেবাতে যাপন করিয়াছেন, আমাদের প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ যত্ন ছিল। আমি সপ্তাহান্তে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া কলিকাতায় প্রচারাশ্রমে সম্পাদন করি, পরে বাড়ীতে চলিয়া যাই। তিনি সেবা প্রিয়া ছিলেন, দুঃখী দুঃখিনীদের প্রতি তাঁহার বড় দয়া ছিল। আমি তৎস্মরণার্থ নিজালয়ে কতকগুলি দুঃখিনী বিধবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজন করাই, এবং এক একখানা বস্ত্র প্রদান করি। বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে লুচি মিষ্টান্নাদি ভোজন করান হয়, এবং পুস্তকাদি উপহার দেওয়া যায়। বরদেশ্বরী দেবীর একখানা জীবনী তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার দিবস পঠিত হইয়াছিল। পরে তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা গিয়াছে।

আরব্য ভাষার চর্চ্চা এবং কোরাণের অনুবাদ

মোসলমান জাতির মূলধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ পাঠ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আমি ১৮৭৬ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ভাষার চর্চ্চা করিতে গিয়াছিলাম। তখন আমার ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্ম সমাজ এবিষয়ে আমার যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেবের বেতন এবং আমার অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা সমাজ হইতে হইয়াছিল। আমি প্রায় এক বৎসর কাল তত্রত্য বন্ধুবর শিবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবাসে স্থিতি করিয়া সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মৌলবী এহসান আলি সাহেবের নিকট আরব্য ব্যাকরণ এবং পারস্য দেওয়ান হাফেজের চর্চ্চা করিয়াছিলাম। মৌলবী সাহেব প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া আমাকে পড়াইয়া যাইতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর ছিল, তিনি স্থূলোন্নত সবলাকায় পুরুষ ছিলেন, প্রতিদিন তিন চারি ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। শুনিয়াছি, মৌলবী সাহেব এক বেলায় এক সের আটার রুটি, অর্দ্ধ সের মাংস ভোজন করিতেন। তাঁহার পায়ের উপযোগী বৃহৎ বিনামা বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না, তিনি ফরমায়েশ করিয়া মুচি দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। মৌলবী সাহেব আমার লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের কয়েক বৎসর পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, আমাকে বড় ভালবাসিতেন। দেওয়ান হাফেজের বিশেষ বিশেষ গজল পড়াইবার সময় ভাবে বিহ্বল হইতেন। আমি লক্ষ্ণৌ নগরে প্রত্যহ পড়িতাম, এবং সপ্তাহান্তে সামাজিক উপাসনার কার্য্য

করিতাম। সেই বৎসর বঙ্গোপসাগরের ভীষণ জলপ্লাবনে নয়াখালী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম জিলার দুই লক্ষেরও অধিক লোক মারা যায়। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস ভাগিনেয় শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বরিশালের সবডিভিশন পটুয়াখালির সবডিভিশনাল আফিসর ছিলেন, তথায় সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। আমি লক্ষ্ণৌ নগরে সুলভসমাচার পত্রিকায় সেই ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের সংবাদ পাঠ করিয়া শ্রীমানের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ি, পরে তাঁহার কুশল সংবাদ পাইয়া সুস্থির হই। তত্রত্য দুঃখী বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যার্থে অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে ১৫০৲ টাকা সংগৃহীত হয়. তাহা শ্রীমানের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যায়। কোন্ সময়ে সেই বিপদ্ ঘটিয়াছিল, আমার স্পষ্ট স্মরণ না থাকাতে সম্প্রতি আমি পত্র দ্বারা শ্রীমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন; "বরিশাল এবং নওয়াখালীর cyclone and storm wave ১৮৭৬ সনের ৩১শে অক্টোবর পূর্ণিমার রাত্রিতে হয়। তাহাতে সন্দীপ, হাতিয়া, দক্ষিণ সাবাজপুর প্রভৃতি নিকটস্থ সমুদয় দ্বীপ এবং তটস্থ অনেক স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। গরু প্রভৃতি যে কত জীব নষ্ট হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। বন্যার অল্প পরে পটুয়াখালীতে মোটামুটি census নেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গেল শতকরা ৭৫ জন বালক-বালিকা, ৫০ জন স্ত্রীলোক এবং ২৫ জন পুরুষ নষ্ট হইয়াছিল। (আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাই লিখিলাম। কোন রিপোর্ট আমার এখানে নাই।)"

আমি লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ব্যাকরণের সামান্য চর্চ্চা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া অল্পদিন একজন মৌলবী সাহেবের নিকটে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম; পরে ঢাকা নগরে যাইয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করি, তখন সেখানে প্রতিদিন নলগোলা পল্লীতে মৌলবী আলিমোদ্দিন সাহেবের আবাসে যাইয়া তাঁহার নিকটে আরব্য ইতিহাস ও সাহিত্যের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তৎপর কোরাণ পড়িতে আমার ইচ্ছা হয়। কোন মোসলমান কোরাণবিক্রেতা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার নিকটে কোরাণ বিক্রয় করিবেনা ভাবিয়া ঢাকানগরস্থ সমবিশ্বাসী বন্ধু মিয়াঁ জালালোদ্দিনের যোগে একখান কোরাণ ক্রয় করা যায়। আমি তফ্‌সির ও অনুবাদের সাহায্যে পড়িতে আরম্ভ করি। যখন আমি তফ্‌সিরাদির সাহায্যে আয়ত সকলের প্রকৃত অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম, তখন তাহা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮১ সালের শেষ-

ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরাণ শরিফ কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। শেরপুরস্থ চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, পরে কলিকাতায় আসিয়া খণ্ডশঃ আকারে প্রতি মাসে বিধানযন্ত্রে মুদ্রিত করা যায়। প্রায় দুই বৎসরে কোরাণ সম্পূর্ণ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। পরিশেষে সমুদায় এক খণ্ডে বাঁধিয়া লওয়া যায়। প্রথম বারে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে পরে ১৮৯৮ সালে কলিকাতা দেবযন্ত্রে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় বারের সহস্র পুস্তকও নিঃশেষিত প্রায়। এক্ষণ সংশোধিত আকারে তাহার তৃতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।

আমার শাস্ত্র ও ভাষা সকলে পল্লবগ্রাহিণী বিদ্যা, কোন শাস্ত্রে ও কোন ভাষায় গভীর জ্ঞান হয় নাই। "মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এস্‌লাম ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে আত্মমন্তব্যে ইহার আভাস প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই আত্মমন্তব্যের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"যে ভারবহন যোগ্য সবল অশ্বপৃষ্ঠ, ঈশ্বর সেই ভার দুর্ব্বল গর্দ্দভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন ; এ বিষয়ে তাঁহার যে কি লীলা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি অবিদ্বান্ ও নানাপ্রকারে অযোগ্য। তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত বিধানাচার্য্যের স্বভদৃষ্টি এই অক্ষম অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। এস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ নিগূঢ় তত্ত্বসকল যাহা সাধারণের জ্ঞানের অগম্য হইয়া আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, পূর্ব্বে আমি মনেও করিতে পারি নাই। প্রথমে আমি আরব্য ভাষার চর্চ্চা কিছুই করি নাই, সামান্যরূপে পারস্য ভাষার আলোচনা করিয়াছিলাম ; ভাষাজ্ঞান যাহাকে বলে তাহা আমার কিছুই জন্মে নাই। পরে মনের আবেগে পরিণত বয়সে লক্ষ্মৌ নগরে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আরব্য ভাষার চর্চ্চা করা গিয়াছিল। এমন অবস্থায় বিধানাচার্য্য ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে আমি মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই ; বোধ হয় আমার ন্যায় অপর সকলেও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কমল সরোবরে জল-সংস্কারের দিন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে আমার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল প্রক্ষণ করিতেছি।" যখন তাঁহার বিশেষ প্রেমোন্মত্ততার ভাব, তখন তিনি আমার নিকটে প্রেমোন্মত্ত খাজা হাফেজের গজল পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি কিছু দিন তাঁহাকে

দেওয়ান হাফেজ পড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহারই আগ্রহ ও অনুরোধে হাফেজের গজল কিয়দংশ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল। সেই অনুবাদদর্শনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। কোরাণের বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ আকারে প্রথমে দুই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেহ অনুবাদের ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমি বল্‌খ রাজ্যাধিপতি এব্রাহিম আদহমের বৈরাগ্যবৃত্তান্ত প্রথম অনুবাদ করি। তাঁহারই উৎসাহে উহা মুদ্রিত ও ভাদ্রোৎসবে গঠিত হয়। কমলকুটীরে নাট্যমঞ্চে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়ে পৃথিবীর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলন সূচক tabelean (দৃশ্যাভিনয়) হইয়াছিল। তখন কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কোন বন্ধু ইহুদী, কোন বন্ধু খ্রীষ্টবাদী, কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা শিখ সাজিয়া এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমাকে ইজার চাপকাণ পরিধান ও মস্তকে টুপি ধারণ এবং মুখমণ্ডলে কৃত্রিম শ্মশ্রুর সংযোজন করিয়া মৌলবী সাজিয়া উপরিউক্ত সকল মৌন অভিনেতার সঙ্গে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। তদ্দর্শনে আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়াছিলেন। আমার সেই সাজ তাঁহার যে মনোমত হইয়াছিল, এরূপ বোঝা গিয়াছিল। এই প্রকার উৎসাহদানে তিনি যেন গর্দ্দভ পিটিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন। যদি এই অযোগ্য ভৃত্য দ্বারা বিধানরাজ্যে কিছু সেবা হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলে ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য; অন্য কিছুই দেখিতে হইবে না। আমি একদিন নাট্যমঞ্চে মৌলবীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি মৌলবী নহি। কেহ কেহ মৌলবী সম্বোধনে আমাকে পত্র লিখেন, এবং সংবাদপত্রে আমার বিষয়ে অনেক লিখিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাহাতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতেছি। বাস্তবিক আমি এরূপ সম্বোধন ও সম্মান পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

পুনশ্চ কোরাণের অনুবাদ খণ্ডশঃ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইলে পর মোসলমান বন্ধুদিগের মধ্যে একজন বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।" আবার আমার সঙ্গে কিছুই আলাপ পরিচয় নাই, এরূপ তিনজন প্রধান মৌলবী একযোগে নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক অনেক প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিয়া আমাকে ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই ইংরাজী পত্রের প্রথমাংশের অনুবাদ এস্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

"আমরা নিম্নলিখিত কয়জন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গভাষার কোরাণের অনুবাদ প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করিলাম, এবং মূলগ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য অনুবাদের তুলনা করিলাম। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কিরূপে এতাদৃশ উদার আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ যখন আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন।

" "আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান, আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্টসহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের গভীর অর্থপ্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।

"কোরাণের উপরিউক্ত অংশের অনুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা অনুবাদক সাধারণের সমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সক্ষম হইলেন, তখন সমস্ত লোকের নিকটে আত্ম-পরিচয় দিয়া তাহার উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা সমুচিত।"

আরও অনেক মৌলবী নিজ হইতে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠাইয়াছেন, এবং অনেক মোসলমান বন্ধু অনুবাদিত কোরাণাদি পুস্তক যাহাতে বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বাহুল্যরূপ প্রচার ও বিক্রয় এবং বিশেষ আদৃত হয় তজ্জন্য চেষ্টা যত্ন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকটে বিশেষরূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এক সময়ে আমি দোকানে একখানা হদিস গ্রন্থ ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। মোসলমানবিক্রেতা দূর হইতে কেতাবখানা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে দেন নাই। আমি আমাদের দপ্তরীযোগে উহা খরিদ করিয়া আনয়ন করি, এবং একজন মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্ম বন্ধু যোগে কোরাণ ক্রয় করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন। বিধাতার বিচিত্র লীলা!

আমি লক্ষ্ণৌ নগরে পাঠ্যাবস্থায় ও পরে গমনাগমন কালে পথে যে যে স্থানে স্থিতি করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। উক্ত নগরে পাঠ্যাবস্থায় একবার গমনকালে আচার্য্যদেবের সঙ্গে আমি গাজীপুরে যাইয়া কিছুদিন স্থিতি করিয়াছিলাম। গাজীপুরে যাত্রা ও তথায় অবস্থান কালের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমদাচার্য্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সপরিবারে সেইবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠ রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সঙ্গের লগেজ ইত্যাদিতে সেই কামড়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ভক্তিভাজন আচার্য্য ও আচার্যপত্নী কয়েকটী বালকবালিকা সহ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কামড়াতে আমিও ছিলাম। ভাই প্রসন্নকুমার সেন সস্ত্রীক সহযাত্রিক হইয়াছিলেন, উক্ত কামড়াতে না অন্য স্থানে ছিলেন ঠিক স্মরণ হয় না। স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ সমুদায় রাত্রি একপ্রকার বসিয়া কাটাইতে হইয়াছিল, দেহ প্রসারণ করিবার স্থান ছিল না। আচার্য্যপত্নী বলিয়াছিলেন, "ছাই গাড়ী করা হইয়াছে, না শোওয়া যায়, না বসা যায়।" আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন, "কি করিব টাকা নাই, ভাল গাড়ী কোথা হইতে হইবে?" তখন দেলদার নগর হইতে গাজীপুরে গমনের ব্রাঞ্চ লাইন হয় নাই। জুমানিয়া ষ্টেশন হইতে যাত্রিকদিগকে উটের গাড়ী বা ডাকগাড়ীযোগে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। আমরা রাত্রিতে জুমানিয়াতে পঁহুছিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে আচার্য্য ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন, আমরা সকলে একখানা দ্বিতল উটের গাড়ীতে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। আচার্য্য-পত্নীর সঙ্গে বুড় ঝী ছিল। উটের গাড়ীর ঝাঁকনীতে সে বমি করিতে করিতে চলিয়াছিল। গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে গাজীপুর নগর। তথাকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ কয়েকখানা বড় বড় ঘোড়ার গাড়ীসহ ঘাটে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আচার্য্য ডাকগাড়ীযোগে পূর্ব্বেই পঁহুছিয়াছিলেন। আমরা সকলে মধ্যাহ্নকালে গঙ্গা পার হইয়াছিলাম। পাড়েজীর বৃহৎ বাগানবাড়ী আচার্য্যদেবের অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহার সঙ্গে আমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাই। তখন দুর্গোৎসবের সময় ছিল। গাজীপুরে রামলীলার মহা ঘটা হইয়াছিল। একদিন আচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া রামলীলার মেলাতে যাইয়া বালকবালিকাদিগের জন্য কিছু খাবার এবং ক্রীড়ার সামগ্রী ক্রয় করিয়াছিলেন। তখন শ্রীমতী সুনীতি দেবী অবিবাহিতা বালিকা ছিলেন। প্রতিদিন বাগানবাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। একদিন আচার্য্য মহাশয় একজন হিন্দুস্থানী বড়লোকের বাড়ীতে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া যাইয়া হিন্দী ভাষায় সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য একদিন সায়ংকালে পারেজীর উদ্যানে তরুতলে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, এমন সময় একটি কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সুললিত স্বরে গান করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করে, তাহাতে তিনি স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হন। সেইবার

মাঘোৎসবে "গাজীপুরের পাখী" বিষয়ে মধুর উপদেশ হইয়াছিল। তদবধি সুকণ্ঠ পক্ষীর প্রতি আচার্য্যের হৃদয় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি কতকগুলি সুললিতকণ্ঠ সুশ্রী ক্ষুদ্র পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে পালন করিতেছিলেন। একদিন তিনি স্থানান্তরে ছিলেন, ভৃত্যের অবহেলায় আহার না পাইয়া কতক পাখী মরিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হয়। তখন হইতে তিনি পক্ষিপালনে বিরত হন।

গাজীপুরে নগরের পার্শ্বে গঙ্গাতীরে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুযোগী "পওহারী" (পবনাহারী) বাবা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুফায় (গর্ত্তে) বাস করিতেছিলেন। একটী কুটীরের ভিতরে সেই গুফায় প্রবেশদ্বার ছিল। দশ পনের দিবসান্তে তিনি গুফা হইতে বাহির হইয়া কুটীরের দ্বারে কিয়ৎক্ষণ বসিতেন। বাবাজী বাহির হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইলে নগরের লোকসকল দৌড়িয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যাইত। আমাদের গাজীপুরে অবস্থিতি কালে একদিন বিকালে তিনি বহির্গত হন। তত্রত্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র রায় এই সংবাদ আচার্য্য মহাশয়কে জ্ঞাপন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গগনবাবুর সমভিব্যাহারে পওহারী বাবাকে দেখিতে যান। আমিও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলাম। আমরা বাবাজীকে কুটীরের দ্বারেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার মধ্যম বয়স, উজ্জ্বল গৌরকান্তি, সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি ছিল। তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন, আচার্য্যকে উপস্থিত দেখিয়া বিনয়াবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। আচার্য্য বসিয়া যোগসাধনের বিষয়ে দুই একটী কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন "দাস ক্যা জান্তা হ্যায় ? আচার্য্য জান্তে হেঁ।" যোগিবর সকল কথায় নিতান্ত অকিঞ্চন দাস বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। এমন বিনয় কোথাও দেখা যায় নাই। গাজীপুরস্থ একজন বন্ধুর পত্নী পওহারী বাবার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। সেই পুস্তকের একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একদা বাবাজী গঙ্গা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, স্নানান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখেন একজন চোর তাঁহার পূজার বাসনপত্রাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে। কুটীরের পার্শ্বেই তাহার সঙ্গে বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়। চোর তাঁহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বাসনগুলি ফেলিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। যোগিবর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি বড় আশা করিয়া আমার ঘরে আসিয়া এইসকল সামগ্রী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ, তোমার অনেক পরিশ্রম

হইয়াছে, তুমি সমস্ত লইয়া যাও, তাহা লইয়া না গেলে এ দাসের অপরাধ হইবে।" চোর বেচারা বাবাজীর কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সেই সকল দ্রব্য সে আর লইয়া যাইবার সাহসী হইবে কি? তাহার মনে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত সাধু কয়েক বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি হোমানলে স্বীয় দেহকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমি সেই সাধুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম, তৎপর গাজীপুর হইতে যাত্রা করিয়া বারণসী ও জৈনপুর হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়াছিলাম।

রোগ-শয্যা

আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে Erysipelas রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। লাহিয়াসরাই নগরে ডিপুটী কলেক্টর ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ মহাশয়ের আবাসে অবস্থানকালে বাম পদে সেই রোগের সঞ্চার হইয়াছিল, পায়ে বিষম ক্ষত হয়, এবং পা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। আমি প্রায় একপক্ষ কাল দ্বারভাঙ্গা মহারাজের হাস্পাতালের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হই। তিনি চারি মাইল পথ দূর দ্বারভাঙ্গা নগর হইতে প্রতিদিন অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আমাকে দেখিয়া ব্যবস্থাদি করিয়া যাইতেন। আমি পাদচারণায় নিতান্ত অক্ষম এবং উত্থানশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীমান্ যোগানন্দ রায় সমভিব্যাহারে সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য লাহিরিয়া সরাইয়ে গিয়াছিলেন। রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে আমি আরা নগরে যাইয়া তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব ডিঃ কলেক্টর প্রীতিভাজন ভাগিনেয় শ্রীমান্ গঙ্গা-গোবিন্দ গুপ্তের আবাসে স্থিতি করি। সেখানে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন স্বর্গগত নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয় চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এবং বধূমাতা সযত্নে সেবা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। আমি অনেক ক্লেশ যন্ত্রণার পর প্রায় দুই মাস পরে সেই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম।

১৮৯০ সালে মাঘোৎসবের সময় আমি কলিকাতা নগরে গুরুতর নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তখন বগুড়ায় তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন পরম বন্ধু রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় তিন মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় ছিলেন। আমি তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিলাম। সেই রোগে আমার জীবনসংশয় হইয়াছিল। আমি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে,

নিজে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম না ; এক বিন্দু দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিতে কষ্টবোধ করিতাম ; মাসাবধিকাল শয্যাগত ছিলাম। কিন্তু রোগের আক্রমণ হইতেই আমি অন্তরে এরূপ এক অশব্দ বাণী শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, "ভয় নাই, এবার মরিবে না, আরও কিছুদিন বাঁচিবে ও কাজ করিবে।" এই অভয় বাণীতে আমি ক্লেশ যাতনার মধ্যে অতিশয় প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত ছিলাম। প্রথমতঃ রোগের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। আমি তখন আমার প্রেমময়ী জননীকে অত্যন্ত নিকটে উপলব্ধি করিতেছিলাম। মেয়েরা ক্ষুধার সময় পার্শ্বে বসিয়া feeding cup দ্বারা সযত্নে দুগ্ধ গলায় ঢালিয়া দিতেন, তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া উঠিলে আঙ্গুর ফল মুখে অর্পণ করিতেন, আমি তাহার মধ্যে পরম জননীর আদর ও স্নেহ স্পষ্ট অনুভব করিতাম। আমি এমন নিকটে তাঁহাকে এ জীবনে কখনও উপলব্ধি করি নাই ; মনে করিতাম আমার দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র হইয়া আছে, শরীর বিগতপ্রাণ হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। নিজে মন স্থির করিয়া আমি উপাসনা প্রার্থনা করিতে পারিতাম না ; কোন ব্রাহ্মবন্ধু নিকটে আসিলে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে বলিতাম, সেই প্রার্থনায় যোগদান করিতাম। আমি সেই মহাসঙ্কটাপন্নাবস্থায়ও ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি। মাসান্তে কিছু সুস্থ ও সবল হইলে পর ফাল্গুন মাসে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পালামোতে চলিয়া যাই। তখন ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় পালামোতে সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তিনি পালামো জিলার সিভিল স্টেশন ডেল্টানগঞ্জে স্থিতি করিতেছিলেন ; তথায় যাইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যত্নপূর্ব্বক আমাকে সেখানে পঁহুছাইয়া আইসেন। আমি উক্ত ডাক্তার বাবুর আতিথ্য গ্রহণে তথায় একমাস অবস্থান করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

ময়মনসিংহে নববিধানের কার্য্য

প্রথমে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ বিরোধী হিন্দুদিগের আক্রমণ ঝড়ে, পরিশেষে আচার্য্যের বিপক্ষ অবিশ্বাসী ব্রাহ্মযুবাদিগের আক্রমণ ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। শেষ ঝটিকার কিয়ৎকাল পরে বিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধু বাবু কালীকুমার বসু এবং গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিরোধীপক্ষ ব্রহ্মমন্দিরে অধিকার লাভ করিবার জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ

উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহারা মন্দিরের অর্দ্ধাংশের স্বত্ববান্ হন। তদনুসারে প্রাতঃকালে এক পক্ষ সায়ংকালে অন্যতর পক্ষ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিতেছিলেন। কিয়দ্দিন পরে প্রবল ভূমিকম্পে মন্দির ভূমিসাৎ হয়। পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমান্ বিহারীকান্ত চন্দের আবাসে, একটি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীরে উপাসনার কার্য্য চলিতে থাকে। বিহারীকান্ত রুগ্ন দুর্ব্বল অর্থসম্বল-বিহীন নিতান্ত অসহায়। তাঁহার উদ্যোগে ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দির পুনর্নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব ছিল। যখন অর্থসম্বল ও লোকবল নাই, তখন ঢাকা নগরস্থ বিধানাশ্রিত প্রচারক বন্ধুগণ এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, উক্ত নগরের পল্লী-বিশেষে সামাজিক উপাসনার জন্য একটী ক্ষুদ্র টিনের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া নববিধান সমাজ রক্ষা করা হয়। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে—ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ, রক্তের যোগ রহিয়াছে, তাহার দুরবস্থা এবং তথায় বিধানের কার্য্য বন্ধ দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রহ্মমন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করা এবং তথায় নববিধানকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে প্রায় ২৪ বৎসর হইল আমি শীত ঋতুতে ময়মনসিংহে যাইয়া বিহারীকান্তের আলয়ে স্থিতি করি। তাঁহার বহির্ব্বাটীর একটী ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছদিত গৃহে বাস করিয়া একটী কুটীরে তাঁহার সঙ্গে দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা করা যায়। বিহারীকান্ত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপে উপাসনায় যোগ দিতেন না, তাঁহার রোগদৌর্ব্বল্যাবস্থা উপাসনায় ঠিক ভাবে যোগ না দেওয়ার অন্যতর কারণ ছিল। আমি দেখিলাম, ময়মনসিংহে বিধানবিরোধী দল প্রবল, বিধানানুগত একজন লোকও নাই বলিলে হয়। দুই একজন নিত্য উপাসনাশীল বিধানবিশ্বাসী উৎসাহী লোক এবং দুই একটী বিধানাশ্রিত বিশ্বাসী পরিবার স্থায়িরূপে স্থিতি না করিলে সে স্থানে বিধানরক্ষা ও বিধানপ্রচার হওয়া অসম্ভব। তখন ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্বপ্রান্তে জঙ্গলবাড়ী পল্লীতে নিজালয়ে বিধানপ্রচারক ভাই দীননাথ কর্ম্মকার এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার স্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা নগরে আসিয়া যাহাতে স্থায়িরূপে বাস করেন, এবং নগরকে কেন্দ্রস্থল করিয়া জিলার ইতস্ততঃ প্রচার করিতে থাকেন, আমি এ বিষয়ে পরামর্শদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন। পরে দুই ভ্রাতাই ময়মনসিংহনগরে চলিয়া আসিলেন। আমি বর্ষাকালে নৌকাযোগে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ময়মনসিংহ জিলার সব্‌ডিভিশন টাঙ্গাইল, জামালপুর ও কিশোরগঞ্জে এবং কয়েকটী পল্লীগ্রামে কিয়দ্দিন ভ্রমণ ও প্রচার করি।

ইতিমধ্যে নগরবাসী একজন মোসলমানের বসতবাটী এবং তৎসংলগ্ন ভূমি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল, নববিধান সমাজের অন্যতর সভ্য বসন্তকুমার ঘোষের যোগে সেই বাড়ী ও ভূমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। দীননাথ, বসন্তকুমার, বিহারীকান্ত এই তিন জনে মিলিয়া লেখাপড়া করিয়া তাহা ক্রয় করেন। উহা তিনজনের জন্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। বাটীর অংশ লইয়া প্রথমে বিবাদ বিসম্বাদ ও গোলযোগ হইয়াছিল, পরে মীমাংসা হইয়া যায়। বিহারীকান্ত অন্যত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থিতি করেন, বসন্তকুমারের ক্রীত অংশে তাঁহার একজন আত্মীয় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন, প্রধান অংশে ও গৃহাদিতে দীননাথ কর্ম্মকার ভ্রাতৃসহ অধিবাসী হইলেন। ২৩ বৎসর যাবৎ উক্ত দুই ভ্রাতা জন্মভূমি জঙ্গলবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ নগরে বাস করিতেছেন। দীননাথ নিঃসন্তান, বিপত্নীক, চন্দ্রমোহন অবিবাহিত পুরুষ। তাঁহারা ময়মনসিংহ আসিয়া স্থিতি করিলে পরও তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাক্তার বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার জঙ্গলবাড়ীর পৈতৃক আবাসে বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত-ছিলেন। বৈদ্যনাথ বোধহয় পাঁচবৎসর পরে জঙ্গলবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে সপরিবারে যাইয়া উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে স্থিতি করেন। বৈদ্যনাথ বিধানাশ্রিত গৃহী, ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করিলে পর চিকিৎসাব্যবসায়ে তাঁহার আর্থিক উন্নতি ও সম্মানবৃদ্ধি হয়। তিনি সপরিবারে বিধানানুযায়ী গৃহস্থ বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিলে, তত্রত্য বিধান বিরোধী-দিগের সঙ্গে ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া না চলিলে নিজের ও নিজের পরিবারের এবং পুত্র কন্যাদের কল্যাণ ও ময়মনসিংহের কল্যাণ হইতে পারে। পবিত্র প্রেমবন্ধনে তিন ভ্রাতা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া সাংসারিক গোলযোগ ও অশান্তি আসিতে না দিয়া বিধানের কার্য্য করিলে ময়মনসিংহে বিধানের জয় দেখিয়া বিধানবাদীগণ আনন্দলাভ করিত পারেন। যে শুভ উদ্দেশ্যে বিধাতা তাঁহাদিগকে ময়মনসিংহে আনিয়া স্থান দান করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সাংসারিকভাবে জীবন যাপন করিলে নিজেদের অনিষ্ট ও ময়মনসিংহের অনিষ্ট সাধন করিবেন। প্রচারকদিগের জীবনের দায়িত্ব অধিক, তাঁহারা প্রেমভক্তি, আত্মসংযম, ও বৈরাগ্যের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে না পারিলে সমুদয় বিফল হইবার কথা।

যাহা হউক ভাই দীননাথ ও চন্দ্রমোহন ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করিলে পর ভগ্ন মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। দুই ভ্রাতার বিশেষতঃ দীননাথ

কর্ম্মকারের উৎসাহ যত্ন ও পরিশ্রমে সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই অর্থসাহায্যে পুরাতন ইষ্টকাদি দ্বারা মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়, বিরোধীদল কিছু অর্থ গ্রহণে মন্দিরের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্থানে অন্য মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। নববিধান মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইলে সেই মন্দিরে বিশেষ উৎসব করিয়া উপাসনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়। আমাদের সহানুভূতিকারী মুক্তাগাছার অন্যতর ভূম্যধিকারী বাবু দেবেন্দ্রনাথ আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাব মনে এবং সকলের ইচ্ছানুসারে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সেই বৎসরে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যায়। তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আসের উদ্যোগে মঙ্গলগঞ্জে কলিকাতাস্থিত প্রেরিত প্রচারক-দলের সম্মিলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় মঙ্গলগঞ্জে সম্মিলনের পর ময়মনসিংহে যাইতে সম্মত হন। ময়মনসিংহে উৎসবের আয়োজনের জন্য আমার তথায় স্থিতি করা প্রয়োজন হওয়াতে বিশেষ অনুরুদ্ধ এবং গমনের পাথেয় প্রাপ্ত হইয়াও আমি মঙ্গলগঞ্জে যাইতে পারি নাই। উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ঢাকা নগরস্থ শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়কে এবং তাঁহার অনুগামী কয়েকজন প্রচারক বন্ধুকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা গিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তথায় গিয়াছিলেন, রায় মহাশয় যাইয়া উৎসবে যোগদান করেন নাই। কলিকাতা হইতে মজুমদার মহাশয় এবং ভাই রামচন্দ্র সিংহ উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেবার মজুমদার মহাশয় একদিন বাঙ্গলাতে এবং একদিন ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন মন্দিরে একবেলা উপাসনার কার্য্য তাহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। পরে তিনি ময়মনসিংহস্থ কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু সহ ঢাকায় চলিয়া আসেন, ঢাকা নগরেও তাঁহার বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ বিধানমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন প্রধানতঃ দীননাথ ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, এই দুই ভ্রাতা মন্দির পুনঃ সংস্কারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। এবার করগেটেট আস্তরণে মন্দিরের ছাদ হয়, ভূমিকম্পে আর ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়বার মন্দির পুনর্নিম্মাণের সময় এ. সি. সেন সেসন জজ ছিলেন। তিনি মন্দিরের পুনঃসংস্কার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ ও আন্দোলন বিষয়ে মন্তব্য

১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ কেশব চন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজ শ্রীমান নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পরিণয় নিবন্ধন হয়। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে হুলুস্থূল ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহা একটা প্রধান ঘটনা। এই উদ্বাহনিবন্ধন ব্যাপারে আমি সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিয়াছিলাম, সকল ঘটনার সঙ্গে জড়িত হইয়াছিলাম। কুচবিহার-বিবাহের আমূল বৃত্তান্ত, আচার্য্যের জীবনচরিত পুস্তকের মধ্য বিবরণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা "কুচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা গিয়াছে। পরে "Keshab Chandra Sen Corrected statement of some disputed facts in his life." (কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার জীবনের কতকগুলি বিসংবাদিত ঘটনার যথাযথ বিবরণ।") এই নামধেয় পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ পরম শ্রদ্ধেয়া একেশ্বরবাদিনী মিস্ কবের নিকটে আচার্য্য স্বয়ং স্বীয় কন্যার বিবাহ বৃত্তান্তপূর্ণ যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আচার্য্যসম্বন্ধে মিস্ কব যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া আচার্য্যের উক্ত পত্রদ্বয় সহ প্রসিদ্ধ East and West পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠকগণ উহা পাঠ করিলে সেই প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মূলে যে কেমন অসত্য ও বিদ্বেষ ছিল তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদে আন্দোলনকে ধর্ম্মের সঙ্গে সংসারের, প্রত্যাদেশের সঙ্গে মানবীয় বুদ্ধির, বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসের সংগ্রাম বলা যায়। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া মুক্তিপ্রদ সত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের তেজ ও তীক্ষ্ণ জ্যোতি ক্ষীণবিশ্বাসী সংসারী লোকেরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার তাড়না ও যাতনার কষাঘাত করিয়াছে, তাহাদের শোণিতপাত করিয়া নিজেদের হস্ত পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিয়াছে।

কুচবিহার-বিবাহ আচার্য্যের প্রতি বিরোধীদের বিরুদ্ধভাব ও শত্রুতাচরণের বিশেষ বিকাশপ্রাপ্তির সুযোগ বিধান করিয়াছিল। কুচবিহার-বিবাহের বহু

বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্যের বিরুদ্ধে বিবাদানল প্রধূমিত হইতেছিল। সেই সময় প্রজ্বলিত হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। আচার্য্যের নিকটে ধর্ম্মগ্রহণ এবং ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার এরূপ কতিপয় অনুগামী নিজেদের স্বার্থসাধনে বাধা পাইয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে লোকের নিকট অবিশ্বস্ত, অশ্রদ্ধেয় এবং অপদস্থ করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র দলে বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেন, পত্রিকাবিশেষ প্রচার করিয়া তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনাদির বিরুদ্ধে নানা কথা ঘোষণা করিতে থাকেন, এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁহার ও তাঁহার অনুগত বিশ্বাসীদলের অপবাদ রটনা করেন। তাঁহারা তাহাতে কিছুতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সুযোগ ও সুবিধা হয়। পরিণয়-নিবন্ধনানুষ্ঠানের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিবাহ অবৈধরূপে হইবে বলিয়া পত্র লিখিয়া এবং বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানাস্থানের ব্রাহ্মগণ হইতে অনুরোধ উপরোধদ্বারা প্রতিবাদ পত্র সংগ্রহ করেন। তখন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কুহকে ও চক্রান্তে পড়িয়া প্রতারিত হন। বিবাহ কিরূপে হইবে? আপনি কন্যাকে কিভাবে বিবাহ দিবেন? কেহ আচার্য্যের নিকটে এরূপ একটীবার জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার আত্মসমর্থণে কিছু বলিবার আছে কি না তাহা না শুনিয়া পূর্ব্বেই তাঁহারা বিচারকরূপে বিচার নিষ্পত্তি করেন। সমুদায় প্রতিবাদপত্র পড়িবার ভার আমার প্রতি অর্পিত ছিল। আচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন "যে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা কোন ব্রাহ্ম প্রতিবাদ না করিয়া, বিবাহ কিরূপে হইবে এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এ প্রকার পত্র পাইলে তাহা আমাকে পড়িতে দিবে, আমি উহার উত্তর দান করিব। যাহারা আমা হইতে কিছুই জানিতে না চাহিয়া পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা পড়িব না, তাহাদিগকে আমার বলিবার কিছুই নাই। আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কন্যার বিবাহ দিতেছি, যে সকল পত্রে আদেশের প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা আমি পড়িব না, আমি তাহা পাঠ করা পাপ মনে করি। প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। নানা উপায়ে তাঁহার নিন্দা অখ্যাতি রটনা, করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে ঘৃণিত ও অপদস্থ করিতে বিধিমত চেষ্টা করিলেন। আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাঁহারা কাহার সঙ্গে এরূপ দুর্ব্ব্যহার করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। সভ্য জ্ঞানী ব্রাহ্মগণ নীতি ও বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ

করিয়া একপ্রকার অজ্ঞান ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পুঞ্জ পরিমাণে পত্র আমার হস্তগত হয়। সমুদায় পত্রেই প্রতিবাদ ও বিচারনিষ্পত্তি এবং দণ্ডাজ্ঞা ছিল। একখানা পত্রেও জিজ্ঞাসা ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিচারক একজন দস্যুর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তাহার আত্মসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে দণ্ডদানের উপযুক্ত বোধ করিলে দণ্ডদান করিয়া থাকেন। বিবাহের প্রতিবাদকারীগণ আপনা হইতে বিচারাসন গ্রহণ করিয়া ভক্তবিচার ও আচার্য্যবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না। প্রতিবাদ-কারীগণ প্রতিবাদ না করিয়া প্রথমে একটী সভা হইতে বিবাহ কিরূপে হইবে বা হইয়াছে কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি সবিশেষ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেন। প্রতিবাদকারীদের অধিকাংশই এক সময়ে তাঁহার অনুগামী ছিলেন, অনেকে তাঁহা হইতে ধর্ম্মগ্রহণ ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের এরূপ কার্য্য, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার অন্য কিছুই নাই। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। যুডাস স্কেরিয়ট সামান্য অর্থলাভে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আপন গুরু যীশুখ্রীষ্টকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, পরে সেই মহাপাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফিরঙ্গীগণ যীশুদেবকে হস্তগত করিয়া নিজেরা বিচার না করিয়া বিচারকদের নিকটে লইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে কঠিন শাস্তি দান করিবার জন্য বিচারপতি পাইলটকে অনুরোধ করিয়াছিল। বিচারপতি রীতিপূর্ব্বক বিচার করেন, যীশুর প্রমুখাৎ তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল ফিরঙ্গীদিগের ভয়ে, তাহাদের দৃঢ়তর অনুরোধ ও উপরোধে বাধ্য হইয়া ক্রুশে তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ করেন। আচার্য্যের স্বধর্ম্মাবলম্বী বিরোধীগণ যীশুর ঘোরতর শত্রু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ফিরঙ্গীদিগের নীতিও অবলম্বন করিলেন না, নিজেরা এক তরফা বিচার করিলেন।

আচার্য্যদেবের নিন্দাপবাদ রটনার জন্য ইংরাজী ও বাঙ্গলা পত্রিকার সৃষ্টি হয়। তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের কুৎসাপূর্ণ পুস্তক রচিত হইয়াছিল। চারিদিকে হৈ চৈ শব্দ। আচার্য্যের বিরুদ্ধে সভাসমিতি ও বক্তৃতার ছড়াছড়ি। কোন যুগে এরূপ ভক্তাবমাননা হইয়াছে কি না জানি না। বাদ প্রতিবাদ

আন্দোলন এবং ভক্তবিচার ও ভক্তাবমাননায়, মানী গুণীদের নিন্দাপবাদ রটনায় পূর্ব্ববঙ্গ অধিকতর উৎসাহী ও অগ্রসর। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ কিছু পশ্চাদবর্ত্তী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ যুবক ও বালকগণ এ সকল ব্যাপারে চলিয়া থাকেন। ধর্ম্মবুদ্ধি হিতাহিত বিবেচনা এবং চিন্তাশীলতার অভাবে এইরূপ আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া অনেকের জীবনের বিশেষ অবনতি ও গুরুতর ক্ষতি হইয়া থাকে।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকা নগরে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কুচবিহারে যাইয়া বিবাহে যোগদান করেন নাই, তখন মুঙ্গেরে ছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র কন্যার বিবাহে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদ না করাতে বেদীচ্যুত হন, তাঁহাকে সদলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মযুবকদল আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া অত্যন্ত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তত্রত্য বিশ্বাসী প্রবীণ ব্রাহ্ম স্বর্গগত কালীকুমার বসু সেখানকার ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদক ছিলেন, যুবকদল তাঁহাকে অন্যায়রূপে পদচ্যুত করেন। পরিণত বয়স্ক পদস্থ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় তাঁহাদের কর্ত্তৃক অপদস্থ হন। আমি যাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম, যাঁহার কল্যাণ সাধনে ও দুঃখ ক্লেশের সময় সাংসারিক উন্নতিসাধনে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিয়াছিলাম, সেই প্রেমাস্পদ যুবা প্রতিবাদকারী যুবকদলের নেতা হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহারই উদ্যোগে ময়মনসিংহ নগরে প্রতিবাদের এক সভা আহূত হয়। শ্রীমানের চক্রে পড়িয়া সত্তোর জন লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সত্তোর জনের মধ্যে সাতজনও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন কিনা সন্দেহ। যিনি এক পত্নী বিদ্যমানে দারান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মোপসনার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেন নাই, শুনিলাম তিনিও কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহে প্রতিবাদকারীদের দলভুক্ত একজন প্রধান লোক ছিলেন। বিবাহের স্বপক্ষ পক্ষে বাবু কালীকুমার বসু ও বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন এবং অপর দুইটি ব্রাহ্মমাত্র ছিলেন। গোপীকৃষ্ণ বাবুর নিকটে যখন প্রতিবাদপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার ভিতরে বিষ রহিয়াছে, ইহা স্পর্শও করিব না।" বিশ্বাসী কালীকুমার বাবুও প্রতিবাদের পূর্ণ বিপক্ষ ছিলেন। যুবকদলের নেতা সভায় নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হন। "যেহেতু বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কন্যার বিবাহে বাল্য-

বিবাহদান ও পৌত্তলিকতা দোষে দোষী হইয়াছেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে কোনরূপ যোগ রাখিব না, এবং যাহারা তাঁহার সহিত যোগ রক্ষা করিবেন তাঁহারা আমাদের আচার্য্যাদি হইতে পারিবেন না। কালীকুমার বাবু "কেশবচন্দ্র" শব্দের পূর্ব্বে "ভক্তিভাজন" বিশেষণটি যোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা হইয়াছিল। এক-দিকে সত্তোরজন অপরপক্ষে চারি পাঁচজন ভোটে সত্তোর জনেরই জয় হইল।*

ময়মনসিংহে সাধু অঘোরনাথের প্রচারের ফলস্বরূপ তত্রত্য অনেকগুলি যুবক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়াছিলেন, এবং কয়েকজন আমার আবাসে আসিয়া স্থিতি করিয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন ঝটিকায় সকলেই বায়ুনিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন, এবং আমাদের ঘোরতর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হন। আমার সঙ্গে তাঁহাদের যে যোগসম্বন্ধ ছিল স্মরণ করিয়া আন্দোলনসম্বন্ধীয় সকল কথা কত দূর সত্য তাঁহাদের একজনও তাহা একবার আমার নিকটে জানিতে চাহেন নাই। সেই আন্দোলনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। পরে মন্দির অধিকার করিবার জন্য প্রতিবাদকারীদের দ্বারা মোকদ্দমাদি উপস্থিত হয়, তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছিল। কেবল বিশ্বাসী কালীকুমার বসু ও গোপীকৃষ্ণ বাবুর দৃঢ়তায় ও

---

*উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন ব্রাহ্মের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া এই বিবরণ লিখিত হইল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমান যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কলিকাতাস্থ মূল প্রতিবাদকারীদিগের সভা হইতে সেই মর্ম্মের প্রস্তাব স্থানে স্থানে ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের একজন চিন্তাশীল জ্ঞানী সম্পাদক এই প্রস্তাব পড়িয়া তদুত্তরে এরূপ লিখিয়াছিলেন, "কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় কন্যার বিবাহে বাল্যবিবাহদান ও পৌত্তলিকতাদোষে দোষী হইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিলে তাঁহার মত উপযুক্ত লোক কোথায় পাওয়া যাইবে?" বাবুদের দ্বারা যেমন আচার্য্য নিয়োগ, তদ্রূপ তাঁহার পদচ্যুতি। আমরা শুনিয়াছি যে, নির্ব্বাণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি বুদ্ধদেবের কতকগুলি অনুগামী শিষ্য তাঁহার বিরোধী হইয়া তাঁহার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দান করিয়াছিল। এ জগতে অসম্ভব কার্য্য কিছুই নয়।

অবিচলিত অধ্যবসায়ে মন্দির রক্ষা পাইয়াছিল। প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মযুবকগণ ভীষণ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক সামাজিক উপাসনার সময় দলবদ্ধভাবে মন্দির অধিকার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। পুলিসের দ্বারা বাধা পাইয়া মনোদুঃখে ফিরিয়া যান। শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ উপরি উক্ত ব্রাহ্মযুবকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ঢাকা নগরে যাইয়া তত্রত্য প্রচারকমণ্ডলীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন; তাহাতেই বিপদ হইতে রক্ষা পান। ভক্তবিরোধীদের দলভুক্ত হন নাই। তখন এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, কুচবিহারবিবাহে যোগদান করা হইয়াছে, যাঁহারা সেই বিবাহের প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহারাই পতিত। যাহারা কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছে, তাঁহাকে গালি দিয়াছে, তাঁহার নিন্দা করিয়াছে, তাহারা পবিত্র বলিয়া সমাদৃত, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অপবিত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এক্ষণও আচার্য্যবিরোধী অনেক প্রচারক ধর্ম্মপ্রচারকে লক্ষ্য না করিয়া মফঃস্বলের যে যে সমাজ তাঁহাদের একান্ত শরণাগত নহে, নানাকৌশলচক্রে সেই সকলকে দখল করিতে, কেশবচন্দ্রের সংশ্রবশূন্য করিয়া রাখিতে রীতিমত যত্ন করিতেছেন।

যাঁহারা বিরোধীদলের নেতা হইয়া কেশবচন্দ্রকে ও আমাদিগকে পতিত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, অকারণে ভক্তকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া লোকের নিকট ঘৃণিত অশ্রদ্ধাভাজন করিতে যত্নবান হইয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বিরোধীদলের কোন নেতা আপন নেতৃত্বে উপাসনাদি কার্য্য করিবেন জানিতে পারিলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাস্থলেও আমি তাহাতে যোগদান করি না। তবে বাঁকুড়া নগরে তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব সেশন জজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পৌরোহিত্যকার্য্যে শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করিবেন জানিয়াও আমি স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহযাত্রী হইয়া যাইয়া যোগদান করিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই,—বিবাহ সম্পূর্ণ আমাদের মনোমত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইবে, মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তাঁহারই নেতৃত্বে উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে, বর নববিধান পরিবারভুক্ত। এদিকে আমাদের মনোনীত পদ্ধতির একটী কথারও অন্যথা হইবে না, কেদার নাথ রায় টেলিগ্রাফযোগে মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার বাঁকুড়াতে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। শাস্ত্রী

মহাশয় মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন হইয়া পাত্রীপক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য করিবেন। এইমাত্র কথা ছিল; কোন গোলযোগ হইবে না ভাবিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে যাওয়া হয়। বিবাহের দিন অপরাহ্নে বিবাহের প্রাক্কালে এরূপ কথা হয় যে, বিবাহসভায় শাস্ত্রী মহাশয় পাত্রীকে উপদেশ দান করিবেন। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। বিবাহে আচার্য্যই পাত্র পাত্রীকে উপদেশ দান করেন, পুরোহিত আবার উপদেশ দান করিয়া থাকেন ইহাতো কখনও হয় না; ইহা নূতন কথা। ইতিপূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাব হয় নাই, এরূপ কথা হইলে বোধকরি কলিকাতা হইতে অনেকেই বাঁকুড়াতে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিতেন না। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া মজুমদার মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ হন, এবং বিবাহকার্য্য-সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বিবাহসভায় বরপক্ষের সকলেই উপস্থিত হইবেন না, এরূপ ভাব ব্যক্ত হয়। পরে অনেক গোলযোগের পর এই প্রকার মীমাংসা হয় যে, পূর্ব্বনির্দ্ধারণানুসারে যথারীতি বিবাহ হইয়া যাইবে, শেষ সঙ্গীত ও শান্তিবাচনের পর শাস্ত্রী মহাশয় পাত্রীকে উপদেশ দিবেন। তখন বরযাত্রিকদিগের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন থাকিবেন, যাঁহার ইচ্ছা না হয় তিনি চলিয়া যাইবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের সময় আমি বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলাম না, আমার ন্যায় অনেকেই ছিলেন না, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুগামী লোকেরা তাহাতে বিরক্ত হন, এবং নানা বিরুদ্ধ কথা প্রচার করেন। শাস্ত্রী মহাশয় এরূপ কার্য্য করিবেন শুনিয়া বরযাত্রিক যুবকদলের অনেকে বিবাহে যোগদান করেন নাই, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন।

বিরোধীমণ্ডলীভুক্ত জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যাদের এবং ভ্রাতা ভগিনীদের বিবাহাদিতে আমি নিমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হইয়াও যোগদান করি নাই। তবে এবার তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী সরযুবালার বিবাহে বুঝিতে না পারিয়া যোগ দিয়াছিলাম, যোগদানে ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বা পরে যাইয়া পাত্রপাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিব, এরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম। বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্নে কন্যাকর্ত্তার প্রেরিত একজন উচ্চপদস্থ আত্মীয় আসিয়া বিবাহে উপস্থিত হইবার জন্য কন্যাকর্ত্তার দৃঢ় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আমি বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিব না, তাহার পূর্ব্বে বা পরে যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব, তাঁহাকে এ প্রকার বলি। তিনি বলিলেন, "ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল আচার্য্যের কার্য্য এবং বাবু উমেশচন্দ্র

দত্ত পৌরোহিত্য করিবেন।" তখন একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিলেন "সান্যাল মহাশয় যখন বিবাহানুষ্ঠানে নেতৃত্ব ও আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তখন আমাদের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারেই কার্য্য হইবে, কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। আপনি যাইয়া যোগদান করিতে পারেন।" আমি এ বিষয়ে উপাধ্যায়েরও সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কোন গোলযোগ হইবে না ভাবিয়াই আমি যাইয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলাম। একপ্রকার অদ্ভুত নূতন পদ্ধতিতে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। তখন ভীষণ উত্তাপ যুক্ত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবাহসভা হইয়াছিল। সভাস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকসকল গ্রীষ্মোত্তাপে আকুল, তন্মধ্যে আচার্য্য ও পুরোহিত মহাশয়ের পাত্রপাত্রীর প্রতি সুদীর্ঘ উপদেশ ও বক্তৃতার স্রোত, উহার যেন শেষ নাই। সকলেরই তাহা অত্যন্ত অসন্তোষকর হইয়া উঠিয়াছিল। সান্যাল মহাশয় এরূপ প্রণালী অনুসারে বিবাহ দিলেন ভাবিয়া আমার ন্যায় নববিধানমণ্ডলীর অনেকেই ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিবাহের অনেক কার্য্য যেন বাল্যক্রীড়ার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। একজন প্রত্যাদিষ্ট মহাজনকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া চলার এই ফল।

পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে যদি কেহ অপমান করে, তাঁহাদের প্রতি অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে, যাঁহাদের অন্তরে পিতৃভক্তি ও গুরুজনভক্তির লেশ আছে তাঁহারা সেই অপমানকারী ও অত্যাচারীকে তাহার মনের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন না। তাহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে অক্ষম। নিজের প্রতি অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব, অত্যাচারীকে ক্ষমা করিব, কিন্তু ভক্তিভাজন গুরুজনের প্রতি অত্যাচার ও অপমান হইল দেখিয়া ক্ষমা করিয়া চলিলে কনিষ্ঠের ভক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য-কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। কেশবচন্দ্র আমাদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা সমধিক ভক্তির পাত্র, তাঁহার নিকটে আমরা আধ্যাতিক অশেষ ঋণে ঋণী, তিনি নিজের অত্যাচারী শত্রুদিগকে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার শত্রুদিগকে "ভাই তুমি খুব ভাল" বলিয়া আলিঙ্গন করিলে গুরুজনভক্তির সঙ্কোচ ও ভক্তির অবমাননা হয়। "নববিধান কেশববাবুর চাতুরী" এরূপ কথা যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিতে পারেন, যাঁহারা বিধানকে অস্বীকার করেন, বিধানের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন, নববিধান ঈশ্বরের বিধান এরূপ বিশ্বাস করিয়া, নববিধান প্রেরিত ও প্রচারকদের পদে

বরিত হইয়া কেমন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে এক ভূমিতে—উচ্চ হইতে নিম্ন সাধারণ ভূমিতে নামিয়া দণ্ডায়মান হওয়া যায়। দেবাত্মা যীশুর প্রতি সংসার-ভক্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ইহুদী ধর্ম্মযাজকগণ অত্যাচার করিয়াছিল, নানাপ্রকার যন্ত্রণাদান ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাতে তৎপ্রচারিত সত্যসকল বিলুপ্ত হয় নাই, বরং সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত পুত্রত্ববিধান সমগ্র সভ্যজগৎকে অধিকার করিয়াছে। দুর্দ্দান্ত কোরেশদিগের অত্যাচারে মহাপুরুষ মোহম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রবলবেগে সেই ধর্ম্ম পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার কন্যার বিবাহসম্বন্ধীয় এই অত্যাচারে প্রত্যাদেশ জয়যুক্ত হইয়াছে, নববিধান সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পরিত্রাণপদ বহু নূতন নূতন সত্য, সাধনভজনের নব নব প্রণালী ও বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সকল সাধু মহাজনের মিলন, সার্ব্বভৌম একতা, ঈশ্বর-দর্শন ও শ্রবণ, যোগ ভক্তি কর্ম্মাদির নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু বিনীত বিশ্বাসী উচ্চ সাধকদিগের পক্ষে শুভদিন ও শুভযুগ ঘটিয়াছে। সেই বিরোধ অত্যাচার না হইলে এই প্রকার শুভযুগ শীঘ্র ঘটিত না। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বতন অনুগামী ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ নিম্ন ভূমিতেই স্থিতি করিলেন, তাঁহাকে অস্বীকার করাতে তাঁহার জীবনে প্রকাশিত নব আলোক ও নব সত্য গ্রহণ ও ধারণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা মুখে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু উপাসনাপ্রণালী উপদেশ বক্তৃতা ব্রহ্মোৎসব সঙ্কীর্ত্তনাদি সকল পুরাতন প্রণালী অক্ষরে অক্ষরে নির্জীব-ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, বিভীষিকা দেখিয়া নূতন কিছু গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহারা রক্ষণশীল আদি ব্রাহ্মসমাজেরও প্রভাব-ধীন হইলেন না, মুখে মহর্ষি মহর্ষি বলিলেন, কার্য্যতঃ তাঁহার কোন মত ও ভাব স্বীকার করিলেন না, উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী একেশ্বর-বাদের ভূমিতে স্থিতি করিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারাদি পার্থিব কার্য্যে উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই নবগঠিত সমাজের নেতা, প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেরই পতন এবং মত ও বিশ্বাসের ঘোরতর স্খলন ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেহ বা হিন্দু গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং মন্ত্রদানে মন্ত্রগ্রাহী বৈষ্ণবসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, কেহ বা হিন্দুবামাচারী মহান্ত হইয়া শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন; কেহ বা

কর্ত্তাভজাগুরুর কেহবা মন্ত্রগ্রাহী গোস্বামী গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেহ বা সিংহবাহিনী ভবানীপূজায় যোগ দিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের নিন্দা-কারীদের এই পরিণাম ঘটিয়াছে। কেহ নিজের বুদ্ধিচাতুরী ও প্রতিবাদের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া নেতৃত্ব করিতেছেন। সমধিক বিস্ময় ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যে সকল লোক কেশবচন্দ্রের প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেব তাঁহাদের সহায় ও মুরব্বি হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়াছেন, অর্থাদিদানে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহার মত ও বিশ্বাসে মিলুক বা না মিলুক তাঁহারা তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই নূতন বিরোধীদলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও আদর পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ তাঁহার মত ও ভাবের এবং তাঁহাকর্ত্তৃক প্রচারিত প্রণালী ইত্যাদির অনুবর্ত্তী নহেন। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষ হইয়াও এক সময়ে কেশবচন্দ্রের বিপক্ষ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদাতাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। উক্ত ঋষিধর্ম্ম যোগধ্যানের সঙ্গে এইরূপ ভাবের কি প্রকার সামঞ্জস্য আছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেকে বলেন মহাপ্রতিভাশালী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী উদারচেতা উন্নতিশীল কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তাঁহার রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত এদেশে গৃহীত ও সমাদৃত হইল না, তজ্জন্য মহর্ষি কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এতদূর প্রতিকূল ছিলেন।

পরম পিতার অনুগত সুপুত্র যীশুদেব, "পিতা আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", এই বলিয়া পিতার ইচ্ছা পালন করিতে যাইয়া শত্রুদল কর্ত্তৃক ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন। যীশুদাশ ভক্ত কেশবচন্দ্র ভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া সমধর্ম্মাবলম্বী এমন কি অনুগামী ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছেন। এদেশে এক্ষণ প্রবল প্রতাপ ব্রীটিশ শাসন, ব্রীটিশ সাম্রাজ্য, নতুবা আমার মনে হয় তিনিও অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ক্রুশযন্ত্রণা অপেক্ষা কম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন নাই, সেই যন্ত্রণা দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী হইয়াছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জগতের একদল লোক নানাপ্রকার যন্ত্রণাদানে সাধুকে হত্যা করে, আবার একদল লোক ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাকেই পূজা করিয়া থাকে। ইহুদীগণ খ্রীষ্টকে দুইজন চোরের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিল, আবার কয়েকশত বৎসর পরে তদ্বিপরীত সভ্যজগৎ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। জগত সাধুর প্রতি অপমান ও

সাধুসম্মাননার এই অবস্থা !

আমার ভগিনীপতি, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতি প্রতিবাদ ও আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া বিরোধীদের দলভুক্ত ও তাহাদের পুষ্টিসাধক হন। আমি তাঁহাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। উক্ত পরিবারস্থ কোন একজন কুচবিহার বিবাহ ঘটনাসম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধান করিয়া একটি কথাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, আমাদের শত্রুদিগের কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন ; তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করেন না, আমি যখন ইহা বুঝিতে পারিলাম, তখন নিজে হইতে কোন্ কথা সত্য ও কোন্ কথা অসত্য তাঁহাদিগকে বলিতে আমার সাহস হয় নাই, কেন না বলিলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না ; আমি কেবল লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইব, এরূপ মনে করিয়াছি। তথাপি ঢাকানগরে উপস্থিত হইলে স্নেহ প্রেম ও হৃদয়ের বন্ধনপ্রযুক্ত প্রথম সেই পরিবারেই সভয়ে, সঙ্কুচিতভাবে স্থিতি করিতেছিলাম। কখন কখন এরূপ ঘটিয়াছে যে, আমার উপস্থিতসত্বেও পারিবারিক বিশেষ অনুষ্ঠানে একজন বিধান-বিরোধী নেতা উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতে না পারিয়া তাহাতে যোগদান করিতে ব্যথিত হইয়াছি। পরিবারে নিয়মিত রূপে পারিবারিক উপাসনা হইত না। দিদীর ইচ্ছা ও আগ্রহমতে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে পারিবারিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা যায়। গৃহস্বামীও যোগদান করিতে থাকেন, কোন কোন দিন আমার প্রার্থনার প্রতিবাদস্বরূপ প্রার্থনা হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, পাপপুণ্য সমুদায়ই ঈশ্বর করাইয়া থাকেন। পাপের জন্য মানুষ দণ্ডিত হয় না ; সাধারণ মনুষ্যতে ও ঈশা চৈতন্যাদিতে বিশেষত্ব নাই, সকলেই ঈশা চৈতন্যের মত হইতে পারে। যখন আমি দেখিলাম মত ও বিশ্বাসে বিষম অনৈক্য, তখন হইতে ক্রমে সরিয়া পড়িলাম, অন্যত্র স্থিতি করিতে লাগিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে গুপ্তপরিবার প্রধান সম্ভ্রান্ত পরিবার, আমার নিতান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ যে, বিবাহাদিসূত্রে ভদ্র পরিবারের সঙ্গে এই গুপ্ত পরিবারেরর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা হয়। তাহার অন্যথা হইতে লাগিল। ঘটনাসূত্রে এরূপ বিগর্হিত অনৈতিক ব্যাপার সকল ঘটিল যে, এই পরিবারের সঙ্গে আমার আর যোগ রক্ষা করা দুষ্কর হইল। যখন এই পরিবার ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূত্রে সম্বন্ধ হইবার প্রস্তাব চলিয়াছিল, তখন আমি পরিণামে তাহাতে ঘোর বিপদের আশঙ্কা মনে করিয়া দিদীকে এবং পরিবারস্থ অন্য দুই একজন প্রধান ব্যক্তিকে অনুনয় বিনয়সহকারে

সাবধান করিয়াছিলাম, কোন ফল দর্শে নাই ; কেবল আমি অনেকের ভর্ৎসনাভাজন হইয়াছিলাম ; কিন্তু পরিণামে আমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল, এরূপ বিপদ ঘটিল যে, তাহাতে সমস্ত পরিবার ক্লিষ্ট ও শোকাকুল হইল। আমি দিদীর ইচ্ছা ও অনুরোধক্রমে পরিবারস্থ কোন পাত্র বা পাত্রীর সম্বন্ধ স্থির করিবার যত্ন করিতেছি ; এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, আমার অগোচরে সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, পাকা দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, এমন কি দিনক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে, পরে আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। পরিশেষে বিবাহাদি অনেক গুরুতর কার্য্যে আমার কোন মত বা পরামর্শ গ্রহণ করা হইত না। ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করা হইত, কোন কোন ঘটনায় আমি মর্ম্মাহত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছি। কখন কখন আমি কোন কোন ব্যাপারে অকারণে অপমানিত ও নির্ভৎর্সিত হইয়াছি। মধ্যম ভাগিনেয় ফরিদপুরের সিবিল সার্জ্জন স্বর্গগত প্যারীমোহন আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। একবার প্যারীও কোন সূত্রে ভুল করিয়া "পরিবারের শত্রু" বলিয়া আমাকে গালি দিয়া এবং ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে আমি তাঁহাকে লিখি, তোমার যখন আমার প্রতি এরূপ বিশ্বাস, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রকার যোগ ও সম্বন্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহি। তাহার কিয়দ্দিন পরে আমি কলিকাতায় যাইবার সময় প্রয়োজনবশতঃ ফরিদপুরে উপনীত হই। প্যারীমোহনের গৃহে উপস্থিত না হইয়া তত্রত্য কলেক্টরীর সেরেস্তাদার বন্ধুবর কালীকুমার বসু মহাশয়ের আবাসে যাইয়া আতিথ্য গ্রহণ করি। প্যারী তখন মফঃস্বলে ছিলেন, আমি ফরিদপুরে যাইতেছি, তাঁহার গৃহে থাকিব না, এই সংবাদ পাইয়া তিনি কালীকুমার বাবুর ঠিকানায় অনুতাপ সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক সুদীর্ঘপত্র আমাকে লিখেন, আমি তথায় পঁহুছিয়াই সেই পত্র প্রাপ্ত হই। তথাপি আমি তাঁহার আবাসে যাইতে প্রস্তুত হই নাই। ইতিমধ্যে শ্রীমান স্বয়ং আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার বাঙ্গলায় অন্ততঃ একদিন স্থিতি করিয়া আমার দিদীর স্বর্গারোহণের দিনে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য করেন। এইরূপে প্যারীমোহনের সঙ্গে আমার পুনর্ম্মিলন হয়। আমি উপস্থিত থাকিলে প্যারীমোহন নিজের বালকবালিকাদিগের জাতকর্ম্ম ও নামকরণাদি ক্রিয়া অন্য কাহারও দ্বারা সম্পাদন করিতেন না। একবার প্যারী ভবানীপুরে নিজের শ্বশুরালয়ে একটী কন্যার নামকরণ করিবেন, তখন

আমি কলিকাতায় অসুস্থ ছিলাম, তিনি ক্রিয়ার দিন অপরাহ্নে প্রচারাশ্রমে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলেন, "আজ আপনি যাইয়া খুকীকে নাম দিবেন।" আমি বলিলাম, আমি অসুস্থ, কেমন করিয়া যাই। তিনি বলেন, "এই অনুষ্ঠানে আপনি সম্পাদন না করিলে হইবে না। গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাইবেন। আমি সাবধানে আপনাকে পঁহুছাইয়া দিব।" শ্বশুরবিরোধী সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারই গৃহে প্যারীমোহন আমাদ্বারা নিজের কন্যার নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। প্যারীমোহন যখন ময়মনসিংহে সিবিল সার্জ্জনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রের জন্ম হয়। সেই সময়ে আমি ভ্রমণ ও প্রচারোপলক্ষে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, তিনি শিশুর জাতকর্ম্ম ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আমাকে বাধ্য করেন। বিলাতে গমনের পূর্ব্বে প্যারীমোহনের ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল ছিল, পরেও আচার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ভক্তির হ্রাস হয় নাই। তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত সরলপ্রকৃতি লোক ছিলেন, একটী দুর্নীতির ব্যাপারে তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ ও বীরত্ব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল মাতৃভক্তি ছিল।

বিশেষ অবস্থা

পঞ্চাশতম সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবে বেদী হইতে নববিধান ঘোষণা হয়। তৎপর অধিকাংশ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হন। প্রেরিতদিগের জীবনের উচ্চতর ব্রত নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহারা অন্যের নিকটে ধন চাহিবেন না, নিজের জন্য ধন গ্রহণ করিবেন না, সঞ্চয় করিবেন না, প্রচার ভাণ্ডারের উপর সপরিবারে নির্ভর করিবেন, এরূপ নির্দ্দিষ্ট। তাঁহারা আচার্য্য কর্ত্তৃক বৈরাগ্যাদি ব্রত ভঙ্গ করিয়া চলেন। তাহাতে আচার্য্যের হৃদয় অত্যন্ত আহত হয়, তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন, তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইতে থাকে। মনের দুঃখে তিনি প্রেরিতমণ্ডলী হইতে একপ্রকার বিদায় গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব হইতে প্রচারকদিগের মধ্যে পরস্পর অপ্রেম ও অসম্মিলন ছিল। আচার্য্যদেব ঈশ্বরাদেশে যে ব্রতবিধি প্রেরিতদিগের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হইল না দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তিনি হিমালয়ে চলিয়া যান। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ হইলে পরে যে সকল প্রেরিত উক্ত ব্রতের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা উহা পুনগ্রহণ করিবার জন্য শ্রীদরবারে পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

দুই তিন জনের অমতবশতঃ প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে নাই। আচার্য্য মহাশয় স্বর্গারোহণের প্রাক্‌কালে প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধে পেন্‌সিল দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

"Asceticism has not taken root"

"Decline of inspiration and apostolic spirit among missionaries"

"Decay of true brotherhood and forgiveness ;
Growth of proud and selfish individuality."

"Neglect of yoga"

"Want of harmony of characters."

তিনি রোগশয্যায় থাকিয়া তাঁহার তিরোধানের পর যেরূপ অবস্থা ঘটিবে তদ্বিষয়ে কয়েকটী ভবিষ্যবাণী সাবধানতার জন্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত প্রচারকদিগকে বলিয়াছিলেন,—যথা প্রত্যাদেশের পরিবর্ত্তে লোকরঞ্জন ফলাফল-চিন্তা বুদ্ধিবিচার চলিবে, ধর্ম্মের আদর্শকে খর্ব্ব করা হইবে, প্রেরিত দরবারকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের নামে মণ্ডলী পরিচালনা ও ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা করা হইবে।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর একমাস পূর্ণ না হইতেই ব্রহ্মমন্দির ও মণ্ডলী মধ্যে হুলুস্থুল ব্যাপার ঘটে। কোন প্রেরিত শ্রীদরবারকে ও দরবারাশ্রিত প্রেরিতবর্গকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নূতন উপাসকমণ্ডলী গঠন এবং নূতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাধা পাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে অপর একজনে উপাসক ও অন্য প্রেরিতদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে অবিধিপূর্ব্বক কয়েক বৎসর বেদী অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও উপাসনায় যোগদান করিতে সাধারণ উপাসকদিগের শ্রদ্ধা আছে কি না সে বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। কেহ ভাবিলেন আচার্য্যের পরই আমি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারি, কেহ ভাবিলেন, আমি ভাল উপাসনা আরাধনা করিয়া থাকি, বেদীতে আমারই অধিকার। কিন্তু আমি ইহাদের কাহারও সঙ্গে রীতিপূর্ব্বক যোগদান করি নাই, কখন মন্দিরে উপাসনা করিতে পারিয়াছি, অনেক সময় পারি নাই। এ সকল নেতা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রতের পক্ষপাতি ছিলেন না। আমি ব্রতের পক্ষপাতি প্রেরিতদিগের অন্তর্গত ছিলাম, এখনও আছি। ইহা দ্বারা বলা

যাইতেছে না যে, বৈরাগ্যাদি ব্রতের নিয়ম আমা দ্বারা পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে ; তবে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, সাধনে যত্ন চেষ্টা রহিয়াছে। মধ্যে বিশেষ গোলযোগ ও বিপদ ঘটিয়াছিল। একজনের দৌরাত্ম্যে দরবারের বাক্স ও খাতাপত্র এবং ধর্ম্মতত্ত্বের খাতাপত্রাদি হারাইয়া কতিপয় দরবারাশ্রিত প্রেরিতকে পথে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। পরে একজন প্রচারক বন্ধুর গৃহে তাহাদের স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হয়। বন্ধুর পত্নী আমাদের প্রতি অনেক দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মমন্দিরের সমুদয়বিধি ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, আমরা তাড়িত হইয়াছিলাম। অবশেষে আমরা বীডন ষ্ট্রীটস্থ কেশব একাডেমী স্কুল বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের প্রায় সকলে সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সায়ংকালে রন্ধনপূর্ব্বক একবেলা ভোজন করিতেন, কোন কোন দিন বিশেষ বন্ধু আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। এইরূপে কিছু দিন জীবন যাপন হয়। পরে ভগবান্ সমুদয় দুঃখ ও অভাব মোচন করেন ; হ্যারিসন রোডের অদূরে পটুয়াটোলাস্থ ২০নং ভবনে প্রচারকার্য্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, ছাত্রনিবাস স্থাপিত হয়। সে স্থানে একটি প্রচারক পরিবারও বাস করেন। তথায় সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা করার ভার আমার প্রতি অর্পিত ছিল। বিধাতা অত্যাচার উৎপীডনকে স্থায়ী হইতে দেন নাই। আজ হউক বা কাল হউক তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। ভক্ত যে কি ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহার এক একটী প্রার্থনাতে বিশেষরূপে ব্যক্ত। সেই ক্লেশের তুলনায় আমাদের আর ক্লেশ কি ?

নববিধান ঘোষণার পর বিধানাচার্য্য একদিন শ্রীদরবারে এক এক জন প্রচারককে এক একটী বিশেষ কার্য্য ও ভাব দ্বারা চিহ্নিত করেন। মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা এবং সেই শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ ও তাহা অনুবাদপূর্ব্বক প্রচার করা আমার কার্য্য, এবং সত্যানুরাগ আমার ভাব নির্দ্দিষ্ট হয়। আমি ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত রূপে উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য অনেকবার শ্রীদরবার ও মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত ভাবিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছি। উপাসকমণ্ডলী সভা এবং শ্রীদরবার এই দুইয়ের যোগে মন্দিরের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইবে, এই বিধি। দুইয়ের একটীকে বা দুইটীকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যাইয়া অনেকে নিজে গোলে পড়িয়াছেন, অন্যজনকে কষ্ট দিয়াছেন, নববিধান সমাজের

বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে উপাসকমণ্ডলী ও দরবার এই দুইয়ের যথাবিধি যোগে মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে মন্তব্য

কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসর হইতে চলিল রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহোদয়ের বঙ্গবিভাগ কার্য্যোপলক্ষ করিয়া বঙ্গদেশে ভীষণ আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলিয়াছে। কতকগুলি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও কতিপয় বক্তা এই প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। সম্পাদকগণ পত্রিকায় আন্দোলন করিয়া, বক্তারা স্থানে স্থানে যাইয়া লোকসংগ্রহপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া রাজপ্রতিনিধির নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণের মনকে উত্তেজিত করেন। তাঁহাদের লেখনী ও রসনা হইতে রাজপ্রতিনিধির প্রতি অজস্র কটূক্তি বর্ষণ হইতে থাকে, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিন্দাপবাদ রটনা করেন, আনুষঙ্গিক ইংরাজ জাতির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। এই আন্দোলন ও প্রতিবাদের স্রোতে পড়িয়া বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক বালকবালিকারা পর্য্যন্ত উত্তেজিত হয়, রাজবিদ্বেষী ও ইংরাজ বিদ্বেষী হইয়া উঠে। তাহাতে ইংরাজ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দুর্নিবার বিচ্ছেদ ও শত্রুতা ঘটে। রাজপ্রতিনিধির প্রতি বিরুদ্ধভাব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, মহিলারাও সভা সমিতি করেন। চারিদিকে হৈ চৈ ব্যাপার হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। আমি বঙ্গবিভাগ নীতির বিপক্ষ নহি বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস এতদ্দারা পশ্চাৎপদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবং পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ স্থান হইতে চলিল, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশও পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দি, বাঙ্গালদিগের উন্নতি দর্শন অনেকের চক্ষুঃশূল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা কোন আফিসে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এখানকার কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই এক

হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী অনেক বক্তা ও পত্রিকা সম্পাদক এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্ররূপে রসনা ও লেখনী চালনা করিয়া থাকেন, রাজ-প্রতিনিধির নিন্দা এবং তাহার প্রতি কটূক্তিবান বর্ষণ করেন, তাহারা দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া প্রশ্রয় দিয়া উদ্ধত, অবিনীত ও অবাধ্য করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। এই ব্যাপারে অবিনয় কৃতঘ্নতা উপকারীর উপকার অস্বীকার এবং অবিমৃষ্যকারিতার একশেষ হইয়াছে, দুরপনেয় জাতীয় কলঙ্ক ঘটিয়াছে। অনেক বক্তা ও সম্পাদক যেন মনে করেন তাঁহাদের ন্যায় বিজ্ঞ অভিজ্ঞ সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী স্বদেশপ্রেমিক অন্য কেহ নাই। তাঁহারা সর্ব্বজনোপদেষ্টা শিক্ষক ও অলৌকিক হিতৈষী পুরুষ। তাঁহাদের দ্বারা এবার নারীজাতি পর্য্যন্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রবল ইংরাজজাতির সঙ্গে দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতির অসদ্ভাব, বিচ্ছেদ ও শত্রুতা এদেশের পক্ষে সামান্য অনিষ্টজনক নহে। মস্তক প্রস্তর ফলককে আঘাত করিলে মস্তকই আহত ও ক্ষত বিক্ষত হয়, সুদৃঢ় প্রস্তর ফলকের কিছুই হয় না। প্রবলজাতির সঙ্গে দুর্ব্বল জাতি বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে দুর্ব্বল জাতিরই ক্ষতি হয়। স্কুলের অত্যাচারী বালকগণ রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে মারামারি করিয়া জেল খাটিয়া আইসে, এদিকে তাহাদিগকে martyr বলিয়া প্রশংসা করিয়া মাথায় তোলা হয়, পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন কোন বালিকাস্কুলের ক্ষুদ্র ছাত্রী পর্য্যন্ত গভর্নরকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছে, কত দূর স্পর্দ্ধা! পুঞ্জ পুঞ্জ বিলাতী কাপড় পোড়ান হইয়াছে তাহাতে কি বিলাতের তন্তুবায়দিগের ক্ষতি হইয়াছে, না তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কোটি টাকা ভারতবর্ষে অধিক লাভ করিয়াছে? ব্রীটিশ গভর্নমেণ্ট ও ইংরাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া স্বদেশের নানা প্রকার উন্নতি সাধন হইতে পারে, অসদ্ভাব করিয়া চলিলে পদে পদে বিঘ্ন বিপদ। যে চাকুরী বাঙ্গালী জাতির প্রধান জীবনোপায়, তাহা প্রধানতঃ গভর্নমেণ্টের হস্তে, এবং ইংরাজদিগের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। এই গোলযোগবশতঃ বাঙ্গালী হিন্দুজাতি অবিশ্বাস ভাজন হওয়াতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাব প্রদেশে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বাঙ্গালীর পক্ষে উপযুক্ত কাজ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। অনেকে বলেন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির স্বদেশী আন্দোলন কে. জি. গুপ্তের পদোন্নতির বিঘ্ন হইয়াছে। এই আন্দোলন ব্যাপারটী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ ব্যাপার, ধর্ম্মশূন্য ব্যাপার। ইহার প্রধান বক্তা ও নেতৃগণ ধর্ম্মভীরু

ঈশ্বরনিষ্ঠ সুনীতিপরায়ণ বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না, তাঁহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করা তাঁহাদের কথানুসারে ও ব্যবস্থানুসারে চলা কল্যাণজনক বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। একজন ভক্তিমান লোক বলিয়াছেন, "ভক্ত কেশবচন্দ্র বহু বৎসর বহু যত্ন আয়াসে বালক ও যুবকদিগের অন্তরে বিনয় ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন এই রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোতে তৎসমুদায় প্রধৌত ও প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে, শত বৎসরেও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমাদের একজন প্রচারক বন্ধু প্রতি সপ্তাহে কলেজ স্কোয়ারে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, বালকদিগের উৎপাতে তিনি আর বক্তৃতা করিতে পারেন না। একস্থানে একজন ব্রাহ্মবক্তা ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, বালকগণ সে বিজ্ঞাপন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অন্তঃপুরে মহিলাগণও বিলাতীবর্জ্জনে উপদিষ্ট, বালকবালিকাগণও জননীর নিকটে সেই ভাবে প্রাপ্ত হইতেছে। যাহাতে বিলাতের প্রতি বিদ্বেষ বিলাতের সঙ্গে বিচ্ছেদ স্থায়িরূপে হয় তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে। সকল জাতির সঙ্গে সম্মিলন ও সদ্ভাবস্থাপন পরস্পরের সঙ্গে সদগুণাদির বিনিময় সাধন বিধাতার বিধি, সেই বিধির বিপরীত পথে চলিলে উন্নতি হইবে না অবনতি হইবে। ইহাতে যে কি কুফল ফলিতেছে বলিয়া উঠা যায় না। একজন সুবিজ্ঞ বন্ধু বিগত আষাঢ় মাসের মহিলাতে "স্বদেশী আন্দোলন ও মহিলাগণ" শীর্ষক একটি সারগর্ভ বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—"দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান আন্দোলনে বিকৃত স্বদেশ প্রীতির আদর্শ আনিয়া দেশে উপস্থিত করিতেছে। অন্দর মহলে যাঁহারা স্বদেশী বিদেশী নানা বিভিন্ন প্রকার লোকের সংস্পর্শে আসিয়া হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিবার সুযোগ পান না, সুতরাং কৃতকার্য্যে সংকীর্ণ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হৃদয়কে বিলাতী-বর্জ্জনের নামে বিদ্বেষপূর্ণ করিয়া আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে, এবং ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহাদের শিক্ষার গুণে উন্নত হইবে; তাহাদিগকেও সংকীর্ণপাশে দৃঢ়বদ্ধ করা হইতেছে। একটী কথা শুনিয়া বড় হাসিও পায় দুঃখও হয়। আমাদের পরিচিতা কোন বড় সুন্দর সাদা ধপধপে ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনী নাকি বলিয়াছিলেন "তোমার ছেলেটি বড় সুন্দর সাহেবের মত, তাহাকে বিলাত পাঠাইও।" তিনি রাগে গড় গড় করিয়া বলিয়াছিলেন 'আমাকে ও সব কথা বলিবেন না আমার ছেলেকে আমি বিলাত পাঠাব না।' আমাদের নারীদিগের মনকে এইরূপ অপ্রেম ও অশান্তিপূর্ণ করিবার জন্য কি

কেহ দায়ী নহেন ?

"স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আমরা অতিশয় পক্ষপাতী, এবং যথাসাধ্য তাহা প্রচারের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তাহা জোর জুলুম করিয়া ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া কোন দেশে কস্মিন্‌কালেও ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি আছে, চক্ষু আছে, সে কি এত নির্ব্বোধ যে, তাহার স্বদেশে সস্তা ভাল জিনিষ পাইলে সে বিদেশী জিনিষের পক্ষপাতী হইবে ? তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক মানুষ আপনার ভালমন্দ বোঝে না। সে বিদেশপ্রীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অধিক অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বশান্ত হইতে চাহে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এঁড়ি, মুগা, বাপ্তা, টুইল, বোম্বাই চাদর ময়নামতী ছিট্‌, ঢাকাই, পাবনা, ফরাসডাঙ্গার কাপড়, লুধিয়ানা, ধারোয়াল, কেনানোর, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাপড় যে একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের মধ্যে আসিয়াছে, সেইজন্য কি কেহ সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, কি লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া উঠিয়াছিল ? মানুষ সস্তা ও ভাল বুঝিয়া আপনার লাভ আপনি দেখিয়া এই সকল জিনিষ ব্যবহার করিতেছে। বিলাতী জিনিষ যদি সস্তা না হয়, টেকসহি না হয়, তোমার আমার বক্তৃতার প্রয়োজন থাকিবে না। আপনা হইতেই তাহার ব্যবহার করিবে। না বুঝিয়া কেহ একবার ঠকিবে, দুইবার ঠকিবে, কিন্তু তৃতীয়বার সে অন্য ভাল জিনিষ পাইলে আর ইচ্ছাপুর্ব্বক ঠকিবে না। আমাদের মনে পড়ে বিলাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার Dr. Smiles (স্মাইলাস্) সাহেব ইংরাজ বণিকদের অসাধুতার তীব্র আক্রমণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ইংরাজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে। তাহারা মাড় দিয়া কাপড় খুব মসৃণ ও গাঢ় দেখাইয়া মানুষকে ঠকাইতে চাহে। ২০ গজ লিখিয়া ১৯ গজ চালাইতেছে, এই সকলের ফলে এই হইয়াছে যে, বিদেশে এমন কি চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অর্দ্ধসভ্য লোকেরা পর্য্যন্ত একবার ঠকিয়া আর ইংরাজের জিনিষ শুনিলে অমনি তাহা বর্জ্জন করে। মাকিন, জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশ সেই জন্য বাণিজ্যে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতেছে। এই সদুপদেশ বাস্তবিক মনুষ্যের প্রকৃতি পাঠ করিয়াই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। এই যে ইংরেজ বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, ইহা কোন বক্তৃতা দ্বারা হয় নাই, আপনা হইতেই হইয়াছে।

"এখন আর এক কথা। বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে অস্বাভাবিক আরও গভীরতররূপে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান

হইবে। এই সভ্যতার যুগে আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী এবং উন্নতির সোপান। আমরা ভিন্ন দেশের সংশ্রবে না আসিলে, ভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে উন্নতপ্রণালী ঈশ্বরের বিধানে লাভ হইয়াছে, তাহার অধিকারী হইতে পারি না। শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের যে প্রদর্শনী হয় তাহার অর্থ কি? ভিন্ন দেশের লোকের বুদ্ধি হইতে যে সকল অভিনব তত্ত্ব বাহির হইয়া মনুষ্যের সুখ সুবিধা ও জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছু নহে। তড়িৎ, বাষ্প প্রভৃতির শক্তি দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এখন কার সাধ্য মান্ধাতার আমলের চরকা, গোযান, ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র বংশলেখনী মৃন্ময়পাত্রমধ্যে চিন্তা ও কার্য্য আবদ্ধ রাখে। যদি কেহ এইরূপ মনে করে যে, ভ্রান্ত, একটি বিপ্লবেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি বিদেশীর বিজ্ঞানপ্রসূত শিল্পাদির আমদানি বন্ধ করিয়া দাও, তবে ক্ষতি হইবে কাহার? তোমাদের দেশের লোকের বুদ্ধির প্রসার হইবে না, নূতন আবিষ্কার ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা হইবে না, তোমরা যে অশিক্ষিত ও অশক্ত ছিলে তাহাই থাকিয়া যাইবে। প্রতিযোগিতা স্বাধীনভাবে আদান প্রদান প্রকৃতির নিয়ম। অবশ্য স্বীকার্য্য-যে, কোন নূতন শিল্পপরিপোষণের জন্য উৎসাহ ও লক্ষণ দরকার, কিন্তু কাপড়ের কল বম্বে, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কত বৎসর হইতে চলিতেছে, এখনও বিলাতী কাপড়ের সমান হইতে পারিল না, ইহা কাহার অপরাধ? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্পাসের চাষ, বস্ত্রবয়ন, দিন দিন নূতন ও উন্নততর যন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে কখনও সাধ্য নাই যে, য়ুরোপীয় জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। অথচ না করিলে চলিবে না। গরীব দেশে স্বদেশ প্রেমের নামে স্বদেশীবস্ত্র কিনিবার জন্য অর্থের সমাগম হইবে কোথা হইতে?

স্থূলবস্তু অদৃশ্য চিন্তাশক্তিরই অভিব্যক্তি। কাপড় বল, খেলনা বল, ছবি বল, বাসনপত্র ইত্যাদি যাহা কেন বলনা, বিলাত হইতে জাহাজে জাহাজে আসিতেছে। এই জিনিষ দেখিয়া আমাদের দেশের লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ক্রয় করিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সকল সামগ্রীর পশ্চাতে কি কোন অদৃশ্য শক্তি, মনের অভিনব চিন্তার উন্মেষ দেখ না? যদি এই সকল সামগ্রী বর্জ্জন কর, তবে মনোবিজ্ঞান ও চিন্তার স্রোতকে বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ বিলাতী বর্জ্জনের জন্য কি প্রস্তুত হইয়াছেন? বিদেশীর হৃদয়ের ভাব, চিন্তা যাহা শতবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত,

যাহা সাহিত্যে, দর্শনে, ভাষায়, চিন্তায়, প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা কি পরিত্যাগ করিবার সাধ্য আছে? তড়িৎবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় শকট, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা প্রভৃতি সেই অদৃশ্য শক্তির অভিব্যক্তি। সেই পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও ভাবরাজ্যের প্রবল স্রোত হইতে বাঙ্গালী কবি ও লেখকগণ ভাষাকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন কি? এবং তাঁহা করা কি যুক্তিযুক্ত? মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন বঙ্গীয় লেখককে বল তোমাদের বিলাতী ভাব, চিন্তা, ছন্দাদি সব বেশ পরিত্যাগ কর। যদি এই ভাবে নগ্নবেশে ইঁহারা এখন দণ্ডায়মান হন তবে বঙ্গভাষার কি শোভাই থাকে? অনেক লেখকের ষোল আনা সাজসজ্জার মধ্যে আধ আনা টেকে কি না সন্দেহ। যদি বর্জ্জন অসম্ভব, তবে অনর্থক কেন দেশকে বিপন্ন করিতেছ? বিধাতার বায়ু যেমন উত্তর দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব অবাধে প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্রস্রোত যেমন ধরাময় পরিব্যাপ্ত, সূর্য্যালোক যেমন পূর্ব্বে পশ্চিমে সমানে আলিঙ্গন করিতেছে, মানবজাতির ভাব, চিন্তা এবং উন্নতির স্রোতও অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত থাকিবে, কেহ বাধা দিতে পারিবে না।"

ভক্ত কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া বিলাতের সঙ্গে ভারতভূমির বিবাহ অর্থাৎ চিরসম্মিলনবিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম উপদেশ দান করেন। বিলাতের দর্শন, বিজ্ঞান, সেবাপ্রিয়তা ও কার্য্যোদ্যম ভারতকে গ্রহণ এবং ভারতের যোগ ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা বিলাতকে গ্রহণ করিতে হইবে, চিরকাল এইরূপ আদান প্রদানের কার্য্য চলিবে, পরস্পরের যোগ কখনও ছিন্ন হইবে না। তাহা হইলে ভারতের উন্নতি ও গৌরব হইবে। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ভারতহিতৈষী বাগ্মিগণ ঋত্বিক্‌রূপে বিবাহভঙ্গের (Divorse) এর বিধি দিতেছেন। বিলাতের সঙ্গে কোনরূপ আদান প্রদান রাখা হইবে না, আমরা স্বদেশহিতৈষী, কেবল স্বদেশের পণ্যজাতের দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার ও উন্নতি সাধন করিব। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের লোকপর্য্যন্ত বিলাতী লবণ ভক্ষণ জন্য পরস্পর দলাদলি করিতেছে, যে বিলাতী লবণ খাইয়াছে তাহাকে একঘরে করিতেছে। শুনিয়াছি একজন ব্রাহ্ম গভর্ণমেণ্টের ও বিলাতের পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্রিকা বিশেষে সত্য কথা স্পষ্টরূপে লিখেন বলিয়া অপর অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত

হইয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের এরূপ মতিগতি তাঁহাদের মধ্যে এরূপ কুৎসিত দলাদলি কি দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র এবং প্রেমাস্পদ বিনয়েন্দ্র বিলাতে যাইয়া সে দেশের নরনারীগণ কর্ত্তৃক কত সমাদৃত হইয়াছেন, কত ভক্তি সম্মান লাভ করিয়াছেন। হায়! ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক সেই ইংরাজ জাতির প্রতি কিনা অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। সকল দেশ ও সকল জাতির সঙ্গে সম্মিলন সাধন যাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র তাঁহাদের একি ভয়ানক দুর্দ্দশা! বিলাতের সঙ্গে ইংরাজ জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া যে একটি দিনও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার উপায় নাই। ইহা যেন কেহই ভাবেন না। এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতা সভাসমিতি বক্তৃতা পত্রিকা মুদ্রাযন্ত্রাদি সমুদায় বিলাত হইতে কি ধার করা নয়? সকল বিষয়ে কি এদেশ বিলাতের নিকট ঋণী নহে? কত অসংখ্য বিষয়ে আমরা বিলাতের নিকটে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকটে ঋণী। যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার লেশ আছে সে এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে না। আজ disloyal বলিয়া সর্ব্বত্র বাঙ্গালী জাতির দুর্নাম হইয়াছে। নববিধান বর্জ্জন জানেন না কেবল গ্রহণ করেন। কৃতঘ্ন হইতে বলেন। নববিধানাশ্রিত হইয়া আমি এই বর্জ্জনাত্মক আন্দোলনের ব্যাপারে যোগদানে অক্ষম।

কুচবিহারবিবাহের প্রতিবাদকারী পুরুষেরা যেমন অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা প্রতিবাদপত্র লেখাইয়া লইয়াছিলেন, তদ্রূপ লর্ড কুর্জ্জনের বিরুদ্ধে মহিলাদিগকে সমুত্তেজিত করা হইতেছে দেখিয়া আমি ব্যথিত ও ভাবিত হইয়া নিম্নলিখিত "তুমুল আন্দোলন ও মহিলাদিগের প্রতি-নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ বিগত ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসের মহিলা পত্রিকায় মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায় এবং কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষকে প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সকলের অনুমোদন মতে মুদ্রিত করা যায়।

সম্প্রতি ভারত সাম্রাজ্যের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড কুর্জ্জন পদত্যাগ করিয়াছেন। এই পদত্যাগের কারণ সৈন্যসংক্রান্ত আয়-ব্যয়বিষয়ে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তাঁহার নিজের মত হোম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষা না পাওয়া। লর্ড কুর্জ্জনের পদে লর্ড মিণ্টো নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধি পাঁচ বৎসরের জন্য সুবিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্য শাসনের

ভারপ্রাপ্ত হন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু লর্ড কুর্জ্জন নিজের যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতার জন্য তদতিরিক্ত দুইবৎসর কালের নিমিত্ত শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই পদত্যাগ করিয়াছেন।

লর্ড কুর্জ্জন কয়েকটি কাজের জন্য প্রজাদের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্গবিভাগকার্য্য প্রধান। সম্প্রতি তাঁহার চেষ্টায় পূর্ব্ব ও আসাম রাজ্যশাসনের জন্য একজন স্বতন্ত্র লেপ্টেনেণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগর স্বতন্ত্র হইবে। এই বিভাগকার্য্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া বাঙ্গালার সহস্র সহস্র লোক তুমুল আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি। এই পরিবর্ত্তন ও নূতন রাজ্যশাসনব্যবস্থার সুফল না কুফল হইবে, সুশাসন না কুশাসন হইবে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিতে এবং রাজপ্রতিনিধির দোষ গুণ ও এই ব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার দুরভিসন্ধি না সদভিসন্ধি আছে, বিচার করিতে অপ্রস্তত। এই ব্যাপারে আমাদের শোকচিহ্ন ধারণ করারও কোন কারণ বিদ্যমান নাই, স্বাধীন শাসনকর্ত্তা রাজ্যশাসন বিষয়ে অভিনব ব্যবস্থাস্থাপনে কতকগুলি প্রজার অভিরুচি ও অভিমতের অনুবর্ত্তন নাও করিতে পারেন। মহিলাগণ এ বিষয়ে আন্দোলন না করিলে ভাল। রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন তাঁহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই আন্দোলন ও প্রতিবাদের স্রোতে পড়িয়া স্কুল কলেজের অনেক বালক বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক স্বদেশ উদ্ধারের জন্য যেরূপ ভীষণ উত্তেজনা ও অবিনয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের জীবনের যে কতদূর কল্যাণ হইয়াছে আমরা জানি না। এ বিষয়ে তাহাদের স্বদেশহিতৈষী নেতৃগণের গুরুতর দায়িত্ব। মহিলারা যেন কাহারও অনুরোধে এইরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া নিজেদের স্বাভাবিক নম্রতা ও শিষ্টতা বিসর্জ্জন না করেন, ইহাই আমাদের নিবেদন। আমরা জানি মফঃস্বলের অনেক মহিলা এই আন্দোলনপ্রবাহে পতিত হইয়া সভা সমিতি করিয়াছেন। প্রেম ও কৃতজ্ঞতাশূন্য protesting spirit অত্যন্ত অনিষ্টজনক। বিদেশীয় বিজেতা রাজা দয়া করিয়া আমাদের ন্যায় পরাধীন পরাজিত জাতিকে যে বলিবার লিখিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার রক্ষা আমাদের দ্বারা না হইলে বোধ হয় তাহা আর অধিক দিন অব্যাহত থাকিবে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন প্রজাদিগের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। আমরা সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাদের অনুকরণ করিতে পারি না। তাঁহাদের

সকল আচরণই যে ভাল ও অনুকরণীয় তাহা নহে। জাতীয় একতা নিতান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু সকল অবস্থায় নহে। ঔদ্ধত্য, অবিনয়, অনীতির ফল কখনও ভাল হইবার নহে।

বিলাতী বস্ত্রাদি দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া স্বদেশী যন্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন বলিয়া এ দেশের বহুলোক প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। তাহা লেখনীচালনায় ও বক্তৃতাতে বদ্ধ না রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিশেষরূপে কাজে পরিণত করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহার মূলে যেন স্বদেশপ্রেম স্বদেশহিতৈষিতা থাকে। রাজ প্রতিনিধি বা ইংরাজজাতির প্রতি ক্রোধ বিদ্বেষ এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইলে ইষ্ট হইবে না, এবং এ কাজ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিলাতী চিকিৎসা, অস্ত্রশস্ত্র ও ঔষধাদি এবং বিলাতী কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রাদি স্বদেশীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বদেশপ্রেমিক বক্তারা এই মহাব্যাপারে নিজেদের স্বার্থত্যাগ ও সৎসাহসের পরিচয়দান পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলে বিশেষ কাজ হইতে পারে, নতুবা দৃষ্টান্তবিহীন উপদেশ ও বক্তৃতায় একপ্রকার পণ্ডশ্রম হইবারই কথা।

পাটের চাষে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর পাটের কুঠীতে কেরানীগিরির কাজে সহস্র সহস্র বাঙ্গালীবাবুর পাটের গুদামে মজুরের কাজে সহস্র সহস্র শ্রম-জীবির জীবনোপায় হয়। আমরা শুনিয়াছি, দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য থান কাপড় ইত্যাদি বিলাতে এদেশজাত পাটে প্রস্তুত হয়। কাপড় প্রস্তুত না হইলেও অন্য কাজের জন্য আট কোটী টাকার পাট এদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি হয়।* বিলাতী কাপড় খরিদ বন্ধ করিলে বিলাতের বণিকগণ্ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যদি খরিদ বন্ধ করে, পাটের অপ্রয়োজন বশতঃ তাহার চাষ বন্ধ হইবে, বা চাষ নিতান্ত কমিয়া যাইবে। তাহাতে রেলী কোম্পানি

---

*পরে শ্রুত হওয়া গিয়াছে বার্ষিক ১২ কোটি টাকা পাটের মূল্যস্বরূপ বঙ্গদেশের কৃষিজীবিগণ বিলাত হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের বৎসর পাট প্রচুর হইয়াছিল, তাহা অন্যবৎসরাপেক্ষা প্রায় তিনগুণ মূল্যে সাহেবেরা খরিদ করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছেন। তাহাতে কৃষকেরা বিপুল অর্থ লাভ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে। নতুবা লক্ষ লক্ষ কৃষক অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিত। বিলাত এদেশের গরীব লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছে তজ্জন্য কি কৃতজ্ঞতা নাই ?

প্রভৃতির পাটের কুঠী ও গুদাম সকল উঠিয়া গেলে বিষম বিপদ্। এক বিঘা ভূমিতে পাটের চাষে কৃষকদের যেরূপ লাভ হয় দশবিঘা ভূমিতে ধান্যের চাষে সেরূপ হয় না। পাট প্রস্তুত হইলেই চাষীরা এক যোগে তাহার মূল্য নগদ প্রাপ্ত হয়। যে বৎসর বিলাতে পাটের রপ্তানি কম হইয়াছে, সেই বৎসর অর্থকষ্ট পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিজীবী প্রজাগণ হইতে খাজনা আদায় করা জমীদার-দিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারগণও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। শুধু মেয়েদের চরকার সুতাতে এক্ষণ আর কুলায় না। সেকালে সঙ্কুলন হইত। তখন পরিচ্ছদের বাহুল্য ও আড়ম্বর ছিল না, এক্ষণ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে পোষাকের আড়ম্বর অনেক বাড়িয়াছে। আন্দোলনকারী মহাশয়গণ পূর্ব্বাপর এ সকল চিন্তা করিয়া সকল দিক্ যাহাতে রক্ষা পায় তাহার সদুপায় বিধান করেন, স্বদেশের হিত করিতে যাইয়া যেন অহিত না করিয়া বসেন। এই প্রার্থনা।”

উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণও সমগ্র মহিলা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মুদ্রাযন্ত্রের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়া একদিন প্রাতঃকালে ১৬।১৭ জন প্রতিবাদকারী মহিলার সেই অংশ ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য মহিলাকার্য্যালয়ে উপস্থিত হন। তখন আমি কার্য্যালয়ে ছিলাম না। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া আমাকে না পাইয়া একখানা কাগজে সকলের নাম লিখিয়া সেই অংশ ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান, এবং তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিলে কিছু ভয় প্রদর্শনও করিয়াছেন। আমি কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া সমুদায় ব্যাপার অবগত হই, তাঁহাদের অনুরোধ ও ভয় প্রদর্শনকে উপেক্ষা করি। সেদিন রবিবার ছিল। রাত্রিতে সামাজিক উপাসনার পরে আমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেন, এবং বলেন সমুদায় কথা ঠিক লেখা হইয়াছে, বরং স্কুলের ছাত্রদিগের অত্যাচারের সকল কথা জানা নাই বলিয়া লেখা হয় নাই। তাহারা বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তবে প্রবন্ধের একটি স্থানে লর্ড কুর্জ্জনের পদত্যাগের বিষয়ে fact ভুল হইয়াছে। এই সকল কথা বলিয়া পরে তিনি বলেন, আপনি এই প্রবন্ধটি এবার পরিত্যাগ করুন, লোকে বড় বিরোধী হইয়াছে। আমি তাঁহার কথায় অসম্মতি প্রকাশ করি। পরে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, অবশেষে বিনয়েরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তখন

আমি তাঁহাকে অধিক কিছু না বলিয়া পরদিন নিম্নলিখিতভাবে পত্র লিখি :—
প্রিয়

কাল যে কার্য্য করিবার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়াছিলেন দুঃখের সহিত আপনাকে লিখিতেছি যে তাহা করিতে আমি আমার অন্তরাত্মার সায় পাইতেছি না। যদি আমি অন্যায় পক্ষে, অপর পক্ষ ন্যায় পক্ষে, এরূপ বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আহ্লাদের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতাম, যখন সেইরূপ বুঝিতেছি না, তখন বিবেক আমাকে তাহা করিতে বাধা দিতেছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে যাঁহাদের মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে মহিলার অঙ্গচ্ছেদ করিলে আমার তদপেক্ষা কম ক্লেশ হইবে না। বলুন আমি আন্তরিক প্রেরণানুসারে চলিব, না লোকের কথানুসারে চলিব ? আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান বিমূঢ় ক্ষুদ্র বালক নহি, তর্ক বিতর্ক করিয়া আমাকে বুঝাইতে হইবে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন মানুষকে ভয় না করিয়া ভগবানের ইঙ্গিতানুসারে চলিতে পারি।”

অতঃপর রাজধানীতে ও নানাস্থানের পথে ঘাটে মাঠে বাজারে “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি, আন্দোলন ও বক্তৃতাদি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া উঠে। কলিকাতার পটলডাঙ্গা গোলদীঘির তীর আন্দোলনকারীদের কেন্দ্রস্থল হয়। ছোট ছোট বালকেরা বাজারে ও দোকানে বিলাতী দ্রব্য ক্রয়কারীদের প্রতি উৎপাত ও অত্যাচার করিতে থাকে। সকলে শোকচিহ্ন ধারণ করে। যে দিন ঢাকা নগরে রাজধানীর সূত্রপাত ও প্রধান বিচারালয় সকল স্থাপিত হয়, সে দিন কলিকাতাস্থিত সকলে বাবু বিপিন পাল প্রভৃতি বক্তা ও দেশহিতৈষী চারি পাঁচজনের দ্বারা প্রচারিত বিধিমতে দুঃখ সূচক অরন্ধনের নিয়ম পালন করেন। আন্দোলনকারিগণ চেষ্টা যত্ন করিয়া নগরের বাজার পশার বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি এই সকল নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করিয়া প্রেরিত দরবারে নিম্নলিখিত মন্তব্য অর্পণ করি।

বিগত ১৯০৫ সন, ৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীদরবারে বর্ত্তমান বঙ্গ বিভাগের আন্দোলন ও অরন্ধন ব্রত গ্রহণ বিষয়ে আমি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম দরবারের পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবার উদ্দেশ্যে দরবারের সভ্যদিগের অভিমতানু-সারে তাহার ভার গ্রহণে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত হইয়াছে :—আমি বর্ত্তমান আন্দোলনে এবং কল্যকার অরন্ধন ব্রত বা অরন্ধন নিয়ম পালনে যোগদান করিতে পারি নাই, যোগদান না করিবার কয়েকটি কারণ আছে ;—

১। আমি একজন প্রেরিত দরবারের সভ্য, নববিধান প্রচারক, দরবারের বিধিমাত্র মান্য করিয়া চলিতে বাধ্য। বাবু বিপিন পাল ও তাঁহার দুই চারিজন বন্ধুর নামে সাধারণের জন্য যে অরন্ধন ব্রতের বিধি নির্দ্ধারিত হইল, দরবারের সম্পাদকের নামে তাহা প্রচার হইলে আমি তাহা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতাম।

২। রাজ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ-শাসনের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশের অকল্যাণ, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবে, একটি দুঃখের ব্যাপার হইবে, এই আশঙ্কা; তৎস্মরণার্থ বাবু বিপিন পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ অরন্ধন ব্রতের বিধি সাধারণের জন্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা একটি দুঃখব্রত। আমার মনে সেই আশঙ্কা কিছুই হইতেছে না বরং তদ্বিপরীত পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণ হইবে, সে দেশ নানা বিষয়ে পশ্চাদ্‌গামী ও অনুন্নত, এক্ষণ হইতে অগ্রসর ও উন্নত হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার জন্ম স্থান ঢাকা জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা নিবাসী ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। অরন্ধনব্রতরূপ দুঃখব্রত পালন করিলে আমার পক্ষে অসত্যাচরণ ও অধর্ম্ম হয়।

৩। বর্ত্তমান আন্দোলন ও ব্রতের পক্ষে বহু জনতা, তাহাতে যে সমস্ত জিনিষ খাঁটি হইল ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি দেখিতেছি যে, এই আন্দোলনের মূলে রাজার প্রতি বিষম বিদ্বেষ ও ইংরাজজাতির প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ হইতে কুচবিহার বিবাহের তুমুল আন্দোলন ঘটিয়াছিল। বহুলোক প্রায় পনের আনা ব্রাহ্ম আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, অনেক প্রচারকেরও পদস্খলন হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের মূলে সত্য ছিল, এরূপ কি বলিতে পারি? কোটি কোটি লোক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা না করিয়া পুতুল পূজা করে, তাহাদের তুলনায় ব্রাহ্মগণ সংখ্যার মধ্যেই গণ্য নয়। ইহা বলিয়া পুতুল পূজাকে কি খাঁটি জিনিষ বলিতে পারি? কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনে আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও ও অশ্রদ্ধা অন্তরে বদ্ধমূল হওয়াতে বহু ব্রাহ্ম যুবা ও বালকের ঘোরতর নৈতিক অবনতি এবং জীবনের চিরক্ষতি ও দুর্গতি হইয়াছে। এক্ষণও সংশোধিত হয় নাই। তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে যুবকগণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশেষ উৎসাহী ও উত্তেজিত; তাহাদের

অনেকের দ্বারা ভয়ানক অনৈতিক কার্য্য সকল ঘটিয়াছে। তাহাতে তাহাদের মানসিক অত্যন্ত অকল্যাণ হইয়াছে, এবং ছাত্রজীবনের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সংশোধন হওয়া দরকার। ইহা ভাবিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি পত্রিকাবিশেষ সময়ে পড়িতাম, ইতিপূর্ব্বে একখানা পত্রিকা খুলিয়া দেখিলাম, অমুক স্থানের স্কুলের একটি ছাত্র বিলাতী কাপড় পরিয়া স্কুল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, অপর অনেক ছাত্র তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে, ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এইরূপ অত্যাচার ও অনীতির প্রতিপোষক সংবাদে পত্রিকাখানা পূর্ণ, সে সকল বিশেষ প্রশংসার কাজ হইয়াছে বলিয়া, সম্পাদক সাধারণের নিকটে প্রচার করিতেছেন ভাবিয়া তখন হইতে আমি উক্ত পত্রিকা পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এইরূপ প্রচার দ্বারা নানা স্থানের ছাত্র ও সাধারণ লোককে তদ্রূপ অনৈতিক কার্য্যে উৎসাহ দান করা হইতেছে। যে স্থানে মহা গৌরবাস্পদ জগন্মান্য উপকারী লোকের অপযশ রটনা ও অবমাননা হয়, ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ গুরুজনগণ সাধারণ লোকের নিকটে ঘৃণিত ও অপমানিত হন, সে স্থানে আমি প্রাণের যোগ রক্ষা করিতে পারি না।

১৩১২ সালে আশ্বিন মাসের মহিলাতে "মোসলমান রাজত্ব ও ইংরাজ রাজত্ব এবং ভারত মহিলা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিধানাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন টাউন হলে রাজভক্তি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তাঁহার শেষাংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"আইনকে গ্রহণ করিব, বিচারকের ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্বকে মান্য করিব। যাহাতে সুশাসনপ্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাজভক্তি ব্যক্তিগতভাবে পরিণত হয়, ততক্ষণ আমার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা প্রাচীন হিন্দুজাতির বংশধরগণ, আমাদের পক্ষে সত্যই এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। বহু শতাব্দী হইতে হিন্দুজাতি রাজার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর নিকট রাজভক্তির অর্থ ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে ভালবাসা ও শাসন বিভাগের কর্ত্তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা। হিন্দুস্থান নিজের রাজাকে প্রগাঢ় আনুগত্যের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুর নিকট রাজাকে বিশ্বাস করার অর্থ রাজভক্তি বা রাজাকে ভালবাসা। হিন্দু গৃহস্থ পিতাকে গৃহকর্ত্তৃরূপে ভক্তি করেন এবং ভালবাসার সহিত তাঁহার আজ্ঞাপালন করেন ; সেই প্রকার রাজাকে রাজ্যের

পিতৃরূপে ভালবাসেন, ও আনন্দের সহিত আজ্ঞা পালন করেন। রাজা যে প্রজাসাধারণের পিতৃস্বরূপ, ইহা প্রধানতঃ হিন্দুভাব, হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং দেশীয় প্রজা সকলের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি তাহার জলন্ত প্রমাণ। হিন্দুমতই যথার্থ মত। ইহা স্বভাবের অত্যন্ত উপযোগী। ভ্রান্তমতবাদীরা ইহা অস্বীকার করুক, হৃদয়বিহীন কল্পনার সেবকগণ ইহার বিরুদ্ধে বলুক তাহাতে কি? আমি তেজের সহিত বলিতেছি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রাজাকে সাধারণের পিতৃরূপে দর্শন করে। তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন তাঁহার শাসন প্রণালী দোষশূন্য না হইতে পারে তথাপি সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভক্তি করে, যেমন সন্তান তাহার পিতার দোষ দুর্ব্বলতা বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। রাজ্যের আইন-সঙ্গত অভিভাবকের উপর যে প্রগাঢ় ভক্তি তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার পক্ষে কোন কারণই যথেষ্ট নয়। শান্ত স্বাভাবিক অন্তঃকরণ কখনও রাজনৈতিক কল্পনাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ব্যক্তিবিহীন ভাব ত্যাগ করে ইহা একটি ব্যক্তি চায়, সেই ব্যক্তি রাজা কিংবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, যাঁহা হইতে নিয়ম ও রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে আমার রাজবিশ্বস্ততার যথার্থ অর্থ কেবল আইন ও পার্লিমেণ্টকে মান্য করা নয়। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ব্যক্তিগত অনুরাগ। কেবল সাংসারিক ভাবে রাজভক্তিতে মন এত সরস হয় না, কিন্তু ইহা গভীর ধর্ম্মভাবের ফল। রাজভক্তির অর্থ বিধাতাকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই রাজভক্তির মধ্যে এত পবিত্রতা গভীরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রত্যেক লোকের অন্তরে ও সমাজের মধ্যে এই পবিত্র বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান? সমস্ত জাতির উন্নতির মধ্যে কি ভগবানের বিশেষ বিধান দেখিতে পাও না? নিশ্চয়ই ভারতে ইংরাজশাসনকাল, ইতিহাসের একটি সামান্য অধ্যায় নয়, কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ইংরাজের পিতার ন্যায় শাসনে সম্পন্ন হইতেছে। যে পুস্তকে একথা লিখিত হয় সত্যই একটি পবিত্র পুস্তক। ইহাতে আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে ভগবানই ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন করিতেছেন। তুমি কি আমাদের রাজার রাজপদবী গ্রহণের দিনে দিল্লির মনোহর দৃশ্যে উপস্থিত ছিলে? কতকগুলি লোক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারে কোন

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় নাই। সত্যই এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহাই হউক না কেন, কেহই এ কথা অস্বীকার করিতে পারেনা যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল। আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে যে, আমাদের মহাহৃদয় প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্মুখে আমি বলিতে পারিলাম। সে স্থানে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী উপস্থিত ছিলেন? তাঁহার নিকট আমি বলিতেছি তিনি কি এই রাজকীয় সভাতে নীতি ও ধর্ম্মের প্রাধান্যের দৃশ্য দর্শন করেন নাই? বিশ্বাসীর চক্ষু কি দেখে নাই, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়া ভিক্টোরিয়ার মস্তকে সম্রাটের মুকুট পরাইয়া দিলেন। তিনি কি শুনিতে পান নাই, যে ঈশ্বর রাণীকে বল্‌ছেন্ ন্যায় সত্য করুণার দ্বারা তোমার পরামর্শ-দাতাদের নিকট যে আলোক আইসে সেইরূপে শাসন করিও এবং রাজ্যে পবিত্রতা শান্তি ও উন্নতি স্থাপিত হউক। তুমি এই দৃশ্যকে ও এই রাণীকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবে? এই দৃশ্যেতে কি কোন সত্য নাই? এই পতিত জাতিকে উত্তোলন করিয়া অন্য জাতির সমান করিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ভগবানের হাতের একটি যন্ত্র, কে ইহার অস্বীকার করিবে? সেই গুরুভার অল্পদিন হইল তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। হে শিক্ষিত দেশীয়গণ, তোমরা তোমাদের স্বর্গের নিয়োজিত রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। তুমি যদি ভক্তি না কর তাহার অর্থ ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হওয়া ও ভগবান অবিশ্বাস করা। যখন তোমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন ইংরাজ শাসন ঈশ্বরের দূত হইয়া তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিযাছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে তোমাদিগকে বর্ত্তমানাবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে, সেই ইংরাজ শাসনকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই কাজ মানুষের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের এবং ইংরাজ জাতির দ্বারা তিনিই ইহা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মনোনীত যন্ত্র জানিয়া তোমরা রাজাকে ও সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মান্য কর। আমরা যতই রাজভক্ত হইব, ততই আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া বহুদিন পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। অপর দিকে দেখ, ইংলণ্ড পক্ককেশ ভারতের পদতলে বসিয়া এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা করিতেছেন, এবং বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিতর হইতে অপ্রকাশিত অমূল্য রত্ন সকল সংগ্রহ করিবার জন্য সমস্ত ইউরোপ ভারতের প্রাচীন বস্তুগুলির দিকে

মনোযোগ দিয়াছেন। এইরূপে আমরা ইংলণ্ডের নিকটে বর্ত্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছি, অপর দিকে ইংলণ্ড ভারতের নিকট অপর জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। মহাশয়গণ, তাহাতে ইংরাজজাতির আগমনে বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন দেখিতে পাই। অর্থাৎ এই দুইজাতি আর্য্যজাতির দুইটি ভিন্ন পরিবার হইতে উদ্ভূত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে. স্বর্গের সুনিয়মে কতকগুলি মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই ভারতে সেই দুই জাতি মিলিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিবিষয়ে পরস্পর আদান প্রদান করিয়া যথার্থ উন্নতি ও অক্ষয় গৌরব লাভ করে ভগবানের ইচ্ছা। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, রাজকীয় সভাতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ও তাঁহার প্রতিনিধিকে এ দেশের রাজামহারাজাগণ মিলিতভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তখন আরও অধিক আনন্দিত হইব, যখন দেখিব, ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ এবং ইংরাজজাতি একটি বৃহৎ মিলিত দলে, সকল রাজার রাজা ও সকল প্রভুর প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হইবে। ইংলণ্ড তাহার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদিগকে সেই সম্পূর্ণ-ভাবে নিকটবর্ত্তী হইতে সাহায্য করুক। ভারতে ইহাই তাহার (স্বর্গের প্রেরিত) কার্য্য। সে যেন এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। ইংলণ্ড তাহার পরিশ্রম ও শিল্প তাহার কার্য্যকরী বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দর্শন আমাদিগকে প্রদান করুক, যাহা এদেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে দেশ কুসংস্কার দ্বারা ভয়ানকরূপে আচ্ছন্ন। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাচীন ঋষি মুনিদের কথা ভুলিয়া যাইব না। হে ভারতের পূজনীয় প্রাচীন যোগীগণ আমাদিগকে যোগ ভক্তি বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। ইংলণ্ড আমাদিগকে অভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের মতে দীক্ষিত করুক। আর্য্যদিগের এই ভারতের মুনিগণ আমাদিগকে স্বর্গের উন্মত্ততা দান করুন। আধুনিক ইংলণ্ড আমাদিগকে কঠিন বিজ্ঞান শিক্ষা দিক ও প্রাচীন ভারত সুমিষ্ট কাব্য শিক্ষা দিক্। আধুনিক ইংলণ্ড রচনা শিক্ষা দান করুক, এবং এই সুবিস্তৃত পূর্ব্বদেশ তাহাতে মনোহর বর্ণ দান করুক। এই স্বর্গীয় মত গ্রহণ কর, যাহাতে কিছু শ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুমিষ্ট তাহা পাইবে; যাহা দৃঢ় ও গভীর ভিত্তির উপর স্থাপিত, যাহাতে সত্য ও প্রেম মিলিত হইবে। কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও মত্ততা দ্বারা দীক্ষিত কেবল পঞ্চাশজন যুবককে আমাদের দাও, তাহারা ঈশ্বরের সৈন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করুক, জয়লাভ করুক, এবং পূর্ণ সময়ে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সত্যের পতাকা উড্ডীয়মান করুক।"

স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক তাঁহার শেষ জীবনে বিরচিত "আশীষ" নামক পুস্তকে ইংরাজশাসনবিষয়ে তাঁহার এরূপ অভিমত ব্যক্ত :—

ইংরাজ শাসন ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি ; তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন, ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ, হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীকার করি যে, তুমি আমাদের ভাবী উন্নতি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পরাক্রান্ত ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্রজয়ী জাতির নিকটে এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহাদের শাসন-প্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য এবং ইহাও স্বীকার করি না যে, রাজনীতি, লোকহিতৈষণা, ন্যায় যাথার্থ সাম্যবিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহা ত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এসকল ত্রুটির ফলভোগে আমরা পুনঃপুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করি যে এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে কতদিন পরে জানি না, সমুদায় মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একতা সম্পন্ন হইবে। আমরা যদি এই ইংরাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটিল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করি, তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর স্বাত্ত্বিকভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেইত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাট ও তাঁহার মহিষীকে; তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর। এদেশবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোক সহানুভূতি দাও, এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান কর।"

নববিধানের মূলমতের অন্তর্গত রাজভক্তি একটি মত। যাঁহারা নববিধান মানেন, তাঁহারা রাজভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপারে যোগদান করিতে পারেন না। প্রতিবাদ ও আন্দোলন সাধারণ সমাজের জন্য। তাঁহারা এই ব্যাপারে উৎসাহী ও অগ্রণী হইবেন আশ্চর্য্য নহে। কেন না প্রতিবাদ আন্দোলনই তাঁহাদের জীবন। দুঃখের বিষয় এই রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রতিবাদ ও আন্দোলনের

ব্যাপারে অনেক নববিধানবাদী যোগদান ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ ব্রীটিশ গভর্নমেণ্টের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, নিজদোষে তাঁহারা বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

লর্ড কুর্জ্জনের অন্য দোষ থাকিতে পারে বা আছে, এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে। লর্ড কুর্জ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্নর জেনারল হইতে সুশাসন ও সৈন্যচালনায় সুব্যবস্থার জন্য সীমান্তবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জিলা আসাম চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করিবার জন্য প্রস্তাব চলিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত কাছার জিলা ও সুবিস্তীর্ণ শ্রীহট্ট জিলা আসাম রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এবার লর্ড কুর্জ্জন উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সমুদ্যোগী হন। তাহাতে ভীষণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা হইতে বক্তারা পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে যাইয়া সভাসমিতি ডাকিয়া বক্তৃতা করিয়া সাধারণ লোককে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ইংরাজি ও বাঙ্গালা কতকগুলি পত্রিকায় রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জনকে ভৎর্সনা এবং তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়। তিনি বলেন তোমাদের ইচ্ছানুসারে এই ব্যবস্থা রহিত করা যাইতে পারে না, তোমাদের যাহাতে সুবিধা হয় এবং কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় বিধিপূর্ব্বক তাহার উপায় করা যাইবে। পরে তিনি চীফ কমিশনরের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম রাজ্যশাসনের জন্য একজন লেপ্টেনেণ্ট গভর্নর নিয়োগ নির্দ্ধারণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন প্রধান নগর ঢাকা রাজধানী, বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্ত্তী চট্টগ্রাম নগর প্রধান বাণিজ্য স্থান হইবে স্থির হয়। তাহাতেও রাজপ্রতিনিধি বঙ্গ বিভাগ করিয়া নিজের দুরভিসন্ধি সাধন করিতেছেন বলিয়া বিরোধীবক্তা ও সম্পাদকগণ তাঁহাকে গালি দিতে থাকেন। তজ্জন্য লর্ড কুর্জ্জন বিরক্ত হইয়া শক্ত কথা কহিয়াছেন, এবং তোমাদের এরূপ একতা ভঙ্গ করিতে হইবে, এ প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের এমন কি দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তোলা হইয়াছিল। তাহাদিগের অনেকে যথেচ্ছাচারী হইয়া শিক্ষকদিগের আদেশ ও স্কুল কলেজের নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলে, এবং নানা প্রকার উৎপাত করিয়া স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দান করে। লর্ড কুর্জ্জন কাহারও কথায় টলিবার লোক নহেন, ভ্রূভঙ্গিতে ভীত হইবার লোক নহেন। তিনি মন্ত্রীদিগের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তুল ছিলেন না। মহাতেজীয়ান অবিচলিত সুদক্ষ পুরুষ। মন্ত্রিসভার এবং লণ্ডনস্থ ভারতমন্ত্রীর

অনুমোদনে নিজের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহাতে হৈ চৈ বৃদ্ধি হইল, রাজপ্রতিনিধি এবং রাজজাতির প্রতি আন্দোলনকারীদের আক্রোশ বাড়িল, নিন্দা ও দোষঘোষণার স্রোত প্রবল বেগ ধারণ করিল। সকলে কৃতঘ্ন হইলেন, উপকারীর উপকার ভুলিয়া গেলেন, কেবল ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা নিন্দারটনায় প্রমত্ত হইলেন; ইহা ভাবিবেন না যে, নিজেদের কোন ক্ষমতা নাই, সকল ক্ষমতা গভর্নমেণ্টের হস্তে। উদার গভর্নমেণ্ট দয়া ও উপেক্ষা করিয়া এ সকল বিরুদ্ধ ব্যাপার হইতে দিয়াছেন। নিবারণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

নূতন রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা হইয়া গেলে পর সকলেই বিশেষ স্বদেশ প্রেমিক হইয়া উঠিলেন, বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জন ও দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও তাহার উন্নতি সাধনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। ইংরাজ জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির বিষম বিচ্ছেদ ঘটিল, সম্মিলন শত বৎসর দূরে পড়িল।

দেশীয় শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি হয়, ইহা দেশীয়লোকমাত্রেরই প্রার্থনীয় বিষয়। তাহার সঙ্গে অপ্রেম ও হিংসা বিদ্বেষ অতিশয় অকল্যাণজনক। রাজার উপর প্রজার জোর জবরদস্তি চলে না। কোন অধিকার পাইবার জন্য প্রজা যথাবিধি প্রার্থনা করিতে পারেন। নূতন প্রদেশের প্রধান শাসন-কর্ত্তাকে ও জিলার মাজিষ্ট্রেটকে অপমান করা, তাঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার অনেক অবাধ্যতা সামান্য প্রজা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ পুলিস ও গোর্খা সিপাহী দ্বারা ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক পর্য্যন্ত আক্রান্ত ও অপমানিত হইয়াছেন। তত্রত্য প্রধান শাসনকর্ত্তা ও কোন কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট অধৈর্য্য হইয়া বিশেষ ঘটনায় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আইন সঙ্গত কার্য্য করেন নাই, তাহাতে তাঁহাদের যে ত্রুটি হইয়াছে কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আন্দোলনকারীদের উৎপাত ও উপদ্রব কি তাঁহাদের উত্তেজনার কারণ নহে? নিজেদের দোষত্রুটি অন্যায়াচরণ কিছুই উল্লেখ না করিয়া বরং গুপ্ত রাখিয়া অনেক স্থানে তিলকে তাল করিয়া গভর্নমেণ্টের ও ইংরাজ জাতির দোষ ঘোষণা কি করা হয় নাই? সে দিন প্রদর্শনী মহামেলার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড মিণ্টো সুন্দর কথা সকল বলিয়াছিলেন, "তোমাদের স্বদেশী শিল্প ও পণ্যজাতে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে, আমি সে বিষয়ে সহায়তা করিব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমরা মিলিত ভাবে কাজ কর, বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছুই করিও না।"

তাহার পরই মেলার কোন দোকানে বিলাতী দ্রব্য রাখা হইয়াছে বলিয়া দলাদলি হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যখন এদেশের নারীজাতির কল্যাণোদ্দেশ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে স্বামিসহবাস করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে লর্ড ল্যান্সডাউন সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ করিতেছিলেন, তখন এই হতভাগ্য দেশের লোক সকল তাঁহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন ও চিৎকার করিয়াছিল। একদিবস আন্দোলন-কারিগণ বক্তৃতা করিয়া ও পত্রিকায় লিখিয়া মহানগরীর দোকান পসার বন্ধ করাইয়াছিলেন। দেড় লক্ষ লোক রাজপ্রতিনিধির মনঃপরিবর্ত্তনের জন্য গড়ের মাঠে হরি সঙ্কীর্ত্তন এবং কালীঘাটে যাইয়া কালী পূজা ও ২০।২৫ মণ ঘৃত জ্বালাইয়া হোম করিয়াছিলেন। তৎপরদিনই মন্ত্রিসভার সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল বলিয়া হিন্দুজাতি বিষম উত্তেজিত এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া হৈ চৈ করিয়াছিলেন। কয়েকজনে মিলিয়া একটা হুজুক তুলিলেই এদেশে সহজেই ঘোরতর আন্দোলন ও মহাজনতা হয়। স্থির গম্ভীর ভাবে শুভাশুভ চিন্তা কয়জন লোকে করে? তরলপ্রকৃতি লোকেরা কোন হুজুক পাইলেই মাতিয়া উঠে। এবারকার দীর্ঘকালব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে অনেক মোসলমানও আসিয়া হিন্দুদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন, অনেকে বেতন লাভে বক্তা হইয়াছেন। একজন ধর্ম্মপ্রচারক মোসলমান আমাদিগকে বলিয়াছেন, "আমরা স্থানে স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করি, এদিকে স্বদেশী বক্তৃতা করিয়াছি বলিয়া আন্দোলনকারীদের পত্রিকায় প্রচার করা হয়। বড় দুঃখের বিষয়।"

নূতন রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটিল বলিয়া যত আর্ত্তনাদ ও আন্দোলন। কিন্তু সম্বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে, কি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। উভয় প্রদেশের বক্তা ও লেখকগণ সম্মিলিত ভাবে উৎসাহ সহকারে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন। রেলওয়ে ও ষ্টীমার যোগে পূর্ব্ববৎ উভয় প্রদেশে সম্মিলিত ভাবে বাণিজ্যাদি চলিতেছে, প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারীর অবাধে গমনাগমন হইতেছে, বিবাহাদি সম্বন্ধ যোগে উভয় প্রদেশবাসী লোকের সঙ্গে পরস্পর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা চলিয়াছে, তাহার এক বিন্দুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অঙ্গচ্ছেদ কেমন করিয়া বুঝা যায়। যদি প্রকৃত একতা চাও, তবে হিন্দুসমাজের তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং ছত্রিশ

প্রকার জাতিভেদকে দূর করিয়া সকলকে এক ধর্ম্ম ও এক জাতিতে বদ্ধ কর। পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসীদের প্রতি "বাঙ্গাল", উড়িষ্যাবাসীদের প্রতি "উড়িয়া", বিহার প্রদেশস্থ লোকদিগের প্রতি খট্টুয়া' এইরূপে বিচ্ছেদজনক ও ঘৃণাসূচক শব্দ প্রয়োগে নিবৃত্ত হও। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পরস্পর একতাবন্ধন জন্য কবির মস্তিষ্ক সম্ভূত কল্পনাজাত উপায় অরন্ধন নিয়ম ও রাখিবন্ধন অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতে কেবল ইংরাজজাতির সঙ্গে বিচ্ছেদই বৃদ্ধি পাইবে। ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের সকল কুসংস্কার ও অসত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে পড়িয়া বহু ব্রাহ্ম পরিশেষে উক্ত দুই কুসংস্কারকে আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অরন্ধন নিয়ম ও রাখিবন্ধন এই দুই কুসংস্কারের সাম্বৎসরিক ব্যাপারে মফঃস্বলের একজন পরিণত বয়স্ক গণ্যমান্য জ্ঞানী ব্রাহ্মকে অতিশয় উৎসাহী ও মত্ত দেখিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত পত্র লিখিয়াছিলাম ;—

"শাস্ত্র এই—

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতিগণনা লঘুচেতসাম্,
উদার চরিত্রানান্তু বসুধৈবঃ কুটুম্বকম্।"

"অর্থাৎ ইনি বন্ধু উনি শত্রু লঘুচিত্ত ব্যক্তিদের এরূপ গণনা, উদারচরিত্র লোকদিগের পক্ষে সমগ্র জগৎ আত্মীয়।

"আমাদের ধর্ম্ম জগতের সমস্ত লোককে প্রেম করা, শত্রুকেও প্রেম করা। উপকারীর উপকার স্বীকার করা, কৃতজ্ঞতা দান পরম ধর্ম্ম ; দ্বেষ হিংসা যে মহাপাপ ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? সদ্ভাব ও সম্মিলনের মধ্যে স্বর্গ প্রকাশিত হয়, বিচ্ছেদ ও অসদ্ভাবের ভিতরে নরক।

"আমরা কি আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতি সভ্যতা স্বাধীনতা সুখ সুবিধা কুশল শান্তির জন্য জ্ঞানোন্নত সভ্য ইংরাজ জাতির নিকটে প্রভূত উপকৃত ও ঋণী নহি ? ইংরাজ শাসন আর তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমানের শাসনে কি আলোক অন্ধকার ও স্বর্গমর্ত্তের ন্যায় প্রভেদ নহে ? এই দুর্গত পতিত দেশ ব্রীটিশসাসনাধীন হওয়া কি ভগবানের বিশেষ কৃপার বিধান নহে ? আজ ব্রীটিশশাসনের প্রভাবে পদদলিত পরাধীন জাতির পক্ষে শত শত বিষয়ে উন্নতি, সুখ সচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইয়াছে, আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও অস্বাভাবিক না হইলে কি ইহা অস্বীকার করিতে পারি ?

স্বীকার করি এদেশে সমাগত ইংরাজজাতির ও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেক দুষ্ট অত্যাচারী ও স্বার্থপর লোক আছে। তাহাদের অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য যথাবিধি অভিযোগ ও সমুচিত প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইংরাজ জাতিসাধারণের প্রতি দ্বেষ হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করা এবং গুণ গ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণ ও দোষ ঘোষণা অপিচ নিন্দাচর্চ্চা করা কল্পনার তুলিকাদ্বারা তাঁহাদের নানা দোষ চিত্রিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধারণ করা, স্বদেশী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে একটি চিরবিচ্ছেদের সুদৃঢ় রেখা স্থাপন করা এ দেশের পক্ষে অতি কৃতঘ্নতা ও দুর্ভাগ্যের কারণ। আমাদের দেশের রাজা জমীদারও প্রবল লোকদের মধ্যে কত মনুষ্যপশু স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত প্রজাপীড়ক স্থানে স্থানে বিদ্যমান, তাহাদের নিষ্ঠুর লোমহর্ষণ কাণ্ড ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজদিগের দুর্ব্বৃত্তরা তাহাদের অনেকের দুর্ব্বৃত্ততার নিকটে দাঁড়াইতে পারে না। এরূপ লোকদিগকে আমরা উপেক্ষা ও ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি।

অধিক দিন হয় নাই, ব্রীটিশ শাসনাধীন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী এই মহানগরী কলিকাতায় রাজ প্রতিনিধি ও ইংরাজ জাতিসাধারণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সময়ে মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর শিশু ইংরাজ জাতি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিরোধী, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী, কুসংস্কারের প্রতিপোষক রক্ষণশীল হিন্দু তিলক আগমন করিয়াছিলেন, তিনি রাজবিদ্রোহিতাপরাধে ইতিপূর্ব্বে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। আন্দোলনকারিগণ যেরূপ মহাঘটা করিয়া সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আমি বোধ করি কখনও কলিকাতায় এদেশের কোন রাজা মহারাজের এ প্রকার অভ্যর্থনা হয় নাই। চারি পাঁচ হাজার লোক মহাসমারোহে সিশান উড়াইয়া গান গাহিয়া অনেকে অশ্বস্থানীয় হইয়া গাড়ী টানিয়া হাবড়া ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাজধানীর বক্ষে সিংহবাহিনী ভবানী মূর্ত্তির পূজা করিয়া শিবাজীর উৎসব ও অন্যান্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ খ্যাতনামা কোন কোন ব্রাহ্মও সেই পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদিতে উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে কয়েকদিন হুলুস্থুল ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তিলকের উপস্থিতি উপলক্ষে একদিন অপরাহ্নে গোলদিঘিতে স্বদেশী বিরাট সভা ও বিরাট বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পর হাজার হাজার লোকের হস্তে এরূপ কাগজ বিলি করা হয় তাহাতে—তোমরা ইংরাজ

চরিত্রে সাবধান হইও, তাহারা দুষ্ট ধূর্ত্ত চোর ডাকাত ইত্যাদি ভাবের ভয়ানক কথা সকল মুদ্রিত ছিল। তিলক সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় ধীরবক্তা নহেন যে, বাগ্মিতার চাতুর্যে শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি একজন সমাজসংস্কারকও নহেন বরং সামাজিক সময়োপযোগিনী উন্নতির বিরোধী রক্ষণশীল হিন্দু, কেবল ইংরাজ জাতির একজন মহাসাহসী শত্রু। তাঁহার প্রতি আন্দোলনকারীদিগের এরূপ সম্রাটোচিত আদর অভ্যর্থনাতে কি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ? গভর্নমেণ্ট এই সকল ব্যাপার ভ্রূক্ষেপে নিবারণ করিতে পারিতেন, রাজধানীর বক্ষে ইহা হইতে দিলেন। কত উদারতা ! কত ক্ষমা ! প্রজার স্বাধীনতার প্রতি কত সম্মান প্রদর্শন ? সভ্য ফরাসী গভর্নমেণ্টের শাসনাধীন চন্দননগরে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার কাহারও স্বাধীনতা নাই, সে বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা দান করিতে কেহ অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

এদেশের শিল্পজাতের উন্নতি ও দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার হয় ইহা যে একান্ত-প্রার্থনীয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? সকলের এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ ও যত্ন চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু বয়কট ও বিলাতীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে বিদ্বেষ বিষ রহিয়াছে। তাহাতে প্রভূত অকল্যাণের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুগে পরস্পর বিনিময় ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। ইংলণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যাদি শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, সে দেশের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর যে সকল মহাকল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিলে আমরা কি নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতভাগ্য হইয়া পড়ি না ? কেবল বিলাতী কাপড় না পরিলে ও বিলাতী লবণ না খাইলে স্বদেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। স্বদেশী বস্ত্রের সূত্র বিলাতী, স্বদেশী লবণও বিলাতী লোকের সাহায্যে আমরা পাইতেছি। লবণের টাকাও লোকের হস্তগত হইতেছে। আমরা জাপান ও জর্ম্মনীর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব, ইংলণ্ডের দ্রব্য ব্যবহার করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভিন্ন অন্য কিছু কি বুঝায় ? এরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া কি ইংরাজ জাতির সঙ্গে সম্মিলনের আশা কখনও করা যায় ? লর্ড কুর্জ্জন বঙ্গবিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজজাতি সাধারণের অপরাধ কি ? লেপ্টেনেণ্ট গভর্নার ফুলার সাহেবের অপরাধ কি ? তাঁহাকে অপমান করা কেন হইল ? তিনি একজন মহামান্য রাজ্যাধিপতি ছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির শক্তি ও গুণের পরস্পর বিনিময়ের উপর জাতীয় উন্নতি

নির্ভর করে, ইহা মঙ্গলময় বিধাতার বিধি। তাহার প্রতিরোধ করিতে গেলে বিধাতাকে অগ্রাহ্য করা হয়, তজ্জন্য দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলে ধর্ম্ম ও নীতি নয়, অধর্ম্ম, অনীতি ও বিদ্বেষ। মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জনের প্রতি ক্রোধ বিদ্বেষই ইহার উৎপত্তি ভূমি। পূর্ব্ববঙ্গের জন্য নূতন শাসন ব্যবস্থা বহু প্রজার অমতে তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ কল্যাণ ও রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলার জন্য যে এই ব্যবস্থা হইবে লর্ড কুর্জ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপ্রতিনিধি হইতে বহু দিন পূর্ব্বে এরূপ স্থির হইয়াছিল, লর্ড কুর্জ্জন তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। ইংলণ্ডের ভারতমন্ত্রীর ও এখানকার মন্ত্রিসভার এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের মত পাইয়াই তিনি এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সম্রাটেরও সম্মতি পাইয়াছেন। এরূপ শাসন-ব্যবস্থা হওয়া অনিবার্য্য ছিল, কেবল লর্ড কুর্জ্জন কার্য্যে পরিণত করিয়া নিমিত্তের ভাগী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জিলা আসাম চীফ কমিশনরের শাসনাধীন হইবে এরূপ কথা ছিল, কিন্তু লর্ড কুর্জ্জন নূতন লেপ্টেনেণ্ট গর্ভনরের শাসনাধীন করিয়া সে দেশের প্রজাবর্গের নানা বিষয়ে সুবিধা ও উন্নতির পথ মুক্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত পূর্ব্ববঙ্গের ও আসামের অচিরে সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে দেশে বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইবে, তথাকার গরিব দুঃখী উপযুক্ত লোক বাঙ্গাল বলিয়া যে, কলিকাতায় সমুদায় অফিস হইতে তাড়িত হইয়া থাকে তাহাদের চাকরী জুটিবার ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপায় হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের সম্বন্ধে আমি এসকল উন্নতি ও উপকার স্পষ্ট দেখিতেছি। এতদ্বারা আমি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পরস্পর বিচ্ছেদের কোন আশঙ্কা করি না। যদি রেলওয়ে ষ্টীমার ইত্যাদির যোগে উভয় প্রদেশের সঙ্গে না থাকিত, তৎসাহায্যে প্রতিদিন উভয় প্রদেশ নিবাসী সহস্র সহস্র লোকের উভয় প্রদেশে নানা কার্য্যও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে দ্রুতগতি যাতায়াত না হইত, তাহা হইলে কথঞ্চিত দূরত্ব ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা করা যাইত। পরস্পর মিলিত হইয়া উভয় প্রদেশের বক্তাদিগের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদেরও কোন বাধা হইতেছে না।

স্কুল কলেজের ছাত্রগণ উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে ও কলিকাতায় যে সকল অন্যায় কার্য্য ও অত্যাচার করিয়াছে তাহা আমি দুঃখের সহিত স্মরণ করি। তুমুল আন্দোলনের সময় আমি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঢিল ছুড়িয়া মারা, য়ুরোপীয়

মহিলার গায়ে কাদা নিক্ষেপ করা, স্কুল কলেজের নিয়মবিধি অগ্রাহ্য করিয়া চলা, শিক্ষকদিগকে অমান্য করা, এমন কি মহামান্য রাজ্যাধিপতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মহোদয়কে পর্য্যন্ত অপমান করা, বিলাতী লবণের নৌকা নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া, এবং হাট-বাজারে দৌরাত্ম্য করা ইত্যাদি অনেক ছাত্র ও আন্দোলনকারী দ্বারা এই সকল দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতেই তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর উত্তেজিত হইয়া গোরখা সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা অত্যাচার করে, পুলিসও অত্যাচার করে, কোন কোন মাজিষ্ট্রেট অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাচ্যুতি দুঃখের কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া সংবাদপত্রে অজস্র গালাগালি করা ভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে? ইহা কি আমাদের শিষ্টতা ও ভদ্রতা?

গত বৎসর ভাদ্র মাসের মহিলাতে, "তুমুল আন্দোলন এবং মহিলাদের প্রতি নিবেদন," শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদিগের যোগদান স্বাভাবিক নয়, এইরূপ ভাবে কিছু লিখা হইয়াছিল। মহিলা প্রকাশিত না হইতেই কোন সূত্রে আন্দোলনকারীগণ জানিতে পারিয়া সতের আঠার জন আমাদের অফিসে আসিয়া মহিলার সেই অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন প্রধান বক্তা "লর্ড কুর্জ্জন অহঙ্কারী, অত্যাচারী ও দুর্ব্বিনীত" বলিয়া গালি দিয়া এবং আমাকে ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইংলিসম্যান ও পায়নিয়র যেমন বাঙালী বিদ্বেষী, অনেক মিথ্যা কথা লিখে আবার এদেশের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকা ইংরাজ বিরোধী, অনেক অসত্য কথা লিখে, গর্ভনমেণ্টের পক্ষে সত্য গোপন করে, নিজেদের কথা গভর্নমেণ্টের বিপক্ষে তিলকে তাল করিয়া প্রকাশ করে। আমি ইহার বহু প্রমাণ পাইয়াছি। এই ভীষণ আন্দোলন ও গোলযোগ উপস্থিত করিয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে চির বিচ্ছেদ ঘটাইবার মূলে কয়েকজন দায়িত্ববিহীন বক্তা এবং কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদক। কোচবিহার বিবাহোপলক্ষে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে সাধারণ্যে ঘৃণিত, নিন্দিত ও অপমানিত করিবার জন্য যেমন অনেক কৌশলচক্র হইয়াছিল, এই ব্যাপারে সেরূপ হইয়াছে ও হইতেছে।

আপনি একজন জনহিতৈষী, সদাশয় ও মহাশয় ব্যক্তি। যুবক ও বালকগণ আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত মান্য করিয়া চলে। যাহাতে তাহাদের মনে বিনয়, সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয়, ইংরাজ জাতির সঙ্গে বাঙ্গালীর বিচ্ছেদের রেখা

দৃঢ়ভূত না হয়, তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাচর্চ্চা না করিয়া যেন তাহারা তাঁহাদের গুণ গ্রহণ ও উপকার স্বীকার করে, রাজনৈতিক আন্দোলনে মত্ত বালক বালিকারা স্বাভাবিক নম্রতা ও কোমলতা বিসর্জন দিয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া যেন অস্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহারা যেন বক্তৃতার পূজা না করিয়া সুনীতি ও চরিত্রের পূজা করে, প্রার্থনা করি আপনি সযত্নে সেই পথ প্রদর্শন করিবেন। এবারকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল কি প্রমাণ করিতেছে না যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মত্ততায় ছাত্রদিগের পাঠে নিরতিশয় অযত্ন ও অনাবিষ্টতা জন্মিয়াছিল? তাহারা যেন ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ-গুরুজনের অনুগত ও বাধ্য এবং সুনীতিপরায়ণ হয়। মিনতি করি আপনি তাহাদিগকে ইহা শিক্ষা দিবেন, এবং নিন্দাচর্চ্চা ও আন্দোলন দৃপ্ত বন্ধুদিগকে সদ্ভাব ও সম্মিলনের সৎ-পরামর্শ দান করিবেন। লোকের কথায় বা লিখায় কোনরূপ ভ্রান্তি দ্বারা পরিচালিত হইবেন না, এরূপ আশাকরি।

আমি গত বৎসর আন্দোলনমত্ত বিপিন পাল প্রভৃতির প্রচারিত "অরন্ধন নিয়ম" এবং "রাখিবন্ধন" বিধিপালন করি নাই। তাহাতে কোনরূপ যোগদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করি নাই। কেন না ঢাকা নগরে রাজধানীর সূত্রপাত আমার দুঃখের কারণ হয় নাই, বরং আনন্দের কারণ হইয়াছে।

ভূমিকা

এদেশে সাধারণতঃ এরূপ নিয়ম প্রচলিত যে, কেহ পরলোকগত হইলে তাহার জীবন সম্বন্ধে সাধারণের কিছু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলে তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু জীবনচরিতাকারে লিখিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। লোক-বিশ্রুত গণ্যমান্য যশস্বী লোকের মৃত্যু হইবামাত্র সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার জীবনের আলোচনা হয়, অনেকে তাঁহার চরিত্রকাহিনী পুস্তকাকারে লিখিয়া প্রকাশ করেন। আমি সেই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নিজের জীবনচরিত নিজে লিখিলাম কেন? বিশেষতঃ আমি একজন জনবিশ্রুত গণ্যমান্য লোক নহি, আমার জীবনে শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ই বা এমন কি আছে যে, লিপিবদ্ধ করা আমার নিজের পক্ষে প্রয়োজন হইল? মনে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। হাঁ সত্য, আমি একজন দেশ-প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণী ধার্ম্মিক লোক নহি, বরং আমার জীবনে শত দোষ-ত্রুটি ও কলঙ্ক ঘটিয়াছে, কিন্তু একদিকে আমি বিধানমণ্ডলীভুক্ত প্রেরিত-শ্রেণীর অন্তর্গত। আমার এরূপ বিশ্বাস যে, আমার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিশেষ বন্ধু পত্রিকাবিশেষে বা পুস্তকাকারে আমার জীবন কিছু না কিছু আলোচনা করিবেন। আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা মৃতব্যক্তির জীবনচরিত লিখেন তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে তাহাতে তাঁহাদের অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি হইয়া থাকে, অনেক সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং অনেক অসত্য সত্যরূপে ব্যাক্ত হয়। অপরের জীবনের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পক্ষেও সহজ নহে। অন্য জনের জীবনচরিত লেখকের বড় দায়িত্ব। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, কোন ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তাঁহার কোন ভাবুক বন্ধু তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে যাইয়া ভাবের স্রোতে পড়িয়া নিজের ভাবুকতার তুলিতে তাঁহাকে এরূপ চিত্রিত করিয়া লোকের নিকটে প্রকাশিত করেন, যেন তিনি আর সেই তিনি নহেন, তিনি অন্য আকারে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হন। পৃথিবীতে সচরাচর দেখা যায়, একজন লোক অপর একজন অযোগ্য লোককে কল্পনাবলে স্বর্গে তোলেন, আবার একজন সুযোগ্য লোককে রসাতলে পাঠাইয়া দেন। এদেশে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, একজন জ্ঞানী বক্তা স্বার্থের জন্য বা খ্যাতির জন্য দুই একটি সৎকর্ম্ম করিয়া যেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তখনই ভাবুক লোকেরা তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে তুলিয়া লইলেন; তিনি ভারতের সমুজ্জ্বল সূর্য্য ছিলেন, ভারতের আকাশ হইতে সূর্য্য স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, ভারত তাঁহার অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে, ভারতের সমস্ত লোক শোকাকুল হইয়া হাহাকার করিতেছে; এরূপ অতিরঞ্জিতরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত

জীবন বিনষ্ট করিয়া থাকেন। খ্যাতিমান ও ক্ষমতাবান্ লোকের মৃত্যুর পর সচরাচর সত্যকে অতিক্রম করিয়া এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়। সত্যের প্রতি আদর থাকিলে এপ্রকার ভাবুকতা ও কল্পনার প্রাধান্য হইতে পারে না। জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হউক, মিথ্যা ও কল্পনার স্রোত বন্ধ হইয়া যাউক, ইহাই প্রার্থনীয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিন্দুকের নিন্দার রসনা, নিন্দার লেখনী কিছু সংযত হয়, কিন্তু প্রিয়জনের মৃত্যুতে অসংযমী ভাবুক স্তাবকের প্রশংসা ও স্তুতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সচরাচর উহা অনিবার্য্য বেগ ধারণ করে।

নিজের জীবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে নিজে যে রূপ জানেন, এবং যথাযথ বলিতে পারেন, অপর লোকে কখনও সেরূপ জানিতে পারেন না, সুতরাং ঠিক বলিতে ও লিখিতে পারেন না। তাহাতে সত্যের অপলাপ হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। একদা কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, ঐহিক লীলা কখন সম্বরণ করিবেন কে জানে? এখনই আপনার জীবনচরিত আপনি নিজে লিখিয়া রাখুন, তাহা হইলে ঠিক লেখা হইবে। তাহা সাধারণের নিকটে প্রচার করা না হউক, আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের নিকটে প্রচার হইতে পারে।" তখন হইতে আমি উহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এক্ষণ আমার বয়ঃক্রম সত্তোর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, পরলোকে প্রস্থানের কাল দূরে নহে। অল্পলোকের এরূপ দীর্ঘ জীবন হয়। আমি এই সত্তোর বৎসরের জীবনে সুখদুঃখ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস অবিশ্বাস আলোক অন্ধকারাদি পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এই জীবনের উপর দিয়া অনেক বিপৎপরীক্ষা গিয়াছে, আধ্যাত্মিক সম্পদুন্নতিও ভগবৎ-কৃপায় প্রচুর লাভ হইয়াছে। আমি ভগবানের বিশেষ প্রেম ও করুণা এই পাপজীবনে ভোগ করিয়াছি। তিনি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছেন, সত্যধনে ধনী সুখসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন, এই পাপীকে পদাশ্রয় দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই তৃণতুল্য অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে পবিত্র বিধানের কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়াছেন। আমার জীবনে ভগবানের কৃপা যে কত প্রকাশ পাইয়াছে অন্য লোকে এমন কি নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পর্য্যন্ত তাহা অল্পই জানেন। আমি স্বীয় জীবনে প্রেমময় বিধাতার জীবন্ত প্রেমের লীলা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগতে স্বয়ং তাহার সাক্ষ্য দান করার উদ্দেশ্যে এই আত্ম-জীবন পুস্তক লিখিলাম। ইহা আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকদিগের হস্তে সমর্পিত হইতে পারিবে, আমার জীবদ্দশায় সাধারণের নিকটে প্রচার এবং পত্রিকাদিতে সমালোচিত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

আত্মজীবনী

উমেশচন্দ্র দত্ত

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজের বিষয় ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১২৪৭ সালের ৩রা পৌষ কৃষ্ণপক্ষ-নবমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করি। স্থান—মজিলপুর বাটী।

বাল্যকালের কথা যতদূর স্মরণ হয়, কিনি-ঝি বড় আদর করিত। পুরোহিতদিগের প্রতিবাসী ঠাকরুণদিদি ও ঠাকুরদাস মামা বড় ভালবাসিতেন। বাহ্যাড়ম্বরে বিতৃষ্ণা ছিল, নূপুর পায়ে দিতাম না। রোক বড় ছিল,—যাহা ধরিতাম না হইলে ছাড়িতাম না। আবার মা আসিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলাইতেন। বাল্যসঙ্গিনী ব্রহ্মময়ী শামুকের মুটী ও কাঁটাল পাতার তাস করিয়া খেলাইত। অল্প-বয়সে রক্ত আমাশয় হয়, জীবন সংশয় হইয়াছিল। রাঙ্গা কৌটায় চিনি খড়িকায় করিয়া খাইতাম। পিতা প্রতিদিন পরে মিঠাই কিনিয়া দিতেন।

বিদ্যারম্ভ—জগু-গুরুমহাশয়ের ও বাসার পাঠশালে এবং নূতন স্থাপিত বাঙ্গলা স্কুলে দাদার সহিত যাইতাম। হাতে-খড়ি হইবার পূর্ব্বে লেখা আরম্ভ হয়, মামা নূতন তালপাতা পাঠাইয়া দেন। লেখা পাইত এবং পাইত না। প্রতিদিন এক-একটী নূতন লেখা শিখিতাম। ৬।৭ বৎসরের সময় চন্দ্র-গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ভরতি হই।

১৮৫০, দশবৎসরের সময় পিতৃবিয়োগ হইলে লেখাপড়া বন্ধ হয়। পরে এ পাঠশালা সে পাঠশালা করিয়া স্কুল বাড়ীতে মুক্তারামের পাঠশালে যাওয়া যায়। সেখানে পরীক্ষা করিয়া ব্রজনাথ-বাবু সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দেন। পরে তিনি তাঁহার বাটীতে লিখিতে নিযুক্ত করেন।

বাঙ্গালাস্কুলে বর্ণমালার ক্লাসে ভরতি হই। অল্পদিন পরে শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় একেবারে ৩।৪ উপরে নীতিকথার ক্লাসে তুলিয়া দেন। যে শ্রেণীতে থাকিতাম প্রায়ই প্রথম থাকিতাম। অতি শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম হইলাম।

ব্রজনাথবাবুর সহিত মিলনে তাঁহার অভিধান-লেখায় অনেক প্রকার জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, কিন্তু এখানে তাঁহার পুত্র শিবকৃষ্ণ-বাবুর সহিত একত্র হওয়াতে ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সুবিধা হইল।

"বিদ্যাবিলাসিনী" নাম্নী একটী সভা করা যায়, গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। রচনা লেখা ও ভাল পুস্তক পড়া হইত। শিবকৃষ্ণবাবু উৎসাহ দিয়া রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা-পাঠের সুবিধা করিয়া দেন। প্রতি সপ্তাহে ছাত্রগণ ও অপর লোক একত্র হওয়ায় বিশেষ উপকার হইত।

পুস্তক পাঠ—বাল্যকালের একটী নেশা। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশীবিলাশ পুস্তক পড়িতে শিখি। পরে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি পুঁথী নিজের আমোদের জন্য ও পাড়ার মেয়েদের শুনাইবার জন্য পড়া যাইত। দোল খরচের পয়সা প্রভৃতি

দ্বারা পুস্তক কিনিতাম। মামা এ বিষয় সহায়তা করিতেন। একখানি পুস্তক সঙ্গে না লইয়া কোথায়ও যাইতাম না। সভায় লাইব্রেরী হওয়ায় পুস্তক পাঠের সুবিধা হয়।

পুস্তক লেখা—বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় একজন বাল্যসখা ছিলেন। তাঁহার বাটীতে গিয়া নানাবিধ পত্ত লিখিতাম, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়। অনেকগুলি সঙ্গীত সঙ্গীত-রত্নাবলীতে মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গহিতার্থিনীর' সহকারী সম্পাদকত্ব করা যায়।

ইংরাজী শিক্ষা—ইহার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, কিন্তু অবস্থা গতিকে হইয়া উঠে না। সাহেব মাষ্টার স্কুল করিলে কাঁদিয়া পড়িলাম, মা কষ্ট করিয়া ৷৹ আনা মাহিনা দিয়া ভরতি করিয়া দিলেন। কিরূপ কষ্টে অথচ ঈশ্বর-কৃপায় স্বাবলম্বনে শিক্ষা হইতে লাগিল! দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনে সাহেব-মাষ্টার চলিয়া গেলে শিক্ষা বন্ধ হইল। যাদব-মাষ্টার পরে শিক্ষা দেন। পরে চন্দ্র-মাষ্টার মহাশয়ের কাছে রীতিমত শিক্ষা হয়। তৎপরে মজিলপুর ইংরাজী-স্কুল ও নব মাষ্টার। শিবকৃষ্ণবাবু ঘরে Denius grammar ও Reader No IV পড়াইয়া প্রথম-শ্রেণীস্থ করিয়া দেন। পুস্তকাদির সাহায্য তাঁহার দ্বারাই হয়। ইহাদিগের সাহায্যে ভবানীপুরে আসিয়া মিশনারী স্কুলে পড়া ও এণ্ট্রান্স পাস হওয়া। গৌরবাবুরা কত ভদ্রতা সহকারে রাখিয়াছিলেন। উমেশ খৃষ্টান কত অনুরাগী।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে আসাতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ। তথায় বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ। ইহার তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়। দেশে-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মোপাসনা-শিক্ষা হয়। হরিদাসবাবু ও হেমবাবু উৎসাহ-দাতা। কেশববাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়।

শিবকৃষ্ণবাবু Guardian angel হইয়া দেখা দেন। কি ভালবাসাই বাসিতেন! কি নিঃস্বার্থ বন্ধুতার কার্য্য করিতেন! তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা, লেখা শিক্ষা এবং বিচার শিক্ষা প্রভৃতি হয়। মহৎ লক্ষ্য সাধনে উৎসাহ হয়। কলিকাতায় আসিবার সুযোগ হয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁহার সহিত বন্ধুত্বে মজিলপুরে কি উন্নত অবস্থায় ছিলাম। তাঁহার-উদ্যানে আসিয়া সঙ্গীতাদিতে কি উপকার করিত। তাঁহার কার্য্য সাধনে কত উপকার হইত। মানুষে মানুষের এত উপকার করে দেখি নাই।

১৮৬০-৬১ মেডিকেল কলেজে পাঠ। বিজ্ঞান অনেক শিক্ষা হয়। কিন্তু কলেজ কি অস্বাভাবিক স্থান বলিয়া বোধ হইত। জ্যেষ্ঠের পীড়া বালকদিগকে কলিকাতায় লইয়া আসাতে কষ্টের কি বৃদ্ধি হয়। মস্তকের ও চক্ষুর পীড়া। শেষ স্কলারসিপও শেষ, কলেজও ছাড়া।

১৮৬২ সালে জয়নগরে মাষ্টারী। কালীনাথের সহিত মজিলপুরে ইংরাজী স্কুলে

পড়া যায়। শিবকৃষ্ণবাবুর যোগে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহার আকর্ষণ। এক্ষণে মজিলপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ ধর্ম্ম-চর্চ্চা কালীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ।

মজিলপুরে ধর্ম্মান্দোলনে সমাজচ্যুত হইতে হয়। ঠাকুর মাতার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে শ্রাদ্ধে ইহা গুরুতর হয়। জয়নগরে কার্য্য ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিতে হয়।

ট্রেনিং একাডেমিতে একটিনী। পরে হিন্দুস্কুলের ৮ম শ্রেণীতে শিক্ষকতা। মেডিকেল কলেজে পাঠের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। বাঙ্গাল ছাত্রগণ, বিজয়বাবু প্রভৃতি এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত একত্র যোগ হয়। হিন্দুস্কুলে চাকরীর সময় দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুর যোগে ব্রাহ্মসমাজের আশ্চর্য্য দৃশ্য! কতকগুলি ধর্ম্মবন্ধুর সহিত মিলন ও বামাবোধিনী প্রচার।

১৮৬৪-৬৫ নিবাধই বিদ্যালয়। স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা ও ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট লাভ inspiration পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৬৬—রাজপুরে আসা, রাজপুরে স্কুলে ২য় শিক্ষক।

১৮৬৭-৭০ হরিনাভি স্কুলের কার্য্য। হরিনাভি সমাজস্থাপন।

১৮৭০-৭৪—কোন্নগর—আশ্রমে বাস—ছাপাখানা—ধর্ম্মসাধন ও ভারত সংস্কারক।

১৮৭৪—কলিকাতা স্কুল ও N. L. Normal school ৬ মাস।

১৮৭৪-৭৮—হরিনাভি, ছাপাখানা, Bengal joint stock Co.

১৮৭৮—শেষ ৬ মাস বেথুন স্কুল।

১৮৭৯-১৯০০—সিটি স্কুল।

কলিকাতা হইতে আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুর প্রায় ১৪।১৫ ক্রোশ দূরে। ইহা ভদ্রলোকের বাসভূমি, একটি গণ্ডগ্রাম। এক সময় এই গ্রামের মধ্যেই ৪।৫টী সংস্কৃত চতুষ্পাটী ছিল এবং অন্যূন ৫০ খানি দুর্গা প্রতিমার পূজা হইত। অধিবাসীদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। কায়স্থ দত্ত জমিদার প্রায় একাধিপতি; কারণ অধিকাংশ লোক, হয় তাঁহাদের সরকারে কাজ করেন, নয় তাঁহাদের অধিকারে জমি জমা করেন। জমিদারদের সৎকীর্ত্তি অনেক এবং তাঁহারা দোল-দুর্গোৎসব, পাল-পার্ব্বন ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, সভা, মহোৎসব, ভোজ প্রভৃতির দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগকে আমোদিত ও পরিতৃপ্ত করিয়া বশীভূত করিয়া রাখিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-চর্চ্চার প্রথম সূচনা—আমরা ১৮৫২-৫৩ সালে আমাদের গ্রামস্থ হার্ডিঞ্জ-স্থাপিত বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। উচ্চতম শ্রেণীতে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" পুস্তক পাঠ করি। গ্রামের জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া প্রসিদ্ধবাবু ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আমি তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদি নকল করি। আমার বাঙ্গলা লেখা পরিষ্কার বলিয়া তিনি পছন্দ করিয়া সেই কাজের ভার আমাকে দেন। এই বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণবাবু ভবানীপুরে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাটীতে থাকিলে আমাকে স্নেহ দেখাইতেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতে হইল। তিনি তত্ত্ববোধিনীর নিয়মিত পাঠক ছিলেন,

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং সকল বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ দেখা যাইত। তিনি আমাকে বলিতেন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যাহা লেখা থাকে সব সত্য এবং সেই পত্রিকা পাঠ করিতে দিতেন। তাঁহার নিকট রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা ছিল, তাহাও পাঠ করিতে দেন। পরে আমাদিগকে লইয়া তত্ত্ববোধিনী-সভার অনুকরণে এক সভা সংগঠন করেন। তিনি তাঁহার সম্পাদক, আমি সহকারী সম্পাদক। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রচনাদি শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদ্যা-বিলাসিনী নামে এক সভা ছিল, তাহাকেই তিনি উন্নত ও বিস্তৃত আকারে গঠন করেন। এই সভার অধিবেশন-স্থলে প্রথমে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা হইতে একটী প্রবন্ধ পঠিত হইত, পরে সভ্যদিগের নির্দ্দিষ্ট-রচনা হইয়া পঠিত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। শেষ সভাপতির মীমাংসা নির্দ্ধারিত হইত। অনেক সময় সম্পাদকই সভাপতির কার্য্য করিতেন। এই সভার আলোচনার ফলে মাদক সেবন ও আমিষ ভোজন-পরিত্যাগ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার, বাল্য বিবাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহের সহায়তা বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কার সভ্যগণের মনে বদ্ধমূল হইল। প্রথম দুইটী অনেকে কার্য্যেতেও পরিণত করিলেন। এই সঙ্গে একেশ্বরের উপাসনাতেও অনেকের অনুরাগ হইল।

জমিদার সন্তান, হরিদাসবাবু ভবানীপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে পড়িতেন এবং ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজেও যাতায়াত করিতেন। তিনি দেশে থাকিলে কখনও কখনও তাঁহার উদ্যানবাটীতে ব্রহ্মোপসনা হইত। "নমস্তে সতে", ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি এই সকলের ছাপা কাগজ আনিয়া তিনি আমাদিগকে অভ্যাস করিতে দিতেন, শিবকৃষ্ণবাবু ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা পুস্তক অবলম্বনে প্রতিদিন উপাসনা করিতে শিখাইতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশও দিতেন। একদিন তাঁহার মনে হইল দেশের সকল লোককে আহ্বান করিয়া আমাদের সভার এক উৎসব করা যাউক। বঙ্গ বিদ্যালয়ের গৃহ ছবি পুষ্প পল্লবদ্বারা সুসজ্জিত হইল, আলোকমালায় গৃহ উজ্জ্বল। জমিদার বাটীর যুবকেরাও সাজসজ্জা দিয়া অনেক সাহায্য করেন। দেশের প্রধান লোক অনেকে সমাগত হইল। জয়নগরে এক সুগায়ক কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন,—আমি "ধর্ম্মের আবশ্যকতা বিষয়ে প্রবন্ধ পড়ি—সভার কার্য্য বেশ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরদিন প্রচার হইল—ছোকরারা জুটিয়া ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। গ্রামে মহা হুলস্থুল। জমিদারের নেতৃত্ব লইয়া ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন—এ সভাতে যাহার সন্তান হউক যাইলেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। শিবকৃষ্ণবাবুর উপর সকলের অধিক ক্রোধ ও বিরাগ। ইহার ফল এই হইল, কয়েকটী যুবক গোপনে গোপনে শিবকৃষ্ণবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পিতামহীর স্বর্গারোহণ—পিতামহী অতি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই পতি, পুত্র,

কন্যা সকলকে হারাইয়া পাগলের মত হইয়াছিলেন, পিতা ঠাকুরের মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় ও ক্ষিপ্ত হইয়া যান। তথাপি পৌত্রদিগের জন্য তাঁহার যত্ন ও স্নেহের ক্রটী ছিল না। ধর্ম্মেতে তাঁর অনুরাগ ও বরাবর দেখা যাইত। রাত্রি থাকিতে উঠিয়া দেবতাদিগের নাম ও নানা ব্রতকথা আবৃত্তিতে অনেক সময় কাটাইতেন এবং আহ্নিক পূজা, ঠাকুর দর্শনেও অনেক সময় দিতেন। শেষাবস্থায় কিছুদিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন, ব্রহ্ম-সঙ্গীত প্রভৃতিও আগ্রহের সহিত শুনিতেন। তখন আমাদের তিন সহোদরের কনিষ্ঠ পাঠার্থে কলিকাতায়। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ গৃহে। জ্যেষ্ঠ আমার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী বিদ্যাশিক্ষার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। আমি জয়নগর স্কুলে শিক্ষকতা করি। দেশের মধ্যে ব্রাহ্ম-বন্ধু কালীনাথ, তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদা ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা হয়। পিতামহীর পীড়া একদিন হঠাৎ বাড়িয়া তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। কবিরাজ রামধন বৈদ্য দেখিয়াই বলিলেন, “আর কেন, গঙ্গায় লইয়া চল”। বাটীর সম্মুখে হেদোর ঘাটে আমরা দুই ভাই কবিরাজের সহায়তায় তাঁহাকে লইয়া গেলাম। কবিরাজ “অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম” নাম ডাকিতে লাগিলেন। কিছুদূরে অনেক লোক দাঁড়াইয়া মূক সাক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় জেঠামহাশয়—পুকুরের অন্য পাড় হইতে বলিতে লাগিলেন “অভয় আমাদের মতে কাজ কর্ম্ম করিস্ ত বল্। দাদা বলিলেন, “মশাই এ সময় আসুন একবার, পরে যেমন হয় করা যাইবে।” তিনি জমিদারের দেওয়ান অমনি সরিয়া গেলেন, আর কেহ কাছে ঘেঁসিল না। তখন অপরাহ্ন, বাটীতে মা কাঁদিতেছেন। দাদা বলিলেন, আর কাহাকেও কাজ নাই, চল আমরা দুজনেই সব কাজ সমাধা করিব। তাঁহার বায়ুর ধাতু রুখিলে আর রক্ষা নাই। ভৃত্য কৃষ্ণগোয়ালাকে এক কুড়ুল সহিত দুই ভাইয়ে শব স্কন্ধে গ্রামের প্রান্তে বুড়ার ঘাটে গেলাম। সেখানে কাষ্ঠ লইয়া ভৃত্য চেলা করিবে—জমিদারের দুইজন লোক আসিয়া বলিল এ স্থানে পোড়াইবার হুকুম নাই, অন্যত্র লইয়া যাও। তাহাদের একজন কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা নিরুপায়। কিয়ৎক্ষণ পরে জমিদারের এক ভৃত্য আসিয়া কুড়ুল ফিরাইয়া দিল এবং বলিল, তোমরা কাজ সার আমরা জমিদারকে যাহা হউক বলিব, মড়া আর কোথায় লইয়া যাইবে। আমরা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া—তাঁহার নাম করিতে করিতে ভৃত্যের পরামর্শানুসারে চিতা সাজাইয়া শবদাহ করিলাম। রাত্রি প্রহরেক হইলে বাটী যাইলে মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাবিধি দ্বারে অগ্নি জ্বালিয়া আমাদিগকে যত্ন করিয়া ঘরে লইলেন—কিন্তু সে রাত্রি বাহির বাটীতে থাকিতে হইল।

পরদিন দেশের লোক শবদাহ সম্বন্ধে আমাদের নামে নানাপ্রকার দুর্নাম রটনা করিয়া দিল—কেহ বলে পুতিয়াছে, কেহ বলে অবৈধভাবে দগ্ধ করিয়াছে। মার উপর পাড়া প্রতিবাসীর পীড়ন, সন্তানদিগকে ত্যাগ কর। তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, আমি সব ছাড়তে পারি, ছেলেদিগকে ছাড়িব না, আর তাদের কি দোষে

ছাড়িব। আমাদিগকে চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিতেন—"তোমাদের ত কোনও দোষ নাই দেখিতেছি—তবে লোকে মন্দ বলে কেন? লোকে মন্দ না বলে এমন করে কি চল্‌তে পারিস না।" তিনি ইতিপূর্ব্বেই ব্রহ্ম সঙ্গীত ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে ভালবাসিতেন। অনেক সময় একাদশীর উপবাসে তাহাই শুনিয়া সুখানুভব করিতেন। অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি টান থাকিলেও সমাজের এবং প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া হিন্দু ধর্ম্মমতে শাশুড়ির শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, আত্মীয় কুটুম্বগণ ততই আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু সমাজ ত্যাগে ভবিষ্যতে যে বিপদ তাহাও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জমীদারেরা আমাদের কোনও কোনও বিষয় ক্রোক করিয়া বসিলেন। এক জমীদার পিতামহের বিশ্বস্ততার জন্য প্রদত্ত ১০ বিঘা নিষ্কর ভুমি কাড়িয়া লইলেন—আর ফিরাইয়া দিলেন না। জ্যেষ্ঠ মহাশয় বলিলেন উহাদিগের কৃপাদত্ত সম্পত্তির পুনঃ প্রার্থনা বা তাহার জন্য মোকর্দ্দমা করিব না।

শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমাদের সঙ্কল্প ছিল যে আমরা পৌত্তলিকতার কোন কার্য্য করিব না, তদ্ভিন্ন হিন্দু আচার সকল রক্ষা করিব। তদানুসারে আমরা এক মাস কাল রীতিমত হিন্দু অশৌচপ্রথা রক্ষা করিলাম। এই সময় দেশের দুইটী বন্ধু উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করিলেন—বাবু হরনাথ বসু এবং রমানাথ ঘোষ। হরনাথ কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভাস করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতা, বারুইপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধু সকলকে সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের দিন মজিলপুর উপস্থিত হইলেন। জমিদারেরা শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু জয়নগরের নারায়ণ দীন পাণ্ডে আমাদের সহকারী থাকায় ও বারুইপুরের জমিদারদের ছেলেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে সাক্ষাৎভাবে বাধা দিতে নিরস্ত হইলেন—দেশের জনপ্রাণী আমাদের সহিত যোগ না দেন, এজন্য গোপনে শাসন করিয়া দিলেন। হরনাথ যোগ দেওয়াতে জমিদার বাটীতে তাঁহার আশ্রয় ও অন্ন উঠিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ গোপাল জমিদারদের প্রাচীন ভৃত্য, তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইলেন না। রমানাথ ঘোষ বড় বুদ্ধিমান ও লিপিপটু ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় লেখাপড়া করিতেন। তিনি এই ঘটনার পর এক পুস্তক বাহির করিলেন।

"পাড়াগাঁয়ে মহা দায়—ধর্ম্মরক্ষার কি উপায়।"

তাহাতে মজিলপুর ব্রাহ্মদের নিরুপায় অবস্থা এবং জমিদারদের প্রবল অত্যাচার নাটকাকারে বর্ণিত হয়।

জমিদারদের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধের দিনে বাটীতে মহাসমারোহ হইল কতকগুলি যুবক উপাসনায় যোগ দিলেন—কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পাড়ার মেয়েরা দলে দলে বাটি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। উপাসনাপূর্ব্বক যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। প্রীতিভোজন ও গরিবদিগকে চাউল পয়সা বিতরণ হইল।

জমিদারেরা এখন ব্রাহ্মদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে চেষ্টা করিলেন। আমার জয়নগর স্কুলের ২য় master-এর কাজ ছিল এবং স্কুলের কর্ত্তা হরিদাসবাবু আমার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু দত্ত জমিদারদের অধীনে তাঁহাদের বিষয় আশয়। এ জন্য অতি দুঃখের সহিত আমাকে সার্টিফিকেট দিয়া বিদায় দিতে বাধ্য করিলেন। কালিনাথের হাটের দরুণ বৎসরে ৩৬৫৲ টাকা আয় ছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা বন্ধ করিবার প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু তাহা কোনও কার্য্যকর হইল না। বারাসতে একটী ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়নগরের দুইজন শিক্ষক তাহার সভ্য ছিলেন, অন্ন যাইবার ভয়ে তাঁহারা সমাজের ও আমাদের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন, ইহাতে সমাজটী উঠিয়া গেল।

ইহার পর মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয় লইয়া গোলযোগ হইল। ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে এই বিদ্যালয় ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টীর একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ব্রাহ্মরা নাবালক হারাণ ঘোষের মাতার নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি পাট্টা লইয়া ঘরের পত্তন করেন। জমিদারদের লোকেরা রাত্রে তথাকার গাছ কাটিয়া খুঁটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। এই উপলক্ষে বারুইপুরে মোকদ্দমা হয়। তাহাতে ব্রাহ্মেরা অসহায় হইয়াও জয়লাভ করেন এবং জমিদারের লোকদের তিন মাস করিয়া মেয়াদ হয়। বেলী সাহেব, পরে ছোটলাট সার ষ্টিউয়ার্ট বেলী ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সুবিচার করেন।

আমার জয়নগর পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ১০ সময় একদিন জমিদারের কাছারির সম্মুখ দিয়া স্কুলে যাইতেছি এমন সময় জমিদার গোপালদাস দত্ত এক দরওয়ান দ্বারা সরকারী কাছারি ঘরে তাঁহার নিকট ডাকেন। তথায় তাঁহার কর্ম্মচারিরা ও জামাই হারাণবাবু উপস্থিত ছিলেন।

গো—তোমার বাপ পিতামহ আমাদের অনুগত ছিলেন আর তোমরা আমাদের মান না।

উ—আজ্ঞা, আপনাদিগকে আমরাও দেশের জমিদার বলিয়া খুব মান্য করি। তবে ধর্ম্ম সকলের উপর, আপনাদের অনুরোধে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিব না।

গো—তোমার বাপ পিতামহরা কি ধর্ম্ম করিতেন না, তোমরাই ধর্ম্ম কর?

উ—আজ্ঞা, তাহাদের বিশ্বাসমত তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম এবং তাহার পুরস্কার তাঁহারা পাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস মতে কার্য্য করাই আমার ধর্ম্ম তাহা পালন না করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত ও ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইব।

গো—তোমরা ঠাকুর দেবতা মান না, ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর না, এসব বড় অন্যায়।

উ—মহাশয়, এক ঈশ্বরই উপাস্য দেবতা, আর সব কল্পনা, এসব হিন্দুশাস্ত্রেই আছে, তাঁকে পূজা করিলেই মুক্তি হয়। আর ব্রাহ্মণ বিদ্বান সাধু হইলে আমাদের প্রণম্য। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট জাতির বিচার নাই গুণেরই বিচার।

গো—আমরা দেশের কর্ত্তা জান, তোমাকে এখন যদি প্রহার করি অপমান করি, তুমি কি করিতে পার?

উ—আজ্ঞা, যথার্থই আপনাদের কাছে আমরা কিছুই নই, এবং আপনারা মনে করিলে সব করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর সকলের উপর কর্ত্তা—আমরা বিশ্বাস করি তিনি মারিলে কেহ রাখিতে এবং তিনি রাখিলে কেহ মারিতে পারে না।

গো—সে যাহা হউক, তোমাকে আর কিছু বলি না, কেবল কালিনাথের সঙ্গে একত্র হইবে না বল।

উ—তা কিরূপে বলিতে পারি, তিনি সম বিশ্বাসী, তাঁর কি অপরাধে তাঁকে ত্যাগ করিব।

গো—আচ্ছা আমার একটা কথা রাখ, তাঁহার বাটীতে আমার অনুমতি ব্যতিত যাইবে না।

উ—আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আপনাকে না-জানাইয়া তাঁহার বাটীতে যাইব না।

গো—আচ্ছা তাহা হইলে হইবে। তুমি স্কুলে যাইতেছ এখন যাও।

৺দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ

১৮৬৬ সালে নিবাধই হইতে রাজপুর স্কুলে ২য় শিক্ষক হইয়া আসি। তখন তিনি উক্ত স্কুলের অন্যতম সম্পাদক এবং সকল কার্য্যের ব্যবস্থাপক। তিনি শিবনাথের মাতুল এবং তাঁহার বাঙ্গলা যন্ত্রে একখানা ক্ষুদ্র ইতিহাস ছাপাই; এজন্য তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন শীঘ্র হেডমাষ্টার করিয়া দিবেন। তিনি তখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাটীতে প্রথম কিছুকাল থাকিবার সময় তাঁহার ভগিনীপতি ভুবন ব্রাহ্ম হইবার জন্য ব্যস্ত হন এবং কিছুদিন উপবীত পরিত্যাগ করেন। হেডমাষ্টার লইয়া স্কুলের অন্যতম সম্পাদক গোলক ঘোষের সহিত বিদ্যাভূষণের মনান্তর হওয়াতে তিনি স্কুলের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। আমিও কার্য্য ত্যাগ করি। পরে হরিণাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন এবং আমি তাহারই কার্য্যে নিযুক্ত হই। এই সময়

হরিণাভি স্কুল গৃহেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বে ভুবনবাবুর সহিত সময় সময় উপাসনা, সঙ্গীত ও কাহার কাহার বাটীতে গিয়া ধর্ম্মকথা হইত। হরিণাভিতে অনেকগুলি উৎসাহী বন্ধু মিলিল, তন্মধ্যে কেদার নাথ দে সর্ব্বপ্রধান। তিনি অনেকদিন হইতে আদি সমাজে যোগ দিয়া আসিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইলেও মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন। কলিকাতা আফিসে কাজ করিতেন—বাটী হইতে যাতায়াত চলিত। হরিণাভির বন্ধুগণের মধ্যে হলধরবাবু মহর্ষির সহায় ছিলেন, উমাচরণ, পূর্ণ, মহেন্দ্র, পরশু প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতাদির খুব চর্চ্চা হইত। কেদারবাবু একদিন আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি কিছু সাহায্য করিলে আমি বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ ঘর নির্ম্মাণ করি। আমি কিছু দিই এবং নিজ ব্যয় ও পরিশ্রমে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করেন। প্রতাপবাবু আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এইসব স্কুলের ছাত্ররা আমার প্রতি বড়ই অনুরক্ত। তাহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত যোগ দিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল। অবিনাশ, কাশীনাথ, প্রিয়, চন্দ্র, কেদার প্রভৃতি প্রতি শনিবার আমার সহিত কলিকাতায় যাইত। রবিবার সমাজে উপাসনা করিয়া আবার হরিণাভিতে আসা হইত। বালকেরা আমার ইচ্ছামত সব করিতে প্রস্তুত। ইহাদের সহায়তায় হরিণাভি সমাজ বেশ জল-জলাট হইয়া উঠিল। উপাসনা গৃহে লোক ধরিত না, আমাকেই অধিকাংশ দিন উপাসনা করিতে হইত—ছাত্রেরা বেশ সঙ্গীত করিত। ইহারা আমার এতদূর অনুগত হয় যে, একসময় ইহাদের কয়েকটীকে লইয়া বারাসাত, নিবাধই প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা যায়। অবিনাশ ও কালীকৃষ্ণ "লবকুশ" আখ্যা পান। ছেলেরা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিল—পিতামাতার ক্লেশ হইবে বলিয়া উপবীত ত্যাগ করে নাই—কিন্তু অনেকেই করিতে উদ্যত। তাহাদের অভিভাবকেরা এসকল দেখিয়া বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ভালবাসা এবং বিদ্যাভূষণের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ বাহ্যে কিছু বলিতেন না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্রাহ্মদের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে রাজপুর স্কুলের সম্পাদক হরিণাভি স্কুলের সহিত তাঁহার স্কুল এক করিবার জন্য কয়েকটী কায়দা করেন, তাহার মধ্যে একটী এই যে, ব্রাহ্ম শিক্ষক কেহ থাকিবে না। এতদুপলক্ষে গ্রামস্থ লোকদিগকে লইয়া সভা হইলে বিদ্যাভূষণ বলিলেন, "আমি ব্রাহ্ম-শিক্ষক পাইলে অন্য শিক্ষক রাখিব না।" চিমুখুড়া নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সঙ্গীতপটু ছিলেন—তিনি সমাজে এবং আমার বাসায় আসিয়া সঙ্গীত করিতেন। প্রায় ৪ বৎসরকাল অবাধে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিস্তার হইতে লাগিল। বাড়ীর মেয়েরা ব্রহ্ম সঙ্গীত আগ্রহের সহিত শুনিতেন।

১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকগুলি গুণবান যুবকের সহিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্যরূপে দীক্ষিত হন। ইনি মজিলপুর-নিবাসী, ছাত্রাবস্থায় তত্রত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য সময় সময় আমার নিকট আসিতেন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পুস্তক লইয়া বাটীতে গিয়া পড়িতেন। অতি সুমিষ্ট সরল স্বভাবের বালক।

আমি যখন বিদ্যাভূষণের বাটীতে থাকি, ইনি এক এক শনিবার আসিয়া আমার সহিত যাপন করিতেন এবং অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন, এবং বামবোধিনীর জন্য কিছু কিছু কবিতা লিখিতেন। তখন তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে আসিবেন, সে আশা দুরাশা। তাঁহার পিতা "রাগী ঠাকুর" বলিয়া খ্যাত এবং দেশের একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য। শিবনাথ পিতাকে যমের মত ভয় করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞা বিন্দুমাত্র লঙ্ঘনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। একসময় পিতার আজ্ঞায় ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাষভূণ ও তাঁহার মাতা এই হতভাগিনী রমণীকে তাঁহাদের বাটীতে আনিয়া রাখেন এবং শিবনাথ আসিলে তাঁহার সহিত পুণর্মিলিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ পিতার অসন্তোষ ভয়ে তাহাতে ঘাড় পাতেন নাই। কিছুদিন পরে পিতা তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের স্থির করিযা তাঁহাকে বর সাজাইয়া বিদ্যাভূষণের বাটীতে আসিলেন। তথা হইতে বর্দ্ধমান গিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বিদ্যাভূষণ, তাঁহার মাতা ও পরিজনবর্গ বিশেষ করিয়া বিবাহ বন্ধের চেষ্টা করিলেন। আমরাও শিবনাথকে খুব বুঝাইয়া তিনিও প্রস্তাবিত বিবাহের অবৈধতা স্বীকার করিলেন—কিন্তু বলিলেন, "কিরূপে পিতার হাত এড়ান যায়।" আমরা বলিলাম পালাও। তিনি বলিলেন "আচ্ছা তাহারই চেষ্টা করিব।" কিন্তু বড়ই চতুর ও সপ্রতিভ; তিনি রাত না পোহাইতে পোহাইতে ছেলেকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। শিবনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর শিবনাথ ভবানীপুরে থাকেন, তথায় মহর্ষি ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিয়া নূতন তেজ ও উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন। শিবনাথ তথায় গিয়া ধরা পড়িলেন। তাঁহার নির্ব্বাপিত ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ শতগুণ প্রজ্জ্বলিত হইল এবং তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইসময় যখন মামার বাটীতে আসিতেন তখন আমার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন ও তাঁহার মনের কথা সকল খুলিয়া বলিতেন। সময় সময় পত্রালাপও করিতেন। এইসময় তাঁহার যে অনুতাপ হয়, তাহা আশ্চর্য্য ও স্বর্গীয়, এবং তিনি আমাকে জানাইতেন এক এক রাত্রি অশ্রুপাত করিতে করিতে অবসান হইয়াছে। এইসময় সর্ব্বপ্রকার পাপ কুসংস্কার পরিত্যাগ তিনি উদ্যত হইলেন। আমাদের লিখিয়াছেন, আমাদের কথা না শুনিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন, 'পৈতা আর গলায় রাখিতে পারি না, ইহা সাপের মত কামড়াইতেছে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৈতা পরিত্যাগ করেন।'

শিবনাথের দীক্ষায় দেশে মহা আন্দোলন উঠিল এবং তাঁহার মহাতেজস্বী পিতাকে জমিদারেরা নির্য্যাতন এবং স্বজাতীয় লোক বিধর্ম্মীর পিতা বলিয়া নানাপ্রকারে অবমানিত করিতে লাগিল। তাঁহার পিতামাতা তখন একদিকে শিবনাথকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন, আর একদিকে আমাকে সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া হরিনাভি স্কুল হইতে অন্তরিত করিবার প্রয়াসী হইলেন। বিদ্যাভূষণ ক্রমে রক্ষণশীল ভাব ধরিতেছিলেন, ভাগিনেয়ের এরূপ আচরণে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং কেশব প্রমুখ ব্রাহ্মদিগকে "কৈশব" আখ্যা দিয়া তাহাদিগের সংস্কার প্রিয়তার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে

আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা, বিশ্বাস ও আশা। আমাকে বিদ্যালয় হইতে কি বলিয়া ছাড়াইয়া দেন। তিনি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া আমি বাড়াবাড়ি না করি এবং দেশের মধ্যে ইহার আর প্রচার না হয়। তিনি দেশের লোকের বিরাগ জানাইয়া বলিলেন, "দেখ তুমি বুঝিয়া না চল, তোমার এত যত্নের স্কুলটির অনিষ্ট হইবে।" পরে এই দাঁড়াইল, হয় আমাকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান বন্ধ করিতে হয়, নয় স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। আমি বলিলাম "ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি"। তখন কি খাইব, কোথায় যাইব? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর "আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বর যা করেন।" কার্য্য পরিত্যাগ করা হইল—স্কুলের ছাত্রগণ কাঁদিয়া আকুল। মাষ্টার ও ছাত্র পরস্পরের অশ্রুজল মিশাইয়া যে বিদায় দৃশ্য তাহা অবর্ণনীয়।

হরিনাভির কাজ ত্যাগ হইল। ত্রৈলক্য আমার বাসায় আশ্রিত আত্মীয় ও ছাত্র ছিলেন, তিনিও আমার অদৃষ্টের সহিত অদৃষ্ট মিশাইয়া আমার সহিত ভাসিলেন। হুঁকোর দোকানের উপর কয়েকটী প্রচারক বাস করিতেন, তাঁহাদের সহিত বাস করি, আর নগদ পয়সা দিয়া এক পাচকের রন্ধন পরমানন্দে ভোজন করি। হরিনাভির শেষ একটী আধলা ছিল। বামাবোধিনীর সামান্য আয়ে তখন দিন চালান হইত।

হরিনাভির কাজ ত্যাগ হইল কিন্তু সমাজ ছাড়া হইল না। কলিকাতার আরও ২।১টী বন্ধুকে লইয়া প্রতি শনিবার রাত্রে উপাসনা করা যায়—প্রিয় ছাত্রগণ আসিয়া যোগ দেন। উৎসাহী ভ্রাতা হরনাথ এ সময় খুব সহকারিতা করেন, এবং প্রতি রবিবার হরিনাভিতে আইসেন। একরাত্রে আমরা উপাসনা করিতেছি—এমন সময় বাহিরের কতকগুলি লোকে হৈ চৈ আরম্ভ করিল। এ সময় গৃহস্বামী কেদার লাহোরে কর্ম্ম করেন ও তথায় সপরিবারে আছেন। আমরা বাহিরের কোনও গোলযোগ গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলাম। "অসত্য হইতে সত্যতে লইয়া যাও" প্রার্থনা আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময় একজন আসিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। আর কয়েকজন আসিয়া দেশের বালকদিগকে ধরিয়া রাস্তায় ও তাহার ধারে কচুবনে ফেলিয়া দিল। তখন প্রার্থনা শেষ করিয়া উপাসনা বন্ধ করিতে হইল। ছাত্রদিগের কেহ কেহ গা ঝাড়িয়া আসিয়া জুটিলেন—কাহাকে কাহাকে অভিভাবকেরা ধরিয়া বাটীতে লইয়া গেল। পরে জানা গেল, আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়াও সমাজবদ্ধ করা গেল না, ইহাতে দেশের লোক, বিশেষতঃ তত্রত্য জমিদার জাতক্রোধ হইয়া উপাসনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা নিরুৎসাহ হইবার নই। পর শনিবার আবার কয়েক বন্ধু মিলিয়া আসিলাম কিন্তু দেখিয়া অবাক হইলাম—সমাজ ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর এক কালী-প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার পূজার ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিরাশ হইয়া কোথায় যাই ভাবিতেছি এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিলেন "প্যারীবন্দি বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন, অদ্য রাত্রে তাঁহার বাটীতে

যাইতে হইবে।" আমরা যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—আপনাদের উপাসনার জন্ম বিছানা প্রস্তুত। যতদিন অন্যস্থানে না হয় এখানে ব্রহ্মোপসনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা, আমরা তাই প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং প্রাণ ভরিয়া উপাসনা ও উদর ভরিয়া তাঁহার প্রদত্ত রুটী ও ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলাম।

প্যারী বৈদ্য দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রোগ চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা—তিনি এ অঞ্চলের ধন্বন্তরী বলিয়া গণ্য। লোকটীর খামখেয়াল স্বভাব আয় যথেষ্ট কিন্তু নিজে ও স্ত্রী—চিন্তা কম, কুটুম্ব ও অপর লোকদিগকে ভরণ পোষণ ও সাহায্য করিয়া অর্থের সার্থকতা করিতেন। জমিদারের সহিত কোনও কারণে তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি এ সময় আমাদের সহায় হন বোধ হয়। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক—তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল, কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর গোঁড়ামি ছিল না।

আমাদের, উপাসনা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপসনালয়টী পুত্তলিক পূজার স্থান হইবে এবং আমরা লোকভয়ে তাহার স্বত্ব ত্যাগ করিব, ইহা অন্যায় বোধ হইল। সত্যের জয় হইবেই হইবে, এই ভরসা করিয়া আমরা উপাসনালয়টী উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাহার দ্বারা সাহায্য হইবে তখন জানি না। অনুসন্ধানে জানা গেল ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর জগৎবাবুর পুত্র পুলিসের ইনস্পেক্টর জগৎবাবু আমাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আমাদিগের কার্য্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া পরিচিত করিয়া দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বলিলেন, ইঁহাদের কার্য্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয় তাহা করিবে।

পূর্ণবাবু (বাঁড়ুয্যে) একদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে হরিনাভিতে থাকিতে বলিলেন এবং সেইদিন তিনি ইনস্পেকসনে আসিবেন জানাইলেন। আমরা সেইদিন আসিয়া দেখি হরিনাভিতে হুলস্থুল পড়িয়াছে, জমীদারের লোক এথায় সেথায় দলবদ্ধ। দেশের সব লোকের জমিদারের রায়ে রায় স্থানীয় পুলিস ও ইহকোচ দ্বারা বশীভূত। ইনস্পেক্টরের এজাহারে সকলেই বলিল ব্রাহ্মসমাজও এখানে কখনও ছিল না—এ পাড়ায় রক্ষাকালী পূজার গৃহ। ইন্সপেক্টর উভয় পক্ষের জবানবন্দী লইয়া পুলিসের উপর খুব শাসাইয়া গেলেন। পরে আমরা সাক্ষাৎ করিলে বলিলেন, দেখ আমি সকলি বুঝিতেছি, কিন্তু যাহার দখলে আছে তাহাই রক্ষা করাই আমার কার্য্য, স্বত্বও আমরা মীমাংসা করিতে পারিব না। আপনারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অপেক্ষা করুন, আমি যতদুর পারি সহায়তা করিব। আর যাহারা আপনাদের ধর্ম্মে আঘাত করিয়াছে তাহারা সহজে এড়াইতে পারিবে না। আমাদের না আছে সহায় না আছে সম্বল। ঈশ্বর ভরসা করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগিলাম। আদালতে ২।১টী বন্ধু পাইলাম। যাঁহাদের নাম আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের নামে সমন গেল।

নালিসের পূর্ব্বে গ্রামে মহাজনরব—আমরা গ্রামে পদার্পণ করিলে প্রহারিত হইব

মাথা কাটা যাইবে। মোকৰ্দ্দমার দিন আদালতে গিয়া দেখি, জমীদার সহিত গ্রামের প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত। জমীদার আমাকে দেখিবামাত্র হাতযোড় করিয়া— আপনি রক্ষা করেন ত আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি এ অবস্থা দেখিয়া কি করিব ভাবিয়া পায় না। আমি বলিলাম, আপনাদের কোনও অনিষ্ট হয় আমার সে ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও নাই। আমরা নিরাশ্রয় গরিব লোক, একটি ঈশ্বরোপাসনার স্থান করিয়াছি, আপনারা তাহাতে কেন হস্তা হন, তাহাতে আমাদের উপাসনা করিতে দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। জমীদার তখন আমার অনেক গুণস্তুতি করিয়া বলিলেন দেখুন আপনি বিজ্ঞ সব বোঝেন। আপনারা যে স্থানে উপাসনার স্থান করিয়াছেন, সে পাড়ার মধ্যস্থলে—মেয়েরা তাহার চারিদিকে চলে বলে। আমি গ্রামের প্রান্ত মৌরসী এক জমি ঠিক করিয়া দিতেছি, তথায় উপাসনা গৃহ করুন। আর যতদিন গৃহ না হয়, আমার উদ্যানবাটী আপনাদের অধিকারে থাকিবে আপনারা স্বচ্ছন্দে আসিয়া তথায় উপাসনাদি করিবেন। আমি আপনাদের উপাসনার পক্ষ বই বিপক্ষ নই। এই বলিয়া তিনি নালিস তুলিয়া লইবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। জমীদার কি কার্য্য করিয়াছেন, আগে বুঝেন নাই, পরে উকিলের মত লইয়া বুঝিয়াছেন ধর্ম্ম বিদ্বেষীর কার্য্যে অতি গুরুতর দণ্ড তাহাতেই ভয় পাইয়াছেন।

আমরা তখন বলিলাম, "আমাদের নিজের একটু স্থান পাওয়াই আবশ্যক। তা কবে কিরূপে হইবে? তা না হইলে তুলিতে পারি না?" তিনি বলিলেন "এখনি হইবে সব প্রস্তুত"। এই বলিয়া কেদার বুড়া ও বৈমাত্র ভ্রাতা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের এক জমীর পাট্টা লেখাইলেন এবং সেই দিনই রেজিষ্টারী হইল। আমরা মোকৰ্দ্দমা তুলিয়া লইলাম। জমীদার স্ববর্গসহিত অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।